চিরঞ্জীব বনৌষধি

আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

অলংকরণ : বিপুল গুহ

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৮৩

মূল্য : ২৫·০০

উৎসর্গ

আমার অগ্রজ আয়ুর্বেদ-দীক্ষাগুরু স্বর্গত অধ্যক্ষ
বিজয়কালী ভট্টাচার্য, এম. এ., স্মৃতিতীর্থ, বেদান্তশাস্ত্রী
মহাশয় চরণাম্বুজেষু

গ্রন্থকার

এই গ্রন্থের মহনীয় বৈদিক তথ্যের সংযোজনায় ও সংহিতা
সূত্রের সৌকর্য্যে আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ বেদজ্ঞপণ্ডিত

আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, শাস্ত্রী

কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ন্যায়-
শাস্ত্রীজীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা-প্রীতির
অভিজ্ঞান অর্পণ করি।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতা কি? এই প্রশ্ন উঠিলেই মনে জাগে বেদের কথা। বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানের বিশাল প্রাঙ্গণটি যে পূর্ণাঙ্গ রূপ লইতে চালিয়াছে তাহাতে ভারতের দান সুমহান, তবে আমরা দীর্ঘকাল বিজ্ঞানের অনুশীলনে বিরত ছিলাম। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিতে শাস্ত্রের অনুশীলন করি নাই।

বেদবিদ্যা-নিঃসৃত আয়ুর্বেদের দানকে বিংশ শতাব্দীর মানব-সভ্যতা নত শিরে গ্রহণ করিয়া সুদূর ভবিষ্যতকে সত্যদর্শনের পথে লইয়া চলিতেছে, এই সত্যদৃষ্টি লইয়া যাঁহারা আজ আয়ুর্বেদবিদ্যাকে দেখিতে চান তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিবার মত একখানি ভাল গ্রন্থ 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'।

এই গ্রন্থে বেদের সূক্তি উল্লেখ করিয়া দেশীয় উদ্ভিদের পরিচয় দিয়া গ্রন্থকার ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম সুহৃদ্ আয়ুর্বেদের প্রাচীনকালের, মধ্যযুগের এবং আধুনিককালের চিকিৎসাবিদ্যার একখানি দর্পণ রচনা করিয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন—

> উদেতি পূর্বং কুসুমং ততঃ ফলং
> ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
> নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রমঃ
> তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ॥

অর্থাৎ প্রথমে ফুল ফোটে তারপর ফল, প্রথমে মেঘ তারপর বৃষ্টি। কার্যকারণের ইহাই ক্রম, কিন্তু তোমার প্রসাদের পূর্বেই সম্পদের প্রাপ্তি হইয়াছে।

ঠিক এইভাবে স্রষ্টার করুণা উপলব্ধির জন্য জগতের রোগ দূর করিয়া দিতে প্রথমে ভেষজের প্রকাশ পরে আয়ুর্বেদের সৃষ্টি।—সোঽয়মায়ুর্বেদঃ ভৈষজ্যবেদমাদিশেৎ শাশ্বতঃ।

আদিতে বেদ একটিই ছিল, পরে বেদ বিভক্ত হয় চারভাগে। সমগ্র বেদের দ্বারাই জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

শতং হ্যস্যভিষজঃ সহস্রঃ বিরুধঃ (অথর্ববেদ ২।৯।৩)—তুমি ভিষক্‌রূপে এবং সহস্র সহস্র ভেষজ, বৃক্ষ, গুল্ম, লতারূপে আমাদের কাছে প্রকাশিত হও।

বেদের সূক্তি অবলম্বন করিয়া ভারতে ভূরি ভূরি আয়ুর্বেদগ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

যদিও সেই সব প্রাচীন গ্রন্থ বহুলাংশে দুর্লভ তথাপি পরবর্তীকালে ভেল, ক্ষারপাণি, অগ্নিবেশ, নবনীতক প্রভৃতির রচিত কয়েকখানি সংহিতাগ্রন্থে তাহাদের সারসংকলন দেখিতে পাই।

কালের বিবর্তনে আলো, মাটি, জলের ন্যায় আয়ুর্বেদসংহিতাগুলিতেও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হইয়াছে। এইসকল পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'। এই গ্রন্থে অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতীয় বনৌষধিগুলির পর্যালোচনা সম্পর্কে সমীক্ষাও করা হইয়াছে। প্রতিটি ভেষজের রাসায়নিক সংযুতির (Chemical composition) আলোচনার দ্বারা ভারতের বনৌষধির রস, গুণ, বীর্য বিপাক প্রভৃতি রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কতখানি কার্যকর তাহা এই গ্রন্থে তীক্ষ্ণদৃষ্টিসহকারে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে এক বিশেষ বিজ্ঞান অতিদেশের অভিব্যক্তিও (extended knowledge from Ayurveda) এই গ্রন্থে সমালোচিত হইয়াছে, যে জ্ঞানের পরিণতি টোট্‌কা ঔষধ।

সত্য কথা বলিতে কি, বর্তমান নববিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এইসব গাছ-গাছড়ার তৈয়ারী টোট্‌কা ঔষধ রোগনিরাময়ের উপায় বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত হয় না, কিন্তু এই পুস্তকে টোট্‌কা ঔষধগুলির গুণাগুণসমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনাই করা হইয়াছে। দেহের কোন্ ধাতুর বিকারে কি ধরণের রোগোৎপত্তি হয় তাহার সংবাদ দিয়া এই আলোচনা এক নূতন পথের সন্ধান দিতেছে।

গ্রন্থপরিশেষে "রোগ ও পথ্য" একটি সুচিন্তিত রচনা। চিকিৎসক কিংবা জনসাধারণ সকলেই অসুখ-বিসুখের সময় পথ্য বিবেচনা বিষয়ে সমস্যায় পড়েন। যে কোন অসুখ হউক সাগু-বার্লি আর হরলিক্‌স্ এবং আপেল-ন্যাসপাতি ছাড়া আর যেন কোন খাদ্যই আমাদের ভাবনায় আসে না। কিন্তু রোগের সূচনা হইতেই তাহার নিদান ও বিকাশের এবং রোগ নিরাময়ের সময়েও যে প্রচলিত ভারতীয় খাদ্য হইতে পৃথক পৃথক পথ্যের নির্দেশ দেওয়া যায় সেই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার নিজের বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন।

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য বৈজ্ঞানিকতার, প্রজ্ঞার সঙ্গে রসবোধের এক মেলবন্ধন এই গ্রন্থটি।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের চিরাচরিত ধারাকে এই গ্রন্থ যেমন স্বমহিমায় দীপ্ত হইতে সাহায্য করিবে, সেইরূপ নব্য বিজ্ঞানীকেও অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দিবে। সাধারণ মানুষও এই গ্রন্থপাঠে রোগমুক্ত জীবনযাপনের পথ খুঁজিয়া পাইবেন।

এই গ্রন্থটি সকল দিক হইতে আমাদের হিতকারী ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থকার কবিরাজ শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য আয়ুর্বেদাচার্য সুদীর্ঘ সুস্থজীবন লাভ করিয়া দেশের ও দশের উপকার সাধন করিতে থাকুন, ইহা সর্বথা কাম্য।

গ্রন্থশংসন

বীজে অংকুর হলেই গাছ হতে পারে এটা ভাবা সত্যি, তবে ক্ষেত্র ও কাল তার উপযোগী হওয়া চাই।

এই গ্রন্থ-প্রকাশের একটা ইতিহাস আছে, যেটায় আমার বৈদ্যকজীবনে দু'টি কথা মনে দানা বেঁধে ছিল, সেটি হলো—কি ও কেন? এই নিয়েই আমার অনুশীলন-পরিক্রমা, গ্রন্থোক্ত প্রতিটি নিবন্ধ পাঠ করলে সে অনুভূতিটা আপনারও হবে।

আমার বৈদ্যকজীবনের এক-একটি স্তরে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এক-একটি ক্রমের অভিজ্ঞতা এসেছে।

একবার দিল্লী থেকে সন্দিগ্ধ ভেষজ কমিটি এসেছিলো। সেই কমিটির সদস্যরা ছিলেন সমগ্র ভারতের বাছাই করা বিদগ্ধ বৈদ্য, অন্য শাস্ত্রেও পণ্ডিত; কলকাতায় অধিবেশনকালে তাঁদের সংগে, আলোচনায় অংশগ্রহণও করেছিলাম। তাঁরা তারিফও করলেন বটে, কিন্তু আমার একটা ইন্‌ফিরিওরিটি কম্‌প্লেক্স (Inferiority complex) এসেছিলো তখন; যেহেতু পাশ্চাত্য বোটানিটা আমার অধিগত ছিল না।

নতুন ক'রে ছাত্রজীবন আরম্ভ হলো আমার—শিবপুর বোটানিক্যাল্‌ গার্ডেনে। সকালে রুটি নিয়ে কলকাতা থেকে যাত্রা করতাম, সমস্তদিন গাছতলায় ঘুরি, নাম মুখস্থ করি, নতুন নতুন গাছের সংগে পরিচিত হই। উত্তর বয়সে আমার উৎসাহ ও আগ্রহটা অনুকম্পার সংগে দেখতেন ওখানকার জ্ঞানবৃদ্ধ আমার যোগীনদা (নস্কর), আর মহাদেববাবুকে সংগে নিয়ে বাগানে ঘুরতাম; ওখানকার কর্তাব্যক্তি যাঁরা, সকলেই আমাকে সাহায্য করেছেন বিভিন্ন বিষয়ে।

এই প্রসংগে আর একটি তথ্য আপনাদের জানাই—দিল্লী থেকে অষ্টাংগ আয়ুর্বেদ কলেজে যে কমিটি এসেছিলেন, তাঁরা প্রথমেই দেখতে চেয়েছিলেন আমাদের হার-বেরিয়াম্‌; তখন বেয়াকুবের হাসি হেসে বলতে হয়েছিলো—না, ওটা তো আমাদের নেই। সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—নাঃ, এ অভাবটা আমাকে পূরণ করতেই হবে, করেছিও; আজ সেটাই আমার গ্রন্থ সংকলনের গাঁথুনিতে কাজে লেগেছে। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত বনৌষধির ছবিগুলি তারই প্রতিচ্ছবি।

একবার বড়বাজারে মশলার দোকানে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক (সাপ্লায়ার) মশলার ফর্দ দিচ্ছেন, উদ্ভট উদ্ভট নাম শুনে তখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এগুলি কি মশাই? উত্তর তো দিলেনই না, মনে হয়তো ভাবলেন—বেয়াকুবের সংগে কি কথা কইবো! দোকানদার ভাবটা বুঝতে পেরে আমায় জানালেন—এসব হেকিমি জিনিষ। সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করলাম—নাঃ, এটা আমাকে জানতেই হবে। ৩ বৎসর হেকিম রেখে ও'দের

কি কি আছে বনৌষধি এবং ভারতের চিকিৎসা-শাস্ত্র থেকে কতগুলি তাঁরা গ্রহণ ক'রে তাঁদের ঐ শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন, সেটার হিসাবও এইসঙ্গে হয়ে গেল। এ সবই সংগ্রহ ক'রে চলেছি, এই সংগ্রহের ব্যতিক আমার বৈদ্যকজীবনের ৪০ বৎসর।

তারপর একদিন দেখা হলো—পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো মিঃ এ. সি. দে মহাশয়ের সঙ্গে; ইনি দীর্ঘ ৪০ বৎসর হিমাচল প্রদেশের উত্তরাখণ্ডের পরিব্রাজক অফিসার। আমার সুবিধে হলো—হিমালয়ের গাছের সন্ধানের ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আহরণের। এই সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতাও কাজে লেগেছে।

দ্বিতীয় পর্ব

আনন্দবাজার পত্রিকা পাঁড়—কলকাতার কড়চায় বহু উদ্ভটের সন্ধান দিয়ে থাকেন লেখক, আমিও তার শিকার হলাম। তিনি হলেন সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ—আমার সংগৃহীত ৮০০ শত (বর্তমানে ১০০০) বনৌষধির মধ্যে বেছে নিলেন 'বিশল্যকরণী'; আমায় পরিচিত করলেন দেশের, দশের কাছে। ওখানকার কর্তাব্যক্তিদের ঔৎসুক্য জাগলো, আরও সন্ধান নিতে আসলেন সাংবাদিক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তিনিও মন্ত্রমুগ্ধের মত সব শুনলেন, দেখলেনও সব খুঁটিয়ে। তাঁর লেখনী বাস্তব সত্যকে রূপায়িত করলো—আরম্ভ হলো আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার লেখা।

এই বনৌষধিগুলির লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকার পাঠক-পাঠিকা মহলে একটা সাড়া পড়ে গেল। তখনই এই নিবন্ধ বিশেষ দ্রষ্টব্য ব'লে ব্যাখ্যাত হলো।

দূরদর্শী প্রখ্যাত সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী মহাশয় আয়ুর্বেদের ও জনসাধারণের কল্যাণের জন্য আমার এই ফিচারটাকে ৬ বৎসর স্থান দিয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

পত্রে বহু আবেদন আসতে লাগলো যে—এই লেখা দীর্ঘদিন ধ'রে চলছে, সব আমি পাইনি, হারিয়েও যাচ্ছে, এসব গ্রন্থাকারে প্রকাশ করুন। আজ তাঁদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

এই পুস্তকের ভূমিকা লিখেছেন ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর এম, এ; পি, এইচ্ ডি প্রাক্তন অধ্যক্ষ সংস্কৃত বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সর্বশেষে আমার বক্তব্য এই যে, মালা গাঁথায় পাঁচরকম ফুল দিলে তবেই দেখতে ভাল হয়, সেইরকম এই "চিরঞ্জীব বনৌষধি" গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন ডঃ ফকিরচন্দ্র ঘোষ এম. এস-সি; পি. এইচ. ডি. (কলিকাতা), তিনি সংকলন করেছেন ভেষজের (Chemical Composition) অংশটি; ডঃ এস. আর. দাস এম. এস-সি., পি. এইচ. ডি., তিনি দেখেছেন বোটানী অংশটি; ডাঃ নিরঞ্জন বসু এম. বি. (কলিকাতা) মহাশয় দেখেছেন পাশ্চাত্য চিকিৎসা সম্পর্কীয় তথ্যগুলি, আর লোকায়তিক কিছু কিছু ঔষধের বাস্তব অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন কবিরাজ শ্রীমান্ সুবলকুমার মাইতি, আয়ুর্বেদতীর্থ; এ ভিন্ন লোকায়তিক ঔষধ সংকলনের আদি পর্বে আমায় সহায়তা করেছেন অনুরাধা (দাশগুপ্তা) এম. এস-সি.।

এই গ্রন্থটি আপনাদের তৃপ্ত করলে আরও সেবা করার প্রয়াস পাবো।

বিনীত—

শিবকালী ভট্টাচার্য

ভৈষজ্য দীক্ষায় শ্রুতি (বেদ) পরম্পরা

পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডের আকাশ, বাতাস, জল, আগুনের তারতম্য খুব সহজেই উপলব্ধ হয়। ঋতুগুলিতে কালের ঐক্য থাকলেও তাদের স্বরূপগত এবং গুণ বৈশিষ্ট্যও পরিষ্কার অনুভূত হয়। ভাব, ভাষা, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিও এক হয় না, এইসব বৈশিষ্ট্যের জন্যই। এই সহজ বাস্তব রূপ উপলব্ধি ক'রেই ভারতের সুপ্রাচীন বৈদিক সূক্ত প্রণেতারা আমাদের অন্যতম নিকট প্রতিবেশী বৃক্ষলতাদিও যে এমনি ভূ, অগ্নি, বারি, আকাশ, বাতাসের তারতম্যের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বায় অবস্থান করে এবং তারাও যেন স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় এবং অপরের ইচ্ছায় ভূস্তরের পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বা বুঝে নিজেরা এবং তাদের সন্তানদের জন্য প্রিয় ভূমি যে নির্বাচন করে—এটার রূপ দিয়েছেন ঋক্ যজু অথর্ববেদে এবং সংহিতার যুগের বৃক্ষায়ুর্বেদে।

যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার ১২ অধ্যায়ে ৮০ সূক্ত থেকে সুদীর্ঘ সম্পূর্ণ অধ্যায়-টিতে, ঋক্‌বেদের কয়েকটি মণ্ডলের স্থানে স্থানে এবং অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের প্রায় সর্বত্রই বৈদ্যকগুরু সোমের কাছে বৃক্ষ লতাদির সমাগম এবং তাদের প্রত্যেকের কি কি রোগ দূর করার সামর্থ্য আছে তারই আলাপন।

সেই সূক্তটি এই—

> "ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা।
> যস্মৈ কৃনোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজানং পারয়ামাসি।"

এখন দেখা যাচ্ছে সেই বৈদিকযুগে কথোপকথনচ্ছলে দ্রব্যগুলিকে অনুশীলনের সূত্র দিয়েছেন; পরবর্তীকালে অর্থাৎ সংহিতার যুগে সেটা গুরুশিষ্য সংবাদে রূপান্তরিত, সেইটাই আবার পরবর্তী যুগে 'তদ্‌বিদ্যসম্ভাষা', যাকে বর্তমানের ভাষায় বলা হয় 'সিম্‌পোসিয়াম্‌'।

সেই বৈদ্যকগুরু সোমের কাছে মানবের কল্যাণে তাদের (অর্থাৎ বৃক্ষরাজির) কার কি রোগ নিরাময়ের দক্ষতা আছে সেটাই যেন তারা জ্ঞাপন ক'রেছে। কেউ বললে—'শ্বয়থুঃ গুড়ূচী', আমি গুড়ূচী, ফুলো দূর ক'রতে পারি; আবার কেউ বললে—'নাশয়িত্রী বলাসস্য পৃশ্নিঃ', ক্ষয়রোগ দূর ক'রতে পারি আমি—পৃশ্নিপর্ণী এই রকম 'অর্শসঃ অপামার্গ'। আমি গুদজাত অর্শ দূর ক'রতে পারি। 'পাকায় নিগুণ্ডীঃ'

আমি মুখপাক, ক্ষত, বাতরোগ দূর ক'রতে পারি, আমি 'নিগুর্ণ্ডী'। সোম তখন ডাকলেন অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃক্ষাদিকে; 'পলাশ-ধব-তমালাসনাঃ' অর্থাৎ পলাশ ধব তমাল অসন প্রভৃতিকে। সেখানে বলা হ'য়েছে 'ত্যামুৎ মস্যোষধে বৃক্ষাঃ পরস্পরা উপতিষ্ঠরস্তু'।

অর্থাৎ উত্তম বৃক্ষগণ! তোমরা পরস্পর বলো কে কোন্ কোন্ ব্যাধি দূর ক'রতে পার? এমনি কল্পপ্রশ্ন তুলে বলা হয়েছে যে, এরাও নিজের নিজের রোগনাশক যোগ্যতার কথা বললে—সোম তখন সকলকে একত্র ক'রে বললেন—আপনারা সকলের কল্যাণের জন্য কি সর্বত্র যেতে পারেন? সেখানে বর্ণনা করা হ'য়েছে, কোথায় অর্থাৎ কোন্ কোন্ দেশে কোন্ গাছটি স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে তারও ইঙ্গিত কথোপ-কথনচ্ছলে ব্যক্ত ক'রেছেন—এমনকি কোন্ প্রাণীর ভক্ষ্য সে হ'তে পারে অর্থাৎ কোন্ প্রাণীর সে খাদ্য, সে কথাও বলা আছে।

ওষধির গুণ সম্পর্কে আরও কয়েকটি সূক্তের উল্লেখ করছি—

শর-শণ-অঘম্বিষ্ঠা দেবজাতা বীরুৎ শপথরোপণী।
বভ্রো অর্জুনস্য কান্ডস্য যবস্য তেলাল্যা তিলস্য তিলপিঞ্জ্যা॥

এই যে শর, শণ এরা মূত্র পাপ দূর করে। এই দৈবশক্তি বীরুৎ অর্থাৎ লতাগুলি, এরা গ্রন্থি, ক্ষত প্রভৃতি রোপণ করে, অর্জুন পত্র, অর্জুনের কান্ড এরা হৃদয়বল সঞ্চার করে। এই যে যব, তিল, এরন্ড, ক্ষার, উদরের তিমির দূর করে।

আর একটি ক্ষেত্রে বলা হ'য়েছে—

দশবৃক্ষ মুঞ্চেমাং রক্ষসো গ্রাহ্যা,
শং নো দেবী পৃশ্নিপর্ণ্যাশম্।
পাঠমিন্দ্র জলায় ভেষজ
ইদং হিরণ্যং গুগ্গুলুঃ।

অর্থাৎ অদৃশ্য অথচ ক্রিয়াশালী রাক্ষসগণ যে ইতস্তত বিচরণ ক'রে সর্বপ্রকার প্রাণীদের অহিত সাধন করে (বৃক্ষলতাদিরও), পৃশ্নিপর্ণীদেবী সকলের হিত সাধন করেন। ইন্দ্রবীজ, পাঠা এরা জলের অমৃতশক্তির মত হিত সাধন করে, এই যে গুগ্গুলু এও হিরণ্যের শক্তিধারণ করে। এর শক্তি সকলের হিতকর; ইনি জলের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে সকলের সুখায়ু বর্ধন করেন। এরপর সেই উদ্ভিদগণ সোমকে বললেন, 'ভূতার্থা প্রাণিনাং প্রাণাঃ বয়ং' অর্থাৎ আপনি আমাদিগকে প্রাণিগণের কল্যাণের জন্য প্রেরণ করুন। তাদের এই প্রেরণা বাণী শুনে ওষধিরাজ সোম ঋষিদিগকে বললেন—'ভূতার্থ চিন্তাংচোদয়েৎ'; আপনারা জীবের কল্যাণের জন্য এই ভেষজগুলিকে উৎসর্গ করুন, এ'রা স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে ব'লছেন, আমরা দেহ ও প্রাণ দিয়ে ভূত কল্যাণ ক'রব।

এইভাবে ভারতে ভৈষজ্যদীক্ষা দান করা আছে বৈদিক সূক্তগুলিতে।

এই বক্তব্য থেকে এইটিই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে যে, ভৈষজ্যবিদ্যায় পারদর্শী হ'তে গেলে তাকে সোমবিদ্যা অধিগত ক'রতে হবে অর্থাৎ ভেষজের রাজা হ'লেন সোম, এবং সেই সোম আবার সৌরশক্তির অধীন; অর্থাৎ সর্বোধের্ব সৌরবিদ্যা, মধ্যে সোমবিদ্যা, পরে জানতে হবে রাজবিদ্যা। অপরপক্ষে আমাদের কাছে একান্ত শিক্ষণীয় ত্রয়ীবিদ্যা অর্থাৎ সোমবিদ্যা হ'লো দেহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান শিরোমধ্যস্থ মস্তিষ্ক।

এখানকার শারীরবৃত্ত অধিগত না হ'লে বল, আরোগ্য এবং পুষ্টিদানকারী ভৈষজ্যশক্তিকে তিনি আবিষ্কার ক'রতে পারবেন না, আর রাজবিদ্যা না জানা থাকলে দেশ, কাল, অবস্থা, পাত্র বিচার করে ভৈষজ্য প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না; এখানে কিন্তু দ্রব্যের আহার্য রস ও বীর্যবত্তার পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞানের প্রয়োজন এবং সাত্ম্য বিচারটাও এই বিদ্যার অন্তর্গত। আর তৃতীয় হ'লো সৌরবিদ্যা। এর দ্বারা প্রতিটি ভেষজের দ্রব্যশক্তি সোমধর্মী না সৌরধর্মী এবং গ্রহ, তিথি নক্ষত্রের প্রভাব করে এবং কখন সেটাতে প্রভাবিত হয়, তার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান এই বিদ্যার অন্তর্গত। এর মধ্যে আছে তাদের বসতিস্থানের পৃথগীগুণ বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানো। জলজ কুসুম বহু থাকলেও পদ্ম কেবল দিনেই ফোটে আর কুমুদ ফোটে রাত্রে, এই যে তার ভৈষজ্যশক্তির সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, এর দ্বারা তার গুণগত বৈশিষ্ট্য কোন্ ক্ষেত্রে এবং রোগ নিরাময়ে তাকে বিপরীতভাবে কি ক'রে প্রয়োগ করা যায় সেটি সৌরবিদ্যার অন্তর্গত।

প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সূক্তের মধ্যে সোমবিদ্যা, রাজবিদ্যা এবং সৌরবিদ্যাই সংহিতার-কালে এসে 'ত্রিধাতু বিদ্যা'। সেই ত্রিধাতু বিদ্যা বা ত্রিধাতু বিজ্ঞান বেদের কোনও সূক্তে স্পষ্ট ভাষায় নেই, তবে ওটি আমরা পাই ব্যাসকৃত চরণব্যূহের একটি অংশে এবং ঋকের ১।৩।৬ সূক্তে—

> "ত্রির্ণো অশ্বিনা দিব্যানি ভেষজাং শং যো সোমা, তেজসা যৎ সদন্তং ত্রিধাতু শর্ম বর্দ্ধতাং।"

এই সূক্তের ভাষ্যে আচার্য সায়ণ বলেছেন—

> 'ত্রিধাতুরিতি বাত পিত্ত শ্লেষ্ম ধাতু ত্রয়োপশমনং শর্ম বহতাং—

অর্থাৎ সূক্তোক্ত ত্রিধাতুর অর্থই বায়ু, পিত্ত, কফ এবং তারাই সোম, তেজস এবং অপ্।

পরবর্তীকালে আরও বিশদীভূত হয় অখিল জগতের স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটি ধাতুকে তাঁরা পঞ্চভূতেরই সম্পুট (পেটিকা) রূপে দেখেছেন, অর্থাৎ বায়ুর আকার প্রকার ও প্রকৃতি বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপ্ত; পিত্তের এবং কফেরও; মানবাদি প্রাণীর মধ্যে বায়ু, পিত্ত, কফের স্বাভাবিক প্রকৃতির মতোই বৃক্ষ লতাদিরও আকৃতি প্রকৃতিতে সাম্য দেখেছেন; তাঁরা এমনকি ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ, ব্যোমের মধ্যেও বায়ু, পিত্ত, কফের কোন্ গুণের আধিক্য আছে, তারই সঙ্গে সাম্য দেখেই নির্বাচন ক'রেছেন যে বিশ্বব্যেপে রয়েছে ত্রিধাতুর প্রাধান্য অপ্রাধান্য।

মানব দেহের দীর্ঘ, স্থূল, কৃশ, মধ্যম, খর্ব এবং গৌর, শ্যাম, কৃষ্ণ, রক্তাভ প্রভৃতি বর্ণের সাম্য দেখেছেন বৃক্ষলতাদির মধ্যেও, এই সাম্যজ্ঞানই তাঁদিকে প্রকৃতি বিকৃতির সাম্য অসাম্য জ্ঞানের প্রেরণার অনুশীলন জাগিয়েছে।

তাই বৃক্ষ-লতাদির সুস্থতা আর প্রাণীর দেহের সুস্থতার মধ্যে ঐক্য দেখেছেন বলেই স্থাবর জঙ্গমের মধ্যেই গুণগত, রূপগত, কর্মগত ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে ঐক্য দেখেছেন তাঁরা।

আবার সেই ঐক্য অনৈক্য বোধটির মধ্যেই দেখেছেন কালগত তারতম্যে অনৈক্যেরও সৃষ্টি হচ্ছে। একের অনৈক্যে অপরের অনৈক্য না হওয়ার কারণও প্রাকৃত বৈষম্যের তারতম্যের জন্য, অনৈক্যই ব্যাধি সৃষ্টির মূল, ঐক্যই সুস্থতা। এইরূপ আদর্শবাদই আয়ুর্বেদের মৌল ভিত্তি।

সূচীপত্র

রোগ ও পথ্যের সূচী

চৌদ্দশাক

চৌদ্দশাক খেলে নাকি কার্তিকের টান থেকে রেহাই পাওয়া যায়; কারণ এই মাসে যমের বাড়ির ৮টি দরজা খোলা থাকে,—এই প্রবাদটি আজও গ্রামের মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

যদি এটিকে গেঁয়ো বাচস্পতি শাস্ত্রের কথা ব'লে উড়িয়েও দেওয়া যায়, কিন্তু এ কথাটার যে একটা মৌল কারণ আছে এবং তার পিছনে বিজ্ঞানও যে আছে, সেটার অনুসন্ধান অগোচরেই বা থাকে কেন? এটা তো ঠিক যে তখনকার যুগের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এদিকে লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে, এবং ষোড়শ শতাব্দীর রঘুনন্দনের গ্রন্থাবলীতেও।

ঋতুজ ব্যাধি প্রতিরোধার্থ কালোপযোগী ব্যবস্থাও তখনকার দিনে প্রচলিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন ঋতুজ ব্যাধির আগমন হয়, তবে বাংলায় ঋতুগুলি প্রকট হয় বেশী, তাই তাঁদের মতে আশ্বিন-কার্তিকের সময়টা যমদংষ্ট্রা কাল বলে উল্লেখিত।

তদানীন্তন কালের বাংলার নব্য-স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন (১৬ শতাব্দী) তাঁর অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের অন্যতম গ্রন্থ "কৃত্যতত্ত্বে" এগুলিকে উল্লেখিত করেছেন "নির্ণয়ামৃতের" (একটি প্রাচীন স্মৃতির গ্রন্থ)। অভিমত অনুসরণ ক'রে—

> "ওলং কেমুকবাস্তুকং, সার্ষপং নিম্বং জয়াং।
> শালিঞ্চীং হিলমোচিকাঞ্চ পটুকং শেলুকং গুড়ুচীন্তথা।
> ভণ্টাকীং সুনিষন্নকং শিবদিনে খাদন্তি যে মানবাঃ,
> প্রেতত্বং ন চ যান্তি কার্ত্তিকদিনে কৃষ্ণে চ ভূতে তিথৌ।"

অর্থাৎ এই চৌদ্দটি শাক কার্তিক মাসে ভূত-চতুর্দশীর দিনে (দীপান্বিতা অমাবস্যার পূর্বদিন) যিনি সেবন করেন, যমের আলয় তাঁর কাছ থেকে অনেক দূর।

এ সম্বন্ধে বিভিন্ন স্মার্ত পণ্ডিতদের মতভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু ভূত-চতুর্দশীর কৃত্য হিসেবে বাংলার রঘুনন্দনের মতে যা উল্লেখিত সে সম্বন্ধে বাস্তব বিজ্ঞানোচিত ধারায় এগুলির স্বভাব প্রকৃতি প্রকাশ করা হ'লো। এই শাকগুলির প্রচলিত নাম— (১) ওল (Amarphophallus campanulatus), (২) কেঁউ (Costus speciosus), (৩) বেতো (Chenopodium album), (৪) কালকাসুন্দে (Cassia sophera), (৫) সরিষা (Brassica campestris), (৬) নিম (Azadirachta indica), (৭) জয়ন্তী (Sesbania sesban), (৮) শালিঞ্চ (শাঞ্চে) (Alternanthera sessilis). (৯) গুড়ুচী (গুলঞ্চ পাতা নেওয়া হয়) (Tinospora cardifolia), (১০) পটুক (পটোল পত্র) (Trichosanthes dioica), (১১) শেলু 'Cordia dichotoma), (১২) হিলমোচিকা (হিঞ্চে) (Enhydra fluctuans), (১৩) ভণ্টাকী (ঘেঁটু বা ভাঁট) (Clerodendrum infortunatum', (১৪) সুনিষন্নক (সুষুনী শাক) (Marsilea quadrifolia).

এদের কোনটার বা সমগ্র, কোনটার বা পাতা শাক হিসেবে খাওয়ার জন্য ব্যবহার করার উপদেশ, কিন্তু এর প্রতিটিই ওষধি-গুণসম্পন্ন। এদের মধ্যে ওলের শাকটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে তার চরিত্রগুণে, তাই আমরা উপমা দিয়ে থাকি— "চৌদ্দ শাকের মধ্যে ওল প্রামাণিক"—এহেন ওলের শক্তি কম নয়, সে অর্শ রোগের বড় ঔষধ—তাই তার এক নাম অর্শোঘ্ন! ঘ্ন অর্থে নাশ করা। ক্রিমিকে প্রতিহত করে কেঁউ ও ঘেঁটু পাতা; লিভারকে শাসন করে বেতো শাক; কাসকে মর্দিত করে কালকাসুন্দে, তাই তার নাম "কাসমর্দ", পিত্তজ চর্মরোগকে নষ্ট করে নিম। সঞ্চিত পিত্তদোষকে সংশোধন করে পটোল পত্র (পলতা)। বায়ুবিকার দূর করে গুলঞ্চপত্র। ঋতুপরিবর্তনজনিত তরুণ সর্দির হাত থেকে বাঁচায় জয়ন্তী পাতা; এদের মধ্যে এক সরষে শাকের বদনামই বেশী; তবে সে মলমূত্রের সারল্য আনে (অবশ্য সংস্কার সাধন ক'রলে) সুস্থ থাকতে গেলে এরও তো প্রয়োজন যথেষ্ট। শেলু (কোন কোন মতে শুলফা) এটি ক্ষুধাবর্ধক ও রুচিকারক। সর্বশেষে সুষুনী শাকের কথা বলি— এটি দেহের স্নায়ুতন্ত্রকে স্নিগ্ধ ক'রে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে থাকে।

চৌদ্দটির প্রতিটি গাছ সম্মিলিত বা এককভাবে বহু রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

এই শাক শব্দটির অর্থ আয়ুর্বেদে ব্যাপক, যেমন—

'পত্রং পুষ্পং ফলং নালং কন্দং সংস্বেদজং তথা।
শাকং ষড়্‌বিধমুদ্দিষ্টং গুরুং বিদ্যাদ্ যথোত্তরম্ ॥'

আমরা যতরকম সব্জি ব্যবহার করি, এগুলিকে ৬টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। (১) পালং, নটে, পুঁইশাক, বাঁধাকপি ইত্যাদি পত্রশাক। (২) ফুলকপি, মোচা, বকফুল ইত্যাদি পুষ্পশাক। (৩) লাউ, কুমড়ো, বেগুন, ঢেঁড়স, পেঁপে হচ্ছে ফলশাক। (৪) ওল, কচু, লাউ, কুমড়ো, শালুক ফুলের ডাঁটাগুলি নালশাক। (৫) আলু, ওল, কচু, মুলো—এরা কন্দশাক। (৬) পাতালকোঁড়, ভূঁইছাতা (Agaricus campestris) হচ্ছে সংস্বেদজ শাক। এগুলি উত্তরোত্তর গুরুপাক অর্থাৎ বিলম্বে পরিপাক

প্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে সব থেকে লঘু হচ্ছে পত্র-জাতীয় শাক। তবে বর্ষাকালের শাকে বিসর্গকালের স্বভাবে বেশী বর্ষণ-জন্য তেজোগুণ সমৃদ্ধ হতে পারে না, তার উপর বর্ষা ঋতু তার স্বভাবধর্মে পরিপাক শক্তিকে কমিয়ে দেয়, সেজন্য মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব বর্ষাকালে শাক কম খাওয়া উচিত। পক্ষান্তরে শরতের শাক তেজোগুণান্বিত হয়ে খাদ্যপ্রাণে সমৃদ্ধ হয়। এই শরৎকালই শাক খাওয়ার প্রারম্ভিককাল বলা যেতে পারে।

চৌদ্দ শাক খাওয়ার মধ্যে আর একটি অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে চরক সংহিতার একটি শ্লোক বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, যথা—

'বর্ষাশীতোচিতাঙ্গনাং সহসৈবার্ক রশ্মিভিঃ।
তপ্তানামাচিতং পিত্তং প্রায়ঃ শরদি কুপ্যতি॥'

ভাবার্থ হচ্ছে—বর্ষাকালের শীতাক্ত দেহ শরদাগমে সহসাই সূর্যরশ্মি দ্বারা সন্তপ্ত হওয়াতে শরৎকালে প্রায়ই পিত্তের প্রকোপ হয়। এইহেতু এই দ্রব্যগুলির একক অথবা সমষ্টিগত ব্যবহার ধর্মের অনুশাসনে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর সঙ্গে আসলে স্বাস্থ্য-ধর্মের সম্পর্ক আছে ব'লে মনে করি।

এ সম্পর্কে একটা কথা—চৌদ্দ শাকের সেবন কি শুধু একদিনের জন্য? তাতেই কি অকালজ প্রেতমুক্তি?

হ্যাঁ প্রশ্নের মত প্রশ্ন। তার উত্তর এই—বৎসরে এক চৈত্র সংক্রান্তির দিনেই ছাতু খাওয়া, একদিনই বনভোজনের রীতি প্রচলিত; একদিনই কুল বেতো খাওয়া, তিনদিন অম্বু-বাচীর বিধি-বিধান—এগুলি পূরণ বাচী নয়, সংখ্যা বাচী অর্থাৎ এদিন থেকে সুরু। কিন্তু অতীতের উল্লেখ অতীতের জন্যই নয়, বর্তমানের জন্যই অতীতের বাণী, অর্থাৎ তাঁরা ক'রে ছিলেন ভবিষ্যদ্‌বাণী।

বর্তমান যুগে আমাদের এসব চিন্তাধারা মন থেকে মুছে যাচ্ছে। ছোটবেলায় দেখেছি—ঠাকুমা, পিসিমার মুখে মুখে ছিল চৌদ্দ শাকের ফর্দ; এখনও দেখা যায় পুরাতনী ধারায় চলা মানুষেরা এই সব শাক যোগাড় ক'রে চৌদ্দশাক খেয়ে থাকেন। যাঁরা নবীন তাঁরা হয়তো এগুলির প্রয়োজনীয়তা অনেকে জানেন না এবং জানার চেষ্টাও করেন না, আমরা অনেকে তাই তাকে আখ্যা দিয়ে থাকি কুসংস্কার। ভূতচতুর্দশীর দিনটি প্রারম্ভিক সূচনা, আসলে ঐ একটি দিন মাত্র খেয়েই ব্রতপালনের উদ্‌যাপন নয়, নিয়তই এদের দুটি-তিনটি বা কয়েকটি মিলিয়েও খাওয়া যায়।

শাক—এই নিবন্ধে শাক-প্রসঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে যতগুলি বৈদিক ও লৌকিক খাদ্য রয়েছে, সকলের মধ্যেই শাক শব্দটির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির কোন না কোনটি জড়িয়ে আছে। বৈদিক সংস্কৃতি ঋক্‌বেদের ৬।২৪।৪ সূক্তে দেখা যায়—শাক নামে একটি দ্বীপে আর্যদের অনেকে গোষ্ঠী-বিছিন্ন হ'য়ে বাস করেন। এইখানে ঋক্-বেদের "শাকল" পক্ষান্তরে বাস্কল শাখার জন্ম হয়। এখানের বাসিন্দারা শাক আহার ক'রতেন। তাঁরা যখন আরও ছড়িয়ে পড়েন, তাঁদের পরিচয় "শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ", কথাটা এই যে প্রাণীজ মাংসপ্রধান আহার্য অপেক্ষা শাকাহারেই তাঁদের পরিচয়।

শাকদ্বীপটি জয় ক'রেছিলেন মহাবীর অর্জুন—এ প্রসঙ্গ আছে মহাভারতের সভা-পর্বের ২৬ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে—

স তেন সহিতো রাজন্ সব্যসাচী পরন্তপঃ।
বিজিগ্যে দ্বীপং শাকং চ প্রতিবিন্ধ্যং চ পার্থিবম্॥

এই দ্বীপটি ভারতের পূর্বদিকে। তারপর ঐ দ্বীপেই আর একটি ভূখণ্ড আছে, কালান্তরের নাম তার 'শাকম্ভর তীর্থ'। এই তীর্থে এসেছিলেন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি। এই তীর্থের নাম প্রসঙ্গে একটি চমৎকার প্রবাদ আছে। এটি আছে মহাভারতের বনপর্বের ৮৪ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে। সেখানে পুলস্ত্য বলছেন—যুধিষ্ঠিরকে—আপনি তারপর শাকতীর্থে যাবেন। ঐখানেই দেবীর শাকম্ভরী নাম। ওখানের অধিবাসিগণ শাক আহার করতেন এবং দেবী শাকম্ভরী হয়ে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন এবং শাক আহার করেছিলেন। তাই তাঁর নাম শাকম্ভরী। তিনি যখন আগমন করেন ঋষিবৃন্দ তাঁকে শাকাহারের দ্বারা অভ্যর্থনা করেছিলেন।

'শাকম্ভরীতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
দিব্যং বর্ষসহস্রং হি শাকেন কিল সুব্রতা॥
আহারং সা কৃতবতী মাসি মাসি নরাধিপঃ।
ঋষয়োঽভ্যাগতাস্তত্র দেব্যা ভক্ত্যা তপোধনাঃ॥
আতিথ্যং চ কৃতং তেষাং শাকেন কিল ভারত।
ততঃ শাকম্ভরীতি বৈ নাম তস্যাঃ প্রতিষ্ঠিতম্॥
ত্রিরাত্রং মুষিতং শাকং ভক্ষয়িত্বা নরঃ শুচিঃ।
শাকাহারস্য যৎকিঞ্চিৎ বর্ষে দ্বাদশভিঃ কৃতম্॥
এবং যৈ স্তু কৃতং পুণ্যং চতুর্দ্দশ্যাং মহাতিথৌ।
তৎফলং তস্য ভবতি দেব্যাশ্ছন্দেন ভারত॥'

অর্থাৎ সেই দেবী যেমন শাকের দ্বারা তৃপ্ত হয়ে শাকাহার ক'রে তপস্যা করেছিলেন, তেমনি ক'রে কেবল শাকের দ্বারাই যিনি দেবীকে চতুর্দশীদিনে তৃপ্ত করেন, তিনি অশেষ পুণ্যলাভ করেন। দেবী শাকম্ভরী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অত্যুত্তম বর দেন। তাছাড়া শুধু শাকাহার ক'রে একমাস ব্রত করলে অশ্বমেধ ফললাভ হয়—

"যদি তত্র বসেন্মাসং শাকাহারো নরাধিপ।
সন্নেং লভতে পুণ্যং বাজিমেধ ফলং তথা॥"

এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়—ঋক্‌বেদের বাস্কল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণই এই শাক-চতুর্দশীব্রতের প্রবর্তন করেছেন। তাও আবার ভারতের পূর্বদেশে এই বাংলাতেই বেশী প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণের আচার চতুর্দশীতে দেবীকে শাক নিবেদন করা।

ভৈষজ্যগুণাবলীর প্রসঙ্গে পত্র এবং সংস্বেদজ শাককে নিরামিষ আহার বলা হয় না। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের শাকের বিশেষ ভৈষজ্য-শক্তি নিহিত আছে ষড়্‌প্রকার শাকের মধ্যে। এ অভিমত ভাবপ্রকাশের। কিন্তু অমর সিংহ তাঁর ব্যাখায় বলেছেন—দশবিধ শাক।

মনু তাঁর সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে ২২৬ শ্লোকে শাকাহারকে 'নিরামিষ ব্যঞ্জন' বলেছেন—'গুণাংশ্চ সূপ শাকাদ্যান্ পয়োদধি—ঘৃতান্ মধু।

শাকের বলবীর্য সম্বন্ধে চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা প্রচুর তথ্য দিয়েছেন—ওখানে আমিষ-নিরামিষের প্রভেদ নাই। অবশ্য শাকের সাধারণ নামেই তার তাৎপর্য।

এদিকে চণ্ডীনামক একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে—'ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈঃ আবৃষ্টিঃ

প্রাণধারকৈঃ।'—বৃষ্টি হোক না হোক, কেবল শাকের দ্বারা প্রাণধারণ ক'রেই আমি লোক-জগতে আবির্ভূতা হব। এখানে পত্র শাকই বক্তব্য নয়।

চৌদ্দশাকের তালিকায় যে নামগুলি পাওয়া যায়, চরক-সুশ্রুতের যুগে সেগুলির দ্রব্যশক্তি চরমভাবে নিরূপিত হয়েছিল।

শাকে প্রাণপ্রাচুর্য সাধিত হয়। হস্তী, গো, অশ্ব প্রভৃতির প্রচুর প্রাণবীর্য শাকাহারের দ্বারাই সাধিত হয়।

ভারতের মাতৃতন্ত্রের সাধকগণ দুর্গার কৃষিকল্প মূর্তির পূজায় তাঁকে শাকিনী বলেছেন। দেবীর আরাধনায় যত রীতি এবং ক্ষেত্র আছে, তাদের মধ্যে যাঁরা তাকে কৃষিলক্ষ্মী ব'লে আরাধনা করেন, তাঁরা তাঁকে শাকিনী অর্থাৎ শাক নৈবেদ্য দ্বারা প্রসন্না হন ব'লে জানবেন। মনসার অপর নাম শাকিনী—তার পূজার উপকরণ প্রধান শাক। ওখানেও শুধু পত্রশাক নয়।

চরকের হরিতবর্গের মধ্যে শাকের পাঠ আছে—

শাক শব্দটি কিন্তু কেবল লতা বা বৃক্ষের পাতাকে বোঝায় না। শক্‌তি+ঘঞ্‌ন—অর্থাৎ পাতা, ফুল, ফল, নাল, কন্দ এবং পুরাণ পচা মাটিতেও যে গাছ জন্মে (ছত্রাক), সবই শাক। ওল ভাতে, মান সিদ্ধ, পটোল সিদ্ধ, বকফুল ভাজা, কাঁচকলা সিদ্ধ, লাউ-কুমড়োর ডাঁটা খেলেও তাকে শাক খাওয়াই বলা হবে। অথবা আমরা যেসব ব্যঞ্জন প্রস্তুত করি তাও শাকাহারেরই বিভিন্ন রূপ।

এখানে চৌদ্দশাক খাওয়ার মধ্যে পাতাশাক সংখ্যাগরিষ্ঠ হ'লেও ওইসব ভেষজ-গুণসম্পন্ন—সকলেই শাক পর্যায়ের। সেইজন্য শাকাহার, শাকদ্বীপ, শাকম্ভরী, শাকিনী ইত্যাদি নামের মধ্যে কেবল পাতা শাকই আমাদের আহার্য—এটা সেখানে বক্তব্য নয়।

কলম্বী

"হ্যাঁরে, বর্ষাকালে কি কলমীশাক খেতে আছে? এখন যে শ্রীহরির শয়ন হয়েছে!" —পিসিমার এই কথা হয়তো একটা নিছক অন্ধসংস্কার থেকে, কিন্তু এই নিষেধের মধ্যেই যে সাবধানবাণী নিহিত রয়েছে, তা তো দেখছি সেই বৈদিক যুগেই উচ্চারিত। পরবর্তীকালে হয়তো বা সেটা স্মার্তসংস্কারের মাধ্যমে তাকে জনমনে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়েছিল। বর্তমানে আলোচ্য সেই কলমীশাক—

অজানার যুগে

'প্রাবৃষেণ্যা যোনাভবাগোঃ কড়ম্বী সংবিদানান্ জন্তূন্।
অসূন্বন্ স্তেনাস্যেতান্ পুরীষ্যমগ্নিং রয়িং যোনিমিহাষদঃ'॥
(—অথর্ববেদ—বৈদ্যককল্প—৮৫৩/৬৩/৫)

মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—
প্রাবৃষেণ্যা=বর্ষাসু জাতা
কড়ম্বীতি=কে=জলে
ডম্বতে=লম্বতে, যা সা যোনাভবা গোঃ=গবাং
সংবিদানান্=জন্তূন্ ধারয়ন্তীতি যোনাভবা=বর্ধাত্মিকা
ভবা, অপিচ যে জন্তবঃ স্তেনাস্যেতা সন্তঃ
অসূন্বন্=প্রাণান্ ঘ্নন্তি তান্ ধারয়সি। পুরীষং
অগ্নিং রয়িং অন্নপ্রাণঃ=শুক্রঃ তং আষদঃ
আবসথ। রয়িং লবং চ যোনেঃ স্নেহবর্ধনাৎ
যোনেরপি ত্বং ইহ আষাদঃ বলং তন্ধারয়সি।

সূক্ত আর ভাষ্যের অর্থ হলো—তুমি বর্ষা খুঁজে জলে বিস্তৃত হয়ে ভ্রমণ কর, তাই তুমি কড়ম্বী (কে অর্থে জলে, তাতে যে লম্বা হয়ে লতিয়ে ভ্রমণ করে)। ওই বর্ষাতেই গো-সকলের প্রাণঘাতী জন্তুগুলিকে তুমি তোমার দেহে স্থান দাও। আর যেসব জন্তু চুরি ক'রে মানবদেহের পুরীষে প্রবেশ করে, তাদিকেও তুমি ধারণ কর। তুমি অন্নের প্রাণ শুক্র ও স্নেহের বর্ধনে যোনির বলকেও ধারণ কর।
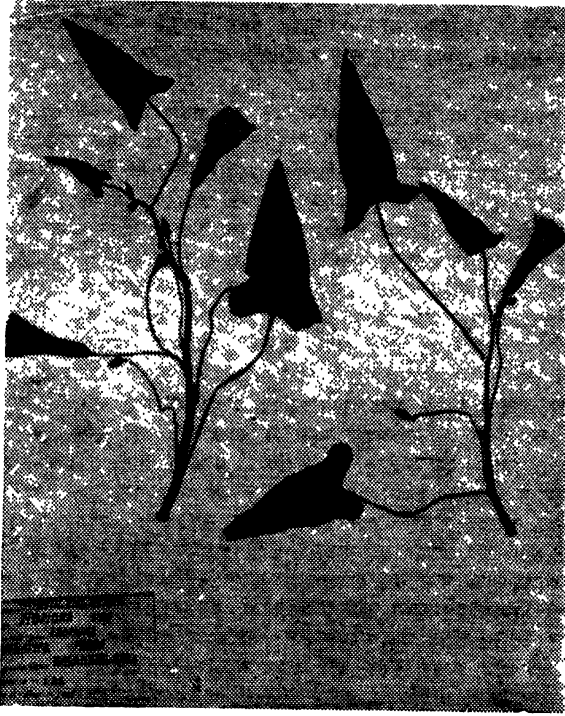
উপরি-উক্ত সূক্তে কাব্যিক ভাষার মাধ্যমে দোষগুণের পরিচয় দিয়ে ভেজষ লতাটির নামকরণ কড়ম্বী; আবার সেই কড়ম্বীই ব্যাকরণের সূত্র ধ'রে কলম্বী হ'য়ে গেল, পরবর্তীকালে লোককথায় এসে কলমী নামে পরিচিত হ'লো; অবশ্য চরক সংহিতায় একে বলা হ'য়েছে 'কলম্ব'।

আয়ুর্বেদবেত্তার বিচারে—

যা আমাদের তরকারি তার প্রাচীন পরিভাষা শাক, অর্থাৎ ব্যঞ্জন যতই হোক্ সবই তরকারি—এটা হিন্দী থেকেই এসেছে। এর কোনটা ফলশাক—যেমন লাউ, কুমড়ো; কোনটা পত্রশাক—যেমন পালং, নটে। এই রকম পুষ্প, নাল, কন্দ ও সংস্বেদজ—মোট ৬ প্রকার শাকের ভেদ। যে কোন তরকারিই যে শাক, সেটা এই বাংলা ছেড়ে পশ্চিমের দিকে গেলেই জানা যাবে।

দ্রব্যমাত্রেই গুণ, বীর্য, রস থাকবেই, তার সঙ্গে থাকে রসের দোষ বিকার, সেই দোষ অংশকে সরিয়ে তার গুণের অংশ কি ক'রে গ্রহণ করা যেতে পারে, এবং তার পদ্ধতিই বা কি, সে সম্পর্কেও প্রাচীনগণ একটি নির্দেশ দিয়েছেন। এই নিবন্ধোক্ত কলমীর আরও একটি বিশেষ অবস্থা 'ঋতু কালজ' রস বিকার। এ সম্পর্কে বৈদিক সমীক্ষার ভাষ্যেও আর একটি সূত্র পাওয়া যায়,—

স্তেনেতি পিচ্ছিকা কাল—সংযোগাৎ শাল্মীনির্য্যাসবৎ ক্রিমিকরোম্ভবাত্ত
স্তেনাস্তে ক্রিময়ঃ তত্র তে চ শারদাগমে অপসৃয়ন্তে'

অর্থাৎ বর্ষাকালের ধর্মে শিমুলের আঠার মত এক প্রকার আঠা কলমীলতায় জন্মে, তাতেই ঐ কীটগুলি জন্মগ্রহণ করে। সেগুলি আবার শরৎ ঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অপসৃত হয়। এই জন্য শয়ন একাদশী থেকে (উল্টোরথের পরদিন থেকে) উত্থান একাদশী (রাসপূর্ণিমার পূর্বের একাদশী) পর্যন্ত কলমীশাক খাওয়া নিষেধ আছে। প্রবাদ কল্পনায় আছে—এই সময় শ্রীহরি কলমীলতার বিছানায় মাথার ও পাশের বালিশ হিসেবে পটোলকে রেখে শুয়ে প'ড়েছেন; তাই বাংলাদেশের সংস্কার বিশিষ্ট অনেকে কলমীশাককে আহার্য হিসেবে গ্রহণ করেন না। আসলে এ সংস্কারটা পুরোহিত সম্প্রদায় প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য প্রচার করেন নি; এটা আমাদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা ক'রেই সমাজহিতৈষীগণ সংস্কারে তাকে বেঁধে দিয়েছেন। নিম্নোক্ত কলমীশাকের এই রস-বিকারটি কালজ; কিন্তু সর্বকালেই নয়, যেন বর্ষাকালেই কলমী অভিশপ্তা হয়; অন্য কালে তার গুণ প্রচুর। সে ক্ষেত্রে বেদের সমীক্ষা হ'লো—স্নেহ সংযোগে গুণবর্ধক হয়।

এ যেন একদিকে ভাসুরঠাকুর অন্যদিকে আঁস্তাকুড়; সেই রকম প্রকৃতির ঋতু-বিবর্তনের পথে মাঝের অবকাশ এই বর্ষাকাল। ফেলে আসা গ্রীষ্মকাল শ্লেষ্মার ক্ষীণাবস্থা হ'লেও তার স্বধর্ম জাঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করা; তার উপর সামনে রয়েছে পিত্তবিকার, শরতের পূর্ব আক্রমণ, মাঝে প'ড়লো বর্ষাকাল; এইকালে বায়ুর হয় ওষ্ঠাগত প্রাণ, তার প্রকোপ তো বাড়বেই, তাইতো প্রাচীন বৈদ্যগণ ব'লতেন—আকাশে মেঘ হ'য়েছে, পেটে বায়ু তো হবেই। এই হ'লো তথ্য কথা; আর এই দুই ঋতুর চাপে প'ড়ে আসে অগ্নিমান্দ্য, এরই ফসল হ'লো—রং কাল হ'য়ে যাওয়া, অক্ষুধা, আর সব থেকে ভয়াবহ হ'লো আমাশার প্রকোপ; আবার কারও কারও আসে মূত্রকৃচ্ছ্রতা, সুতরাং এই কালে খাওয়া দাওয়া খুব হিসেব ক'রেই ক'রতে হয়।

বামুনের ছেলে হ'লেই কি বামুন হয়?—তার উপনয়ন সংস্কার হ'লেই বামুন হয়; তখন সে দ্বিজ। সেই রকম শাককে সংস্কার ক'রে খেলে সে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই বিশেষ ধাতু দুটিকে পুষ্ট করে, তখন সে জন্মে দ্বিজ আর সংস্কারেই তার দ্বিজত্ব।

কি ক'রে খেতে হবে—

'পত্র শাকং গুরু রুক্ষং প্রায়োবিষ্টম্ভ জীর্যতি।
স্বিন্নং নিষ্পীড়িত রসং স্নেহাঢ্যং তৎ প্রশস্যতে॥ (চরক-সূত্র)

অর্থাৎ পত্রশাক মাত্রেই গুরু ও রুক্ষ—তা পেটে বায়ু করে ঠিকই, কিন্তু ওকে একটু সিদ্ধ ক'রে জলটা ফেলে দিয়ে সাঁতলে নিয়ে খেলে ও দোষটা আর থাকে না, এই তার সংস্কার। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে—বৈদিক সূক্তের অনুসরণ এই সংহিতার যুগের

অনুশীলন। এই শাকটির পরিচিতি নিষ্প্রয়োজন, এর বোটানিক্যাল নাম Ipomoea reptans (Linn.). Poir ফ্যামিলী Convolvulaceae.

লোকায়তিক প্রয়োগ—

১। **আফিং-এর বিষক্রিয়ায়ঃ—** ঢ'লে পড়েছে, হাতের কাছে কিছু নেই, কলমী শাকের রস ক'রে অন্ততঃ এক ছটাক খাইয়ে দিন; সব সামলে দেবে।

২। প্রথম বয়সের যৌবনের চাঞ্চল্যের কু-অভ্যাসে শরীর হাড়-সার, ঘুমুলেই ক্ষরণ, এর সঙ্গে মাথাধরা, হাত-পা জ্বালা, অগ্নিমান্দ্য, মুখে জল আসা, পড়াশুনা মনে না থাকা ইত্যাদি—এ ক্ষেত্রে কলমী শাকের রস ২ চা-চামচ, তার সঙ্গে অশ্বগন্ধা (Withania somnifera Dunal.) মূল চূর্ণ ১½ গ্রাম আন্দাজ মিশিয়ে খেতে হয়; অল্প দুধ মিশিয়ে খেলে আরও ভাল। এর দ্বারা তার যেসব উপসর্গ উপস্থিত হয়েছিল সেগুলি তো যাবেই, অধিকন্তু তার শুক্রধারণ ক্ষমতাও বেড়ে যাবে।

৩। **কোলের শিশু রাত্রে জাগে আর দিনে ঘুমোয়ঃ—** অনেকের বিশ্বাস—রাত্রি-বেলায় জন্মালেই বুঝি এই হয়, তা ঠিক নয়; এর জন্য অনেক সময় দেখা যায়—তার মল কঠিন হয়েছে এবং দুধ তোলে সে। এ ক্ষেত্রে অল্প গরম দুধের সঙ্গে ২০।২৫ ফোঁটা কলমীশাকের রস খাওয়ালে এই উপদ্রব চলে যাবে।

৪। **বসন্তের প্রতিষেধেঃ—** বাড়িতে জল-বসন্ত ঢুকলে যেতে চায় না, এ ক্ষেত্রে কলমীশাকের রস ২ চা-চামচ একটু গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে প্রত্যহ অন্য সকলের খেলে ভাল হয়; এর দ্বারা অন্যান্যরা রক্ষা পেতে পারেন। এ ভিন্ন আশপাশের বাড়িতেও এটা খাওয়া উচিত।

৫। **স্তন্য বর্ধনেঃ—** শিশু-পোষণের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুও দুধ নেই, এ ক্ষেত্রে কলমীশাকের রস ৩।৪ চা-চামচ মাত্রায় একটু ঘিয়ে সাঁতলে খেতে হয়। সকালে ও বিকালে দু'বার খেলেই ভাল হয়। এটাতে দুধ বাড়বেই।

৬। **গণোরিয়ায়ঃ—** জ্বালা-যন্ত্রণা, তার সঙ্গে পুঁজ পড়া, এ ক্ষেত্রে কলমীশাকের রস ৪।৫ চা-চামচ অল্প ঘিয়ে সাঁতলে দুইবেলা খেতে হয়। এর দ্বারা কয়েকদিনের মধ্যেই এ জ্বালা-যন্ত্রণা ও পুঁজ পড়া বন্ধ হয়।

৭। **ঠুনকো হলেঃ—** কলমী বেটে অল্প গরম ক'রে স্তনে লাগাতে হয় এবং ঐ শাকের রস দিয়ে ধুতে হয়; এর দ্বারা বসা দুধ পাতলা হয়ে নিঃসরণের সুবিধা হয় এবং যন্ত্রণাও কমে যায়।

৮। **হুলের জ্বালায়ঃ—** বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছি প্রভৃতির হুল ফুটানোর জ্বালায় এই কলমী বেটে লাগালে জ্বালা কমে যায়। অগত্যা পক্ষে কলমীর ডগা ঘষে দিলেও উপকার হয়।

৯। **নিমুখো ফোঁড়ায়ঃ—** ভেতরে পুঁজ হয়েছে, বেরুতে পারছে না, বসে যাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে ঐ কলমীর শিকড় ও ডগা একসঙ্গে বেটে ফোঁড়ার উপর প্রলেপ দিতে হয়; এর দ্বারা ফোঁড়ার মুখ হয়ে যায়।

এ ভিন্ন আরও কত মুষ্টিযোগ এখনও আমাদের অজানা আছে।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Hydrocarbons viz., pentairiacotane triacontance. (b) Sterol. (c) Acids viz. melissic acid, behenie acid, butyric acid and myristic acid. (d) Essential oil—0.048%. (e) Different type of resin—7.27%.

বাস্তুক

সুস্থ মানুষ নড়ে-চড়ে কিন্তু খাটা-খাটুনীতে গড়িমসি, তাকে বলা হয় "গে'তো"।

এটা দেশীয় উপভাষা হ'লেও এই উপমাটি কিন্তু এক ধরণের যকৃতের কাজ-কর্ম সম্পর্কে প্রয়োগ করা চলে।

কথাটা এই যে, আমাদের কাছে উপেক্ষিত হ'লেও এমন একটি ভৈষজ্যগুণের শাকের সন্ধান আছে যেটি অমনি সুস্থ অথচ গে'তো লিভারকে চাঙ্গা করে তোলে।

এটির বিশদ পরিচয় দেওয়ার আগে বৈদিকসমাজে শাকটির স্থান কোথায় ছিল এবং তার আভিজাত্যই বা কি ছিল সে কথা আগে বলি—

আভিজাত্যের নজির:—

আয়ুষ্যং বর্চস্য কংকৈল্লং ঔদ্ভিদম্। ইদং বর্চস্য
জৈত্রায় বিশতাদুমাম্॥ (ঋক্‌বেদ—৬।২৪।৪)

বেদ-ভাষ্যকার সায়ণ বলেছেন—কংকৈল্লং হচ্ছে—যবশাক বা বাস্তুক, এটি ঔদ্ভিদ; শরীরে তেজ বিধারণ করতে হিতকর; ব্যাধির জয়ের জন্য হিতকর; এটি আমাতে প্রবেশ করুক। দ্বিতীয়টি—অথর্ব বেদের বৈদ্যক কল্পের ১১।৩৮।৪৭ সূক্তে—

কং কৈল্লং মে অরাতী সহাব পৃতনামৃতম্।
সহস্ব সর্বং পাপ্মানং সহমানস্যোষধে॥

তার অর্থ হচ্ছে—ওষধি! তুমি কং কৈল্ল, তুমি বাস্তুক, তুমি দেহের শত্রুবর্গকে পরাজিত

কর; অর্শ, মলরোধ, ক্রিমিজাত শত্রুদিগকে তুমি অভিভূত কর।

এই দু'টি সূক্তের মূল বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করলে এই পাওয়া যায়—ঋক্‌বেদ তার জন্মকর্মের বৈশিষ্ট্যটা উপলব্ধি ক'রেছেন। তার ঔদ্ভিদ নামকরণের সার্থকতাও দেখেছেন।

"ভূমিম্ উদ্ভিদ্য জায়তে ঔদ্ভিদঃ" (বৃক্ষায়ুর্বেদঃ)
ভূতমুদ্ভিদ্য জায়তে ইতি ঔদ্ভিদঃ (যাস্কঃ)

ভূমি ভেদ ক'রে যে জন্মগ্রহণ করে, সে-ই তো ঔদ্ভিদ; এটি বৃক্ষায়ুর্বেদের অভিমত। উদ্ভিদের সাধারণ পরিচয় হিসাবে এটি সাধারণ সূত্র, তা ছাড়াও যাস্কের ব্যাখ্যায় এর বিশেষ পরিচয়—ভূতমুদ্ভিদ্য জায়তে ঔদ্ভিদ অর্থাৎ ভূত বস্তুকে ভেদ করে যে ওঠে। চৈত্র বৈশাখে এই উদ্ভিদটির বীজগুলি মাটিতে ঝ'রে পড়ে, আর সমগ্র বর্ষা
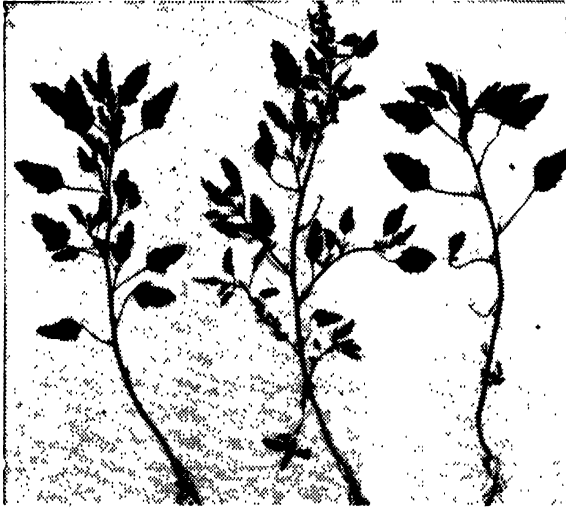
ও শরৎকালের মধ্যেও তারা অঙ্কুরিত হয় না, আবার শীত এলেই তবে তাদের আত্মপ্রকাশ। এই বৈশিষ্ট্য থাকার জন্যই এই ঔদ্ভিদটির নামকরণ বাস্তুক; অর্থাৎ জমির বাসিন্দা হওয়ার পর আবার তার জন্মকর্ম, তাই বাস্তুক। পরবর্তীকালে আয়ুর্বেদ সংহিতাগুলিতে বাস্তুক বা বেতোশাকের গবেষণা আরও ব্যাপকভাবে করা হ'য়েছে এবং নানাভাবে রোগ প্রতিকারে তাকে কাজে লাগানো হ'য়েছে।

ষোড়শ শতকের বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—'চৈতন্যচরিতামৃতে' এই শাকটি স্থান পেয়েছে—'বাস্তুক শাক খাইলে হয় কৃষ্ণভক্তি'—এ ক্ষেত্রে কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে শাকের যোগসূত্রটার সূত্র এই যে—মলিন দেহে কোন ভজন সাধনই যখন সম্ভব নয়, তখন দেহাভ্যন্তরস্থ স্থূলে মলকে শোধন করার সুষ্ঠু পথ এই

শাকের ব্যবহার; তারই জন্য এ উপদেশ দেওয়াটা তো অস্বাভাবিক নয়। হয়তো বা মহাপ্রভুর বেতোশাকে প্রীতি এই জন্যই হ'য়েছিলো। তিনি এর গুণপনায় মুগ্ধ হ'য়ে শরীর শোধনের একটি সহজ ভেষজের উপদেশ দিয়েছেন।

নাম-ধাম ও পরিচিতি :—প্রাণী-জগতের মধ্যে সিংহকে আমরা বলি পশুরাজ, আবার শাক-জগতে বেতোকেও বলা হয় শাকরাট বা শাকরাজ। বাংলা কেন সমগ্র ভারতবর্ষেই এই শাকের জন্ম, বিশেষতঃ যব, গম বা সর্ষের ক্ষেতে; সেইজন্যই কি তার নাম যবশাক? আর বাস্তুভূমির যেখানে সেখানে জন্মে বলেই তা "বাস্তুক"। গুল্ম জাতীয় ছোট ছোট গাছ, পাতা তুলসীর পাতার মত কিন্তু ধারগুলি ঢেউ খেলানো; এগুলিকে বলা হয় ক্ষুদ্র বাস্তুকী, এর আর একটি নাম জ্বরঘ্নী অর্থাৎ জ্বরনাশকারী। সম্ভবতঃ অগ্নিবল বৃদ্ধি করে ব'লেই তার এই জ্বরনাশিত্ব শক্তি বর্তমান। এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম—Chenopodium album Linn.

আর এক প্রকার বেতো পাওয়া যায়, তার পাতাগুলি লাল; সাধারণ শাক হিসাবে তাদিকেও ব্যবহার করা হয়, এর বোটানিক্যাল নাম Chenopodium purpurascens.

এছাড়া আরও একপ্রকার বেতো এ দেশে দেখা যায়, তার নাম চন্দন বেতো, বোটানিক্যাল নাম Chenopodium ambrosioides Linn.

এক শ্রেণীর ভেষজ বিজ্ঞানীদের অভিমত, চন্দনবেতোর আদিম বাসস্থান নাকি আমেরিকা; এদের ফ্যামিলী Chenopodiaceae.

কে কিভাবে দেখলেন—

ভুক্ত্বা বাস্তুকশাকেন সতক্রং লবণং পিব।
হরীতকীং ভুংক্ষ রাজন্ নশ্যন্তু ব্যাধয়শ্চ তে॥

—অর্থাৎ হে রাজন্, নিত্যই আপনি বেতোশাক, ঘোল এবং অল্প লবণ একত্রে মিশিয়ে খেয়ে পরে একটু হরীতকী সেবন করবেন, কখনই কোন ব্যাধি হবে না।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে এই শ্লোকটির অর্থ পরে রূপান্তরিত হয়েছে 'রায়তায়' এবং রায়তা সেবনটি সামাজিক প্রথা। আর এই বাংলার কোন কোন অঞ্চলে শিবচতুর্দশীর পরের দিন বেতোশাক ও শুকনো কুল দিয়ে ব্রত-পারায়ণের একটি আহার্য তৈরী হয়, তাকে বলা হয় 'কুল বেতো', এটি কিন্তু ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে।

ব্যবহার ব্যতিক্রম :—চরক সংহিতায় বলা হয়েছে সব শাককেই অল্প সিদ্ধ ক'রে জলটা ফেলে দিয়ে খাদ্য রূপে ব্যবহার করা ভাল; কিন্তু বেতোশাকের বেলায় তার উল্লেখ নাই; কারণ এটি ত্রিদোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) নাশক; অগ্নিবল বৃদ্ধিকারক। 'বিদ্যাদ্ গ্রাহি ত্রিদোষঘ্নং ভিন্নবর্চস্তু বাস্তুকম্॥' (চরক-সূত্র-২৭।৬৮)

আর ১১দশ শতাব্দীর চক্রদত্ত এর আর একটু ফল সন্ধানী হয়ে বলেছেন—এই বাস্তুক শাকের গুণ-বীর্যের কথা। তাঁর বক্তব্যে বোঝা যায় এতে প্রভাব নামক এক প্রকার শক্তি আছে অর্থাৎ স্পেসিফিক্ প্রপার্টি—যে শক্তির দ্বারা এই বাস্তুকশাকের অগ্নিবলবৃদ্ধিকারকতা এবং মেধাবৃদ্ধিকারকতাও নিহিত আছে। তাছাড়া এর ক্ষার-ধর্মিতা থাকার জন্য ক্রিমিনাশক শক্তিও বিদ্যমান।

এর ক্রিমিনাশকতা বাহ্য ব্যবহারেও প্রত্যক্ষ হয়। বেতোশাকের রস মাথায় মাখলে এবং কিছুক্ষণ ঐ রসে মাথার চুল ভিজিয়ে রাখলে উকুন থাকে না।

শাকটির গুণ, বীর্য ও প্রভাব সম্বন্ধে সুশ্রুতেও অভিমত পাওয়া যায়—

'কটু বিপাকে কৃমিহা মেধাগ্নে-বলবর্দ্ধনঃ।
সক্ষারঃ সর্ব্বদোষঘ্নঃ বাস্তুকো রোচকঃ পরঃ॥
(সুশ্রুত—সূত্র—৪৬ অধ্যায়)

অর্থাৎ যেটি বিপাকে কটু সেটি অবশ্যই আগ্নেয় দ্রব্য।

সুশ্রুতের বক্তব্য অনুশীলন ক'রে ভারতের সব প্রদেশের বৈদ্যগণই এই শাকটিকে নির্দোষ আহার্যের মধ্যে অন্যতম আহার্য ব'লেই শুধু গণ্য করেন নাই, এর ভৈষজ্যগত শক্তিরও ব্যবহারগত ফল তাঁরা ঘরোয়া মুষ্টিযোগের তালিকাভুক্ত করেছেন—

১। বেতোশাকের রস ১ চা-চামচ এবং টাট্‌কা ঘোল আধ পোয়া মিশিয়ে খেলে হিক্কা বন্ধ হয়।

২। বেতোশাকের রস আধ পোয়া, তিল তৈল তিন পোয়া ও জল চার সের, তৈল পাকের রীতিতে পাক ক'রে সেই তৈল ব্যবহার করলে মাথার খুসকী, উকুন, চুলের গোড়ার চাপড়া ঘা কয়েক দিনেই সেরে যায়।

রোগ-প্রতিকারের উৎস—

১। বেতোশাকে যেমন ক্ষারধর্মিত্ব আছে (যার জন্য এর আর একটি নাম 'ক্ষারদলা'), তেমনি এর মধ্যে আছে উদ্বায়ি (volatile) তৈল। এর ফলে মলবাহক অন্ত্র ও স্রোতপথকে সহজেই পরিষ্কৃত করে, মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখে এবং লিভারের ক্রিয়াগুলিকে শক্তিশালী করে।

২। **রক্তার্শেঃ**— বেতোশাকের রস ৩।৪ চা-চামচ অল্প গরম ক'রে দুধ (মহিষের দুধ হলে ভাল হয়) মিশিয়ে খেলে অর্শের রক্তপড়া বন্ধ হয়।

৩। **আমাশা রোগেঃ**— বেতোশাক শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে অল্প দই মিশিয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে তার সঙ্গে দাড়িমের রস দিতে বলা হয়েছে চরকে।

৪। যাদের শুকনো কাসি থাকে (চলতি কথায় বলে বাতিকের কাসি,) সেক্ষেত্রে কিছুদিন শাক হিসেবে খেলে উপকার হয়।

৫। **শোথেঃ**— হাতে-পায়ে শোথ হলে প্রস্রাব পরিষ্কার করানোর জন্যে বেতোশাক সিদ্ধ জল খেতে দিয়ে থাকেন এবং তার সঙ্গে ঐ শাক বেটে গরম ক'রে প্রলেপ দিয়ে থাকেন প্রাচীন বৈদ্যেরা।

৬। যাঁদের আহারে রুচি নেই, তাঁরা শাক হিসাবে এটা খেলে মুখে রুচি ফিরে আসবে।

৭। লিভারের যথাযোগ্য ক্রিয়া মৃদু হ'লে গৌণভাবে (Indirectly) অনেক রোগ উপস্থিত হয়ে থাকে, যেমন—অম্লরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, গাত্রদাহ, আমবাত (Rheumatism) প্রভৃতি; সেক্ষেত্রে ঐটিকে শাকের মত রান্না ক'রে খাওয়া খুবই ভাল।

৮। যাঁরা ছোট ক্রিমির উপদ্রবে কষ্ট পান, সেক্ষেত্রে সকালে ২।৩ চা-চামচ রস অল্প গরম ক'রে খেলে উপকার হয় অথবা শাক হিসাবে দুপুরে বেলা খেতে হয়; মোট কথা যকৃদ্দোষজনিত সর্বপ্রকার রোগের উপদ্রবে এটি বিশেষ কার্যকরী।

৯। অতিসারের (পাতলা দাস্ত) বেগ খুব অথচ অল্প অল্প মল নির্গত হয় এবং তাতে কুন্থনও হয় প্রবল, তখন বেতোশাকের রস দধি ও দাড়িম্বের রসের সঙ্গে তিল-তৈল যোগে পাক ক'রে সেবন করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

১০। বেতোশাক তিল তৈল যোগে পাক ক'রে লবণ যোগে খেলে উরুস্তম্ভ আরাম হয়।

১১। বেতোশাক ধারক, এটি প্লীহা ও পিত্তজনিত রোগে হিতকর।

১২। গাছ বিরেচক ও ক্রিমিনাশক।

খ্যাতি পরিচয়ে সামান্য হলেও বিশেষ গুণসম্পন্ন শাক এটি—আর রোগ-নিরাময়ের দক্ষতায় তার স্থান প্রথম সারিতে; খ্যাতির আড়ালে থাকা এদের চিনতে বা জানতে হলে যে দৃষ্টিভঙ্গী এবং দেশীয় সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকার প্রয়োজন—তা কি আমাদের জাগ্রত? তাই বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে ঘরমুখো না করলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও চেনা যাবে না, আর গোলমালে পড়ে থেকে এই রামের মুরগী শ্যামের ঘরে ডিম পেড়ে আসবে, তাও দেখতে হবে।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Saponin. (b) Vitamin viz. carotene, vitamin-C. (c) Sterol viz., ascaridol (40-45%. (d) Inorganic salt viz., magnesium phosphate. (e) essential oil 0.03-0.04%

উপোদকী

প্রচলিত প্রবাদের অতীত ভিত্তি কোন ঘটনা থেকেই, এটা প্রমাণিত সত্য। ঘটনার পরবর্তীরূপ রটনা, অবশেষে সেই রটনাটিকে জাগ্রত রাখতে হ'য়ে দাঁড়ায় সংস্কার।

এই পুঁইশাককে নিয়ে যত প্রবাদ তারও মূলে আছে ঘটনা ও পরে রটনা। হিরণ্য-কশিপুর নাড়ী এটা, এ রটনার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে আছে হয়তো বা এককালে প্রাক্-আর্যদের সঙ্গে খাদ্য নিয়ে কলহ।

পুঁইশাককে হিরণ্যকশিপুর নাড়ী বলা হয়েছে, কারণ হিরণ্যকশিপু তো আর্য-বংশীয় ছিলেন না; হয়তো বা এও অসত্য নয় যে, যাঁরা বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী ছিলেন তাঁদিকে অপবিত্রও বলা হ'তো।

বাংলায় ব্রাহ্মণ্য আচারে পুঁইশাক অগ্রাহ্য, তবে বিংশশতাব্দীতে সেটা পুঁথিগত তথ্য। এটির ব্যবহারগত অপবিত্রতা আছে তাও বলা যায় না। অজ্ঞাত তথ্যের দিক থেকে সর্বজনীন প্রবাদ—"শাকের মধ্যে পুঁই ও মাছের মধ্যে রুই"। এছাড়া আর একটি প্রবাদে শোনা যায়—এটি নাকি আমাশার ঘর; আবার এমন কিংবদন্তীও আছে যে—

"মসুরং আমিষং জ্ঞেয়ং পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা"

অর্থাৎ মসুর ডাল খেলে আমিষ খাওয়া হয়, আর পুঁইশাক খেলে ব্রহ্মহত্যার ভাগী।

তাই প্রশ্ন—এই দ্রব্যটির সম্পর্কে পরস্পর বিপরীত যে সব লোকোক্তি তার মূলে কি?

"নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ"

অর্থাৎ জনশ্রুতি কখনও অমূলক হয় না। এমনি চিন্তাধারার মধ্যে বস্তুবিজ্ঞানের দিকও তো আছে।

বনজ-উপোদকী (বনপুঁইশাক)
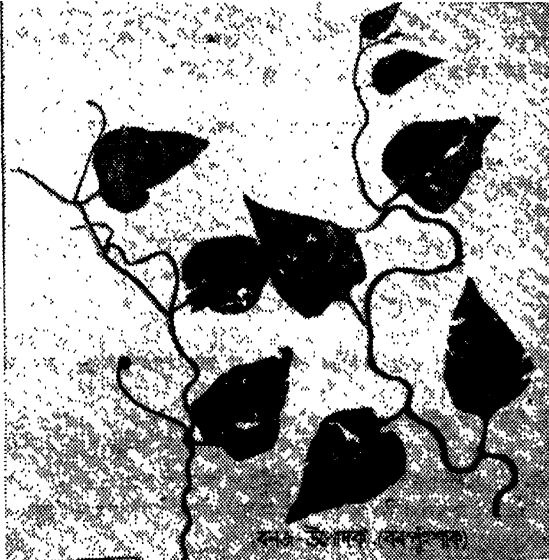
প্রথমতঃ বলা দরকার যে, সকল প্রদেশের ব্রাহ্মণ বা বিধবারাই যে এটিকে বর্জন ক'রে থাকেন, তা নয়; তবে বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দুদের এ সংস্কার বদ্ধমূল, এটি বহুগুণ সম্পন্ন, আমিষগুণের ভেষজ, তাই এটি যেন হিরণ্যকশিপুর নাড়ীর মতই অপবিত্র, এমনি আখ্যায় আখ্যায়িত ক'রে তা পরিত্যজ্য অর্থাৎ অনার্য গ্রাহ্য ব'লেই ও অপবিত্র;

তা ছাড়া সেটা উপমাকেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর নামটির সঙ্গে জড়িয়ে এই নামকরণের তাৎপর্যও হয়তো হিরণ্য অর্থে স্বর্ণ আর কশিপু অর্থে বস্ত্র। হিরণ্যকশিপু প্রাক্-আর্যজাতির হ'লেও রাজা ছিলেন; তিনি সর্বদা স্বর্ণখচিত বস্ত্র প'রতেন, তাই তাঁর নাম ছিল হিরণ্যকশিপু। পুঁইলতা যতই পাকে রং হয় তার সোনার মত। তাই এই লতাগাছটির নামের সঙ্গে হয়তো বা শ্লেষাত্মক শব্দ জড়িত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রবাদবাক্যের দৃষ্টিকোণ্ তার আহার্য রস বিচারে—এটি নিদ্রাজনক, জনন-উত্তেজক, শুক্রবর্ধক, রুচিপ্রদ ও তৃপ্তিকারক, তাই আমিষপ্রধান, এবং রুইমাছের সঙ্গে তার তুল্য-মূল্য দেওয়া হয়েছে। আর আমিষ অর্থ লোভনীয়।

তৃতীয় প্রবাদবাক্যের উত্তর পাওয়া যায়—সে যুগের দ্রব্যগুণ-বিশারদগণের দ্রব্যের নামকরণ চাতুর্যে—এই পুঁইশাকের একটি নাম দিয়েছেন "কীটাবাস", সুতরাং যাঁরা Chronic অ্যামেবিয়েসিস্ (Amaebiasis) বা জিয়ার্ডিয়ায় আক্রান্ত, তাঁদের এই শাকটি বিষবৎ, তাই বলা হ'য়েছে "আমাশার ঘর"; দ্বিতীয়তঃ এটি গুরুপাক, তাই পরিপাক ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটায়, সেটাও আমাশার একটি কারণ। আর চতুর্থ প্রবাদ বাক্যের অর্থটি দার্শনিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে;—সত্বগুণের অধিকারী হ'তে গেলেই রজো বা তমোগুণের বৃদ্ধিকারক দ্রব্য পরিহার করাই শ্রেয়, সেক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিতে এটি রজো ও তমোগুণ সমৃদ্ধ; পাছে সত্বগুণ নষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মচিন্তায় ব্যাঘাত ঘটায়, তাই একে বলা হয়েছে 'পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা'।

যদিওবা পুঁই অনার্য-ভক্ষ্য, তথাপি বৈদিকযুগে যে তার উপর দৃষ্টি পড়েনি তা নয়—তার প্রমাণ আছে ঋক্‌বেদের ৬।৪৬।১৪ সূক্তে—

'সৌবীরং নামিষং ভুংক্ষা ব্যাচক্ষ্ণীত প্রপোদকং'

সায়ণ এই সূক্তটির ভাষ্য করেছেন—

প্রকৃষ্টরূপেণ আপোদকং=উপোদকীলতা তাং সৌবীরং
মৌরেয়ং বা আমিষং অন্তরেণ ন ভুংক্ষা।
ব্যাচক্ষ্ণীত=সুষ্ঠু কাময়তে

অর্থাৎ উপোদকীলতা এবং সৌবীর বা মৌরেয় মদ্য আমিষ ছাড়া গ্রহণ করবে না, এইটি সুষ্ঠু কামনা।

এই বৈদিক সূক্তটির অনুশীলনেই পরবর্তীকালে সংহিতা ও পুরাণে দেখা যায়—

ছত্রাকং গৃঞ্জনং মাষঃ পূতিকা মসুরং তথা।
কন্দশাকানি সর্ব্বাণি আমিষং পরিকীর্ত্তিতম্॥ (যাজ্ঞবল্ক)

অর্থাৎ মাটিতে জন্ম নেয় যেসব ভুঁই ছাতা এবং গাজর, মাষকলায়, পুঁই, মসুর এবং কন্দশাক—এগুলি আমিষ দ্রব্য।

আমিষ দ্রব্যগুলি যেকোন প্রকার স্নেহ-দ্রব্যের দ্বারা ভাজা হলেই তাতে যে ক্ষার-ধর্মিতার গুরুত্ব সৃষ্টি হয়, সেইটিই হয় রজোগুণবর্ধক। দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখার সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেই যাজ্ঞবল্কের আমিষ-বিচার।

কুলজিনামা ঃ— এই পুঁইশাকের আয়ুর্বেদিক নাম উপোদিকা। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে তিনটি জাতের পুঁইশাকের কথা লেখা আছে—উপোদিকা, বনজ বা ক্ষুদ্র উপোদিকা ও মূলপোতী। এদের মধ্যে উপোদিকা অর্থাৎ এই প্রচলিত পুঁইশাক। বনজ উপোদিকা অর্থাৎ বনপুঁই—এই দুই রকম সর্বদা দেখা যায়। কিন্তু মূলপোতীর সন্ধান পাইনি। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে এদের ফ্যামিলী—Basellaceae, ব্যোটানিক্যাল নাম—Basella alba Linn. এটি সাদা রঙের গাছ। আর ব্যাসেলা রুব্রা (Basella rubra Linn.) হচ্ছে লাল পুঁইশাকের নাম। আকারে, স্বাদে ও গুণে পার্থক্য যথেষ্ট থাকলেও দুই রঙের বনপুঁইকেই সেই একই নাম বলা হয়ে থাকে।

প্রাচীনেরা একে কিভাবে দেখেছেন—

(১) পুঁইশাক দিয়ে বার্লি রান্না ক'রে একটু দই মিশিয়ে খেলে, বেশী মদ খাওয়াতে যে সব দোষ জন্মে, সে সব দোষ সারাতে এই পুঁই আহার এবং ওষুধ হিসেবে ব্যবহার ক'রতে বলা হ'য়েছে।

(২) অর্শ রোগীর অতিরিক্ত রক্তস্রাব দেখা দিলে—এই শাক, কুল ও ঘোল একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে খাওয়ার উপদেশ।

এ দুটি চরক সংহিতায় লেখা আছে।

(৩) এই শাকটির আরও দু'টি বিশিষ্ট রসপরিচিতি সম্পর্কে আমাদের আর একটি প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ "চক্রদত্তের" শ্লোক এখানে তুলে দিচ্ছি—

উপোদিকা রসাভ্যক্তাস্তৎ পত্র-পরিবেষ্টিতম্।
প্রণশ্যন্ত্যচিরাৎ নৃণাং পিড়কার্ব্বুদ জাতয়ঃ॥

অর্থাৎ ব্রণ ও অর্বুদাদিতে (টিউমার) পুঁইপাতার রস মাখিয়ে ঐ পাতা দিয়ে বেঁধে রাখলে নিরাময় হয়। আরও একটি প্রাচীন গ্রন্থেও (বঙ্গসেন) এই একই কথা লেখা আছে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি—রক্তবর্ণ পুঁই হলেই ভাল হয়, তবে এই সাধারণ পুঁই-শাকেও উপকার হয়—একথা বলেছেন আমার অগ্রজ কবিরাজ *শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য মহাশয়। আর এক কথা বলে রাখি—টিউমার ছোট থাকা কালে লাগালে তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ—পীড়কা অর্থাৎ ব্রণ সম্পর্কে। এটা গ্রামাঞ্চলে প্রাচীনদেরও অনেকে ব্যবহার ক'রে থাকেন। এই কথাটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'ওয়াট' সাহেবের বইতে। তাঁদের আমলের বরিশালের সার্জেন এফ্. ডব্লু. মিজেস্ দেখেছেন—এটা ফোঁড়া পাকানো ও ফাটানোর পক্ষে খুব ভাল। অর্থাৎ এর পাতায় একটু গাওয়া ঘি মাখিয়ে গরম করে ফোঁড়ায় জড়ালে ফোঁড়া পাকে, আবার পাকাফোড়ার ঘা শুকোতেও ওই রীতি।

(৪) এও শোনা যায়—এটার রসের সঙ্গে ছাগল দুধ মিশিয়ে ৫।৭ দিন খাওয়ালে হুপিং কাশির প্রকোপ কমে যায়। অপকারের সম্ভাবনা যখন নেই, তখন দেখতে ক্ষতি কি?

(৫) কোন কোন দেশের গ্রাম্য-চিকিৎসকরা গায়ে শীতপিত্ত (যাকে আমরা চলতি কথায় আমবাত বলি, ডাক্তারী নাম urticaria) বেরুলে এর চুলকণা নিবারণের জন্য গায়ে মাখিয়ে দিয়ে থাকেন। এটা 'Indian Medicinal Plants' বইতে লেখা আছে।

(৬) পুঁই-ডাঁটা টুকরো টুকরো ক'রে কেটে শুকিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে (অন্তর্ধূমে)

তার ছাইগুলির সঙ্গে একটু নারকেল তেল মিশিয়ে খোসে ও কাউর ঘায়ে মাখলে অচিরে ওগুলি শুকিয়ে যায়।

(৭) প্রাচীন কবিরাজবৃন্দ আর একপ্রকারে পুঁইশাকের আশ্চর্য শক্তির প্রত্যক্ষ ফল দেখেছেন—পুঁইপাতা আধসের। খাঁটি সরিষার তৈল আধপোয়া। পাতার রসটি তেলে জ্বাল দিয়ে (জল শুকিয়ে গেলে) নামিয়ে ঠাণ্ডা হলে শিশিতে ভরে রাখতেন। ঐ তৈল দিয়ে নালী ঘা ও পচা ঘা সারাতেন।

(৮) কোন কোন স্থানের গ্রাম্য বৈদ্য রক্তাল্পতায় পাকা পুঁইবীজের বেগুনে রঙের রস খেতে বলেন; তাঁদের অভিজ্ঞতা—ফলও হয় চমৎকার।

গত ১৯৩৩ সালে ফিলিপাইন ও জার্মানীতে এই পুঁইশাকের খাদ্যপ্রাণ সম্পর্কে গবেষণা ক'রে পেয়েছেন ভিটামিন 'এ' এবং 'বি'। ১৯৪০-এ এদেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণা ক'রে তার মধ্যে পেয়েছেন প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও আয়রণ।

চরক—(১) অতিসারে উপোদিকাঃ— পুঁইশাক দধি ও দাড়িম্বরসসহ সিদ্ধ করতঃ বহু স্নেহসহ ভোজন করাবে। ইহা প্রবাহিকায় প্রযোজ্য। (চরক চিকিৎসা—১০ অঃ)

সুশ্রুত—(২) শ্লীপদে (গোদে):— পুঁইশাকের রস উপকারী। রস খেতে হয় আর গরম করে প্রলেপ দিতে হয়।

বঙ্গসেন—(৩) বালকের সর্দিতেঃ— পুঁইপাতার রস ব্যবহার্য। একটু গরম করে। (৪) গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতায়ঃ—পুঁইশাকের পাতার রস বিশেষ উপকারী। অবশ্য পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসের পর।

Watt (৫) পুঁইশাকের রস স্নিগ্ধকর, মূত্রকর এবং গণোরিয়ায় ও লিঙ্গপ্রদাহে উপকারী।

পায়োরিয়ায়—পুঁইপাতা ও ডাঁটা পুড়িয়ে ছাই করে তাই দিয়ে দাঁত মাজলে বহুদিনের পায়োরিয়ায় চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Vitamin viz. vitamin-A, vitamin-B. (b) Protein (different types). (c) Inorganic element viz., calcium, iron. (d) fixed oil (different types).

সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় "উপোদকী" নামটি পরবর্তী লোকসংস্কৃত ভাষায় "উপোদিকা"-য় রূপান্তরিত।

গ্রীষ্মসুন্দরক

ঢিমে? নাকি ধীর শব্দের ভ্রংশতায় ধিমে? ধিমে লিভারে গিমে শাক?

হয়তো বা প্রচলিত প্রবাদের সবটাই সত্য নয়, আবার অসত্যও নাও হ'তে পারে! গিমে শাকেই প্রবাদের সত্যাসত্যের দৃষ্টান্তস্থল। গ্রামে ক্ষেতে ময়দানে পুকুরে বা জলাশয়ের ধারে জন্ম নেয় এটি, থাকেও অনাদৃত হয়ে এই গিমে শাক; কিন্তু শাকটি যে আহার্যে এবং ঔষধে খুব মূল্যবান ব্যবহার্য বস্তু এ কথাটা অনেকের জানা নেই।

এককালে এর প্রাচীন ভারতীয় নাম গ্রীষ্মসুন্দরক। ঋক্‌বেদে ১।৪৮।৮ এবং ৮।২৯।১ সূক্তে এর নামের উল্লেখ—

"গ্রীষ্মসুন্দরঃ সবনর্মাসি বৃহচরণে প্রাণঃ প্রাণিনাং ব্যরংহৎ"

এই সূক্তের সায়ণ ভাষ্যে বলা হয়েছে—

"গ্রীষ্মসুন্দরঃ শাকঃ, গ্রীষ্মস্তু রসগ্রাসকঃ নিদাঘঃ=
ঋতুবিশেষঃ, বিষুবরেখায়াঃ পার্শ্বস্থঃ কর্কট-মকর-ক্রান্ত্যা-
ভূখণ্ডঃ, তত্রজাত শাকঃ, প্রাণিনাং প্রাণান্‌ ব্যরংহৎ=
রক্ষকোঽসি চতুর্বর্গেষু অগ্রিমঃ"

এই ভাষ্যের অর্থ হ'লো—গ্রীষ্মসুন্দর একটি শাকের নাম। আর গ্রীষ্ম হ'লো রসগ্রাহক এবং নিদাঘ ঋতু বিশেষ। বিষুবরেখার পার্শ্বস্থ কর্কট ও মকরক্রান্তির দ্বারা আক্রান্ত ভূখণ্ড, সেই ভূমিতে যে শাক জন্ম গ্রহণ করে, সেই শাক প্রাণিগণের প্রাণের শক্তিকে রক্ষা করে, এই শাকটি অন্য চারটি বর্গের মধ্যে অগ্রিম। তাই তুমি পবিত্র।

বেদোক্ত সেই মুন্দর শাকই এখন সুন্দর নামে আদৃত হয়। বিবর্তনেই বর্ণ-বিপর্যয় এমনি হয়। প্রায় সব বনৌষধিই প্রদেশ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে উচ্চারিত হওয়ার কারণও এই। যেমন উড়িষ্যায় বলা হয়, "পীতা গহম্"। তাঁদের পীতার অর্থ তিক্ত, এবং গিমা হ'য়ে গিয়েছে গহম্। অথবা এর বীজকোষগুলি ক্ষুদ্র গমের মত ব'লেই বা "গহম্"।

ভাষ্যের বিশেষ বক্তব্য—অভ্যন্তরের তাপ দূর করে। তাই দেখাও যায় ভৌগোলিক সংস্থানের খণ্ড খণ্ড ভেদে সূর্য তাপেরও ভেদ হয়, তাই গ্রীষ্মঋতুটি এককালে সমভাবে
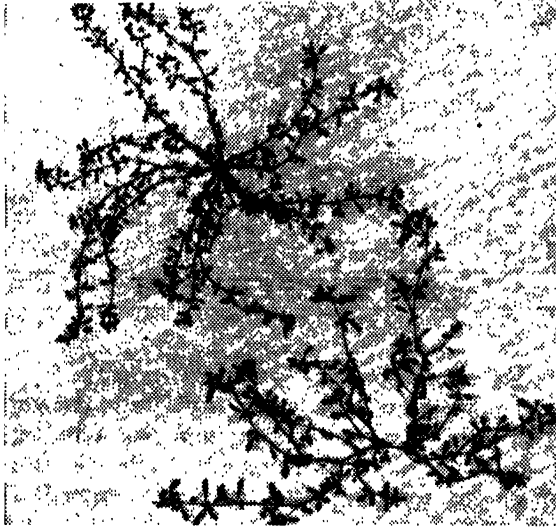
সর্বত্র কিরণ বিকীরণ করে না; যেখানে করে সেখানেই গ্রীষ্মসুন্দরের অর্থাৎ গিমে শাকের জন্ম।

গ্রীষ্মের উত্তাপে অন্যান্য গাছ যখন মৃতপ্রায় তখন এই গুল্মলতাটির যৌবন যেন জৌলুষ নিয়েই জনদৃষ্টি আকর্ষণ করে আর ভূমিশয্যায় স্বল্প গণ্ডীতে ছড়িয়ে থাকে; অর্থাৎ সে তার ভিতরের তাপকে সংহরণ করে ব'লেই অমন রূপ। তেমনি মানুষের শরীরের অন্তরগ্নির রূপ যে পিত্ত, তার আধিক্যকে এ সংযত করে। পরবর্তীযুগে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও ওর ঐ সূত্র ধ'রেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং তা হওয়াটাই স্বাভাবিক ব'লে মনে করি।

নব্যমতে কুলজিনামা:— ফিকোইডি (Ficoideae) ফ্যামিলীভুক্ত ভূমি প্রসারণী ছোট পাতার শাকটি মলিউগো (Mollugo) গণভুক্ত ৪।৫টি প্রজাতি (Species) সর্বদা পাওয়া গেলেও সাধারণতঃ মলিউগো স্পারগুলো (Mollugo spergula যার বর্তমান নাম Mollugo oppositifolia Linn.) ও মলিউগো হিরুটা (Mollugo hirta) বর্তমান নাম (Mallugo lotoids) ব'লে দুটি প্রজাতি কি আহারে বা ঔষধে সর্বদা ব্যবহৃত হয়, এদের নাম যথাক্রমে গিমে ও কাকীডুমে। অবশ্য

দু'টির গুণের সামান্য ইতর-বিশেষও আছে, কিন্তু কোন্‌টি কি—সাধারণের পক্ষে বিচার করা সম্ভব নয়। এর আর একটি প্রজাতি আছে, তার প্রাদেশিক নাম জলপাপ্‌ড়া বা জ্বরপাপ্‌ড়া, যার বোটানিকাল্‌ নাম Mollugo pentaphylla Linn.; সেটা জ্বরে ব্যবহার করা হয়।

সংহিতাযুগের সমীক্ষাঃ— চরক সুশ্রুতে 'গ্রীষ্মসুন্দরকঃ' নামের উল্লেখ নেই, কিন্তু এমন একটি তিক্ত শাকের উল্লেখ করা রয়েছে—যাকে আমরা এই গিমে শাক বলেই গ্রহণ করেছি। এটি চরকের সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ের ৭৫ শ্লোকগুচ্ছের প্রথম শ্লোকটি—

'মণ্ডূকপর্ণী বেত্রাগ্রং কুচেলা বনতিক্তকম্‌'।
পাঠান্তরং যবতিক্তকম্‌

কিন্তু কেউ কেউ আবার বলেন কুচেলাই এখানে উদ্দিষ্ট বনতিক্তকেই গিমে বলার প্রস্তাব; তার অর্থ—পাঠা এবং বনতিক্তক শব্দের অর্থ আকনাদি। এস্থলে ভেষজ বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন—চরকের কল্পস্থানের একাদশ অধ্যায়ের যেটি যবতিক্তা, বা নীলী অথবা সপ্তলাই সেখানে গিমেশাক। তবে শিবদাস (চক্রদত্তের উদাবর্ত রোগে) বলেছেন নীলী আর শঙ্খিনীকে 'কালমেঘ।' এখানে আমাদের উদ্দিষ্ট গিমের যেটি স্বাভাবিক প্রকৃতি, সেটি হলো জলের সঙ্গে একে চট্‌কালে প্রচুর ফেনা হয় এবং এর ফলগুলি যবের আকৃতি হয়। তাই ফেনিলা, যবতিক্তা ও নীলী যখন একই প্রকৃতির পর্যায়ের এসে যাচ্ছে, তখন প্রকৃতি সাম্যে এই গিমে শাককেও সপ্তলা ব'লে নির্বাচন করাটা প্রসঙ্গাধীন হয়। অবশ্য সপ্তলার স্বভাব সাধর্ম্য শঙ্খিনীতেও দেখা যায়। তাই একই শ্লোকে চরক সংহিতায় উভয়কে একত্র করে গ্রথিত করা হ'য়েছে। তবে আজও ভেষজটির কোন সমীক্ষা হয়নি। তাই পরবর্তীযুগে নিঘণ্টু গ্রন্থে (**একার্থবাচক বৈদিক শব্দকোষ**) একে বলা হয় গ্রীষ্মসুন্দরকঃ, সেইজন্যই পরবর্তীকালে নিঘণ্টু বিধৃত নামের ওষধিটির আলোচনা হয়েছে শাকবর্গে। সেখানে তার গুণ বর্ণনায় লিখেছেন

'তিক্তত্বম্‌, লঘুত্বম, কফপিত্তদোষনাশিত্বম্‌ রুচিকারিত্বঞ্চ';

অর্থাৎ স্বাদে তিক্ত, কফপিত্তাধিক্যনাশক ও রুচিকারক, আর রোগারোগ্যের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে—পাণ্ডু-কামলা (জণ্ডিস্‌ বা তার পূর্বাবস্থা) ইত্যাদি যকৃত-প্লীহাঘটিত যাবতীয় রোগ প্রতিষেধক ও উপশামক।

নব্য ভেষজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে— এই তিক্ত শাকটিতে সাবান জলের মত কতকগুলো ফেনিল পিচ্ছিল পদার্থ আছে, তার নাম স্যাপোনিন্‌, তা থেকে বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার দ্বারা কতকগুলো নতুন ধরনের টাইটারপিন্‌ জাতীয় দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে এই বস্তুটি মানুষের রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে তার বিশিষ্ট উপযোগিতার ক্ষেত্র কি, তার অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে শাক-সব্‌জি— যেকোন তরকারী মাত্রেই শাকপর্যায়ভুক্ত, অবশ্য তার শ্রেণীভেদ করা হয়েছে, যথা—পত্র, পুষ্প, ফল, নাল, কন্দ ও সংস্বেদজ (ছত্রাক শাক) শাক; এই ছয়টি শ্রেণীর মধ্যেই সমস্ত তরিতরকারী। এগুলি উত্তরোত্তর গুরুপাক, এর মধ্যে পত্রশাকই সর্বাপেক্ষা লঘু। তবে আমাদের পূর্বাচার্যগণ বলেছেন—শাককে স্নেহাভ্যক্ত ক'রে অর্থাৎ অল্প ঘৃত বা তৈল (তিল তৈল এখানে বক্তব্য) দিয়ে সন্তলন ক'রে (সাঁতলে নিয়ে) খাওয়া সমীচীন; এদ্বারা শাকের রুক্ষতা নষ্ট হয়ে হজমের পক্ষে সহায়ক হয়।

বর্তমান সমীক্ষার উপলব্ধ তথ্যঃ— এটি অগ্ন্যুদ্দীপক, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, বিষ-দোষনাশক। এটি যে জ্বরঘ্নও, সেটা ব'লেছেন মেজর স্টীওয়ার্ট সাহেব। আর একটি গুণের কথা ওয়াট সাহেবের গ্রন্থে পাওয়া যায়—এটা মাদ্রাজের পাদকোটা অঞ্চলে চুলকণা ও অন্যান্য চর্মরোগে এই শাক বেটে গায়ে মাখিয়ে থাকে। (স্বর্গত কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় এই গিমে শাকের মূল ৫।৬টি গোলমরিচের সঙ্গে বেটে বসন্ত রোগে ব্যবহার করতেন—বিস্ফোটকগুলোকে পাকানো অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বসানোর জন্য।)

এই শাক সম্পর্কে একটি বিধিনিষেধ আছে—যেসব রমণীর কষ্টরজঃ (ডিসমেনো-রিয়া) আছে, আহার্যের সঙ্গে এটি খেলে তাঁরা সে দোষ থেকে রেহাই পাবেন; আর যাঁদের স্রাবের আধিক্য আছে, তাঁরা এটা খাবেন না। এই তথ্যটি দিয়েছেন ডাইমক সাহেব। এটার সত্যতা সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।

এই শাকটির বিভিন্ন রোগনাশক গুণ থাকলেও আহার্যের সঙ্গে কালে ভদ্রে শাক-হিসেবে অথবা ফুলুরির মত বড়া ক'রে ব্যবহার ক'রে খেলেও কিছু না কিছু উপকার হবেই। তাছাড়া যেখানে লিভারের ক্রিয়া মন্দীভূত, সেসব ক্ষেত্রে সপ্তাহে ৩।৪ দিন অল্প পরিমাণ শাক হিসেবে যদি ব্যবহার করা হয়, তাহলে যকৃতের ক্রিয়া স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে। কারণ অন্ন-পানের মাধ্যমেই আমাদের অন্তরাগ্নি ইন্ধন সঞ্চয় করে। তাতেই আমাদের প্রাণধারণ সুষ্ঠু হয়। এ আবিষ্কার আজকের নয়—চরক সংহিতার চিকিৎসা প্রচলনের যুগে। এই অভিমত আজও স্বীকৃত ও অপরিবর্তিত।

"বিহিত-বিধি হিতমন্নপান-প্রাণিনাং প্রাণ-সংজ্ঞকানাং প্রাণকুশলাঃ।
প্রত্যক্ষ ফলদর্শনাৎ তদিন্ধনাৎ হ্যন্তরাগ্নেঃ স্থিতিস্তদেব
সত্ত্বমুর্জয়তি তচ্ছরীরধাতু ব্যূহবল-বর্ণেন্দ্রিয়-
প্রসাদকরং যথোক্তমুপসেব্যমানং বিপরীত মহিতায় সম্পদ্যতে
(চরক-সূত্র—২৭।২)

যেমন বটের একটি ছোট্ট বীজাঙ্কুর কালে একটি প্রাসাদকে চিড় ধরিয়ে দিতে পারে—মন্থরগতিতে ক্রিয়াশালী যকৃতও তদনুরূপ।

চরকে বর্ণেন্দ্রিয়ের পোষক রূপে যে শরীরস্থ অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র—এই সপ্তধাতুর যে উপকারিতার উল্লেখ আছে— সে সিদ্ধান্ত সর্ববাদীসম্মত। চরকে বলা হয়েছে, পোষকতা অন্নপানীয়েই সমূহ বিদ্যমান। অতএব শরীরপুষ্টি বা ধাতুসৃষ্টির একান্ত কারকতা যদি কোন একটি বিশেষ ভৈষজ্যে থাকে, তাকে সংকেত করেই বলা যেতে পারে 'সপ্তলা'। অতএব এই গ্রীষ্মসুন্দর বা গিমে শাকের পর্যায় সপ্তলা সংজ্ঞাটিও সার্থক নাম, তা নিঃসন্দেহ। অর্থাৎ সপ্তধাতুর পোষকতা করে ব'লেই এই নাম দেওয়া হয়েছে।

'সপ্তধাতূন্ লাতি=দদাতি ইতি সপ্তলা।'

যার জন্য চরকে এটি একটি কল্পের পরিকল্পনা। অর্থাৎ বৈদ্যগণের অভিমত হ'লো মনঃপ্রিয় বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ বিশিষ্ট এবং বিধিপূর্বক কল্পিত অন্নপানকে প্রাণীদের প্রাণ বলেই নির্দেশ করা হয়। আর প্রত্যক্ষতঃ দেখাও যায় যে অন্নপানই প্রাণীদের অন্তরাগ্নির ইন্ধন (জ্বালানির কাঠ) স্বরূপ। এইটিই প্রাণীদের প্রাণধারণের হেতু। এটি যথাবিহিত ব্যবহৃত হলে সেই অন্নপান শরীরের ধাতুসমূহের বল ও বর্ণ এবং

ইন্দ্রিয়দের প্রসন্নতা সম্পাদন করে, আর বিপরীতরূপে ব্যবহৃত হলে অহিতকর হেতু হয়।

এই শাকটি সম্পর্কে উল্লিখিত বৈদিক সূক্তের একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভাষ্যকার লিখেছেন—

'সবনমসি'

এই সবন শব্দের তাৎপর্য যকৃতের দূষিতাংশকে আঁচড়ে নিষ্কাষণ ক'রে দেয়।

লোকায়ত মুষ্টিযোগ

১। চোখ উঠলে, চোখ দিয়ে পিঁচুটি পড়লে, গিমে পাতা সেঁকে নিয়ে তার রস ফোঁটা ফোঁটা করে চোখে দিলে, চোখের করকরানি কমে, পিঁচুটি পড়া বন্ধ হয়।

২। অম্লপিত্ত রোগে যাঁদের বমি হয়, তারা গিমে পাতার রস ১ চামচ এবং তার সঙ্গে আমলকী ভিজানো জল আধকাপ মিশিয়ে সকালে খাবেন, অচিরেই বমি করা কষ্ট দূর হবে।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Saponin. (b) Vitamin viz. carotene. (c) Fatty acid (d) Glucoside (different types). (e) Alkaloid 0.038%. (f) Highly essential oil.

১) ত্বাষ্ট্রী

ব্যক্তি উপকৃত হ'লে তার ফললাভ—সমাজে ও রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি বার্তাই কালে হয় কাহিনী, আর সেই কাহিনীই আবার কাব্য ও ছড়ায় গাথা হ'য়ে যায়।

এমনি একটি কাল, যে কালে ফলপ্রদ বনৌষধিগুলিকেও কাহিনী উপাখ্যানের মাধ্যমে জনসমাজে প্রচার করা হ'তো, এ রীতি চিরন্তনী এবং বৈদিকযুগেও এটি প্রবর্তিত।

এই বনৌষধিটিও একটি বৈদিক কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে আছে অথর্ববেদের বৈদ্যক-কল্পের ৪৩২।২।১১ সূক্তে সেখানে বলা হ'য়েছে—

> ত্বাষ্ট্রী দধৎ শুষ্মমিন্দ্রায় বৃষ্ণে অপাকো অচিষ্টু যশসে পুরূণি।
> বৃষা যজন্ বৃষণং ভূরিরেতা মূধর্ণ্যজ্ঞস্য সমনক্তু দেবান্।

অথর্ববেদের ভাষ্যকার মহীধর বলেছেন—

> ত্বং ত্বাষ্ট্রী, ত্বাষ্ট্রে=চিত্রানক্ষত্রে জাতা লতা মাণ্ডূকী।
> ত্বাং সমনক্তুং ভোজয়ৎ যশসে=যশস্বিনে
> বৃষ্ণে সেক্তে ইন্দ্রায় বহু শুষ্মং=বলং দধৎ।
> তথা অপাকঃ যস্মাৎ সঃ অচিষ্টু=অর্চনশালী
> বৃষা=ইন্দ্রঃ যজন্=পূজয়ন্ ভূরিরেতা=
> বহুবীর্য্যং যস্য সঃ দেবান্ মূধর্ণ্যজ্ঞস্য সমনক্তুং=করোতু।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—তুমি ত্বাষ্ট্রী। তুমি চিত্রা নক্ষত্রে জাতা (জন্ম নাও)। তুমি

মাণ্ডূকী লতা। যে তোমার সেবা করে সে যশস্বী হয়। ইন্দ্র তোমাকে সেবা ক'রে বহু বল লাভ করে। তুমি অপাকী ব্যক্তিকে (অপদুষ্ট মেধা) অর্চনা পরায়ণ কর। ইন্দ্র তোমাকে যজন্ করে। তোমার দ্বারা বহুবীর্য লাভ হয়; দেবতাদিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, বীর্যধারণ ক'রতে তোমাকে নিযুক্ত করেন।

উপরিউক্ত বৈদিকতথ্যে ইন্দ্রকে উপস্থাপিত করা হ'য়েছে।

এই লতাগাছটি মেধাকরী ও বলবীর্যদায়িনী, এইটাই প্রকাশ করা হ'য়েছে। এই তথ্যকে উপজীব্য ক'রে চরকাদি সম্প্রদায়ের বৈদ্যককুল তাকে অনুশীলন ক'রে রোগ প্রতিকারের কাজে লাগিয়েছেন।
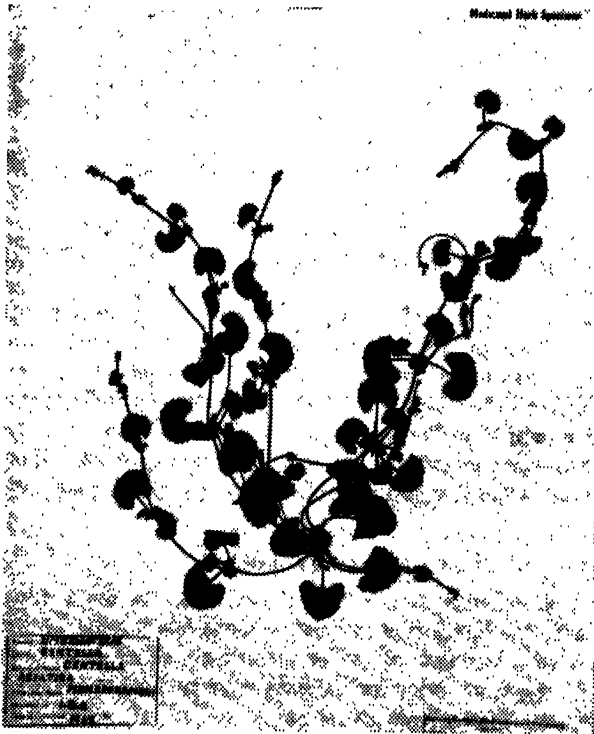
মাণ্ডূকী কি—

আচার্যদের মতে এইটি মণ্ডূকপর্ণী, যাকে আমরা চল্‌তি কথায় থুলকুড়ি বা থানকুনী বলি। কোচবিহার অঞ্চলে একে বলে মানামানি, অবশ্য বাংলা ও মালাবার ভিন্ন এই মণ্ডূকপর্ণী বা থানকুনী সমগ্র ভারতে "ব্রাহ্মী" ব'লে পরিচিত। এমনি মত বিরোধ স্মরণাতীতকাল থেকে চ'লে আসছে।

নামের সার্থকতা—

মাণ্ডূকী বা মণ্ডূকপর্ণী এইটি তার প্রকৃতি-পরিচয় জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা। মণ্ডূক অর্থে ভেক বা ব্যাঙ, "মণ্ডূকবৎপর্ণতে" অর্থাৎ ব্যাঙের মত লাফিয়ে লাফিয়েই লতা থেকে শিকড় ব'সে নূতন গাছ হয় (এই লতা গাছটির বিস্তৃতির বিন্যাস দেখলেই সেটা অনুমিত হয়)। সেইজন্যেই তার এই নামকরণ; এইটাই আচার্যগণের অভিমত। আর বাংলাদেশে ব্রাহ্মী ব'লে পরিচিত যেটি সেটিকেও মাণ্ডূকী বলা যায়; কারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে মণ্ডবৎ কর্দমের (কাদায়) ক্ষেত্রেও জন্মে। এই বাংলায় সেটিরই প্রচলিত নাম ব্রাহ্মী; যার বোটানিকাল্ নাম Bacopa monniera (Linn.) Pennell. ফ্যামিলি Scrophulariaceae. তবে এটা দেখা যায় যেসব অঞ্চলের জলবাতাসে একটু লবণের ভাগ বেশী সেই সব অঞ্চলে বেশী পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য নিবন্ধোক্ত বনৌষধিটির (থানকুনীর) যে স্বাদের উল্লেখ চরক সুশ্রুতে উক্ত হ'য়েছে তার সঙ্গে মণ্ডূকপর্ণীর স্বাদের পার্থক্য অনুভূত হয়। এখন প্রশ্ন হ'লো স্মৃতিবর্ধক হিসেবে কোনটির প্রাধান্য? সেটা কিন্তু আজও বৈদ্যককুল সন্দেহাতীত হননি।

যাই হোক পরবর্তীকালের গ্রন্থে লেখা হ'য়েছে, ব্রাহ্মী ও মণ্ডূকপর্ণী সমগুণান্বিত। বর্তমান আমার বক্তব্য থানকুনীকে কেন্দ্র ক'রে।

বৃহৎপত্র ও ক্ষুদ্রপত্র ভেদে দুই প্রকারের থানকুনী এদেশে পাওয়া যায়; ছোট পাতার থানকুনী বা থুলকুড়ি কোচবিহার অঞ্চলে জন্মে; সেটিকে ও অঞ্চলে ক্ষুদে মানী বলে।

এটি "আমাশায় ও পেটের দোষে", বড় থানকুনীর (ঢোলা মানী) থেকে বেশী উপকারী। (যদিও বলা যায় আমাতিসার কখনও প্রচলিত আমাশা শব্দের বাচ্য নয়)— এই বড় থানকুনীর বোটানিকাল্ নাম Centella asiatica (Linn.) urban. এবং ছোট থানকুনীর (ক্ষুদে মানী) বোটানিকাল্ নাম Centella japonica. দুটিরই ফ্যামিলি Umbelliferae. দেখতে অনেকটা থানকুনীর মত। আর একপ্রকার লতাগাছকে অনেকে থানকুনী ব'লে ভুল করেন। এটির বোটানিকাল্ নাম Ipomoea reniformis Choisy, ফ্যামিলি Convolvulaceae একে দেশীয় ভাষায় ভুঁইকামড়ী বলে।

লোকায়তিক ব্যবহার—

(১) থানকুনীপাতার রস ৫।৬ চামচ (চা-চামচ) একটু গরম করে ১ কাপ দুধের সঙ্গে একটু চিনি মিশিয়ে খেতে হয় (অম্লরোগ থাকলে চিনি নিষিদ্ধ)। এটাতে দেহের লাবণ্য ও কান্তি ফিরে আসে। আয়ুর্বেদিক পরিভাষায় বলা হয় এটা রসায়নগুণ সম্পন্ন।

(২) কেশপতনে— দেহের অপুষ্টির কারণে যাঁদের চুল উঠে যায়, উপরিউক্ত নিয়মে ব্যবহার ক'রলে তাঁদেরও বিশেষ উপকার হয়।

(৩) কৃশতায়— উক্ত পদ্ধতিতে ব্যবহার ক'রলে চেহারার পরিবর্তন হয়, একটু শাঁসে জলে লাগে।

(৪) অস্বাভাবিক ঘাম হলে— যাঁদের বেশী ঘাম ও তজ্জনিত গায়ে দুর্গন্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে ঐ ভাবে খাবেন। তবে একটু বেশীদিন খেতে হয়, এ সব ক্ষেত্রে দু-এক দিন খেয়েই বাস্তবে মিলিয়ে নেওয়ার প্রবণতাটা কিন্তু সংযত ক'রতে হয়।

(৫) পেটের দোষে— শ্লেষ্মা বা কফ্ সংযুক্ত মল, বারে বারে যেতে হয়, ভাল পরিষ্কার হচ্ছে না, পেটে বায়ু, কোন কোন সময় মাথাটা ধরা; এ ক্ষেত্রে অল্প গরমকরা

থানকুনী পাতার রস ৩।৪ চামচ সমান পরিমাণ গোদুগ্ধ (কাঁচা) মিশিয়ে খেতে হয়। এটাতে উপকার নিশ্চয় হবে; তবে একটু সময় দিতে হবে বৈকি।

(৬) বিস্মরণে— মনে আজ আছে কাল নেই; ইচ্ছে ক'রলেও মনে থাকছে না; এসব ক্ষেত্রে উত্তর বা পশ্চিম ভারতের বৈদ্যকবৃন্দ এই থানকুনী রস ২।৩ তোলা আধকাপ দুধ ও এক চামচ মধু মিশিয়ে খেতে দিয়ে থাকেন। ব্রাহ্মী বলে তাঁরা এইটাই ব্যবহার করেন। তবে বেশী টক, ঝাল, লবণ, ঘি, ডিম, তরকারী খাওয়ায় উপকার না পাওয়ারও হেতু হয়।

(৭) বাক্ স্ফুরণে— বাচ্চাদের কথা বলতে দেরী হচ্ছে, হয়তো পরিষ্কার বলতে পারছে না, সে ক্ষেত্রে ১ চামচ ক'রে থানকুনীপাতার রস গরম ক'রে ঠাণ্ডা হ'লে ২০/২৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে ঠাণ্ডা দুধের সঙ্গে কিছুদিন খাওয়াবেন, ওই অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

(৮) ডাক-হারা কোকিল— বসন্ত ফিরে যাচ্ছে অথচ সে নির্বাক, এ ক্ষেত্রে থানকুনী পাতা খুব কুচি ক'রে কেটে ছাতুর সঙ্গে খাওয়ান; ও ডাকতে সুরু ক'রবে।

(৯) অনিয়মিত ঋতু দোষে— থানকুনীপাতার রস কিছুদিন খেলে ওটা স্বাভাবিক হয়। অবশ্য মেদস্বিনীর ক্ষেত্রে নয়।

(১০) দূষিত ক্ষতে— মূল সমেত সমগ্র গাছ নিয়ে সিদ্ধ ক'রে সেই জলে ধোওয়ালে কিম্বা ঐ সমগ্র গাছটি শিলে পিষে নিয়ে সেটার সঙ্গে ঘি পাক ক'রে সেটা ছেঁকে ঐ ঘি লাগালে উল্লেখযোগ্যভাবে ওটা ক'মে যাবে।

(১১) পীনস রোগে— নাক বন্ধ এবং জ্যাব্‌জ্যাবে, আর সর্দিও থাকে, প্রায়ই গন্ধ হয়। তাঁরা থানকুনীর শিকড় ও ডাঁটার মিহি গুঁড়োর নস্যি নিলে ওটা কমে যাবে।

(১২) সাধারণ ক্ষতে— সে যেখানেই হোক না কেন, থানকুনী পাতাকে সিদ্ধ ক'রে সেই জল দিয়ে ধুইয়ে দিলে উপকার হবেই আর এই পাতার রস দিয়ে তৈরীকরা ঘি লাগালে নিশ্চয়ই নিরাময় হয়।

(১৩) মুখে ঘা— অনেক কারণেই হয়, তবে অম্লপিত্ত রোগে বেশীদিন ভুগতে থাকলে এটা প্রায়ই দেখা যায়, এ ক্ষেত্রে রোগের চিকিৎসা প্রয়োজন হয়, তার সঙ্গে এই পাতাসিদ্ধ গার্‌গেল (Gargle) ক'রলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

(১৪) জ্বর ও আমাশায়— (এখানে আমাশায় মানে আমাতিসার) দুটোই হয়েছে (সাধারণতঃ বাচ্চাদেরই বেশী দেখা যায়) সে ক্ষেত্রে এই গাছের পাতার রস গরম ক'রে ছেঁকে খাওয়ানো হয়।

(১৫) আঘাতে— থেঁতলে গেলে থানকুনীগাছ বেটে অল্প গরম ক'রে সেখানে প্রলেপ দিলে ওটা সেরে যায়।

আজ আমাদের আমলের ছোটবেলাকার পাঠশালার গণ্ডাকিয়া পড়ার কথা মনে প'ড়ছে। সবটা না প'ড়ে শেষের কলিটা এলেই সুরে সুর মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠতাম। আজও কি বিনা বিচারে সেই পদ্ধতিটি অবলম্বন ক'রবো?

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Acids viz. pecific acid, centotic acid, centellic acid. (b) Alkaloids viz. hydrocotyline, vellarine. (c) Sterols viz. betasitosterol, gamasitosterol. (d) Glycosides viz. asiaticoside. (e) resinous substances. (f) Fat.

শোভাঞ্জন

'যাঁহা মুস্কিল, তাঁহাই আসান' এদেশে এমনি একটা আকাশভিত্তিক প্রতিশ্রুতির লোককথার প্রচলন আছে; কিন্তু কথাটার মূলে আছে একটা কৃত্য সমীক্ষা। সেটি হচ্ছে—স্থান, কাল পাত্র ভেদে প্রকৃতি বিকারে দেহে রোগও যেমন হয়, তার প্রতিষেধকও তেমনি প্রকৃতি সৃষ্টি করে আশেপাশে। তাই চরকে বলা হয়েছে—'যস্য যদ্দেশ জন্ম তজ্জং তস্য ভেষজম্' অর্থাৎ যাহার জন্ম যেখানে, তাহার ভেষজও সেখানে জন্মগ্রহণ করে; তাই বলা হয়ে থাকে—যাঁহাই মুস্কিল তাঁহাই আসান। প্রাচীনমতে মুস্কিল অর্থ ভয়, অর্থাৎ ভয় যেখানে ভয়ের নিবারণও সেখানে। যেকোন প্রকার ভয়-নিবারকতাই ভেষজ। (ভেষ্+জি +ড, ঋক্‌বেদ ২।৩৩।২) সেটি যেন যমজ হ'য়েই জন্ম নেয় সুখ-দুঃখের মত। অর্থাৎ ভয়ের কাছে নির্ভয়কারীও কাছেই থাকে। এইজন্য কুষ্ঠরোগের প্রাক্‌প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাই কুষ্ঠরোগের ওষধিগুলির মধ্যে ভল্লাতকের (Semecarpus anacardium Linn.) ব্যবহার খুব বেশী, যার প্রচলিত নাম ভেলা; এই ভেলার গাছ সব থেকে বেশী ছিল ও আছে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও তন্নিকটবর্তী জেলায়; আবার দেখা যায় সেই অঞ্চলেই এ রোগের প্রাদুর্ভাবও বেশী। ব্লাক্‌ওয়াটার ফিভার (Black water fever) আসামের একটি ভয়াবহ রোগ; এই রোগের নিশ্চিত কার্যকরী বনৌষধিও ঐ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হ'য়েছে; ওটির স্থানীয় নাম "আলুই"; বোটানিকাল্ নাম Vitex peduncularis Roxb. ঠিক কাল সম্পর্কে এমনি কথাই বলা চলে। বসন্তকালের প্রভাবে (একে মধুকালও বলা হয়) শরীরে পিত্তশ্লেষ্মার যেমন উপদ্রব—তেমনি আবার বায়ু ও পার্থিবশক্তির প্রাধান্যজনিত কালধর্ম ব্যাধিও আবির্ভূত হয়—এই যেমন আসে হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগ; আবার এ সময়ে দেশের ভেষজ সব্জী সজিনার ফুল ও তার খাঁড়া (ডাঁটা), এঁচোড় (কচি কাঁঠাল) উচ্ছেও প্রকৃতি প্রসব করায়, পাতাঝরা নিমগাছে আবার নূতন পাতাও আসে; এরা এই

কালোদ্ভূত রোগের প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক; আয়ুর্বেদমতে এগুলি কফপিত্তের আধিক্য দূর করে। এইসব দ্রব্য ওষধিজ্ঞানেই এ সময়ে খাওয়া উচিত। শরীরে ঋতুকাল প্রসূত দ্রব্যের অনুকূল প্রয়োজন সর্বদাই থাকে এবং ভালও লাগে। অবশ্য এটাও ঠিক যে প্রকৃতি বিচারে স্থূল দৃষ্টিও অনেক সময় বিপদ ঘটায়। এই গাছটির বহুলাংশেই গুণের অভাব নেই, তবুও আমরা কটাক্ষ ক'রে তুলনা দিয়ে থাকি যে, 'লোকটা যেন সজ্‌নে কাঠ', কারণ এই গাছটি যতই বিশাল ও প্রাচীন হোক না কেন, গাছে এতটুকুও সার হয় না; তথাপি তার আভিজাত্য বৈদিক সাহিত্যের সূক্তে বিধৃত হয়েছে।

বৈদিক সমীক্ষা—

অয়ং স্ব অগ্নিঃ আক্ষীব দধে জঠরে বাবশানঃ
সসবানঃ স্তূয়সে জাতবেদ শৈশিরেণ (শুক্ল যজুঃ ১২।৪৬-৪৭)

অক্ষীবস্থং আক্ষং=মস্তকরং তদাক্ষীতি শিগ্রুঃ, শিঞ্জতি ইতি= দারয়তি ইতি উট্। ত্বং শৈশিরেণ জাতবেদঃ অসি বহ্নিরিব। অতস্ত্বং জঠরং প্রবিশ্য জাতবেদঃ সন্ বাবশানঃ স্বং স্তূয়সে।

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য করেছেন—হে আক্ষীব! (যার নাম শিগ্রু বা সাজিনা বৃক্ষ) তুমি শিশিরে প্রাণবান হও। তোমার শক্তি অগ্নিবৎ। জঠরে প্রবেশ ক'রে অগ্নি প্রকাশ কর। তোমাকে স্তব করি।

এছাড়া অথর্ববেদেও একে বলা হয়েছে—এই সজিনা দেহজ শত্রুর বিনাশ সাধন করে, সে শত্রু অর্শ ও ক্রিমি।

ভাষ্যকারের আক্ষীব শব্দের আর একটি অর্থ "মাতাল"। এটি যাস্কের অভিমত। ক্ষীব ও আক্ষীব দুইই মত্ততাবোধক শব্দ।

বেদের এই ইঙ্গিতটি প্রাক্-আর্যগোষ্ঠীর উত্তরাধিকারিদের এক বিশেষ ব্যবহারের সঙ্গে খুব মিল হয়। বৈদিক সংস্কৃতি বিস্তারের বহুপূর্বেই এই জাতির বসবাস এই ভারতে। তাঁরা অদ্যাবধি সজিনার রসে মদ্য প্রস্তুত করেন। এতে তাঁদের মত্ততা নাকি বেশ তীব্রই হয়। এই সজিনার ছালের মদ সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভীল, লোধা প্রভৃতি খুব আগ্রহের সঙ্গে পান করেন।

এই মদ তৈরী করতে সজিনার ছাল, অনন্তমূল (Hemidesmus indicus) R. Br. শতমূল (Asparagus racemosus Willd.) শিমুলমূল (Salmalia malabaricum (DC.) Schott & Endl.) ও মুথা (Cyperus rotundus Linn.) —এ পাঁচটির মাত্রা প্রথমটি তিনসের, বাকীগুলি আধসের ক'রে নেয়; মাত্র ২০দিন পচায়। তারপর শুক্‌নো মহুয়া এবং গুড় মিশিয়ে প্রয়োজন মাফিক জল দেয় এবং দেশীয় পদ্ধতিতে চুইয়ে নিয়ে যে মদ প্রস্তুত করে, তাকে বলে 'হাঁড়িয়া খেরী' (এই মদ ওদের কাছে পবিত্র এবং মূল্যবান। বিশুদ্ধ ভৈষজ্যের কিন্ত এতে থাকে বলেই ভাষাটা সুচিন্তিত।

বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়—অসুরদের মধ্যে সজিনারসের মদ্যটি গৃহীত হ'য়েছে। তবে বৈদিক ঋষিগণ সজিনার মধ্যে মদ্য-শক্তি ছাড়া, এর পাতা, ফুল, ফল, বীজ, এবং মূলের ও গাছের ছালেরও যে বিশেষ গুণ-বীর্য আছে—সে সম্বন্ধেও তাঁরা গবেষণা ক'রে দেখেছেন।

তাঁদের সেইসব সূক্তের অনুসরণ করেই পরবর্তীকালের সংহিতাকারগণের ব্যবহার-গত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রাক্-আর্যবংশীয়গণ আজও এই বৃক্ষের ছালের রস দিয়ে বাহ্য অর্বুদকে Tumour পাকায়, ফাটায় এবং পরে তাতে নিসিন্দা Vitex nigundo পাতার গুঁড়ো দিয়ে সে ঘা শুষ্ক করে।

সংহিতার যুগে:— ঐ বৈদিক সূক্ত দু'টির সূত্র ধ'রে চরকে, সুশ্রুতে যেমনি, তেমনি বাগ্‌ভট্, চক্রদত্ত, বঙ্গসেনেও এই গাছটির বিভিন্নাংশকে বহু দুরূহ রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার উপদেশ দিয়েছেন। এই গাছের মূলের রস যে অন্তর্বিদ্রধি (শরীরা-ভ্যন্তরস্থ দুষ্ট ব্রণ) নাশক—এ তথ্যটি নব্য বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক সমর্থিত। সে সমীক্ষা-টির দ্রষ্টা কিন্তু মহামতি বাগভট এবং চক্রদত্ত। এই শিগ্রু নামটির অর্থই হ'ল—প্রবেশ ক'রে বিদীর্ণ করা। তার উপর বিভিন্ন প্রদেশের লৌকিক ব্যবহার—এসব তো আছেই; আমার সীমিত বক্তব্যে কেবলমাত্র সাধারণের জ্ঞাতব্য কয়েকটি তথ্য এখানে প্রকাশ করছি।

জাতি ও প্রজাতি:— বৈদিকযুগে এক প্রকার সজিনারই উল্লেখ; পরবর্তীযুগে শ্বেত, রক্ত ও নীল পুষ্প—বর্ণভেদে আরও তিন প্রকার সজিনার উল্লেখ দেখা যায়। তবে নীলফুলের সজিনাগাছ বর্তমানে দুর্লভ। সাদাফুলের সজিনাগাছই সর্বত্র। বারোমাস যেটা পাওয়া যায়—তাকে নাজ্‌না বলা হয়, কিন্তু এরা প্রজাতিতে একই, বোটানিক্যাল নাম Moringa oleifera Lam. আর রক্তপুষ্প সজিনা বাংলার মালদহ অঞ্চলে পাওয়া

যেতো, কিন্তু বর্তমানে সেটা পাওয়া যায় কিনা আমার অজ্ঞাত; তবে Moringa concanensis Nimmo প্রজাতির এক প্রকার সজিনা রাজপুতনায়, সমগ্র দাক্ষিণাত্যে, এমনকি বেলুচিস্থান ও সিন্ধু প্রদেশেও পাওয়া যায়; এর ফুল ও ফল (ডাঁটা) গুলি রক্তাভ। পুষ্পের বর্ণ ভেদে গাছের গুণেরও পার্থক্য আছে—একথাও প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে।

দিল্লীরও লোভনীয় সজনেফুল:— এই জন্যেই চাষ করা হয়েছে দেরাদুনের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে। গাছে ফুল হলেই ডালগুলি কেটে ফেলা হয়, তারপর ঐ ফুল শুকিয়ে চালান হয়ে থাকে দিল্লীর ইউনানি চিকিৎসক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে।

বিভিন্ন অংশের ব্যবহার:—

(১) **সজনের পাতা:—** শাকের মত রান্না ক'রে (কিন্তু ভাজা নয়) আহারের সময় অল্পপরিমাণে খেলে অগ্নিবল বৃদ্ধি হয় ও আহারে প্রবৃত্তি নিয়ে আসে; তবে পেটরোগাদের—ঝোল ক'রে অল্প খাওয়া ভাল। তবে হ্যাঁ, এটা গরীবের খাদ্যই বটে, কারণ—তার মধ্যে আছে ভিটামিন এ, বি, সি, নিকোটিনিক এসিড্, প্রোটিন চর্বিজাতীয় পদার্থ, কার্বোহাইড্রেট এবং শরীরের পোষণ-উপযোগী আরও প্রয়োজনীয় উপাদান; এসব তথ্য কিন্তু নব্য বৈজ্ঞানিকের সমীক্ষার। এই শাক কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসিদের নিত্য প্রিয় ভোজ্য শাক। তারা কিন্তু গুণ জেনে খাচ্ছে না—আদিকালের সংস্কারেই খায়।

(২) **সজনের ফুল:—** শাকের মত রান্না ক'রে বসন্তকালে খাওয়া ভাল। এটা একটা বসন্ত-প্রতিষেধক দ্রব্য। তবে ইউনানি চিকিৎসক সম্প্রদায় ফুল (শুষ্ক) ব্যবহার করেন সর্দিকাসির দোষে, শোথে, প্লীহা ও যকৃতের (Liver) কার্যকারিত্ব শক্তি কমে গেলে, ক্রিমির আধিক্য থাকলে এবং টনিকের একটি অন্যতম উপাদান হিসাবে।

(৩) **সজনের ফল (ডাঁটা):—** 'খুদ্‌কুঁড়ির মধ্যে খাসা চালের' মত আমাদের দেশে সজনের ডাঁটা। নব্য বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ বিচারে পাতা ও ফল (ডাঁটা) অল্পাধিক সমগুণের অধিকারী হলেও ডাঁটাগুলি Amino acid সমৃদ্ধ, যেটা দেহের সাময়িক প্রয়োজন মেটায়। সর্বক্ষেত্রে সব দ্রব্যেরই ব্যবহার করা উচিত পরিমিত ও সীমিত। ইউনানি চিকিৎসকগণের মতে—বাতব্যাধি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের ও যাঁরা শিরাগত বাতে কাতর, তাঁদের আহার্যের সঙ্গে এটি ব্যবহার করা ভাল।

(৪) **বীজের তেল:—** এদেশে সজ্‌নের বীজের তেলের ব্যবহার হয় না, তাই পরীক্ষাও তেমন হয়নি, তবে আমাদের এ দেশের বীজের তেমন তেল পাওয়া যায় না, আমদানী হয় আফ্রিকা থেকে—নাম তার 'বেন অয়েল'। ঘড়ি মেরামতের কাজে লাগে, বাতের ব্যথায়ও মালিশে নাকি ভাল কাজ হয়। এ ভিন্ন গাছের ও মূলের (ত্বক) গুণের অন্ত নেই। এই গাছের গুণের কথায় অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত রচিত হয়।

রোগ-নিরাময়ে—

১। **হাই ব্লাড প্রেসারে** (High Blood Pressure);— নাফেন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের একটি সংবাদে প্রকাশ—বার্মিজ চিকিৎসকগণের মতে—সজনের পাকা পাতার টাট্‌কা রস (জলে বেটে নিংড়ে নিতে হবে) দুইবেলা আহারের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ২·বা ৩ চা-চামচ ক'রে খেলে সপ্তাহের মধ্যে প্রেসার কমে যায়। তবে যাঁদের প্রস্রাবে

বা রক্তে সুগার আছে, সেক্ষেত্রে এটা খাওয়া নিষেধ করেছেন। এটির সত্যাসত্য বৈজ্ঞানিক-গণকে দেখতে অনুরোধ করি।

২। **অর্বুদ রোগে** (Tumour):— ফোঁড়ার প্রথমাবস্থায় গ্রন্থিস্ফীতিতে (Glandular swelling) অথবা আঘাতজনিত ব্যথা ও ফোলায়—পাতা বেটে অল্প গরম ক'রে লাগালে ফোঁড়া বা টিউমার বহুক্ষেত্রে মিলিয়ে যায় এবং ব্যথা ও ফোলার উপশম হয়।

৩। **সাময়িক জ্বর বা জ্বরভাবে:—** এর সঙ্গে সর্দির প্রাবল্য থাকলে অল্প দু'টো পাতা ঝোল ক'রে বা শাক রান্না ক'রে খেলে উপশম হয়।

৪। **হিক্কায়** (Hiccup):— হিক্কা হতে থাকলে পাতার রস ২।৫ ফোঁটা ক'রে দুধের সঙ্গে ২।৩ বার খেতে দিলে কমে যায়।

৫। **অর্শে** (Piles)— অর্শের যন্ত্রণা আছে, অথচ রক্ত পড়ে না—এক্ষেত্রে নিম্নাঙ্গে তিলতৈল লাগিয়ে পাতা-সিদ্ধ ক্বাথ দ্বারা সিক্ত করতে বলেছেন চরক।

৬। **সন্নিপাত জন্য চোখে ব্যথা, জল বা পিচুটি পড়া:—** এসব ক্ষেত্রে পাতা-সিদ্ধ জল সেচন করতে বলেছেন বাগ্‌ভট্।

৭। **দাঁতের মাড়ি ফোলায়:—** শ্লেষ্মাঘটিত কারণে দাঁতের মাড়ি ফুলে গেলে পাতার ক্বাথ মুখে ধারণ করলে উপশম হয়।

৮। **কুষ্ঠে** (Leprosy):— কুষ্ঠের প্রথম অবস্থায় বীজের তৈল ব্যবহার ক'রতে পারলে ভাল হয়। অভাবে বীজ বেটে কুষ্ঠের ক্ষতের উপর প্রলেপ দিলেও চলে (এটি সুশ্রুতের অভিমত)।

৯। **অপচী রোগে** (Scrofula):— সজনেবীজ চূর্ণ ক'রে নস্য নিতে হয়। এটি সুশ্রুতের ব্যবস্থা—

(১০) **দাদে** (Ring worm):— **সজনে মূলের ছালের প্রলেপে** এটার উপশম হয়। তবে এটা প্রত্যহ ব্যবহার করা ঠিক নয়।

নব্য বৈজ্ঞানিকের কাছে যদি এসব তথ্য অকেজো জিনিসকে আঁকড়ে রাখার পাগলামি মনে হয়, তবু সময় অবসরে দ্রব্যের মৌল বিচারের তথ্য বিশ্লেষণের পর নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে অগ্রসর হ'লে পুরাতন তথ্যের বনিয়াদের উপর নূতন হর্ম্য গড়ুন না, কারণ তাদের মৌলিক গঠনপদ্ধতির বৈচিত্র্যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঞ্চভৌতিক উপাদানের যে স্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটার একটা স্বাভাবিক তথ্য দেওয়া আছে, তাদের থেকেই তো মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়—এই ৬টি রসের উদ্ভব হয় এটা তো আজও সর্ববাদিসম্মত সত্য। তাছাড়া এইসব রসই তো জীবনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে, এবং এদের মধ্যে রোগকারিত্ব ও রোগনাশিত্ব শক্তিও নিহিত আছে; সেই দৃষ্টি-কোণ থেকে দ্রব্য প্রকৃতি বিচার ক'রলেই তাদের প্রকৃত স্বধর্ম জানা যাবে, সুতরাং এদের বুঝতে বা কাজে লাগাতে হ'লে মত ও পথের একটা নূতন সমীক্ষা হয়তো অনুকূলই হবে।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz. moringine, moringinine. (b) Certain amorphous bases. (c) Antibiotic pterygospermin active against both gram-positive, gram-negative and acid-fast bacteria.

পটোল

পটোল তোলার আতঙ্ক বাঙ্গালী মাত্রেই, কারণ এ ভাষায় সঙ্কেত আছে লোকান্তর প্রাপ্তির; কেই বা চায় পটল তুল্‌তে? এ যেন সেই কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা—কাঁচা খাও পাকা খাও নাহি তাহে জ্বালা। তুমি খাও বলিলেই হয় বড় জ্বালা, অর্থাৎ এই কলা ফলটি কাঁচায় পাকায় সবারই খাদ্য; কিন্তু ভাষায় "কলা খাও" বল্‌লেই তা কটূক্তি, পটল তোলার ইঙ্গিত তার চেয়েও ভয়ঙ্কর, তাই ভাবতে হচ্ছে—এ ভাষার এই আতঙ্কের জট ছাড়ানো যায় কিনা।

সত্যিই জট্‌ পাকিয়ে আছে ো ওকারে অর্থাৎ পটল আর পটোল এই দুটি শব্দের শ্রুতিধ্বনির সাম্যেই হ'য়েছে এই বিপত্তি। পটলের অর্থ অক্ষিপটল অর্থাৎ চোখের কৃষ্ণ তারকা সহ সাদা অংশটির নাম। অক্ষিপটলের এই কৃষ্ণ তারকাটি যখন ঊর্দ্ধ-দিকে ওঠে, তখন সেটা মুমূর্ষুর পূর্ব সঙ্কেত বলে ধরা হয়; অর্থাৎ প্রায় মৃত্যু এসে গিয়েছে বলা হয়; তাকে বৈদ্যের ভাষার সঙ্গে গ্রামীণ ভাষায় বলা হয়ে থাকে, ও তো "পটল তুলেছে।" এটাতে আছে আক্ষরিক পার্থক্য, কিন্তু এমনি ধরনের আরও তো কত আশ্চর্য রকমের ভ্রমাত্মক শব্দের প্রচলন—যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মা ছিলেন আর্যদের বৈদিক দেবতা। তিনি এখন আমাদের কাছে পতঙ্গে রূপায়িত; তাই বিবাহের প্রতীক একটি কীটের চিহ্নে তিনি পরিণত হয়েছেন অর্থাৎ প্রজাপতয়ে নমঃ, তার প্রতীক হ'ল ফড়িং আকৃতিতে প্রণতি জ্ঞাপন।'

বর্তমান নিবন্ধ খাদ্যোষধি পটোল সম্পর্কে। আজকের দিনে যারা গৃহপালিত পশুপক্ষী—কিংবা বনজ বৃক্ষ লতা তারা যে এককালে বন্য ছিল—এটা ইতিহাসলব্ধ প্রমাণ। এইরকম বহু খাদ্য আমাদের পথ্য দ্রব্যও একদিন বন্য দ্রব্য ছিল; কালান্তরে কৃষি উৎকর্ষের দ্বারা সেগুলি ওষধি ও খাদ্য হিসেবে সমাজ-কল্যাণে লাগানো হয়েছে। সেইরকম বন্য তিক্তপটোলকে মিষ্ট স্বাদে পরিণত করা হয়েছে, এইটিই প্রাচীন গ্রন্থের

অভিব্যক্তি। এই বন্য পটোল পূর্বে কোচবিহার অঞ্চলে যেখানে সেখানে দেখা যেতো; পটোলগুলি আকারে ক্ষুদ্র; বীজবহুল ও স্বাদে তিক্ত; এটা উল্লেখিত হয়েছে বনৌষধির স্থানীয় প্রামাণ্য গ্রন্থ 'বনৌষধি দর্পণে'।

বৈদিক যুগের নিরীক্ষা:—বৈদিক বনৌষধির পরিচয়ে কোথাও প্রত্যক্ষতঃ এই পটোল শব্দটির উল্লেখ দেখা যায় না; তবে শুক্ল-যজুর্বেদের একটি ভাষ্যে মহীধর এই ওষধির নামোল্লেখ করেছেন। মূল বৈদিক সূক্তে আছে—
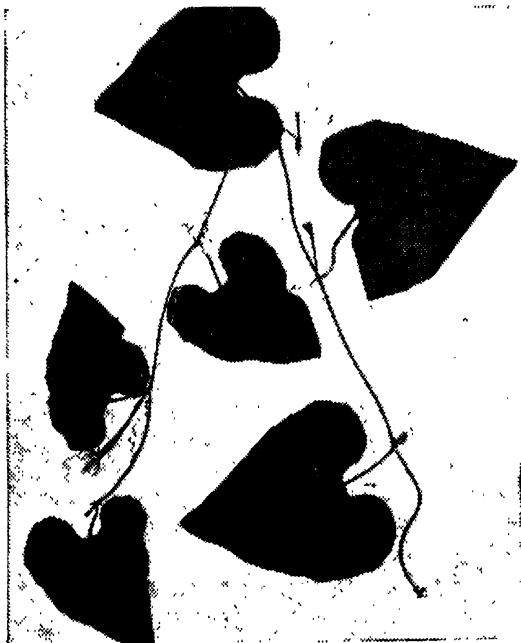
'কুলকোলিকা যে অগ্নয়ঃ সমনসো অন্তরা বাসন্তিকা অভিসংবিশন্তু।
তয়া আঙ্গিরসঃ সদ্ধ্রুবং সীদতম্'

সেখানে ভাষ্যকার বলেছেন—

'কুলকং=তিক্ত পটোলং ওলিকা=আকর্ষিণী'
অন্তরা অন্তরাগ্নেঃ। অন্তঃ অগ্নিং বর্দ্ধয়ন্তী যা লতা,
বাসন্তিকা বসন্তেষু চীয়মানা অর্থাৎ বর্দ্ধিতা।

যুগান্তরের সমীক্ষা:— উপরিউক্ত বৈদিক সূক্তগুলির শব্দবিন্যাসের অন্তর্নিহিত তথ্যগুলির উপলব্ধ বাস্তব জ্ঞানই লিপিবদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক গ্রন্থে। সেখানে পটোলিকা (সংস্কৃত নাম) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—পট অর্থে গমনবোধক, আর ওলিকা

অর্থে আকর্ষণী শক্তি যার আছে; তার সঙ্গে অনুশীলন করার ফল হলো পাঞ্চভৌতিক গুণসম্পন্ন সব দ্রব্যের মধ্যেই রোগপ্রতিষেধক ও প্রতিরোধক শক্তির আধার রস, বীর্য, বিপাক ও প্রভাবের অস্তিত্ব রয়েছে। এই পটোলিকা নামটিও তার গুণের বাস্তব দর্পণ।

দ্রব্যগুণ বৈচিত্র্য :— সর্বজনবিদিত এই লতা গাছটির অংশবিশেষে রস ও গুণের পার্থক্যও বর্তমান। এখন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাবতে হয়—কী ক'রে এই ভেষজটির অংশবিশেষে রস গুণের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছিল যে 'পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং নাড়ী তস্যাঃ কফাপহা। ফলং তস্যাঃ ত্রিদোষঘ্নং মূলং তস্যাঃ বিরেচনম্॥' অর্থাৎ এই লতা গাছটির পাতা পিত্তনাশক, নাল অর্থাৎ ডাঁটাটি কফনাশক, তার ফল অর্থাৎ পটোল ত্রিদোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) নাশক এবং মূল তীব্র বিরেচক। এই লতাগাছটিকে আমরা চলতি কথায় পলতা অর্থাৎ পটোল লতা ব'লে থাকি। প্রাচীন কালে তিক্ত পটোলকেই ওষধি হিসেবে ব্যবহার করা হতো ব'লে মনে হয়।

নব্যমতে পরিচিতি :— এই লতাগাছটির বোটানিক্যাল নাম Trichosanthes dioica Roxb,এটি cucurbitaceae ফ্যামিলীভুক্ত।

উপযোগিতা :— চরকে এই বনৌষধিটির ব্যবহার করার ক্ষেত্র—রক্তপিত্তে (Haemoptysis), শোথে, মদ্যপান জন্য বিভিন্ন পিত্তবিকৃতিজনিত রোগে, সর্বপ্রকার বিষদোষে, পিত্তশ্লেষ্মাজনিত জ্বরে। তবে এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ব্যবস্থামত ব্যবহার করাই শ্রেয়।

অম্লপিত্ত রোগে পলতা :— বাঙ্গালীর সমাজে আরও একটি কথা প্রচলিত আছে যে, "মুড়ি আর ভুঁড়ি সব রোগের গুঁড়ি", অর্থাৎ রোগের উৎস মাথা ও পেট। আমার ধারণা শেষোক্ত স্থানটি প্রায় রোগেরই মূল ক্ষেত্র। আহার্য গ্রহণের পর পিত্তক্ষরণের অসমতা সৃষ্টিতে অম্লপিত্ত রোগের উদ্ভব হয়। অসম বা অতিরিক্ত আহার্য দ্রব্য গ্রহণ জন্যও এই অসমতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই অম্লপিত্ত রোগকে আমরা চলতি কথায় 'অম্বল রোগ' বলে থাকি। পালিভাষায় 'অম্বিল' এবং মারাঠী ভাষাতেও অম্বি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির আহার্য থেকে আহৃত রসে সৃষ্ট রক্তাদি ধাতুর (রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ইত্যাদি) পোষণের দ্বারা দেহধর্ম প্রতিপালিত হয়। সুতরাং মূলে গলদ থাকায় যেকোন প্রকার Constitutional রোগ আসাটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং বহু রোগ আসেও; সেই জন্যই সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই অম্লরোগকে প্রশমিত করা। পলতা সে ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী।

ব্যবহারবিধি : কাঁচা ডাঁটা ও পাতা আন্দাজ ৪।৫ গ্রাম থে'তো ক'রে গরম জলে (আধকাপ) ভিজিয়ে বা সিদ্ধ ক'রে আধ কাপ রেখে সকালে খালি পেটে খেতে হয়। দাস্ত পরিষ্কার না থাকলে ঐ সঙ্গে একটি হরীতকীর শাঁস (বীজ বাদ) দেওয়া ভাল কোন কোন প্রাচীন বৈদ্য এই পলতার সঙ্গে ২।১ গ্রাম ধনেও (যেটা আমরা তরকারীতে বেটে দিই) দিয়ে থাকেন। পল্তা শুকিয়ে গেলেও চলবে, তবে পাতা ৩।৪টি ও ডাঁটা ৫।৬ ইঞ্চির বেশী নয়।

যাঁরা কোন দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত, তাঁদের পূর্ব ইতিহাস নিলে দেখা যায়, দুই তিন টুকরো শুকনো আমলকীও রাত্রে ১ প্লাস গরম জলে ভিজিয়ে রেখে পরদিন মধ্যাহ্নে আহারের সময় জল হিসেবে ঐ জলটা খেতে হয়। এক্ষেত্রে কাচের গ্লাস ব্যবহারই শ্রেয়। এইভাবে পলতা ও আমলকী ভিজানো জল খেলে এ রোগ নিশ্চিত প্রশমিত হবে।

যাঁরা কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, তাঁদের পূর্ব ইতিহাস নিলে দেখা যায়, তাঁদের অধিকাংশেরই এই অম্লপিত্তরোগের জের ছিল। সুতরাং কোন কঠিন রোগের হাত

থেকে অব্যাহতি পেতে গেলে এই অম্লরোগকে প্রতিহত করা বিশেষ প্রয়োজন; এমন-কি যাঁরা ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন, এগুলি ব্যবহার করলে তাঁদেরও কিছু উপশম হবে।

এইবার পটোল সম্পর্কে বলি—

(১) বসন্তের মামড়ি শুকিয়ে গিয়েও পড়ছে না, আর পড়ে গেলেও কালো দাগ থাকছে—সেখানে পটোল পুড়িয়ে তার রস গায়ে মাখালে মামড়িগুলি পড়েও যাবে, কালো দাগও থাক্‌বে না।

শিশুর দুধ তোলায়ঃ— পাতার আঁকসী বা আকর্ষণী (যেগুলির দ্বারা ধ'রে সে লতিয়ে ওঠে) ২।৩টি দুধের সঙ্গে বেটে শিশুকে প্রত্যহ ১ বার সকালের দিকে খাওয়াতে হবে, তবে স্তনদুগ্ধ হলে ভাল হয়।

(২) **ফোঁড়ায়ঃ**—না পাকা না কাঁচা অবস্থা, যাকে বলা হয় দরকচা, এক্ষেত্রে পোড়া পটোলের শাঁস ন্যাকড়ায় লাগিয়ে ফোঁড়ার উপর বসিয়ে দিলে ওটা পেকে ফেটে যাবে।

(৩) তরুণ জ্বর, হাতে-পায়ে জ্বালা, মাথায় যন্ত্রণা, গা-বমি অথবা বমনেচ্ছা—এ ক্ষেত্রে খোসা ছাড়ানো পটোল উনুনে সে'কে সেটা রস ক'রে ২।৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে খাওয়ালে এ সব উপদ্রবই থেমে যাবে।

(৪) নখ ছিঁড়ে ফুলে গিয়েছে, বিষিয়ে আঙ্গুলহাড়ার মত অবস্থা—এক্ষেত্রে খোসাসমেত পটোল সে'কে খানিকটা কেটে বীজশূন্য করে আঙ্গুলটা পুরে রাখুন। এটাতে ওটা সেরে যাবে।

(৫) **মুখদৌর্গন্ধেঃ—** যাঁদের মুখের ভিতর হেজে গিয়ে দুর্গন্ধ হয়—সেক্ষেত্রে পটোল পোড়ার রস ও মধু অথবা তিল তৈল মিশিয়ে কবল ধারণ করতে হবে অর্থাৎ মুখে খানিকক্ষণ ক'রে রেখে ফেলে দিতে হবে। এটাতে ঐ অসুবিধে চলে যাবে।

বৈশিষ্ট্যে পটোলমূলঃ—এই গাছের গুণের প্রসঙ্গে গ্রাম্য ছড়ায় শোনা যায়—'বনে ছিলি পটোলরে! তোকে ঘরে আনলো কে। পায়ে পড়ি পটোল রে! কাছা খুলতে দে।' কথাটা আসলে পটোলমূলের বিরেচক ক্রিয়াশালিতার আতিশয্য বর্ণনা। এই গাছের মূলগুলি স্বাদে তিক্ত ও মাংসল; শুকিয়ে গেলে ৩ মাসের পরে আর কার্যকর থাকে না, ঘুণে খেয়ে যায়। তবে তাকে বেশীদিন অবিকৃত রাখতে গেলে বাষ্পস্বেদ বা ভাপ্‌রা দেওয়ার পর তাকে শুকিয়ে রাখতে হবে।

আয়ুর্বেদিক গ্রন্থে উদরী রোগে (ascites) এই পটোলমূল চূর্ণের ব্যবহার করা হয়েছে অন্য কয়েকটি দ্রব্যের সঙ্গে। এক্ষেত্রে এটির প্রধান কাজ peritoneal cavity থেকে উদরের সঞ্চিত জল আকর্ষণ ক'রে মলের সঙ্গে নির্গত করায়। শুধু এক্ষেত্রে বলেই নয়, এর লতা ও পাতার ব্যবহারে রোগোৎপাদনকারী যাবতীয় সঞ্চিত দোষকে সে নিঃসরণ করায়। এই পটোলিকা নামকরণের সার্থকতা এইখানেই।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Saponin. (b) Hydrocarbons viz. pentriacontane. (c) Sterols viz. betasitosterol, gamasitosterol. (d) Glycoside. (e) Small amount of essential oil. (f) Traces of tannins.

নিম্ব

পার্থিব প্রকৃতি হয়তো কামনা করে তার বয়সে যেন বার বার বসন্তঋতুর সমাগম ঘটে, আর আমাদের দেহেরও শ্রেষ্ঠ কামনা থাকে যৌবন-বসন্তের উদয় যেন অস্তমিত না হয়, কিন্তু অরসিক চিকিৎসকই একটি মাত্র প্রাণী যিনি ওই প্রকৃতি বসন্তঋতুর আর দেহে বসন্তের আবির্ভাবে বড়ই শঙ্কিত হ'য়ে ওঠেন; তিনি প্রচার করেন এই বসন্তই সর্বপ্রকার অতিসার রোগের আকর, খুব সাবধান। তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ ক'রেও সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—

বসন্তে ভ্রমণং কুর্য্যাৎ অথবা নিম্বভোজনম্।
অথবা যুবতী ভার্য্যা, অথবা বহ্নিসেবনম্॥

অর্থাৎ বসন্তকালে ভ্রমণ, নিম্বভোজন ও তন্বীর সান্নিধ্য—এই তিনটির অভাব হ'লে তার মরণই ভাল। দুর্বিসহ বসন্তে নিম্বের প্রশস্তির মধ্যে যে তথ্য নিহিত আছে—তারও পূর্বে এই বৃক্ষটির উল্লেখ রয়েছে অথর্ববেদের বৈদ্যকল্পের ৩৫।৬।২৭ শ্লোকে—

যো বঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ বসন্তস্য ভাজয়তে হনঃ।
হৃদয়ভূমিং জাতবেদসং অযক্ষ্মায় ত্বা সংসৃজামি প্রজাভ্যঃ॥

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য হলো—

সর্ব্বতোভদ্রঃ=নিম্বঃ, অরিষ্টশ্চ। সর্ব্বতোভদ্রাণি=মুখানি যস্য,
নিম্বতি=সেচতে, রসেণ স্বাস্থ্যাং;

রিষ্‌+ক্তঃ=রিষ্টঃ=শুভেতি, তদ্‌ অশেষেণ জ্ঞাপয়তি দূরাৎ।
তস্য রসঃ হৃদয়ভূমেঃ জাতবেদসং=পিত্তবৎ অগ্নিং,
তস্য দাহ শান্তিকৃৎ, অযক্ষ্মায়=ক্ষয়রোগায়=সংজাত
ক্রিমিসম্ভূতায় ত্বা সংসৃজামি প্রজাভ্যঃ।

এই ভাষ্যটির অর্থ হলো—তুমি সর্বতোভদ্র, তোমার নাম নিম্ব ও অরিষ্ট। সর্বপ্রকারেই তোমার মুখ প্রসারিত। তোমার রস স্বাস্থ্যপ্রদ। রিষ অর্থে শুভ, দূর থেকে শুভ সঞ্চারিত হয় এইজন্য নাম অরিষ্ট। তোমার রস হৃদয়ভূমির দাহ দূর করে, তাই তুমি অ-যক্ষ্ম। ক্ষয় রোগের তুমি হন্তা; আর ক্রিমি সম্ভূত ক্ষয় রোগকেও তুমি অপসারণ কর, তোমাকে প্রজাদের জন্য সৃজন করেছি।

এর দ্বারা খুব পরিষ্কার ধারণা করা যায় বসন্তঋতুতে কেন নিম্বের প্রশস্তি গান।

প্রতিটি ঋতু এবং কালের গতির সঙ্গে দেহের ক্ষয় বা অতিসার দেখেই নিম্বের ক্ষতি-পূরক সামর্থ্য আছে জেনেই তাঁদের সমীক্ষণ—

বেদোত্তর সমীক্ষা

এই বৈদিক সূক্ত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গেল—

(১) এই বৃক্ষের হাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ।

(২) তোমার রস হৃদয়ভূমির অগ্নিদাহ দূর করে।

(৩) সর্বোপরি একটি বিশেষ ইঙ্গিত যে—যক্ষ্মারোগটি জীবাণুজ। এই সূত্র ধরেই বিভিন্ন প্রতিভাবান ঋষি তাকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে রোগপ্রতিকারের কাজে লাগিয়েছেন—এটা বিশেষভাবে চরক সংহিতায় প্রতিভাত। এটি আছে সূত্র স্থানের ২৩ অধ্যায়ে, এবং বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে ও শারীরস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে গর্ভ-সংক্রান্ত আলোচনায়। এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে—সেগুলি বৈদিক সমীক্ষারই অনুশীলন। তাঁদের প্রথম অনুশীলন হচ্ছে—ব্যাধির রূপ অনন্ত হতে পারে কিন্তু তার মৌলিক প্রকাশ দু'টি ধারায় 'সন্তর্পণ' ও 'অপতর্পণ'—যেটা শরীরের পক্ষে গ্রহণোপযোগী এরূপ দ্রব্য এবং শরীরের সহনোপযোগী যে ধরণের বিহার, এই দু'টিকে বিচার ক'রে যাঁরা চলেন, তাঁরাই নীরোগ থাকতে পারেন; যাঁরা এইসব দ্রব্যের সেবনে বেশী আসক্ত হন, তাঁরাই এই সন্তর্পণপোষক দ্রব্যের মাধ্যমেই শরীরকে বিকারগ্রস্ত ক'রে রোগকে ডেকে আনেন। আবার শরীরে যদি সন্তর্পণোযোগী আহারের ও বিহারের ন্যূনতা আসে, তবে তার দ্বারাও রোগোৎপত্তি হয়, একেই বলা হয় অপতর্পণজনিত রোগ। স্নেহ, মধুর ও অম্ল প্রভৃতি দ্রব্যের অত্যধিক সেবনে শরীরে যে রসধাতুর আধিক্য সৃষ্টি হয়ে থাকে, তার দ্বারাই সমস্ত রসবহ স্রোতের পথ অবরুদ্ধ হয়ে বহুরোগের সৃষ্টি হয়। এইসব ক্ষেত্রে প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক দ্রব্য হলো কটু-তিক্ত-কষায় রস বিশিষ্ট ভেষজ। বিশেষ করে তিক্তরস প্রধান ভেষজ। তাদের মধ্যে আবার নিম্ব একটি প্রধান ভেষজ।

বৈদিক সূক্তের আর একটি উপদেশ—এটি অশুভ দূর করে। এই তথ্যটির বাস্তব পন্থা কি তা চরক সংহিতায় আলোচিত হয়েছে। (শারীরস্থান) শিশুর জন্ম-মাত্রেই সূতিকাগৃহে কোনপ্রকার দূষিত বায়ু প্রবেশ বা অন্য কোন কীটের উপদ্রব থেকে রক্ষা, এ ভিন্ন ধাত্রীর বস্ত্র, দেহ প্রভৃতিতে বিষাক্তদ্রব্যের স্পর্শের আশঙ্কাকে দূর করতে নিম্ব-পত্রের ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন।

ঋতুভেদে নিম্বের অংশবিশেষের ব্যবহার

আগ্নেয়কালে অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে নিমের ছাল ও কাষ্ঠ ব্যবহার করা প্রশস্ত। এই সময়ে দাহজনিত রোগে এটি বিশেষ কার্যকরী। বিসর্গকাল (অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র)—এটি অগ্নি ও বায়ুর সংকরকাল, এই সময় মূলের ছালের রস বেশী কার্যকরী।

আদান ও বসন্তের সন্ধিকালে ও বসন্তে অর্থাৎ বসন্তকালে ব্যবহার করা উচিত কচি পাতা।

প্রধানতঃ শরৎ ও বসন্তঋতুতে পিত্তের ভূমিকা যেখানে ক্রূর বাঘের মত আর শ্লেষ্মার ভূমিকা যেন নাছোড়বান্দা ফেউ; এরাই যোগসাজসে সৃষ্টি করে রোগ। এইসব ক্ষেত্রে

নিম বিশেষ কার্যকরী, তবে রোগ বিশেষে নিমের অংশবিশেষের ব্যবহারের নির্দেশ তাঁরা দিয়ে গিয়েছেন।

কোথায় কোন রোগে এবং কিভাবে এটাকে ব্যবহার করা যায়—

(১) **অজীর্ণে:—** যেক্ষেত্রে পাকস্থলীর রস উদরবোপে পাক দেয়, মুখে জল আসে, সেখানে নিমের ছাল ৪।৫ গ্রাম ১ কাপ গরম জলে রাত্রে ভিজিয়ে রেখে সকালে ছেঁকে খালি পেটে খেতে হয়।

(২) **স্বপ্নদোষে:—** সে যে বয়সেই হোক্ না কেন—নিমের ছালের রস ২৫।৩০ ফোঁটা কাঁচাদুধে মিশিয়ে খেতে হয়।

(৩) **শর্করা রোগের ফোঁড়ায়:—** স্থূলদেহী, গায়ের ঘা সারতে চায় না, নিমের আটা এক বা দেড় গ্রাম মাত্রায় দুধে মিশিয়ে খেতে হয়।

(৪) **পরিমাণে বেশী প্রস্রাব হয় ও তার সঙ্গে আশেপাশে চুলকায়:—** এক্ষেত্রে ৩।৪টি নিমপাতা ও কাঁচাহলুদ এক টুকরো (এক গাঁট আন্দাজ) একসঙ্গে বেটে সকালে খালিপেটে খেতে হয়।

(৫) **রক্ত-শর্করায়** (Blood-sugar):— ১০টি নিমপাতা ও ৫টি গোলমরিচ সকালে খালিপেটে চিবিয়ে খেতে হয়। তবে আহার ও বিহারের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়।

(৬) **যকৃতের ব্যথায়:—** নিমের ছাল আন্দাজ ১ গ্রাম, কাঁচাহলুদ ½ গ্রাম, আমলকীর গুঁড়ো ১ গ্রাম একসঙ্গে মিশিয়ে জল দিয়ে সকালে খালিপেটে খেতে হয়—এটাতে সপ্তাহের মধ্যে উপশম হয়।

(৭) **বমিতে:—** অনেক সময় এটা বেশীবার হলে তার সঙ্গে রক্তের ছিটও আসতে পারে, সেক্ষেত্রে পাতার রস ৫।৭ ফোঁটা একটু দুধে মিশিয়ে খেতে দিলে ওটা বন্ধ হয়।

(৮) **চোখ ঝাপসায়:—** অকালেই যদি এটা আসে কিংবা পিচুটি হতে থাকলে পাতার রস ৫।৭ ফোঁটা দুধ ও জলের সঙ্গে খেতে হয়।

(৯) **শুষ্কার্শে:—** বলি আছে, রক্ত পড়ে না, সেক্ষেত্রে নিমের বীজের শাঁস ৩।৪টি সকালে-বিকালে ২বার চিবিয়ে বা বেটে জল দিয়ে খেতে হয়। এটির ব্যবহারে ঐ বলি চুপসে যাবে।

(১০) চাপা অম্লরোগে:—নিমপাতার গুঁড়ো আন্দাজ ৩৭৫ মিলিগ্রাম **সকালে** খালিপেটে জলসহ খেতে হয়।

(১১) **রাত কাণায়:—** নিমের ফুল ভাজা মানুষের সহজপ্রাপ্য, তাই গ্রামের বৈদ্যগণেরও এটি একটি বিশেষ মুষ্টিযোগ।

(১২) **যে ক্ষত কুষ্ঠের রূপ নিচ্ছে:—** সেক্ষেত্রে নিমের ছালের ক্বাথ খাওয়া আর সেই জলে ক্ষত ধোওয়া—এটিতে প্রতিরোধ নিশ্চয়ই হয়।

(১৩) **রক্তদুষ্টিতে:—** রক্ত অনেক কারণেই দূষিত হয়, আর তার জন্য গায়ে লাল বা তামাটে দাগ এবং তার সঙ্গে চুলকানি ও অল্প ফুলো—সেক্ষেত্রে নিমপাতা ৪।৫ গ্রাম সওয়া সের জলে সিদ্ধ ক'রে ১ সের থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সমস্ত দিনে অল্প অল্প খেতে হয়।

(১৪) **কামলা রোগে** (Jaundice):— নিমপাতার রস ২৫।৩০ ফোঁটা একটু মধু মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেতে হয়।

(১৫) **সর্দি-গর্মিতে:—** সর্দি-গর্মিতে অথবা কোন দুর্গন্ধ বমি হলে বা বমি

আসতে থাকলে নিমপাতার রস ৫।৬ ফোঁটা দুধ বা জল সহ খাওয়ালে ওটা প্রশমিত হয়।

(১৬) **ঘুষঘুষে জ্বরে:**'— নিমপাতা চূর্ণ আন্দাজ ২৫০ মিলিগ্রাম, তার সঙ্গে ১/১½ রতি মকরধ্বজ মিশিয়ে মধুর সঙ্গে খেতে দিলে ওটা সেরে যায়।

(১৭) **লালামেহ রোগে:**— নিমের গাছের রস (তবে মূলের হ'লেই ভাল) ও কাঁচা দুধ মিশিয়ে খেতে হয়।

(১৮) **ক্রিমিতে:**— ছোটক্রিমির উপদ্রবে নিমপাতার ২।৩ রতি গুঁড়ো সকালে খালিপেটে জল দিয়ে খেতে হয়। এটার প্রত্যক্ষ ফল দেখতে পাওয়া যায়।

(১৯) **অরুচিতে:**— যে অরুচিকে কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে সুজির হালুয়ার সঙ্গে নিমপাতা চূর্ণ ২৫০/৩০০ মিলিগ্রাম মিশিয়ে খেলে কয়েকদিনের মধ্যেই ওটা উপশম হয়।

(২০) **শিশুদের কেশদাদে:** নিমের বীজের তৈল লাগালে সেরে যায়।

(২১) **মুখে বা মাড়িতে ঘা (ক্ষত):**— পিত্তবিকারে যদি এই ক্ষতের উদ্ভব হয়, তাহলে নিমবীজের তৈল লাগালে সেরে যায়।

(২২) **অকালপক্কতায়:**—নিমবীজের তৈলের নস্য নেওয়া এবং ঐ তৈল মাথা—এটাতে মাথাধরাও সারে—এটা পরীক্ষিত।

(২৩) আর একটা কথা বৈজ্ঞানিকগণকে জানিয়ে রাখি—এই নিমতৈলের বাহ্য-প্রয়োগে (external application) জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

এ ভিন্ন হয়তো এর কত গুণের কথা আমাদের অজানা রয়ে গিয়েছে। বৈদিক সূক্তের আর একটি ইঙ্গিত আছে—এটি অশুভ দূর করে। আর একটি ঘটনা আপনারা হয়তো লক্ষ্য ক'রে থাকবেন—রাজস্থানী বণিকসম্প্রদায়ে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিবাহে একটি নিমের ডালকে বরানুগমন করাতে হয় এবং সেটি বরকেই ধ'রে রাখতে হয়। আবার এই বাংলায় শ্মশানযাত্রীকে বাড়ি ফিরে এসে নিমের পাতা দাঁতে কাটতে হয়। দু'দেশের চিন্তাধারার কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা আছে। তবে সেটাকে সংস্কারের বাঁধনে ধ'রে রাখা হয়েছে। তাই একে বলা যেতে পারে—এটি সে যুগের যেন বৃক্ষ-পুরোহিত।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) alkaloids viz. nimbin, nimbinin, nimbidin, nimbosterin nimbecetin, bakayanin. (b) Fatty acids (different types). (c) Highly pungent essential oil.
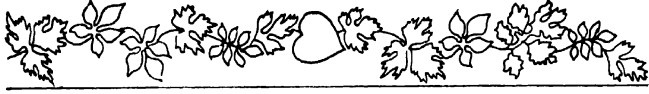
সুকন্দক

স্মরণাতীত কালে ভারতে বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাব সমাজ-ব্যবস্থায় একটা প্রধান অঙ্গ ছিল, পাশাপাশি ছিল প্রাক্-আর্যদের সংস্কৃতি। ব্রাহ্মণ্য, ক্ষাত্র, বৈশ্য ও শৌদ্র—এই চারটি শ্রেণীই তখন বৈদিক সংস্কৃতিকে ধারণ পোষণ করতো। একই সঙ্গে পাশাপাশি থাকার মধ্যে, প্রত্যেকের পেশা হিসাবে আচার ব্যবহারের পার্থক্য মেনে চলার রীতিটি আদর্শ হিসেবে যে সামাজিক ব্যবস্থার একটি চিত্র তাতে দেখতে পাই, সে ব্যবস্থায় প্রত্যেক গোষ্ঠীর আহার্যও বাদ পড়ে না; সেই আহার্যের বাছ-বিচারে ব্রাহ্মণের কাছে যেগুলি ছিল নিষিদ্ধ, সেগুলিই আবার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ক্ষেত্রে বাধা ছিল না, কিন্তু শূদ্রের আহার্যে তেমন বিধি-নিষেধের গণ্ডী টানা হয়নি। প্রাক্-আর্যজাতিরা শূদ্র সংস্কারের সঙ্গে প্রায় অভিন্নই হয়ে গিয়েছিল।

বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদী মনুর চিন্তাধারা হলো—আহার্যই শরীর মন ও দেহ প্রকৃতি এবং আয়ু গঠনে অনেকটা সাহায্য করে; আবার ক্ষত্রিয়ের কাছে সেই আহার্যের উপকরণ তাঁদের ক্ষাত্র শক্তি জাগ্রত করার এবং বজায় রাখার জন্য সেগুলি উপযোগী। ক্ষাত্র ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির আহার্য দ্রব্যের মধ্যে সুকন্দক ছিল অন্যতম; এর সঙ্গে প্রায় সমধর্মী ব'লে যমজ ভাইএর মতই রসোনকেও ধরা হ'য়েছে। তবে নিরপেক্ষ স্বাস্থ্য-চিন্তক আয়ুর্বেদবেত্তা ঋষিগণ এই সুকন্দকের এবং রসোনের প্রকৃতিগত সত্তার ভৈষজ্যগত শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে রোগ-প্রতিকারে এবং দেহপোষণের জন্য তাদের উপযোগিতা কতটুকু দেখিয়েছেন—সেইটাই বিচার্য।

বৈদ্যক-কুলের গবেষণার উৎস

ব্রহ্মদর্শনাভিলাষী হয়ে এগিয়ে যাওয়ার মত এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে উপবর্হণ

সংহিতা, সেখানে যে নামকরণ করা হয়েছে, সে নামটির সঙ্গে যুক্ত দেখা যাচ্ছে ঋক্‌বেদের ৫-৮-৩৪ সূক্তের একটি কাহিনী। সেই কাহিনীর নায়ক সেই যুগের দুজন বিখ্যাত দস্যু—নাম নমুচি ও শম্বর। তাই কি এই দ্রব্য দু'টির প্রকৃতিগত প্রভাবশক্তিও আমাদের প্রবৃত্তিকে দস্যুরূপে পরিণত করে? নাকি নমুচি ও শম্বরই ঐ সুকন্দক ও রসোনের প্রতীক নাম?
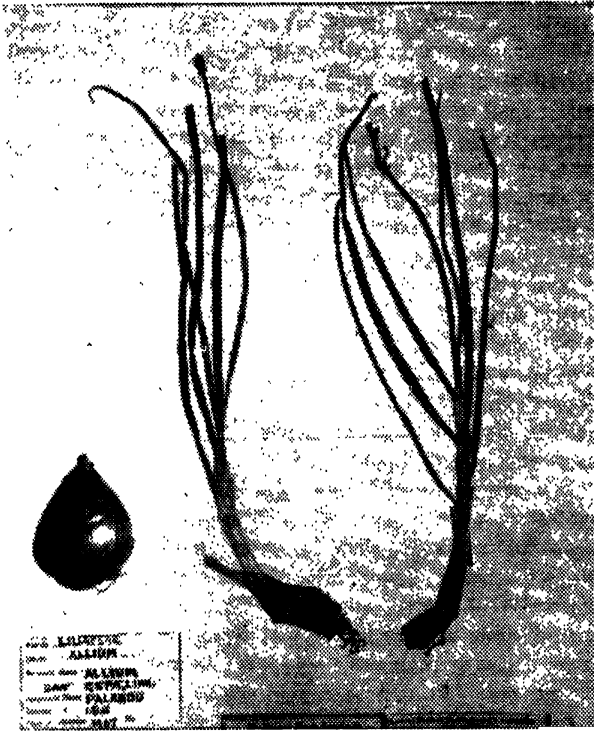
উপবর্হণ সংহিতায় কি পাওয়া গেল

নমুচি শম্বরঃ শ্রেষ্ঠঃ সুকন্দকঃ সুরায়ৈ কিন্বতঃ কিংত্বঃ
ধানাবন্তং করম্ভিনং অপূপং বলবন্তং পুরোডাশান্।
ব্রাত্যৌ চ সম্যঞ্চৌ চরতঃ সহলোকং।
প্রাজ্ঞেব যদ্রদেবা সহাগ্নিনা 	(৭-১৭৫-১৭৬ সূক্ত)

এই সূক্তটির উবট্ ভাষ্য হলো—

ত্বং সুকন্দকঃ। মূদে সুকন্দঃ মূলতঃ=রসোনপলাণ্ডৌ,
ত্বং নমুচিশম্বরপ্রিয়ঃ। ত্বঃ অন্তঃসারং কিন্বতঃ সুরায়ৈ

কিং জাতং। ধানাবন্তং করম্ভিনং, অপূপং পুরোডাশান্
বলবন্তং করোসি। যুবাংচ ব্রাত্যৌ=মলসম্পন্নৌ,
সম্যঞ্চৌ চরতঃ, যত্রদেবা অগ্নিনা সহ গচ্ছন্তি যুবাং
তত্রপ্রস্তেব প্রজানীয়ঃ জ্ঞাপয়থঃ।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'ল—তোমার কন্দেই সুখ (প্রীতিউৎপাদনকারী) তাই তুমি সুকন্দক। তুমি নমুচি ও শম্বরের প্রিয় (এই নাম দু'টিই বৈদিক যুগের দু'জন দস্যু-দলপতির)। তোমার অন্তর মদ্যের সার। যে ধনবান, যে শস্যবান, যে পিষ্টকবান—সে পুরোডাশ সম্পন্ন, তাকে তুমি বলদান কর। এই ভাষ্যের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হচ্ছে—পিষ্টকাদি গুরুপাচ্য ভোজ্যের সঙ্গে পলাণ্ড ও রসোনের ব্যবহার ছিল।

উপরিউক্ত সুক্তটির উবট্ ভাষ্যে দেখা যাচ্ছে—সুকন্দক বলতে পলাণ্ড ও লশুন বা রসোন—এই দুইকেই ধরা হয়েছে; এই পলাণ্ডকে আমরা চলতি কথায় পলাণ্ডু বা পেঁয়াজ বলি। এক্ষেত্রে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু ঐ পেঁয়াজই।

সুপ্রাচীন তথ্য থেকে তিনটি ইঙ্গিত আমরা পেলাম—

(১) তোমার কন্দে সুখ (২) তোমার অন্তর মদ্যের সার, (৩) যে পুরোডাশ সম্পন্ন, তাকে তুমি বলদান কর। প্রথম উক্তিটির দ্বারা এইটি প্রতীয়মান হয় যে, এই কন্দটি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তর্পিত করে, যার দ্বারা দেহের সমস্ত শক্তিকে প্রাণবন্ত ক'রে থাকে। দ্বিতীয়টির অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হলো—এটাতে আছে মদ্যের সমস্ত গুণ, নেই কেবল মাদকতা দোষ। তাই পরবর্তী যুগে এটাকে গৃহিগণ গ্রহণ করলেও স্মার্ত-সম্প্রদায় তাকে দূরে রেখেছিলেন; তাঁদের মতবাদ হলো—যেহেতু এটি উগ্রগন্ধ এবং অনিয়ত উত্তেজক। আর তৃতীয় হলো—যজ্ঞকার্যের শীর্ষভাগের উপচার যেমন দুগ্ধ ঘৃত ও যব এই তিনটির দ্বারা দেহের যে বল ও কান্তি দান করে, কেবলমাত্র তোমাতেই সেটি বর্তমান।

উপবর্হণ সংহিতার তথ্যের ভিত্তিতে এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এটা কোন সম্প্রদায় বিশেষের কাছ থেকে আমরা গ্রহণ করিনি বা অন্য কোন দেশ থেকে আসেনি। তবে এটাও ঠিক যে আর্যভূমির পরিধি তো এখনকার মত নিশ্চয়ই তিন বিঘে জমি ছিল না; আর যুগোত্তীর্ণ আজকের ধর্মীয় সংস্কারের পুরাণবেত্তার রূপও তখন এত টুকরোও ছিল না। ভাবা চলে তখনকার আর্যভূমি কি বিরাট ছিল; সুতরাং সে যুগের সুকন্দক সেই বৃহত্তর আর্যভূমির হৃদ্য ও ভৈষজ্য সম্পদ।

বৈদিক যুগ থেকে যুগান্তরে কত আচার-ব্যবহার ও ধর্মের ধারা বদলেছে—সেটা ইতিহাস বলে দেয়। এই ভেষজ-সম্পদ নিয়ে চরক-সুশ্রুত সম্প্রদায়ের অনুশীলন আজও আমাদের পাথেয়।

পরিচিতি

বর্ষজীবী কন্দমূলের গাছটি ও তার পেঁয়াজ নামটি সর্বজনপরিচিত। অবশ্য পেঁয়াজ নাম ফারসি 'পয়াজ' থেকে এসেছে। এটির বীজ থেকেও গাছ হয়, আবার ছোট ছোট কন্দমূল রোপণ ক'রেও চাষ হয়। ছোট এক প্রকার পেঁয়াজ দেখা যায়, এরা কিন্তু প্রজাতিতেও ওই; একে চলতি কথায় বলে ছাঁচি পেঁয়াজ। ওষধিটির বোটা-নিক্যাল নাম Allium cepa Linn. ফ্যামিলি Liliaceae. ডিম্বাকৃতি এই কন্দমূলটি সিদ্ধ করলে মাংসের মত থলথলে হয়। তাই এর নাম পলাণ্ড (পল অর্থে মাংস); পরবর্তী যুগে সেইটাই পলাণ্ডু নামে পরিচিত হয়েছে।

আছে কোথায়?

চরকের হরিৎবর্গে। এই বর্গের ওষধিগুলির বৈশিষ্ট্য হলো—যারা সূর্য-কিরণের শক্তিকে বিশেষভাবে গ্রহণ করে, তাকেই হরিৎবর্গে গ্রহণ করা হয়। সূর্য-কিরণের এক নাম হরিৎ। এটি বৈদিক সূক্ত ও আর্যভাষ্যের কথা। এই কন্দমূলের প্রকৃতি-বর্ণনায় বলা হয়েছে—এটি শ্লেষ্মাকারক, বায়ুনাশক, অল্প পিত্তবর্ধক, আহার্যের সহযোগী, বলকারক, গুরু, বৃষ্য, রোচন ও জঠরানলের উদ্দীপক। অর্থাৎ—পৃথ্বী ও অগ্নিপ্রধান ভেষজ। এই পলাণ্ডু সম্পর্কে সুশ্রুতের সমীক্ষাও ঐ একই। বাংলার কোন কোন সম্প্রদায়ে এটির কাঁচা বা তরকারির সঙ্গে ভূরি ব্যবহার প্রচলিত। এই পেঁয়াজের সবুজ গাছ ও কলি (পুষ্পদণ্ড) শাক হিসেবে কাঁচা ব্যবহারের কথা বলা আছে, তবে সেগুলি ব্যবহারের বিধি হলো—অল্প লবণ মাখিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ছিবড়ে ফেলে দেওয়া।

লোক-সংহিতায়—

(১) **তরুণ সর্দিতে:**—মনে হয়—যেন জ্বরই আসছে, সেইরকম সব লক্ষণ দেখা দিলে—নাক বন্ধ, কপাল ভার; সেক্ষেত্রে পেঁয়াজের রস ক'রে নাস নিলে সর্দিও বেরিয়ে যায় এবং জ্বর ভাবও চলে যায়।

(২) যেকোন কারণে শরীর গরম হয়ে প্রস্রাব কষে গিয়েছে, সেক্ষেত্রে পেঁয়াজের রস ১ চা-চামচ ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে খেলে ঐ অসুবিধেটা চলে যায়। তবে রস বেশী খেলে যেমন বমি হওয়ার ভয় থাকে, আবার অল্প খেলে তেমনি বমি বন্ধও হয়।

(৩) **দাস্ত অপরিষ্কারে:**—দাস্ত হয় বটে কিন্তু খোলসা হয় না, সেক্ষেত্রে এক বা দেড় চা-চামচ পেঁয়াজের রস সম-পরিমাণ গরম জলে মিশিয়ে খেলে সে অস্বস্তির লাঘব হয়।

(৪) **ধারণে অক্ষমতা:**—প্রস্রাব চাপলে আর দাঁড়াতে পারা যায় না, প্রায় বেসামাল —এক্ষেত্রে পেঁয়াজের রস এক চা-চামচ ক'রে কিছুদিন খেয়ে দেখুন; ওটা সামলে দেবে।

(৫) **রক্তস্রাবে:**—শরীর গরম হয়ে অনেক সময় নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, সেক্ষেত্রে পেঁয়াজের রসের নস্যি নিলে তা বন্ধ হয়ে যায়।

(৬) **অর্শে:**—কোন কারণে যদি রক্তের অতিস্রাব চলতে থাকে, সেক্ষেত্রে রক্ত বন্ধ না করলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় পেঁয়াজের রস এক চা-চামচ ক'রে সমপরিমাণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়মিত ভাবে খেলে ওটা হঠাৎ বন্ধ না হয়ে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে।

(৭) নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকলে দুই এক ফোঁটা পেঁয়াজের রসের নস্য নিলে বন্ধ হ'য়ে যায়।

(৮) **হিক্কায়:**—হাতের কাছে কিছু নেই— ২৫।৩০ ফোঁটা পেঁয়াজের রস একটু জলে মিশিয়ে ২।৩ বারে একটু একটু ক'রে খাওয়ালে ওটা বন্ধ হয়।

(৯) **অত্যধিক গরমে:**—উৎকট গরমে পথে পিপাসা পেলে হঠাৎ জল খাওয়া গর্হিত কার্য, সেইজন্য পশ্চিমাঞ্চলে ঐ সময় পেঁয়াজ বেশী ক'রে ব্যবহার করে। এটাতে নাকি লু (Loo) লাগে না। সেই সময় প্রত্যহ একটু ক'রে কাঁচা পেঁয়াজ খেলে পথে-ঘাটে বিপর্যয়ের ভয় থাকে না।

(১০) **বেরসিক পেঁয়াজ:**—তার সব ভাল, মানুষের শরীরে যে ছয়টি রসের (মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু, কষায়) প্রয়োজন, সব কয়টি দেওয়ার ক্ষমতা তার আছে; কিন্তু ব্যবহারের অন্তরায় তার গন্ধ। একে উড়িয়ে দেওয়া যায়, যদি রাত্রে তাকে চৌচির ক'রে

কেটে টক দই-এ ভিজিয়ে রাখা যায়। তখন সে সমাজে চলে যাবে, অথচ গুণটাও পাওয়া যাবে। এইটাই বৈদ্যকুলের পেঁয়াজ কৌলিন্য সৃষ্টি।

(১১) **কানের পুঁজে:**—এটাতে অনেক সময় কানের বাইরে ঘা হয়, এক্ষেত্রে পেঁয়াজের রস গরম ক'রে ২।১ ফোঁটা কানে দিলে ওটা সেরে যায়।

(১২) বমি নিবারণে—পেঁয়াজের রস ৪।৫ ফোঁটা অল্প জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে বমি বন্ধ হয়।

(১৩) **বিষ ফোঁড়ায়:**—টন্‌টন্‌ করছে (সে যেখানেই হোক না কেন), এক্ষেত্রে পেঁয়াজের রস ক'রে একটু গরম করে লাগিয়ে দিলে ঐ বিষুনিটা কেটে যায়।

(১৪) **মাথা ধরায়:**—সর্দিজনিত মাথা ধরায় ২।৩ ফোঁটা এর নস্য নিলে তৎক্ষণাৎ কমে যায়।

(১৫) **স্তনের ঠুনকো ও ফোঁড়ায়:**—পেঁয়াজের রস গরম ক'রে লাগাতে হয়।

(১৬) **মুখ রোগে:**—পেঁয়াজ কাঁচা খেলে দাঁতের ও মুখের অনেক রোগ থেকে বাঁচা যায়। এর অন্য একটা নাম মুখদূষক। আবার অনেকের অভিমত—এটাতে মুখ গন্ধ হয় ব'লেই এটির নাম মুখদূষক।

(১৭ **পচা ঘায়ে**—জলে পেঁয়াজের রস মিশিয়ে সেই জলে ক্ষত পরিষ্কার ক'রলে ক্রিমি (পোকা) হয় না।

এখন প্রশ্ন হলো—প্রদেশ বিশেষের স্মার্ত-সম্প্রদায়ের এটাকে বর্জন করার গূঢ় রহস্য কি তার গন্ধ, না আর কিছু?—এ যেন 'গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।'

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Organic sulphide viz., alkylsulphides, allyl propyl disulphide. (b) Phenolic constituents viz., catechol, protocatechuic acid (c) Amino compounds viz., different amino acids. (e) Essential oil.

রসোন

'বলা মুখ আর চলা পা'ও যেমন,—আমাদের 'মর্ত্যের অমৃত' শব্দটাও তেমনি, এই মর্ত্য শব্দটাই তো মরণধর্মী, এখানে মৃত্যু তো থাকবেই, সুতরাং এই শব্দটা অনির্দিষ্ট জীবনেরই তো নির্দেশক; হ্যাঁ—তবে সেই নির্দিষ্টকালটিতে যেন নীরোগ থাকি—তারই জন্য আমাদের ওষধি। আর এই যে 'অমৃত', এটিও গড্ডলিকা শব্দ, এই শব্দটি চিরকালই আমাদের স্তোভ দিয়ে আসছে। তবুও ব'লবো—আমাতে আমি থাকার যে চেষ্টা সেইটাই তো আমাদের 'অমৃত', এমনি আকাঙ্ক্ষার আকর্ষণীয় বস্তুই বুঝি মর্ত্যের কোন কিছু; তাই গালগল্প যেমন এ যুগে চালু তেমনি অতীত ভারতেও কম চালু ছিল না, সবই সেই অবিনশ্বরের আকাঙ্ক্ষায়। অবশ্য গল্প চিরকালই সমাজের কোন বিশেষ ঘটনা থেকেই উদ্ভূত হয় এবং আগামী দিনে সেই ঘটনাটিকে সমাজে হিত-অহিতের দিকটা আলোচনার বিষয় ক'রে রাখা হয়—এমনি একটি প্রাচীন কাহিনী—ইন্দ্রের পত্নী শচী দেবীকে নিয়ে। প্রথমে তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান, তাঁদের ধারা বজায় রাখার জন্য ঋষির পরামর্শে ইন্দ্র আনলেন অমৃত, সেই অমৃতবস্তু খাওয়ার সময় শচীদেবীর হ'লো উদ্গার (ঢেঁকুর), কিন্তু ভক্ষিত অমৃতটির অংশ পড়ে যায় মর্ত্যে (ধরণীতে), সেই মর্ত্য সত্তা থেকেই যেন জন্ম অমৃত রসোনের। এই কাহিনীটি কাশ্যপ সংহিতার—

'এতচ্চাপ্যমৃতং ভূমৌ ভবিষ্যতি রসায়নম্'

অমৃত হ'লেও সে ভূজন্মা, তাই ভূমিজাত দোষ তাতে বর্তালো, সেই দোষেই তা'তে দুর্গন্ধের সঞ্চার।

দ্বিতীয় কাহিনী—চোরের উপর বাটপাড়ি ক'রেই যেন এক অসুরে অমৃত পানে শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা ক'রেছিলো, ব্যাপারটা জানতে পেরে তাকে হত্যাও করা হয়;

পরে তারই অস্থি থেকেই রসোনের উৎপত্তি, তাই তার রসে দুর্গন্ধ। এটা নাবনীতকের উপাখ্যান।

এর দ্বারা এইটাই বোঝানো হ'য়েছে যে—এটি মর্ত্যের মাঝেই বস্তুসত্তায় অমৃত।

তারও পূর্ববর্তীকালে রসোনের উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ববৈদিক উপবর্হণ সংহিতার ৭।১৭৫।১৭৬ সূক্তে। যেখানে রসোন ও পেঁয়াজ একই পর্যায়ে উল্লেখিত হ'য়েছে; কিন্তু পরবর্তী সংহিতার যুগে (চরক-সুশ্রুতাদি) এসে তাদের পৃথক সত্তার অনুশীলন।

এই রসোন পেঁয়াজের ক্ষেত্রেও ঋক্‌বেদের ৫।৬।৩৪ সূক্তের একটি কাহিনী বিধৃত করা আছে; সেটি হ'লো আর্যদের গবাদি পশুগুলিকে জোর ক'রে অপহরণ ক'রতো ব্রাত্য ব্যক্তিরা, এরা দল বেঁধে আসতো, কর্কশ কথা ব'লতো, এদের দলপতির মধ্যে দুজন দুর্ধর্ষ ব্রাত্যের নাম ছিল নমুচি ও শম্বর, পরে তাদিকে দাস অর্থাৎ বশ ক'রেছিলেন আর্যরা। তারা যে কন্দ ভক্ষণ ক'রে অসীম বলশালী হ'য়েছিলো, সে সন্ধান লাভ ক'রেই সেই কন্দের বৈদিক নামকরণ সুকন্দক। এই নামকরণের তাৎপর্য এইভাবে বর্ণনা করা হ'য়েছে। এই উপবর্হণ সংহিতায় বর্ণিত সূক্ত ও তার ভাষ্যটি সুকন্দকের (পেঁয়াজ) বর্ণনাতেও পাওয়া যায়।

পৌরাণিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী— যে যুগে পুরোহিত তন্ত্রের হাতে ভারতের প্রতি প্রদেশের সমাজ নিয়ন্ত্রণের অধিকার; তাই কড়া হাতে সমাজকে নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাঁধা হ'চ্ছে, তখনও কিন্তু এই সুকন্দকের গুণপণাকে তাঁরাও হীন ক'রতে পারেননি। তারও একটি উপাখ্যান স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়।

এক সময়ে প্রবল দুর্ভিক্ষ হয়, তাতে বহু মুনি-ঋষিসহ জনসাধারণ মৃতপ্রায় হ'য়ে যান; কিন্তু দুজন ঋষি খুব হৃষ্ট ও পুষ্ট হ'য়ে থাকার পিছনে কি কারণ? এ'রা জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু তাঁরা সেই হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার প্রকৃত ব্যাপারটা গোপন ক'রে যান; তাই প্রশ্নকর্তারা ক্রুদ্ধ হ'য়েই অভিশাপ দিলেন যে—"আপনাদের খাদ্য সকলের অভক্ষ্য হবে"—অবশেষে ভীত হ'য়েই তাঁরা অকপটে স্বীকার করলেন—আমরা সুকন্দক ভক্ষণ ক'রেই এত হৃষ্টপুষ্ট; এতে কিন্তু ঋষিরা আর অভিশাপ প্রত্যাহার করে নিলেন না, সেই থেকেই এটি সংস্কারানুগ ব্যক্তিগণের অভক্ষ্য হ'য়ে আছে।

এইসব বৈদিক ও পৌরাণিক কাহিনীর বক্তব্যের লক্ষ্য কিন্তু সেই একই, তাদের গুণপনার শ্রেষ্ঠত্ব জনসমাজে তুলে ধরা, অপরদিকে এও ঠিক যে—ভারতে বহিরাগত অহিন্দুদের আহার্য থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে (আয়ুর্বেদিক একটি প্রাচীন গ্রন্থ) পেঁয়াজ রসুনের সুখ্যাতি প্রচুর।

অচ্ছুত পর্যায়ে ফেলার অন্তরালে

পৌরোহিত্য সংস্কারের প্রাধান্য বজায় রাখতেই এই পেঁয়াজ-রসুনকে একঘরে করা আছে—

এই হিসেবে যুক্তিও নিরূপণ করা হ'লো যে—আহার্যই মানুষের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রিত করে; পাছে তার সত্ত্বগুণ-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে, তাই রজঃ বা তমোগুণধর্মী আহার্যবস্তু বর্জনের প্রধান হেতুই এইটি; কিন্তু তার বহু পূর্ব থেকেই সদাজাগ্রত চিকিৎসককুল জানেন যে—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র যে কোন ব্যক্তিরই দেহ যখন রোগক্লিষ্ট হয় এবং হওয়াটাই যখন স্বাভাবিক, তখন তাঁরা এই বস্তু দুটিকে মর্ত্যে অমৃততুল্য দ্রব্যের অন্যতম বোধে অনুশীলন যথাযথই ক'রেছিলেন, তাই চরক-সুশ্রুতের যুগে এই দ্রব্য দুটির প্রকৃতি পরিচয় তাঁরা কম করেননি।

বৈদিকযুগে এই সুকন্দকের (পেঁয়াজ-রসুনের) গুণ একই পর্যায়ে ধরা হ'লেও ঋষি চিকিৎসকগণ (চরক-সুশ্রুতের কালে) তার পৃথক সত্তার অনুশীলন ক'রেছেন বটে, তবে তার বিশেষ পার্থক্যের কথা তাঁরা বর্ণনা করেননি; তবে ব'লেছেন একটির আকৃতি মাংসের পিণ্ডের মত, ঐ মাংসপিণ্ডাকৃতি কন্দটিতে আয়ুর্বেদোক্ত ৬টি রস (মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়) রস বর্তমান। চরক-সুশ্রুতে এই দুটি ভেষজের বৈদিক নাম ব্যবহৃত হয়নি—এ দুটিকে হরিতবর্গের অন্তর্গত ক'রেছেন, এই হরিত শব্দের

অর্থ হ+ইতি অর্থাৎ সূর্যের কিরণ থেকে যারা (যেসব ভেষজ) বর্ণ সঞ্চয় ক'রে বিশিষ্ট তেজোগুণধর্মী হয়, তাদেরকেই হরিত বর্গে ধরা হ'য়েছে। পলাণ্ডু রসোনের প্রথম পরিচয় তার হরিত পত্রের দ্বারা। পলাণ্ডু ও রসোনের গুণ এবং রোগনাশিত্ব সম্বন্ধে চরকের সূত্রস্থান ২৭ অধ্যায়ে ১৪৯।১৫০।১৫১ এবং ২৭৬ শ্লোকে বর্ণনা ক'রেছেন।

পেঁয়াজ ও রসোনের তুলনামূলক দোষ-গুণ বিচার

পেঁয়াজ খুব বায়ুনাশক, পরোক্ষভাবে সামান্য শ্লেষ্মাকর, পিত্তবর্ধক, আহার্য দ্রব্যের সহযোগী, খুব বলকারক, একটু গুরু, তবে বৃষ্য (শুক্রশক্তি বর্ধক) এবং রুচিকারক।

রসোন সম্বন্ধে ঐ গুণগুলি তো আছেই, এ ভিন্ন ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কিলাসের (ছুলি, শ্বেতী প্রভৃতি) ক্ষেত্রে অহিতকর নয়, এবং গুল্মরোগের ক্ষেত্রেও ব্যবহার ক'রতে উপদেশ দিয়েছেন; তা ছাড়া এই রসোন যেমনি স্নিগ্ধ তেমনি উষ্ণ, তবে সেটা নির্ভর করে রোগাক্রমণের ক্ষেত্রে কোন্ দোষের প্রাবল্য বর্তমান, তার ওপর উষ্ণতা ও স্নিগ্ধতা গুণের প্রভাব বর্তাবে।

এই কন্দটি সম্পর্কে সুশ্রুত সংহিতার মতবাদ প্রায় একই, তবে হ্যাঁ, চরকে একটি নূতন কথা বলা হ'য়েছে; পেঁয়াজ রসোনের পাতার গুণ সম্বন্ধে ব'লেছেন—অন্যান্য শাক্-সিদ্ধ জল যেমন ফেলে দিয়ে তাকে রান্না ক'রে খাওয়ার বিধি বলা হ'য়েছে—এই পেঁয়াজ রসোনের গাছ বা পুষ্পনালকে (কলি) সে পদ্ধতিতে রান্না ক'রে খাবে না; ওটাকে অল্প ভাঁপিয়ে নিয়ে অথবা কাঁচা গাছ বা পুষ্পনাল অল্প লবণ দিয়ে খাবে। আর পেঁয়াজ-রসোন কন্দ কাঁচা খাওয়াই ভাল, তবে পরিমিত। তারপর সুশ্রুত সংহিতার সূত্রস্থান ৪৬ অধ্যায়ে ২৫৫—২৫৭ শ্লোকে এদের গুণপনার কথা বলা হ'য়েছে, তবে এই দুটির মধ্যে স্নেহভাব পলাণ্ডু অর্থাৎ পেঁয়াজেই বেশী আছে। আর রসোন, ঔষধার্থে ও আহার্য হিসেবে গাছের কন্দ থেকে বীজ পর্যন্ত সমগ্র অংশেরই ব্যবহার হয়, এবং এর প্রতিটি অংশই পৃথক পৃথক গুণের অধিকারী; সেখানে বলা হ'য়েছে—কন্দে কটু, পাতায় তিক্ত, পুষ্পনালে (কলিতে) কষায়, তার অগ্রে (আগায়) লবণ এবং বীজে মধুর রস; এই উদ্ভিদটির মধ্যে নেই ছয়টি রসের বাকী একটি, সেটি অম্লরস, তাই সে রসে উণ অর্থাৎ একটি কম, তাই তার নামকরণ করা হয়েছে রসোন। অম্লরস যে নেই তার প্রমাণ—দুধে রসোনের রস দিলে দুধ কাটে না, কিন্তু পেঁয়াজের রসে কেটে যায়।

পরিচিতি

কন্দ বা বীজোদ্ভব বর্ষজীবী উদ্ভিদ ভারত বা তৎসন্নিহিত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে তো চাষ হয়ই, তা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশেও এর চাষ হ'য়ে থাকে।

অতি পরিচিত সাধারণ সব্জী—এর বোটানিক্যাল্ নাম Allium sativum Linn. এই সব্জীটির কন্দমূলই প্রধানভাবে ব্যবহার হ'লেও তার পুষ্পনাল (কলি), বীজ, গাছও আহার্য ও ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হ'য়ে থাকে। এর আর একটি প্রজাতির সর্বদা ব্যবহার হ'য়ে থাকে, সেটা দেখতে অনেকটা ধানী পেঁয়াজ অর্থাৎ ছোট জাতের পেঁয়াজের মত। সাধারণ রসোন যেমন বহুকোষ (কোয়া) বিশিষ্ট হয়, এটাতে সে রকম হয় না। এর বোটানিক্যাল্ নাম Allium ampeloprasum Linn. রসোনের চলতি ডাকনাম রসুন বা লসুন।

রসোনের গুণ (এক নজরে)

দীপন (অগ্নির দীপ্তিকারক), মুখশোধক, সূক্ষ্মস্রোতগামী ও স্রোতশুদ্ধিকর (এটি পারদের মত সর্বশরীরে ব্যপ্ত হ'তে পারে ব'লেই গায়ে গন্ধ বেরোয়; তা ছাড়া মেধা, স্মৃতি, বল ও আয়ুবর্ধক, অঙ্গ সৌষ্ঠবের ক্ষেত্রে কেশ ও শ্মশ্রু রক্ষক ও বৃদ্ধি-কারক ও গাত্রবর্ণ প্রসাদক, চক্ষুর জ্যোতি রক্ষক। পুরুষের পক্ষে—শুক্র ও ওজো ধাতুর বর্ধক, পৌরুষ প্রবৃত্তির ধারক ও বাহক। নারীর পক্ষে—সন্তানপ্রদ ও তার আয়ুষ্কর ও যুবতী জীবনের অঙ্গসৌষ্ঠবের সমতা রক্ষক। কিশোরের পক্ষে—শরীর ও মনের সার্বিক উন্নতিকর। যে সব রোগের ক্ষেত্রে রসোনের ব্যবহার ফলপ্রদ হ'য়ে থাকে—(১) অস্থিচ্যুতি (Dislocation of Bones), (২) অস্থিভগ্ন (Fracture of Bones), (৩) অস্থি সম্বন্ধীয় রোগ, (৪) বীর্য সম্পর্কীয় রোগ, (৫) ভ্রম রোগ (Giddiness), (৬) কাস ও শ্বাস রোগ, (৭) কুষ্ঠ রোগ, (৮) কৃমি রোগ, (৯) গুল্ম রোগ, (১০) চর্ম রোগ ও চর্মের বিবর্ণতা, (১১) নেত্র রোগ ও রাত্র্যন্ধতায় (রাতকানায়), (১২) জীর্ণজ্বর এবং চাতুর্থক জ্বর (পালা জ্বর) স্রোতরোধজনিত উদ্ভূত রোগ সকল, যেমন—মূত্র সম্বন্ধীয় রোগ প্রভৃতি।

সংহিতাগ্রন্থোক্ত ও লোকায়তিক ব্যবহার

(১) **চলা যৌবনে—** কোন দিকেই একে ধ'রে রাখা যাচ্ছে না, এক্ষেত্রে দু' কোয়া রসুন গাওয়া ঘিয়ে ভেজে মাখন মাখিয়ে খেতে হয়, খাওয়ার শেষে একটু গরমজল পান করা উচিত। (খ) আটার সঙ্গে রসুন বাটা মিশিয়ে রুটি বা লুচি ক'রে খাওয়া। (গ) ছাতুর সঙ্গে একটু ঘি, চিনি ও একটু রসুন বাটা মিশিয়ে খেলেও হয়।

(২) **যৌবন রক্ষায়—** কাঁচা আমলকীর রস দুই বা এক চামচ নিয়ে তার সঙ্গে এক বা দুই কোয়া (নিজের শরীরের সহ্যাসহ্য বুঝে) রসুন বাটা খেতে হয়, এটাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই যৌবন ধরে রাখে। যৌবনের প্রারম্ভ থেকে ব্যবহারে নারী থাকে তন্বী।

(৩) দুই বা এক কোয়া রসুন চিবিয়ে খেয়ে একটু গরম দুধ খেলে এইসব ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যায়—

(ক) স্বল্প মেধায় (খ) বিস্মরণে (গ) কৃমিতে (ঘ) রাতকানায় (ঙ) শুক্র-তারল্যে (চ) চুলকণায় (ছ) পাথুরীরোগে (জ) জীর্ণ জ্বরে (ঝ) শরীরের জড়তায়।

(৪) হাড়সার শিশুর গায়ে মাংস লাগাতে চাইলে, ভাতের সঙ্গে টাট্‌কা ঘোল ও সিকি (¼) বা আধ (½) কোয়া রসোন কিছুদিন খাইয়ে দেখুন।

(৫) **পেটের বায়ুতে—** এর সঙ্গে অনেক সময় শ্লেষ্মারও যোগ থাকে, এ ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা জলে ২।৫ ফোঁটা রসুনের রস মিশিয়ে খেলে অনেকক্ষেত্রে এটার উদ্বেগ চলে যায়।

(৬) **বাতের কন্‌কনানিতে (মাংসাশ্রিত বাতে)—** গাওয়া ঘিয়ের সঙ্গে দুই/তিন কোয়া রসুন বাটা খেতে হয়; অথবা ৫।৭ ফোঁটা রসুনের রস ঘিয়ে মিশিয়ে খেলেও হয়।

(৭) **শরীর ক্ষয়ে—** খায় দায়, শুকিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এক বা দুই কোয়া রসুন বেটে এক বা আধ পোয়া দুধে পাক ক'রে সেটা খেতে হয়। এটাতে ক্ষয় বন্ধ হবে; অধিকন্তু আস্তে আস্তে ওজন বেড়ে যাবে।

(৮) **মদ্যপায়ীর পেটে—** অনেক সময় শূল ব্যথা ধরে, অথচ তাকে পরিত্যাগ করার

থেকে তাঁর মরাটা সহজ এই মনোভাব, এ ক্ষেত্রে তাঁরা একটা কাজ ক'রে দেখতে পারেন, ওরই সঙ্গে দুই এক কোয়া রসুন খাবেন, এ অসুবিধেটা আর থাকবে না।

(৯) **শুক্রতারল্যে—** অল্প গরম দুধের সঙ্গে ২/১ কোয়া রসুন বাটা খেলে শুক্র-তারল্য হয় না; অস্থির বল বাড়ে; অস্থির ক্ষয় হ্রাস পায়; শরীরের নিত্য ক্ষয় রুদ্ধ হয়।

(১০) **যক্ষ্মারোগে প্রতিরোধক—** নিত্য এক কোয়া রসুন অল্প গরম দুধে মিশিয়ে খাওয়া।

(১১) **নরম মাছে (মৎস্যে)—** সংসারে অনেক সময় ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় অনেককিছুই এসে যায়; সে ক্ষেত্রে একটু রসুন বাটা দিয়ে রান্না ক'রলে শরীরের ক্ষতিকারক দোষ অংশটা অনেক কেটে যায়, এটা কিন্তু আয়ুর্বেদ সম্মত বিধি নয়, এভাবে খেলে রক্ত দূষিত হ'তে পারে।

(১২) **কুকুরে কামড়ালে—** বর্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসার ক্রমকে মানতে হবে, তবে যদি তার আদৌ প্রয়োজন না থাকে, তা হ'লেও কিছুদিন রসুনের রস ২।৫ ফোঁটা অল্প গরম জলে বা দুধে মিশিয়ে খাওয়া ভাল। গ্রীক্ দেশের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিতে এটা লিপিবদ্ধ আছে।

(১৩) **বিষমজ্বরে (পুরাতন)—** জ্বর ছাড়ে না; বাড়ে কমে কিন্তু একটু থেকে যায়, যাকে বলা হয় ঘুস্‌ঘুসে জ্বর—এ ক্ষেত্রে ৫।৭ ফোঁটা রসুনের রসের সঙ্গে আধ বা এক চামচ গাওয়া ঘি মিশিয়ে খেলে দুই চার দিনের মধ্যে জ্বর ছেড়ে যাবে।

(১৪) **আর্টারিওস্কেলেরোসিস—** (Arteriosclerosis)— একটু বয়স হ'লে শুদ্ধ রক্তবাহী শিরাগুলির স্থিতিস্থাপকতা অর্থাৎ ইলাস্‌টিসিটি (elasticity) ক'মে যেতে থাকে, সে ক্ষেত্রে এটি খাওয়ার অভ্যাস থাক্‌লে ঐ অসুবিধেটা সৃষ্টি হয় না।

(১৫) **এম্‌ফাইসিমা** (Emphisema) রোগে—এই রোগটি হাঁপানি, তবে অসুবিধে এটাতে নিঃশ্বাস ছাড়তে কষ্ট হয়। ৫।৭ ফোঁটা রসোনের রস ঠাণ্ডা দুধে মিশিয়ে রোজ একবার ক'রে খেলে অনেকক্ষেত্রে ঐ রোগের উপশম হয়।

(১৬) **মাথা ধরায়—** সর্দি হয় না অথচ মাথা ধরে (বায়ুর জন্য)। এই সমস্যা সমাধানের উপায় দুই-এক ফোঁটা রসুনের রসের নস্য নেওয়া। আর একটা কথা—এর রস গায়ে লাগলে চামড়ার কোন অনিষ্ট করে না।

(১৭) **ক্ষতে—** ক্লেদ কিছুতেই যেতে চায় না; একটু ঘিয়ের সঙ্গে রসুন বাটা ক্ষতে লাগালে ওটা কেটে যাবে।

(১৮) **বাতের যন্ত্রণায়—** সরষের তেলে রসুন ভেজে সেই তেল মালিশ ক'রলে বাতের যন্ত্রণা কমে যায়।

(১৯) **ক্ষতের ক্রিমিতে—** অনেক সময় পচা ঘায়ে পোকা জন্মে। বিশেষতঃ গরু মহিষের প্রায়ই এটা হ'তে দেখা যায়। এ সব ক্ষেত্রে রসুন বেটে ঘায়ে লাগালে পোকা হয় না, আর হ'লেও মরে যায়।

এ ভিন্ন গ্রন্থোক্ত অথবা লোকায়তিক ব্যবহারের বহু মুষ্টিযোগ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।

মাত্রা সম্বন্ধে বক্তব্য— রসুনের মাত্রা জঠরাগ্নির বলাবল, কাল (ঋতু ভেদে) ও বয়স এবং সাত্ম্য অনুযায়ী (অর্থাৎ অভ্যাস বা অনভ্যাসের ক্ষেত্র বিচারে) মাত্রা ঠিক করতে হয়। তবে যে সব মাত্রা নির্দেশিত হ'লো—সেটাই অবশ্য পালনীয় এমন কোন নির্দেশ নয়।

নির্গন্ধ রসুন— খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় তার গন্ধটাই বিরসতা সৃষ্টি

করে, এ উপলব্ধি সকলেরই হয়। তাই রসুনের কোয়ার উপরের খোসাটা ছাড়িয়ে, আধখানা ক'রে কেটে টক দইএ পূর্বদিন রাত্রে ভিজিয়ে রেখে তার পরের দিন খাওয়ার পূর্বে ওটা ধুয়ে নিলে ঐ অভদ্র গন্ধটা আর থাকে না। এটাও না খেতে পারলে রসুন ঘিয়ে ভেজে শাক কিম্বা তরকারির সঙ্গে মিশিয়ে খাবেন। অথবা মাংস বা দইএর সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে খাবেন।

নিষেধ— মাছের সঙ্গে, কাঁচা দুধের সঙ্গে রসুন খেতে নেই, এর দ্বারা রক্ত দূষিত হয়।

অবশেষে একটা কথা না লিখলে আমার পূর্বসূরিদের উপেক্ষা করা হবে—তাই অপ্রিয় হ'লেও লিখতে বাধ্য হচ্ছি—আজ এত দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির প্রাবল্য আমাদের খাদ্যের সংকর সৃষ্টিই এর জন্য অনেকাংশে দায়ী, সে কথা ভাবার যথেষ্ট কারণ উপস্থিত হ'চ্ছে—এ কথাটা কিন্তু আমার নয়, কাশ্যপ সংহিতার কথা—যেমন তাঁরা নিষেধ ক'রেছেন মাছের সঙ্গে আদা রসুন এক সঙ্গে খাওয়া বিরুদ্ধ আহারের পর্যায়ে পড়ে।—অথচ আদা রসুন না হ'লে যে আমাদের রান্নাই অচল। সে কালের মতে এটি অহি-নকুল অর্থাৎ সাপ-নেউল সম্পর্ক।

এ তো গেল ভারতীয় ভৈষজ্যবিদ্যার অনুশীলন কিন্তু এ রসুনটিকে কেন্দ্র ক'রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কম ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়নি—রসুনের বস্তুসত্তা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হ'য়েছে, তবে সেটা এককন্দ রসুনের, যার বোটানিক্যাল নাম— Allium ampeloprasum Linn.

তাই বলছি আপনার যতই সাবুদ থাক, সরকারের সিলমোহর না থাকলে আপনার দলিল যেমন প্রামাণ্য হয় না, সেইরকম—আমাদের সংহিতায় রসুনকে মর্ত্যের অমৃত যতই বলুন না কেন, তার কোন ওজনই নেই, তাই আমার এই বিশ্বের সাবুদ হাজির করা।

কয়েক বৎসর পূর্বে এই রসুনকে কেন্দ্র ক'রে একটা সিম্পোসিয়াম হ'য়েছিলো কালিফোর্ণিয়া সহরে, সেখানে এসেছিলেন সারা বিশ্বের রসুন প্রেমিকগণ। আমার এ ক্ষেত্রে বক্তব্য সেই প্রতিবেদনকে কেন্দ্র ক'রে। তবে এটাও ঠিক যে ভূমণ্ডলের অবস্থানান্তরে শীতগ্রীষ্মের তারতম্যে দেহের উপর দ্রব্যের গুণাগুণ প্রকাশ নির্ভর করে। সুতরাং আমাদের দেশে সেইসব রোগের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ কতটুকু হবে অথবা আদৌ হবে কিনা সেটাও তো বিচার্য। তবে তাঁদের গবেষণালব্ধ সমীক্ষাটাও আমাদের জানা দরকার।

ভক্ত যেমন ভজনের সূত্র খুঁজে নেয়, বিশ্ব বৈজ্ঞানিকগণের রসোন ভজনাও সেই ধরনের। এক এক দেশে এক একটি বিশেষ রোগের উপর তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। সেইসব প্রতিবেদনের রোগপঞ্জীতে এই ধরনের লেখা রোগগুলির নাম দেওয়া হ'য়েছে—সর্বপ্রকার ফোড়ায়, বিষ ফোড়ায় ও বোল্‌তা বিছের কামড়ে বাহ্যপ্রয়োগ (External application), ধমনীর সঙ্কোচন (Arteriosclerosis), হাতে পায়ে খিল ধরা, কোষ্ঠবদ্ধতায়, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সর্দি-কাসির প্রবণতা ও হাঁপানীতে। রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া মন্দীভূতজনিত রোগগুলিতে, শোথে, গলা-বুক জ্বালা, অগ্নিমান্দ্য ও পাত্‌লা দাস্তে, অম্লপ্রদাহে ও পিত্ত পাথুরীতে (Gall-Stone), হাই ব্লাড প্রেসারে (High Blood pressure), অর্শ রোগে, জীবাণুজ সংক্রামক রোগে, যকৃৎ দোষে, স্নায়বিক দৌর্বল্যে, ফেরিঞ্জাইটিস্‌ (Pharyngitis), গলক্ষত (Sore throat), ও ডিপ্‌থিরিয়ায় (Diphtheria), নানা প্রকার চর্ম রোগে, ক্ষয় রোগে, গলগণ্ডে, ক্রিমিতে, হুপিং কাসিতে, বমনে, এমন কি বুক ধড়ফড়ানিতে ব্যবহৃত হ'য়েছে।

প্রথমতঃ ব'লে রাখি—এটাতে আছে ভিটামিন্‌ 'এ' 'বি' 'সি' ও 'ডি' এই হেতু

এটি ব্যবহারে বহু রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

গত মহাযুদ্ধে বৃটিশ চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ দেখেছেন যে—আহত সৈনিকদের ক্ষেত্রে বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রয়োগ ক'রলে কোন ক্ষেত্রেই ক্ষত বিষিয়ে যেতো না। এ ভিন্ন এটিতে আছে Potassium, Calcium, ফস্‌ফরাস্‌, আয়রণ, আয়োডিন এবং উগ্রশক্তির জীবাণুনাশক acrolein, crotonic aldehyde, allyl sulphide ও volatile terpenes. এটির গবেষক Arthur W. Synder, Ph. D.

রসুনের মধ্যে allyl sulphide থাকায় এই কন্দটির সর্বপ্রকার জীবাণুনাশ করার শক্তি আছে, এবং এ কথাও লিখেছেন যে—একটা রসুন থে'তো ক'রে ঘরে রেখে দিলে ঘর জীবাণুমুক্ত থাকে। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের পিতৃস্বরূপ হিপোক্রাট্‌স্‌ (Hippocrates) লিখেছেন যে আমাদের বনৌষধির মধ্যে রোগ প্রতিকারে রসুনেরই স্থান প্রথম।

জার্মাণীতে ৮০টি ব্লাড্‌-প্রেসারের রোগীকে দেওয়া হ'য়েছিলো, তাঁরা প্রায়ক্ষেত্রে বিশেষ উপকার পেয়েছেন।

জাপান দেখেছেন যে—এই দ্রব্যটিতে বি কোলাই এবং টায়ফায়েডের জীবাণু নাশ করার শক্তি আছে।

ব্রাজীলের একটি চিকিৎসক সম্প্রদায় এটিকে প্রয়োগ ক'রেছেন এমিবিক্‌ ডিসেন্‌ট্রী (Amoebic dysentery) ও টায়ফায়েড্‌, প্যারা-টায়ফায়েডের ক্ষেত্রে (Typhoid, Para-typhoid).

রাশিয়ান চিকিৎসকগণ ব্যবহার ক'রে ব'লেছেন যে, এর দ্রব্যশক্তি পেনিসিলিনের তুল্য।

শিশুদের হুপিং কাসিতেও ফল পাওয়া যায়—যদি শিশুর পায়ের নিচে কোন স্নেহ-পদার্থ (ভেসিলিন্‌ জাতীয় জিনিস) লাগিয়ে ২।৩ কোয়া রসুন বেটে তার উপর লাগানো হয়। এর দ্বারা এই রোগ উপশম হয়। যেহেতু রসুনের দাহিকা শক্তি আছে, তারই জন্য পায়ের তলায় কোন স্নেহ পদার্থ (oily substance) না লাগিয়ে এটি দেওয়া নিষেধ। তবে এগুলি পুনরায় আমাদের এই প্রাকৃতিক পরিবেশে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন।

আমাশায় ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায়— ছোট এক কোয়া রসুন সকালে চিবিয়ে খেতে ব'লেছেন, সহ্য হ'লে সকালে ও বৈকালে এক কোয়া ক'রে দুবেলাই খাওয়া যেতে পারে।

পায়ের তলার কড়ায়— যাকে আমরা চলতি কথায় গুপো বলি—রসুন আধখানা ক'রে কেটে, রাত্রে কড়ার উপর চেপে লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast) দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখতে হয়। এই রকম কয়েকদিন ক'রলে কড়া সেরে যায়। এ'দের মধ্যে অনেকেই ব'লেছেন যে—রসুন কোন জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া ভাল।

সেই সিম্‌পোসিয়ামের (Symposium) প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ অনুবাদে একটি গ্রন্থের উপাদান তবুও এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হ'লো।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Organic sulphides viz., allyl propyl disulphide, diallyl disulphide, allicin, allisatin-I, allisatin-II. (b) Sulphur bearing amino acid viz., S-(2-carboxy propyl glutathinone). (c) Essential oil.

আর্দ্রক

অগ্নিগর্ভ আর্দ্রক (আদা)

বাস্তব জগতের বস্তুসত্ত্বায় ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ও ব্যোম্ এই পাঁচটি পদার্থের মৌলিক উপাদান গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের অস্তিত্ব নেই এমন প্রস্তাব কেউই করেন না।

তাই মানব-সভ্যতার আদিবিকাশের যুগ সেই বৈদিক যুগে উদ্ভিদ্ সমূহের মধ্যে ভৈষজ্য-শক্তির উপাদানের অস্তিত্ব নিয়ে যেসব গবেষণা হয়েছে, তাদের অন্তর্নিহিত মৌলিক উপাদানের তারতম্য যে আছে, সেই সময়েই সেটা তাঁদের নজরে এসেছিল। বৈদিক সূক্তে বিবৃত সেইসব ইঙ্গিতকেই আবার অনুশীলন করে কাজে লাগানো হয়েছে—পরবর্তী সংহিতার যুগে রোগ-প্রতিকারে।

এই আর্দ্রকটি—যার প্রচলিত নাম আদা, তাকে জনসমাজের শারীর-কল্যাণে কতভাবে যে কাজে লাগানোর উপদেশ দেওয়া হয়েছে—সেইটি আমার বক্তব্য।

লোককথায় একে নিয়ে উপমা সৃষ্টিও করা হয়েছে, যেমন—'আদা জল খেয়ে লাগা', 'আদায় কাঁচ কলায়', 'আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কি কাজ', 'পচা আদায় ঝাঁঝ বেশী' ইত্যাদি; এই উপমাগুলি ব্যঙ্গাত্মক হলেও উপদেশাত্মক। যেমন আদা পচে গেলে তার দ্রব্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ঝাঁঝটা কমে না বরং বাড়ে, এটা নির্গুণ মানুষের তিন গুণ ঝাঁঝেরই রূপান্তরিত লোককথা। অপর পক্ষে সংস্কৃত ভাষার ঝর্ঝর শব্দটি ঝাঁঝ্ হ'য়ে গিয়ে সে তীক্ষ্ণ কটুতার বোধক হয়।

বৈদিক যুগের অনুশীলন

"সৌপর্ণমসি অপাঘ্নে অগ্নিমাসাদং জহি নিষ্ক্রব্যাদং সেধ।
মাদেব যজং বহ। ত্বা ক্ষত্র সজাত বন্যপদধামি।"

(অথর্ববেদ—বৈদ্যককল্প—১৩।৩।২৭)

মহীধর ভাষ্য করেছেন—

ত্বং সৌপর্ণমসি=সুষ্ঠু পর্ণানি অস্য। বিশ্বং তদ্ভেষজং।
(এই 'বিশ্ব'ই আবার শুষ্ক আদার একটি নাম।)
অপাঘ্ন=ইত্যঙ্গারাণ পাচং করোতীতি। ত্রয়ো অগ্নয়ঃ সন্তি।
একঃ আমাৎ। আমং অপকং অতীত্য। আমাৎ লৌকিকঃ অগ্নিঃ।
দ্বিতীয়ঃ ক্রবাৎক্রবং মাংসং অত্তি। তৃতীয়ঃ যাগযোগ্যঃ।
তথাবিধান্ ত্রীন্ অঙ্গারাণ। উপদধামি ত্বাং অঙ্গারে স্থাপয়ামি।
ত্বং আমিদং অগ্নিং জহি।

এটির অনুবাদঃ—তুমি সুপর্ণ। তোমার পত্রগুলি সুষ্ঠু। তুমি বিশ্ব। ভেষজ। তুমি তিনটি অগ্নিকে পক্ক কর। তুমি মাংস ভক্ষণ কর। তোমাকে অঙ্গারে স্থাপন করি।

বৈদিক সূক্তটির গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জনা বিচিত্র; অন্যান্য গ্রন্থে অগ্নির বিভিন্ন সংখ্যা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এক্ষেত্রে বেদ বলেছেন তিনটি অগ্নির কথা, অগ্নির এই তিনটি সংখ্যাকে সামনে রেখে সংহিতার যুগে সংহিতাকারগণ তার স্বরূপ উন্মোচন ক'রে বলেছেন—কায়াগ্নি, অন্তরগ্নি, বহিরগ্নি। কায়াগ্নির অবস্থান তিনটি ক্ষেত্রে—ব্রহ্ম-রন্ধ্রে, মুখগহ্বরে ও গুহ্যদেশে; অন্তরগ্নির তিনটি স্থান—আমাশয়, পচ্যমানাশয় বা অগ্ন্যাশয় ও গ্রহণীনাড়ী; আর বহিরগ্নির তিনটি স্থান— ভেষজ, মহানস বা রন্ধনশালা ও যজ্ঞভূমি। পরবর্তী যুগে বেদোক্ত এই তিনটি অগ্নির অস্তিত্ব নয়টির দ্বারা বর্ণনা করেছেন। সেই বহিরগ্নির অন্তর্গত যে ভেষজাগ্নি, তাদের মধ্যে আর্দ্রকই হলো অপর একটি। আরও একটা ইঙ্গিত—"অঙ্গারে তোমাকে স্থাপন করি"—এই কথাটির অন্তর্নিহিত তথ্য হলো—আমাশয়, পক্কাশয় ও গ্রহণী নাড়ীর অগ্নি মন্দীভূত হলে যে সমুদয় রোগের উদ্ভব হয়—এই ভেষজাগ্নি আর্দ্রকই সেই নিভন্ত অগ্নিকে উদ্দীপিত করে। আর একটি কথা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়—সেই বৈদিক যুগে আর্দ্রককে মাংস-ভক্ষক বলা হয়েছে, অর্থাৎ আদার রসে মাংস নিজে জীর্ণ হয়, এবং এর দ্বারা সেই খাদ্যও সুপাচ্য হয়ে যায়। সেটাও সমীক্ষার বিষয় হয়েছিল সেকালে।

পরিচিতিঃ— এটি কন্দজাতীয় উদ্ভিদ—ভারতের সর্বত্র হরিদ্রার (Curcuma domestica) মত চাষ হয়, তবে কম-বেশী। গাছ ২।৩ ফুট উঁচু হতে দেখা যায়; সুবিন্যস্ত পত্র ১/১২ ইঞ্চি চওড়া, ১২।১৩ ইঞ্চি লম্বা। এর পাতাগুলি সুন্দর ভাবে সাজানো দেখেই বৈদিক যুগে তার নাম সৌপর্ণ; এতে একটি সুমিষ্ট-গন্ধেরও অস্তিত্ব থাকে। গাছটির বোটানিক্যাল নাম Zingiber officinale Rosc. ফ্যামিলি Zingiberaceae. এই গাছের মূলই (কন্দ) গ্রহণ করা হয়; আবার তাকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুকিয়ে নেওয়া হয়, তখন তার নাম হয় শুঠ বা শুণ্ঠী। আয়ুর্বেদিক গ্রন্থে ঔষধার্থে শুঁঠের ব্যবহারই বেশী, তাই প্রায় সর্বত্র শুঁঠের নামের উল্লেখ দেখা যায়; এ ভিন্ন তার আরও নাম আছে—বিশ্ব, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র, নাগর প্রভৃতি। তার আর্দ্রক নামকরণে তাৎপর্য হ'ল—জন্মক্ষেত্র স্যাঁতস্যাঁতে ভূমিতে (আর্দ্র ভূমিতে)। এই হিসেবে তার নাম আর্দ্রক। তবে সে নিজে তেজোগুণে ভরপুর—সোমগুণে নয়। এখানে দ্রব্য-সংগঠনে পঞ্চমহাভূতের মধ্যে তেজ বা অগ্নিগুণেরই আধিক্য।

রোগ-প্রতিকারে আদা ও শুঁঠ

(১) **অক্ষুধায়ঃ**—মধ্যাহ্ন-আহারের অব্যবহিত পূর্বে সৈন্ধব লবণ দিয়ে একটু আদা চিবিয়ে খেলে ক্ষুধা বাড়ে; মুখের বিরসতা, জিভের ও গলার কফের জট এবং জড়তা দুইই নষ্ট হয়। অধিকন্তু এটি হৃদ্‌গ্রন্থির বলকারক।

(২) **নূতন সর্দি ও জ্বর ভাবেঃ**—আদার রসে একটু মধু মিশিয়ে খেলে এটার যে উপকার হয়, সেটা তো সকলেরই জানা।

(৩) **শীতপিত্তেঃ**—শরীরে চাকা চাকা হয়ে ফুলে ওঠার চিহ্ন লক্ষিত হয়, যাকে চলতি কথায় আমবাত বলে—সেক্ষেত্রে পুরাণো গুড়ের সঙ্গে অল্প আদার রস মিশিয়ে খাওয়ালে উপশম হয়। তবে দাস্ত পরিষ্কার না থাকলে এটা যেতে চায় না।

(৪) **বসন্তেঃ**—আদার রস ১ চা-চামচ ও তুলসী পাতার রস ১ চা-চামচ এক-

সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিয়ে থাকেন। যাঁরা বসন্ত চিকিৎসা করেন তাঁরা বলেন—এর দ্বারা বসন্তের গুটিগুলি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে।

(৫) **অরুচিতে:**—সিকি কাপ জলে ২ চা-চামচ আন্দাজ আদার রস ও সামান্য লবণ মিশিয়ে ১০।১৫ মিনিট মুখে পুরে রাখতে হয়, তারপর ফেলে দিতে হয়; এতে খাওয়ার রুচি ফিরে আসে। আর লবণ না দিয়ে ঐ জল মুখে রাখলে সান্নিপাতিক দোষ-জনিত দাঁতের মাড়ি ফোলা আরাম হয়।

(৬) **নেফ্রাইটিসে (বৃক্কশোথে):**—রোগীর আহার্য দ্রব্যের সঙ্গে একটু আদার রস বা শুঁঠের গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে দিলে চমৎকার কাজ পাওয়া যায়, তবে মাত্রা ঠিক করতে হয় বয়সানুসারে, পূর্ণ মাত্রা ১ গ্রাম।

(৭) **পুরাণো আমাশায়:**—পুরাণো 'আমাশা' যাঁদের আছে, তাঁদের উচিত—আন্দাজ ১ গ্রাম মাত্রায় (সহ্যমত) শুঁঠের গুঁড়ো গরম জলের সঙ্গে খাওয়া, এর দ্বারা আম পরিপাক হয়।

(৮) **অতিসারে:**—খুব পাৎলা দাস্ত হচ্ছে, থামানো যাচ্ছে না, তখন নাভির চারিদিকে একটু শক্ত ক'রে আমলকী বেটে আল্ দিয়ে তার মাঝে আদার রসে ভেজানো ন্যাক্ড়া দেওয়া, আর একটু একটু ক'রে আদার রস ওতে ঢেলে দিতে হয় এবং খেতেও দেওয়া হয়। এর দ্বারা ওটা থেমে যায়—এ মুষ্টিযোগ আজকালের নয়, ৮।৯ শত বৎসর পূর্বেকার (চক্রদত্ত সংগ্রহ)।

(৯) **হিক্কায়:**—ছাগলের দুধে অল্প আদার রস মিশিয়ে খেলে ওটা থেমে যায়।

আজ হয়তো অনেকেই মনে করবেন—এ তো সেই পুরোণো কাসুন্দি। হ্যাঁ, এর জৌলুস নেই সত্যি, কিন্তু বিজ্ঞান আছে—তাই তো কাসুন্দি ঘাঁটা।

(১০) **কেটে গেলে:**— কোন জায়গায় কেটে রক্ত প'ড়ছে—ওখানে একটু শুঁঠের গুঁড়ো টিপে দিলে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাড়াতাড়ি জুড়ে যাবে।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Terpenoids viz., camphene, betaphenandrene, cineol, citral, borneol gingerol, shogaol. (b) Salt viz., potassium oxalate. (c) Traces of essential oil.

অলাবু

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে যখন আমাদের বলা হয়—এখন এটা খেতে নেই তখন সেটা খেতে নেই, তখনই এ প্রশ্ন মনে জাগে—কেন? এই নিষেধের মূলে কি কোন বলিষ্ঠ যুক্তি আছে? না নিছক উদ্দেশ্যমূলক সংস্কার?
সাধু ভাষায় দুটি প্রবাদ আছে—

'নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ'।

যাকে বলে জনপ্রবাদের মূলে কিছু না কিছু থাক্‌বেই; আবার

'স্মার্ত্তা হি বেদ গন্তারঃ'।

স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশীলক যাঁরা, তাঁরা বেদকেই অনুশীলন ক'রেছেন।

আদ্যি নাড়ী

অপরিচিতের ক্ষেত্রে চিরাচরিত রীতি হ'লো—প্রথমতঃ প্রশ্ন, মহাশয়ের নিবাস? আপনার নাম কি? আপনি কোন্ কুলের? সেই রকম কোন দ্রব্যও আমাদের দেখ্‌তে হয় এটা ঘোরো না বেরো, তাই খুঁজতে হয় বেদ; সেখানে দেখা গেল—এই অলাবু সম্পর্কে বলা হয়েছে—

সমুদ্রং তে হৃদয়ং অপস্বন্তঃ দ্রাপ তুম্বঃ বিশত্বোষধিরুতাপঃ।
সুমিত্রিয়া ন আপঃ দুরমিত্রয়া অগ্নিঃ যো
অস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ॥

এই সূক্তটির মহীধরের ভাষ্য হ'লো—

তুম্বস্য দ্রাপত্বং দ্বেষ্যং চ বিদধাতি। তুম্বতি=রুচিং অর্দতি ইতি, অলাবুরিতি বা, ন লম্বতে যঃ, ন লোপঃ। তস্য দ্রাপত্বং=দারিদ্রং অগ্নে দ্বেষ্য ত্বং চ। ধরামুদং =রত্নাদিকং গৃহীত্বা যঃ রাজতে স সমুদ্রঃ। স এব তে হৃদয়ং অপ্সু অন্তঃ বিশতুঃ আপঃ ওষধীঃ ত্বাং বিশতু, দুর্মিত্রয়া বয়ং দ্বেষ্মঃ ত্বাং চ অগ্নিঃ দ্বেষ্টি। অগ্নিঃ=সৌরতেজঃ অস্য নাড়িকায়াং প্রবিশ্য যথোক্ত পাকাভিঃ প্রভূতেন বাতেন নাড়িকানাং চ জায়তে, ততো দ্বেষ্টি অগ্নিরিতি।

ভাষ্যটির অনুবাদে বুঝা যায়—তুম্ব বা অলাবুর প্রতি দ্বেষ্যত্ব বিধায়ক সূক্ত এটি—তুম্বের অর্থ রুচিকে যে পীড়িত করে। ধরার রত্ন ও মুদ্রা নিয়ে যে গম্ভীর হ'য়ে থাকে তার নাম সমুদ্র। সেই সমুদ্রেই তুম্বের হৃদয় নিহিত থাকে। জল ও ওষধি তোমাতে প্রবেশ করুক। তুমি সুমিত্র ও দুর্মিত্র হও ব'লেই আমরা তোমাকে দ্বেষ করি। সৌর অগ্নির তেজ তোমার নাড়িকায় প্রবেশ করে। প্রভূত বায়ুর সহায়তায় জাঠর অগ্নিকে তুমি দ্বেষ কর। অগ্নিও তোমাকে দ্বেষ করে।

সূত্রে কি পাওয়া গেল—

অলাবু গোল হবে (যার প্রচলিত নাম লাউ), এটি আকারে লম্বাও হয়, তার নাম তুম্ব কিন্তু বৈদিক সূক্তের শাব্দিক অর্থে এটি গোল। দোষগুণের ক্ষেত্রে এটি পাচক অগ্নির শত্রুতা করে। আর তুম্বের অর্থই হ'লো রুচিকে পীড়িত করা। এই রুচি শব্দের তিনটি অর্থ (১) কান্তি (২) স্পৃহা (৩) জাঠর অগ্নি, আর গুণ বিচারে দেখা যাচ্ছে—সমুদ্রের মত তার হৃদয়ে ধনরত্ন ধারণ ক'রে রেখেছে। একাধারে দুটি রূপ তার মধ্যে থাকাতে তাকে বলা হ'য়েছে—তুমি সুমিত্রও যেমনি, আবার দুর্মিত্রও তেমনি। এখানে তার গুণ যে কালাপেক্ষী তারই ইঙ্গিত। তাই কি স্মার্তের বিধান যে—ভাদ্র মাসে লাউ খেতে নেই?

কূট বিচারে

লাউএর ভৈষজ্য বা আহার্য স্বভাব রুচির মৌলিক অর্থকেও (জাঠর অগ্নি বিনাশ) গ্রহণ করে আবার পারম্পর্য অর্থও প্রকাশ করে। সামবেদ সংহিতার ২।১০।৭ ও ১৮৪ সূক্তে বলা হ'য়েছে—

'বাত আবাতু ভেষজং শম্ভুময়ো ভুনো হৃদে প্রণ আয়ূষি=তারিষৎ'

অর্থাৎ ভেষজের সঙ্গে জীবের আয়ুর সম্বন্ধ জানা থাকলে আয়ুর্বেদ জানা যায়। ভেষজ আয়ু উভয়েই অবস্থান করে জাঠরাগ্নি, অন্নাগ্নি ও ইন্দ্রিয়াগ্নিতে; কেউ কাউকে ছেড়ে থাকে না। জঠরাগ্নির ক্রিয়া সম্পন্ন হ'লেই তবে আয়ুর ভিত্তি গঠিত হয়। সেই অগ্নিই সর্বক্ষেত্রে সর্বশরীর ব্যাপীই বিদ্যমান, যাকে বর্তমান যুগে বলা হয় মেটাবলিজম্ (Metabolism); অতএব জাঠরাগ্নিকে রক্ষা করাই প্রথম কাজ। এর থেকে পরিষ্কার হ'য়ে যায়—যে সব দ্রব্য জাঠর অগ্নিকে মন্দীভূত করে তা থেকে দূরে থাকা। এই অগ্নির পারিভাষিক রূপ হ'লো পিত্ত, এটির সমতায় পোষণ, আধিক্যে বা ন্যূনতায় রোগ সৃষ্টি। তারই সামগ্রিক পরিণতিতে আসে Metabolic disorder.

আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায়—বাহ্যতঃ যেমন ঋতু ও কালগত অবস্থায় সৌরতেজের হ্রাসবৃদ্ধি হয়; দেহগত অবস্থাতেও তেমনি পিত্তের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। স্বচ্ছ জল যেমন তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, কর্দমাক্ত জল তেমন তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় না; সেই রকম যে দ্রব্য জাঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করে সেই ভুক্তদ্রব্যের সৃষ্টরসে কফপ্রাধান্য থাকায় ঘনত্ব বেড়ে যায়, এই রসকে দেহাভ্যন্তরস্থ অগ্নি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে দিতে পারে না, তার উপর পুনরায় আহার্য গ্রহণ ক'রলেই সেইখানেই জীবাণু সৃষ্টিই স্বাভাবিক ধর্ম; তাই জাঠরাগ্নিকে সর্বদা উদ্দীপ্ত রাখার জন্য আহারের এতটা বাছ-বিচার। এই লাউফল আর জাঠরাগ্নি ও ঋতুপ্রভাবে সূর্যকিরণের হ্রাসবৃদ্ধির মধ্যেই বেদের সূক্ত ও জনশ্রুতির অর্থ নিহিত আছে অর্থাৎ ভাদ্র মাসে প্রায়ই বর্ষা, জ'লো হাওয়া, সব ক্ষেত্রেই সৌরতেজের শোষণ ক্ষমতা সীমিত; তার উপর লাউএর জলীয়াংশ গাঢ় এবং প্রকৃতিতে গুরু, এটি আহার্য হিসেবে গ্রহণ ক'রলে মানুষের অগ্নিমান্দ্য আসাটাই স্বাভাবিক ভেবেই শাস্ত্রকারের নিষেধ বাণী—এই মাসে লাউ না খাওয়া। এই জন্যই বেদ ব'লেছেন—তুমি তুম্ব জাঠরাগ্নির পীড়ক ও রুচির বিঘাতক, সেই অর্থেই সে শত্রু; আবার তোমার অন্তরে সমুদ্র, এই সমুদ্র শব্দ নামের বিশ্লেষণাত্মক বৈদিক অর্থ হ'লো পৃথিবীর ধন-রত্ন টেনে নিয়ে তার গর্ভে রাখে ব'লেই তার এই নামকরণ।

সেই রকম মাস দোষ (ভাদ্র মাস) কেটে যাওয়ার পর প্রকৃতির অনুকূল পরিবেশে সে হয় তখন গুণের আকর, তাই তখন সে হয় মিত্র। একেই ভিত্তি ক'রে চরক সংহিতার বক্তব্যকে অনুসরণ ক'রে চক্রদত্ত ব'লেছেন—

'অলাবু নাড়িকা গুর্ব্বী মধুরা বর্চঃ ভেদিনী'

অর্থাৎ লাউএর ডাঁটা গুরু গুণান্বিত ও মধুর রস সম্পন্ন, এই জন্যেই এক কথায় বলা যায় এটিতে পৃথ্বিগুণ বেশী আছে, তাই সে হয় মলনিঃসারক।

পরিচিতি

এই গাছটি বাংলাদেশ কেন, ভারতের প্রায় সর্বত্রই চাষ হয়, আমাদের নিত্য আহার্যের তরকারী হিসেবে ব্যবহারের জন্য। এটির বোটানিক্যাল্ নাম Lagenaria vulgaris Seringe. ফ্যামিলি Cucurbitaceae. এই অলাবুর চল্‌তি নাম লাউ, আবার কোন কোন প্রদেশে 'কদ্দু'ও বলে। এই ফল আকৃতিতে ভিন্ন হ'লেও এর প্রজাতি (Species) ও গণে (Genus) কোন পার্থক্য নেই, আবার ফল স্বাদে তিক্তও হয়, তাকে বলে 'কটুতুম্বী' অথবা তিক্ত অলাবু। আমাদের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বনৌষধির গ্রন্থ 'রাজনিঘণ্টুতে' গোরক্ষতুম্বী ও ক্ষীরতুম্বী, এই দুই প্রকার মিষ্ট অলাবুর (লাউএর) উল্লেখ দেখা যায়। ঔষধার্থে ব্যবহার হয় মূল, পত্র, নাল, বীজ ও ফল। বৈদ্যক সম্প্রদায় লাউএর প্রতিটি অংশকে পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতিতে কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন সেইটাই বলি—

(১) **পিত্তশ্লেষ্মাজনিত জ্বরে—** তার সঙ্গে গায়ে জ্বালা, বমনেচ্ছা বা বমন হ'তে থাক্‌লে লাউটা ঝ'লসে নিয়ে নিংড়ে রস ক'রে (৩।৪ চামচ) তার সঙ্গে আধ চামচ আন্দাজ মধু মিশিয়ে খাওয়ালে গায়ের জ্বালা ও বমন বা বমনেচ্ছা চলে যাবে।

(২) **চোরা অম্বল (অম্লরোগ)—** কিন্তু ঢেকুর তোলাটাই তাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রছে, (রোগী মনে করে কেবল মাত্র তোলাটাই তার রোগ) তার সঙ্গে আবার কোষ্ঠকাঠিন্য, এ ক্ষেত্রে ঐ ঝল্‌সা পোড়া লাউএর রস ২।৩ চামচ একটু মধু মিশিয়ে খেলে এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে রেহাই হয়।

(৩) **দাহে—** কি শীত কি গ্রীষ্ম (সব ঋতুতেই) গায়ে হাত দিলেই গরম বোধ হয়, এ ক্ষেত্রে ঐভাবে তৈরী ক'রে ২।৩ চামচ রস কিছুদিন খেলে ওটা স্বাভাবিক হবে।

(৪) **অর্শোবিকারে—** দাস্ত পরিষ্কার না হওয়ার মত, চট্‌চটে মল নিঃসারণ, তার সঙ্গে ২।৪ ফোঁটা রক্ত, তারপর অসহ্য টন্‌টনানি, এর উপর শৌচক্রিয়ার পরেও কিছুটা পিচ্ছিলতা থেকে যায়—এ ক্ষেত্রে ঐ ঝল্‌সাপোড়া লাউএর রস ও চিনি অমোঘ ঔষধ।

(৫) **যাযাবর পিপাসা—** এ রোগ আসে শ্রাবণে, যায় কার্তিকের শেষে, এ ক্ষেত্রে লাউ খাওয়ার বিধিনিষেধ না মেনে ঐ ঝল্‌সা পোড়া লাউএর রসে একটু চিনি মিশিয়ে ১ গ্লাস সরবৎ ক'রে কিছুদিন খেয়ে দেখুন, এ পিপাসা আর থাকবে না।

(৬) **পিত্তশ্লেষ্মা বিকারে—** হলুদ না মেখেও গেঞ্জিতে বগলের নিচের অংশটাই হলুদের ছোপ্ পড়ে, গায়ের দুর্গন্ধের জন্য নিজেরই অস্বস্তি বোধ হয়। সে ক্ষেত্রে এই ঝল্‌সা পোড়া লাউএর রস একটু মধু মিশিয়ে খাওয়া আর শুধু ঐ রসটা স্নানের কিছুক্ষণ পূর্বে গায়ে লাগানো। এর দ্বারাই ঐ দোষটা নষ্ট হয়।

(৭) **ন্যাবার লক্ষণ সবে দেখা দিয়েছে—** এ ক্ষেত্রে লাউ আর তার পাতা ঝল্‌সানো রস ৫।৬ দিন খাওয়ালেই ওটা রুখে দেবে।

(৮) **বিদগ্ধাজীর্ণে—** এ রোগের লক্ষণ সকালের দিকে মুখ তেতো (তিক্ত) হওয়া, দাঁত অপরিষ্কার থাকা অর্থাৎ দাঁতে ছোপধরা—এই ক্ষেত্রেও ঐ লাউ পোড়ার সরবৎ খাওয়া।

(৯) **গ্রন্থিক মলে—** বৃহৎ অন্ত্রে বুলেটের মত শক্ত মল বেরুতে চায় না, যেন প্রাণান্ত হয় আর কি, এ ক্ষেত্রে লাউএর ডাঁটা ছ্যাঁচা রস ৪।৫ চামচ একটু জল মিশিয়ে কয়েকদিন খেতে হয়, এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা দূর হয়।

বাহ্যপ্রয়োগ

(১০) **পায়োরিয়ায়—** ঝল্‌সা-পোড়া লাউএর রস মুখে নিয়ে খানিকক্ষণ (১০-১৫ মিনিট) ব'সে থাকতে হয় (যাকে আয়ুর্বেদের পরিভাষায় বলা হয় কবল ধারণ করা)। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলা, এইভাবে কয়েকদিন করলে ওটা সেরে যাবে।

(১১) **দূষিত ক্ষতে—** ঐ ধরণের রস দিয়ে ধুলে ক্ষতের দোষ-অংশটা নষ্ট হয়।

(১২) **মেচেতায়—** মুখেতে প্রায় বদ্বীপ সৃষ্টি হয়ে মুখের জন্য লোকসমাজে বেরুতে কুণ্ঠা বোধ হয়; এই ক্ষেত্রে এক টুকরো লাউ ঝ'লসে নিয়ে ঐ জায়গায় ঘ'ষতে হয় রোজ একবার ক'রে। এর দ্বারা কয়েকদিনের মধ্যে ঐ মেচেতার দাগটা আর থাকে না। এ ভিন্ন ছোট ছোট কাল দাগ থাকলেও সেটাও উঠে যায়।

(১৩) **মুখ লাবণ্যে—** সব বয়সেই কার না এটাকে রাখতে ইচ্ছে করে! এর জন্যে এক টুকরো লাউকে নিয়ে রোজ মুখে ঘষতে হয়—ঐ সাদা থল্‌থলে দিকটা। এর দ্বারা মুখের লাবণ্য ফিরে আসবে; তবে হাঁ—পচা ছানায় ভাল চিনি দিলেও তো ভাল সন্দেশ তৈরী হবে না।

(১৪) **সিধ্ম রোগে (ছুলিতে)—** এ রোগ নির্মূল হ'য়ে সারে না সত্যি, তবে অদৃশ্য হয়—এই জন্যেই ঝল্‌সা পোড়া লাউ এক টুকরো নিয়ে সেইখানটায় ঘষে দিন; কয়েকদিন ঘষলেই ওটা মোটামুটি তখনকার মত অদৃশ্য হবে। এটাতে অনেকদিন ভাল থাকতেও দেখা যায়।

(১৫) **ছানিতে—** চোখে ছানিপড়া সবে সুরু হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে লাউফুলের সাদা পাপ্‌ড়ি অংশটা নিয়ে র'গড়ে এক ফোঁটা করে রস যে চোখে ছানিপড়া আরম্ভ হ'য়েছে, সেই চোখে ১ দিন অন্তর দিলে ছানিপড়া বন্ধ হ'তে দেখেছি। তবে একটু বেশীদিন প্রয়োগ করতে হয়। তবে লাউফুলটাকে অল্প গরম জলে ধুয়ে নেওয়াই উচিত আর প্রথম প্রথম ২ দিন অন্তর একদিন ব্যবহার করাটাই ভাল, তারপর ১ দিন অন্তর।

(১৬) **শ্বেতী রোগে—** সবে সুরু, ছোট ছোট সাদা দাগ দেখা যাচ্ছে, দেরী না করে রোজ একবার ক'রে ঐ জায়গায় লাউফুল র'গড়ে দিতে হয়। এর দ্বারা রেহাই পাওয়া যায়।

আরও কত অজানা গুণাবলী যে আমাদের অগোচরে আছে তার ইয়ত্তা নেই।

এখানে কেবলমাত্র মিষ্ট অলাবুর সম্পর্কে কয়েকটি রোগে তার উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লো। এ ভিন্ন কটুতুম্বী অর্থাৎ তিক্ত অলাবুর (যার চলতি নাম তিত্ লাউ) গুণাবলী আলোচনা করা হ'লো না—তবে আয়ুর্বেদের প্রাচীনগ্রন্থে এই তিক্ত অলাবুর রোগ নিরাময়ে যথেষ্ট উপযোগিতা আছে সেটা বর্ণনা করা হ'য়েছে।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Saponin. (b) Fatty oil viz., mixture of different fatty alcohols.

কুষ্মাণ্ড

কাল ও অকালের কুষ্মাণ্ড

হতাশা, আক্ষেপ অথবা ঘৃণার পাত্রই যে অকাল কুষ্মাণ্ডের বিশেষণ এ সংস্কার সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পাওয়া; তাই শিরোনামের শেষোক্ত বিশেষণটিকে শ্লেষ ক'রেই বলে ফেলি, এবং জীবনে অনেককেই হয়তো শুনতে হয়েছে গুরুজনদের কাছে। এ নিয়ে আলোচনাটা তেমনি কিনা?

এ প্রশ্ন মনে আসা খুবই স্বাভাবিক—এই কথাটাই বা কেন বলা হ'য়েছে, আর উপমাটা একটি ফলকে উপলক্ষ্য ক'রেই বা কেন সৃষ্টি করা হ'য়েছে?

এ প্রসঙ্গের আগেই বলি কল্প রূপায়িত শিবদুর্গার বিবাহের রহস্য যে আর্য ও প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির মিলনের পর এক কল্পকাহিনী এবং যার থেকে সেটি পৌরাণিক পূজাদির প্রবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হ'লো, তেমনি এই বৈদিক ভেষজটিও প্রাক্-আর্যদের পূজার উপকরণে স্থান পেয়েও পরে দেখা গেল ওটাকে এই বাংলায় বেদাচার মণ্ডিত তান্ত্রিকদের পশুবলির অনুকল্পরূপে হাঁড়িকাঠে। তবে সেই বধযোগ্য ফলটি হওয়া চাই পক্ক ও অক্ষত।

এই নির্ধারণও যেন সেই সমাজ কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখেই। অতিবৃদ্ধ প্রপিতা-মহাদির অনুধ্যান—

কুষ্মাণ্ডী পাবমানা উদ্ধর্বমারোহ শতব্রধা স্তোমা শারদীবীর্যস্থিষি।
ওজোহসি হেমন্ত শিশিরাবৃতু বর্চো দ্রবিণং প্রত্যস্তং নমুচেঃ শিরঃ॥

মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

ত্বং পাবমানা কুষ্মান্ডী, কুষ্মঃ ঈষৎ উষ্মা, অণ্ডেষু=বীজেষু অপি পাবমানা=পাব্যতে অনয়া পর্ব্বফলা। ত্বং ঊর্দ্ধ্বং আরোহ। শতব্রধা বিস্তৃতিং গচ্ছ। স্তোমা বহুফলা ভব। শারদীতি বীর্য্যান্বিষি শরদী বীর্য্যবত্যসি। হেম শিশিরয়োঃ ওজঃ ধারয়সি। তে শিরঃ অসুরস্য মস্তকং প্রস্ত্যস্তং ক্ষেপণে প্রতিগৃহ্য ক্ষিপ্তমিতি।

উপরিউক্ত ভাষ্যটির অর্থ হ'ল—কুষ্মাণ্ডী, তুমি পর্বফলা। তোমার বীজে ঈষৎ তাপ আছে। তাই তুমি কুষ্মাণ্ডী। তুমি উর্ধ্বে আরোহণ কর, শতধায় বিস্তৃত হও। তুমি বহু ফল দান কর। শরৎ ঋতুতে বৃদ্ধি পাও। হেমন্ত ও শিশিরে তুমি ওজঃ শক্তিকে ধারণ কর। তোমার শিরোভাগের ফলগুলি অসুরের মস্তকে ক্ষেপণ করা হয়।

এই বৈদিক সূক্তোক্ত তিনটি তথ্য বিশেষ অনুধাবন করার যোগ্যঃ—

(১) শরৎ ঋতুতে তোমার বীর্য বৃদ্ধি পায়।

(২) হেমন্ত ও শিশিরে তুমি ওজঃ শক্তিকে ধারণ কর।
(৩) তোমার শিরোভাগের ফলগুলি অসুরের মস্তকে ক্ষেপণ করা হয়।

রোগে ও ভেষজে ঋতু প্রভাব

সকলেই জানেন—হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই তিনটি ঋতুই আয়ুর্বেদীয় পরিভাষায় আদানকাল, এই তিনটি ঋতুর মাঝখানে হলো শীত ঋতু, এটির আসা-যাওয়ার সন্ধিকালও যেমন আছে, তেমনি বিসর্গকাল অর্থাৎ বর্ষা ঋতুর আসা-যাওয়ারও ঋতুসন্ধি আছে, এই সন্ধিকালের প্রভাবে মানুষ রোগাক্রান্ত হয় বেশী—বিশেষ ক'রে শিশু, গর্ভিণী ও বৃদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে এই ঋতুতে সৃষ্ট ভেষজ বা আহার্যের দ্বারা রোগ-নিরাময় করা সহজ হয়—এটা অবশ্য আয়ুর্বেদের নিজস্ব চিন্তাধারা। এক্ষেত্রে সংহিতা-যুগের মনীষীবৃন্দ বিচার ক'রে দেখেছেন যে আদান ও বিসর্গ—এই দুই কালকে আশ্রয় ক'রে যেসব ভেষজ জন্মগ্রহণ করে, তারা এই ঋতু সমূহের সন্ধিকালজ ব্যাধিকে উপশম ক'রতে পারে। এই আহার্য ভেষজটিও সেই পর্যায়ে প'ড়ে।

কাল প্রভাবের দোষ-গুণ

আমাদের মনীষিগণ দুটি বিশেষ সূত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে দ্রব্যবিচার ক'রেছেন। একটি ঋতুজ আর একটি কালজ। আদানকালের কোন ফল বিসর্গকালে পাকলে—সে ফল কোন না কোন দোষের (বায়ু, পিত্ত, কফের) সাম্য সঞ্চার ক'রে রোগ সৃষ্টি করেই।

এই নিবন্ধোক্ত কুষ্মাণ্ডের জন্মলগ্ন ও বৃদ্ধি বিসর্গকালে, পাকেও বিসর্গকালে; সেই জন্যেই সে বিশেষ গুণের অধিকারী হ'য়ে থাকে। এই জন্য তাকে নিয়ে কাল প্রসঙ্গে অকাল কথাটাও এসে পড়ে ওরই বিপরীত কালের। এখন অকাল কুষ্মাণ্ড কথাটা কেন হ'ল? এ কথাটায় ইঙ্গিত করে—কুষ্মাণ্ড আকৃতি হ'য়েও যেটি অকালে হয়। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হ'লো—এই কুষ্মাণ্ড আকৃতির ফলটি ঋতুর মৌল কালে না জ'ন্মে সব ঋতুতেই জন্ম নেয়, অর্থাৎ শরৎ ঋতুর প্রভাবেও সৃষ্টি হয় এবং শরতের পূর্বে ও অন্তেও জন্ম নেয়। শরতের বীর্যবত্তা ও হেমন্তে ওজস্বিতা না পেয়েও সে বেড়ে ওঠে; আর সেই জন্য ভৈষজ্যগুণও থাকে না তার। অতএব সে অপদার্থেরই তুল্য। তাই মানুষের ক্ষেত্রে পণ্ডিতগণ এই উপমাটি উপস্থিত ক'রেছেন, যে ব্যক্তি অন্তর্বহির্গুণ থেকে বঞ্চিত থেকেও মানুষের আকৃতি লাভ ক'রেছে।

কবে—কোথায়—কখন

আমরা দেখি আদানকালের শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ বর্ষা আসার পূর্ব মুহূর্তে (যাকে প্রাবৃট্ কাল বলা হয়) এর বীজ মাটিতে বসানো হয়, বর্ষারম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২।৩ মাসের মধ্যেই এর লতাগাছটিতে ফল ধরে; গ্রামাঞ্চলে তার আশ্রয়স্থল ঘরের চালায় বা বাঁশের মাচায়; তাই তার চলতি নাম চালকুমড়ো বা ছাঁচি কুমড়ো। আয়ুর্বেদের পরিভাষানুসারে এটাকে বলা হয় ফলশাক। এই লতাটির পর্বেই ফল হয়, তাই তার বৈদিক নাম পর্বফলা। বঙ্গের চাষী অঞ্চলে একে বলে ভতুয়া বা পেঠা। এই লতাগাছটির বোটানিক্যাল নাম Benincasa hispida (Thunb) Cogn. ফ্যামিলী Cucurbitaceae. ঔষধার্থে ব্যবহার করা হয়—ফল, লতাগাছ ও মূল।

বেদোত্তর কালে

এই কুষ্মাণ্ডকে চরকে দিয়েছেন আহার্যে গুরুত্ব, আর সুশ্রুতে দিয়েছেন ভৈষজ্যে

গুরুত্ব (অর্থাৎ রসপ্রাধান্য ও গুণপ্রাধান্যের দৃষ্টিতে)। আয়ুরক্ষায় উভয়ের দৃষ্টিকোণ কিন্তু একই। আহার আর ওষুধ দু'টিরই বিচার করতে হয়, তবেই হয় আয়ুরক্ষা; এই কুষ্মাণ্ড সম্পর্কে সুশ্রুতে আছে—কচি কুমড়ো পিত্ত বিকাররোধক, বাতি কুমড়ো কফ-নাশক আর পাকলে সে হয় লঘু, অগ্নিবল বৃদ্ধিকর, মল-মূত্র রোগ সংক্রান্ত রোগ-প্রশমক, বক্ষোগত রোগেও তার বিশেষ প্রভাব। আর একটি বিশেষ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, সে চিত্তবিকার দূর করে।

বৈদ্যের সমীক্ষায়—

(১) **রক্তপিত্তে—**রক্ত উঠলেই টি. বি হয়েছে যেমন ধ'রে নেওয়া উচিত নয়, সেই রকম রক্ত পড়লেই অর্শ হয়েছে—একথা ভাবাও সমীচীন নয়; বৈদ্যকের ভাষায় এটিও রক্তপিত্ত রোগের অন্তর্গত। এরকম ক্ষেত্রে পাকা চালকুমড়োর রস ৩।৪ চা-চামচ একটু চিনি মিশিয়ে খাবেন। রক্ত ওঠা বা পড়া যেটাই হোক না কেন, বন্ধ হবে। আরও ভাল হয় একটু বাসক পাতার রস ঐ সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া।

(২) শরীরের ক্ষয়-ক্ষতিতে মাথা হাল্কাবোধ, মনে কিছু থাকে না, এক্ষেত্রে এর শুষ্ক শাঁস চূর্ণ (জল নিংড়ে শুকিয়ে নিতে হয়) ২।৩ গ্রাম একটু মধু মিশিয়ে খেতে হয়; এটাতে ঐ দোষটা চলে যায়।

(৩) **প্লুরিসিতে—**প্লুরিসি (আয়ুর্বেদ মতে এটি বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি) হয়েছে, এক্ষেত্রে এই কুমড়োর রস একটু চিনি মিশিয়ে খেতে হয়। প্রাচীনদের উক্তি দেখতে দোষ কী?

(৪) **হৃদ্‌গত রোগে—**হৃদ্‌যন্ত্রের বিবৃদ্ধি হলে বা ঝুলে গেলে কি অসুবিধে হয়—সব চিকিৎসকই জানেন। এক্ষেত্রে রোগীকে পাকা চালকুমড়োর হালুয়া খাওয়ানোর অভ্যাস করাবেন; তবে হালুয়াতে গোদুগ্ধ থেকে ছাগদুগ্ধ দিলে ভাল হয়।

(৫) **কোষ্ঠকাঠিন্যে—**বালক বা বৃদ্ধ এই দু'জনের একই জ্বালা—অর্থাৎ সব রকম দাস্ত পরিষ্কারের ওষুধ খাইয়েও ফল হয় না, এ সময় চিকিৎসক বিভ্রান্ত হন। এক্ষেত্রে বৃহদন্ত্রের শুষ্কতা সৃষ্টি আয়ুর্বেদের নিদান। একে স্বাভাবিক করতে গেলে চালকুমড়োর রস ৪।৫ চা-চামচ গরম দুধের সঙ্গে খাওয়াতে হয়। এটাতে প্রস্রাব ও দাস্ত দুটোই পরিষ্কার হয়।

(৬) **যক্ষ্মা সন্দেহে—**প্রাথমিক লক্ষণ সব মিলে যাচ্ছে—তখন প্রারম্ভিক চিকিৎসা হিসাবে এই চালকুমড়োর রস ৪।৫ চা-চামচ একটু চিনি ও দুগ্ধ মিশিয়ে দু'বেলা খেতে দিয়ে তার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করুন।

(৭) **শূল ব্যথায়—**এ ব্যথা পেটের যে কোন জায়গায় হোক্, এই কুমড়োর শাঁসকে শুকিয়ে পুড়িয়ে (অন্তর্ধূমে) তার চূর্ণ (আধ গ্রাম মাত্রায়) গরম জল খেলে উপশম হবেই।

(৮) **ধী-শক্তি রক্ষায়—**দুধ আর তামাক যেমন একসঙ্গে খাওয়ার বয়স এককালে থাকাটা হাস্যকর, সেই রকম মাথার কাজ ক'রতে হয় অথচ শুক্রকে ধরে না রাখার মনো-বৃত্তি; এক্ষেত্রে তার পরিপূরক হিসেবে কুমড়োর শাঁস বাটা (জল সমেত) মধুর সঙ্গে সরবৎ ক'রে খেতে হয়; তবে সংযম ক'রে দ্বিতীয়টির সহজ বেগ রুখতে হয়।

(৯) **কামজ উন্মাদে—**সব রকম উন্মাদ এক ধারার চিকিৎসায় সারে, এ কথা আয়ুর্বেদ বলেনি। একটি সাধারণ ক্ষেত্র হিসাবে এর বীজের শাঁস বেটে মধুর সঙ্গে খেতে দিতে হয়। যেহেতু উন্মাদের ক্ষেত্র শরীরের অন্যান্য স্থানে হয় না।

(১০) **ক্রিমিতে—**এর বীজের শাঁস ২ গ্রাম আন্দাজ বেটে জলসহ খেতে হয়।

(১১) **পেট ফাঁপা এবং প্রস্রাব ভাল হচ্ছে না**—এ ক্ষেত্রে কুমড়োর রস পেটে মালিশ করলে ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে দুটোই সহজ হয়।

সর্বশেষ বৈদিক তথ্যের একটি ইঙ্গিত সম্পর্কে বক্তব্য রেখে এই নিবন্ধের ছেদ টানতে চাই।

'তোমার ফল অসুরের মস্তককে চূর্ণ করে' এই উপমাবোধক ইঙ্গিতকে উপজীব্য করে বাংলার আয়ুর্বেদিক জগতের শেষ সূর্য আচার্য গঙ্গাধর মাথার যন্ত্রণায় এই চাল-কুমড়োর রসের সরবৎ খেতে দিতেন। এ সব অনুশীলন আজ অস্তমিত।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Fatty oil. (b) Vitamin viz., vitamin-B_1.
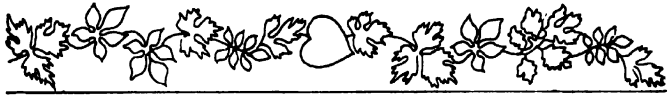
সুনিষণ্ণক

বক্তব্য প্রকাশ ক'রতে গেলে বাক্‌বিস্তার অপেক্ষা বাক্য-সংক্ষেপের দ্বারা বক্তব্যটির গাম্ভীর্য সৌন্দর্য সাধিত হয়। তদপেক্ষা সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়—যদি বহুমুখী অর্থ নিহিত করার জন্য শব্দপ্রয়োগ করা হয়; তাই এমন একটি যুগ ছিল, যে যুগে মনীষীদের ছিল শব্দভেদী রহস্যবিজ্ঞান।

যে কোন শব্দকে ভেদ অর্থাৎ ভেঙে ফেললেই তার অর্থ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে। এই ধরণের শব্দবিন্যাস আর্যসভ্যতার সংস্কৃতি সৌধের স্তম্ভ—সেটা কিন্তু আজও অম্লান। তাই শব্দভেদী এক জলজ পর্ণকে এইভাবে বলা হয়েছে—

'নিষণ্ণং দোভিদে সুখং যমকং' (ঋক্‌বেদ—১।৫৮।৩ সূক্ত)

ভাষ্যকার সায়ণ ব'লেছেন—

> 'দৌভিদে অর্থাৎ বর্ষাসু যমকং পত্রং নিষণ্ণং শাকং
> সুখং স্বপ্নং স্বাপয়তি'

অর্থাৎ বর্ষাকালের যমকপত্র নিষণ্ণ শাক সুখনিদ্রা আনয়ন করে। আর লীলাবতীর (জ্যোতিষের অঙ্ক শাস্ত্র) দেওয়া একটি উপমার শ্লোকেও ওই অর্থ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ দেখা যায়। তার ভাবার্থ হ'চ্ছে—"ঈড়া ও পিঙ্গলা" জুড়ে গিয়ে যেমন মনকে সুষুম্ণিতে পেঁ'ছে দিয়ে থাকে—সেই রকম যমকপত্র নিষণ্ণও মনকে সুষুম্ণিতে নিয়ে যায়। তাই পরবর্তীকালে শাকটির নাম দেওয়া হ'লো—সু-নিষণ্ণক।
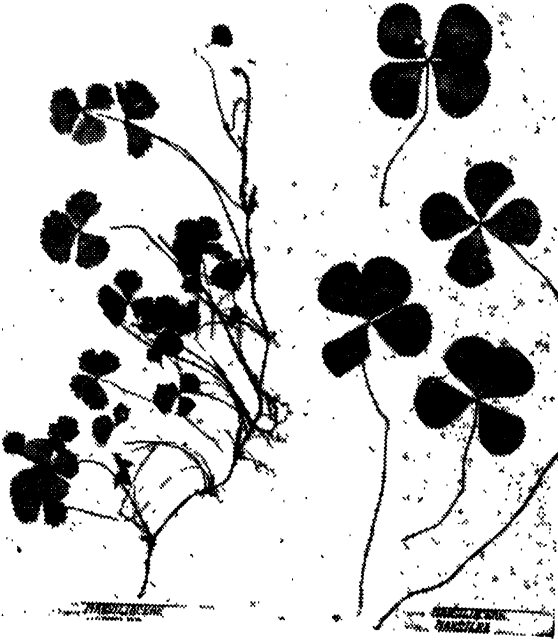
নাম-উপক্রমণিকা:— নিষণ্ণ শব্দের অর্থই হচ্ছে অবসাদক; আর অবসাদের অর্থ নিয়েই তার নামকরণ। ওখানে আর একটি শব্দ "যমক"; এ কথাটাও বোধ হয় অভ্রান্ত। দুই জোড়া কচিপাতার মূল-কোরক যেন স্থানভ্রষ্ট হ'য়েই ৪টি পাতায় রূপান্তরিত হয়, তাই তার আর এক নাম "চতুষ্পত্রী"।

পরিচিতি:— সুনিষণ্ণক ভারতের বহু প্রদেশে বিশেষতঃ দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল প্রদেশের (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি) জলাসন্ন ভূমিতে, ধানক্ষেতে, পুকুরের বকচরে জন্মে, এর প্রচলিত বাংলা নাম সুষুণীশাক, গ্রামাঞ্চলে এর ডাকনাম 'ঘুম শাক', ওড়িষা প্রদেশের সাধারণ নাম 'সুনসুনিয়া', হিন্দি-ভাষী অঞ্চলের নাম 'চৌপাতিয়া', এই নামটি কিন্তু আসলে সংস্কৃত চতুষ্পত্রী নামের বিবর্তিত শব্দ নাম।

ভূমি প্রসারণী লতা হ'লেও লতানালের পর্ব থেকে শিকড় মাটিতে প্রবেশ ক'রে বিস্তারলাভ করে, এর শিকড়ের মাঝে মাঝে গ্রন্থি আছে, ক্ষীণ পত্রবৃন্তে বিভক্ত ৪টি পত্র একত্র মিলিত। পত্রবৃন্ত নালটি ৭।৮ ইঞ্চি পর্যন্তও লম্বা হ'তে দেখা যায়। শীতকালে এর Spore বা বীজ হয়। সব প্রদেশে অনেকেই আহার্য শাক হিসেবে এর পত্র রান্না ক'রে খেয়ে থাকেন। এটির বোটানিক্যাল্ নাম Marsilea minuta Linn. ফ্যামিলি Marsileaceae.

পাশ্চাত্ত্য গবেষণা:— এই সুষুণীর ভেষজগুণ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে গবেষিত হ'য়েছে। এই ভেষজের গুণাগুণ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত হ'চ্ছে—অন্যান্য পত্রশাকের মধ্যে যে সব দোষ অত্যন্ত প্রকট হ'য়ে প্রকাশ পায়, যার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য হয়, এই সুষুণীশাকে তেমন প্রতিক্রিয়াত্মকশক্তির বিকাশ হয় না।

প্রাচ্যের দৃষ্টিতে সুষুণী:— প্রাচীন মনীষীরা ব'লেছেন—

'সুনিষণ্ণো হিমগ্রাহী মোহদোষত্রয়াপহঃ'

অর্থাৎ এটি স্নিগ্ধকর, মল সংগ্রাহক, ত্রিদোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) জনিত মোহ অপহরণকারী। এই মোহরোগ অপস্মার রোগেরই নামান্তর।

এই জলজ লতাটির আর একটি নাম দেওয়া হয়েছে 'মেধাকৃৎ' অর্থাৎ মেধাজনক। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য—এদেশে অপস্মার রোগে বহুলোকই আক্রান্ত হন; সেক্ষেত্রে এই ভেষজ সম্পর্কে প্রাচ্যের চিন্তাধারাটি অনুশীলনের ক্ষেত্রকে তো আরও প্রসারিত ক'রেই দেয়। অবশ্য এ সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা ক'রে অপস্মার রোগেই একে প্রয়োগ করেছেন। তবে এটা ঠিক যে, তাঁদের এ গবেষণাটি আয়ুর্বেদের চিন্তাধারার একটি নব-সংস্করণ। এই শাকটি শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে অথবা ঐ শাকেরই ঝোল ক'রে খাওয়াতে বাধা কি? পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীগণ এটাও তো স্বীকার করেন যে অ্যালকালয়েড্ (Alkaloid) বা বীর্যশক্তিই সব নয়, সামগ্রিকভাবে তার শক্তি যে ভিন্ন হ'তে পারে—এটাকেও তাঁরা অস্বীকার করেন না।

ট্রানকুইলাইজারের ভাষ্য:— পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ বলেন—নিদ্রাকারক না হ'য়েও তাঁদের যে শ্রেণীর ঔষধগুলি দেহ ও মনকে উদ্বেগ ও চিন্তা থেকে সরিয়ে রাখে, সেগুলিকেই ট্রানকুইলাইজার বলা হ'য়ে থাকে। নিদ্রা আনয়নকারী হিসেবে Cerebral Cortex-এ এর কোন বিশেষ প্রভাব নেই। এ জাতীয় ঔষধের প্রভাব শুধু সাব্ কর্‌টিকাল্ স্টেশন্‌স্ (Reticular formation, Hypothalamus প্রভৃতি)। অভিজ্ঞ চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে তাঁদের এসব ঔষধ অতিমাত্রায় দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে শারীরিক ও মানসিক বৈকল্য আসে। যা আয়ুর্বেদিক ভেষজে তেমন প্রতিক্রিয়ার অবসরই হয় না। ভেষজটিকে ঔষধ না ভেবে আহার্য শাক হিসেবেও ব্যবহার ক'রে দেখুন। যেটি অতি অল্পমাত্রাতেও বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ঋক্‌বেদের ১।৫৮।৩ নিষণ্ণং প্রভৃতি সূক্তটিকে যাঁরা অনুশীলন ক'রেছিলেন, তাঁরা সংহিতার যুগের এবং পরে সেটি লোকসংস্কৃতিতেও প্রবর্তিত করেছেন।

এই শাকটির বিকাশকাল বর্ষা; অতএব অগ্নিমান্দ্য ও বায়ুবৃদ্ধির কালে এর জন্ম। অপরপক্ষে যেকালে স্বভাবতই অজীর্ণ রোগের সৃষ্টি হয় সেই কালেই এর জন্ম, কারণ বর্ষাকাল বায়ুর সঞ্চয়ের কাল। যদিও প্রত্যেক দ্রব্যেই ঋতুজ প্রভাবের মধ্যে বায়ুরই প্রাধান্য আসে, কারণ সৃষ্টির সঙ্গে বায়ুর প্রাধান্য স্বাভাবিক; আবার সে দোষের প্রকোপও হয়, এবং আহ্নিকগতিতে সৃষ্ট দোষের উপশমও হয়। এটি দৈনন্দিন কালকৃত স্বভাব। এই কাল-স্বভাবটির প্রকৃতি ও বিকৃতি নামক দুটি গতি আছে।

সুষুণীশাকের প্রকৃতিগত স্বভাবেই (বর্ষায়) তার বৃদ্ধি, অতএব প্রকৃতিগত পিত্তের উষ্মাটি তার স্বভাবজ গতি। প্রকৃতিগত পাচকপিত্তের উদ্বোধন বা জাগরণ করা তার একটি স্বভাব ধর্ম।

এইজন্য চরকের উক্তি—প্রতিটি ভেষজের জন্ম ও বিলয়কাল দেখে এবং ভূপ্রকৃতির স্বভাব দেখে ভেষজের গুণ-বীর্য-বিপাক-প্রভাবের কল্পনা ক'রবে—'জন্মানি বৃদ্ধিং বিলয়ং সমীক্ষ্য ভৈষজ্য শক্তিং গুণমাদধীত'। অর্থাৎ প্রতিটি বৃক্ষলতার জন্মকাল, বৃদ্ধি-কাল ও বিনাশের কাল দেখেই তার গুণ-বীর্যের অস্তিত্ব চিন্তা ক'রবে।

ভেষজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই হ'ল চরকীয় ধারা, এই সুষুণীশাকের জন্ম যেমন বর্ষাকালে, তেমনি পার্বত্য ভূমিতে যে তার জন্ম হয় না—এটাও সমীক্ষা করার ব্যাপার। পুরাতন পাঁক ও স্বল্পকঙ্কর জলাজমি এর জন্মস্থান। রাত্রে এদের পাতাগুলি ঘুমিয়ে পড়ার মত জুড়ে যায়, যেন চোখের দুটি পল্লব জুড়ে গিয়েছে। ভৈষজ্য বিধায়কগণের হয়তো-বা এই লক্ষণ দেখে আরও অনুশীলন করার প্রেরণা এসেছে। অর্থাৎ কোন্ কোন্ রোগ বায়ুপ্রধান কারণে জন্ম নেয় এবং তার ঔপশমিক হেতুই বা কি, তারই আকরিক ভৈষজ্যবিধান শক্তি এই ভেষজ লতাটিতে আছে।

শাকপত্র লতাটির ব্যবহারগত ফলের নিরীক্ষা

সুষুণীর মধ্যে ভৈষজ্য এবং আহার্য রস দুইই আছে; এর ভৈষজ্যশক্তির মৌল পরিচয় বীর্যগত, এটি শৈত্যবিধান করে ব'লেই মল সংগ্রহ করে অর্থাৎ এটি বিদাহকর নয় বলেই, এবং এই জন্যই সুষুণী শাকের ব্যবহার পুরাতন জ্বরের পথ্য এবং মেহ ও কুষ্ঠরোগের পথ্য হিসেবে নির্বিঘ্নে ব্যবহার করা যায়; তাতে ভৈষজ্য ও আহার্য দুই চলে। কারণ ঐ সব রোগে অগ্নিমান্দ্যের জের মেটে না, সে ক্ষেত্রে সুষুণীশাকের রস তার শীতবীর্যতা ও লঘুগুণের জন্য অগ্নিমান্দ্য সত্বর অপসারণ করে, তা ছাড়া এতে আছে অল্প কষায় রস, তারই জন্য পাকস্থলীর ক্লেদ দূর করে; এর বিশেষ হেতু এটি কষায় রস ব'লেই সে রূক্ষ। রূক্ষগুণ শীতবীর্যের প্রতিকূল হয় না, কারণ তখন কালজ আদানধর্মিতা এতে সহজেই সংসক্ত হয় অথচ বর্ষায় এর জন্ম কিন্তু বর্ষার জলে এর পচন হয় না। মূলের সর্বাগ্রে থাকে তিক্ত কষায় এবং কষায় সেখানে গৌণই থাকে, তাই তিক্ত প্রধানতাটাও এবং পচন নিবারকধর্মী, তা না হ'লে অতখানি সূক্ষ্ম শিকড়ও সামান্য ভাবেও পচে যেতো।

রোগ প্রতিকারে

১। **শ্বাস রোগে (হাঁপানীতে)**— কফের প্রাবল্য নেই অথচ শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় এটা বায়ুপ্রধান শ্বাস রোগ,—এ ক্ষেত্রে সুষুণী শাকের রস ৪।৫ চামচ একটু গরম ক'রে অথবা কাঁচা হ'লে ৮।১০ গ্রাম, আর শুষ্ক হ'লে ৩।৪ গ্রাম ৩।৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় খেলে শ্বাসকষ্টের অনেকটা লাঘব হয়, তার সঙ্গে নিদ্রাও ভাল হয়।

২। **জ্বালা মেহে**— প্রস্রাবে জ্বালা, তার সঙ্গে কিছু ক্ষরণও হ'চ্ছে—এ ক্ষেত্রে উপরিউক্ত মাত্রায় ও ঐ পদ্ধতিতে তৈরী ক'রে তিন চার দিন খাওয়ার পর থেকেই উপকার বুঝতে পারবেন।

৩। **অল্প মেধায়**— বাল্যকাল থেকে মেধা কম, সে ক্ষেত্রে এই শাক বেশ কিছুদিন অন্ততঃ ৩।৪ মাস নিয়মিত খাওয়াতে হয়; তবে তার মাত্রা বয়সানুপাতে নিতে হবে।

তবে এই শাক শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে, ছে'কে নিয়ে খেলেও চলে; এটার মাত্রা পূর্ণ-বয়স্কের ২ গ্রাম নিতে হয়; জলসহ না খেয়ে অন্ততঃ আধকাপ দুধ আর একটু চিনি মিশিয়ে খেলে খুবই ভাল হয়।

৪। **বিস্মৃতিতে—** বয়সের ধর্মে এটা আসে; তার কারণ মূর্ধা থেকে যে সব বর্ণের উচ্চারণ হয় যেমন র, ড়, ল প্রভৃতি বর্ণ যেসব শব্দের আদিতে থাকে, বয়স বেশী হ'লে এগুলি মনে প'ড়তে চায় না—সে ক্ষেত্রে সুষুণী শাকের রস দিয়ে ঘি পাক ক'রে প্রত্যহ ২।১ চামচ করে কিছুদিন খেলে ঐ অসুবিধেটা আস্তে আস্তে চ'লে যায়। এটা বালকদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করানো চলে। ব্রাহ্মী ঘৃতের প্রতিনিধিও এটি।

৫। **অনিদ্রায়—** কোন কারণ বা অবান্তর কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা, শুয়ে থাকলেও ঘুম আসে না; আবার কারও কারও তন্দ্রা আসার মুখে চ'মকে উঠে ঘুম ভেঙে যায়, অবান্তর চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত, শরীর উদ্বেগগ্রস্ত, সে ক্ষেত্রে কাঁচা হ'লে ১৫ গ্রাম আর শুষ্ক হলে ৩।৪ গ্রাম ৩।৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে ২।৪ চামচ দুধ মিশিয়ে প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা খেলে ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৬। **ব্লাড্ প্রেসারে—**(Blood pressure) বেশী থাকলে কাঁচা শাক আন্দাজ ১২ গ্রাম বেটে, জলে গুলে, ছে'কে নিয়ে একটু মিছরি বা চিনি মিশিয়ে সরবৎ ক'রে খেতে হয়; তবে ডায়াবেটিস্ থাকলে অথবা অম্লরোগ থাকলে কোন মিষ্টি দেওয়া চ'লবে না; আর শাক শুকিয়ে গেলে (৩।৪ গ্রাম আন্দাজ) ৩।৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে ওটাকেই সরবৎ ক'রে খেতে হয়; তবে সিদ্ধ করার পূর্বে একটু থে'তো ক'রে দেওয়াই ভাল।

৭। **রমণ প্রয়াসের শৈথিল্যে—** মেদোবহ স্রোত দূষিত হ'লে এবং তার জন্য অগ্নি-মান্দ্য, অরুচি, পিপাসা থাকলে সুষুণী শাকের রস অথবা শাক বেটে সরবৎ ক'রে খেলে ১৫।২০ দিনের মধ্যে কিছুটা ফল উপলব্ধি করা যায়।

৮। **দাহ রোগে—** শাকের রস অথবা শাক বাটা গায়ে মেখে কিছুক্ষণ বাদে স্নান ক'রলে স্নায়বিক কারণে সর্ব শরীরের দাহ প্রশমিত হয়।

৯। **কীট দংশনে—** বিষাক্ত কীটের দংশনের জ্বালায় সুষুণীর রস অথবা শাক বাটা ওখানে লাগালে কয়েক মিনিটের মধ্যে ওখানকার জ্বালা ক'মে যায়।

১০। **রক্তপিত্তে—** সুষুণীশাক ঘিয়ে ভেজে খেতে বলা আছে সুশ্রুত সংহিতায়—আবার ভাবপ্রকাশে রক্তপিত্তে এই শাকটিকে প্রয়োগ ক'রতে নিষেধ ক'রেছেন (এই গ্রন্থটির প্রণেতা ভাবমিশ্র, এটি ষোড়শ শতকের গ্রন্থ)।

১১। **অপস্মারে—**(Epilepsy) সুষুণী শাক (শুষ্ক) ৪ গ্রাম এবং জটামাংসী ২ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ২ কাপ থাকতে থাকতে নামিয়ে, চট্‌কে, ছে'কে ঐ জল সকালে ও বৈকালে ২ বারে খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ রোগ প্রশমিত হয়।

এই ভেষজ দু'টির ঘন সারকে উপাদান ক'রেই কোন কোন স্থলে বিশেষ ধরণের অপস্মারহারক বটিকা নামে প্রচার করার পিছনে ভারতীয় এই ভেষজ দুটি আজ জনসাধারণের গোচরীভূত।

পরিশেষে আমার বক্তব্য হ'চ্ছে—সে যুগে এই সব সম্ভাব্যতার অন্তর্নিহিত কারণটা কি—তা তাঁরা অবগত ছিলেন, যে জন্য বানপ্রস্থের ব্যবস্থা ছিল তাঁদের, আজ শিক্ষা-সভ্যতার সংকর যুগে ব'সে বানপ্রস্থ আশ্রমের চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁদের ট্রান্‌কুইলাইজার (tranquillizers) খুঁজতে হয়। আর সেই দোষে দুষ্ট হ'য়ে আমরাও খুঁজি সুষুণী শাক।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Ketonic constituents viz., marsiline, 3-hydroxytriacontane. (b) Alcoholic constituents viz., hentriacontan-16-01. (c) Sterol viz., betasitosterol. (d) Mixture of normal hydrocarbons. (e) Nitrogenous compounds viz., methylamine. (f) Saponin.

তুলসী

মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতিতে (খ্রীষ্টীয় ৫ম থেকে ১২শ শতাব্দী) বহু ঘটনাকে যেমন সরস ও রূপক উপাখ্যানের মাধ্যমে ধরে রাখা হ'য়েছে—তেমনি আর্যসংস্কৃতিতে আরও সংগৃহীত ভাবধারার মধ্যে রূপক উপাখ্যানের বহু গল্পাখ্যান সৃষ্টি ক'রে বিশেষ গুণান্বিত অবৈদিক ভেষজগুলিকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এই তুলসীকে গ্রহণই তারই অন্যতম।

উপাখ্যানের বিষয়বস্তু— দৈবযুগের কোনও এক সময়ে যেন বিষ্ণু কর্তৃক কোন সতী রমণী তুলসীকে অসতী বলে চিহ্নিতা করা হ'য়েছিল, তারপর আবার সেই তুলসী দ্বারাই বিষ্ণুও অভিশপ্ত হ'য়ে পাষাণভূত হ'য়েছিলেন; তারই জন্য যেন ক্ষমাপ্রার্থী হ'য়ে তুলসীকে মস্তকেও ধারণ করেছিলেন—এমনি এক শৃঙ্গার রসাত্মক উপাখ্যানের মাধ্যমে মর্ত্যে তুলসীপূজার কাহিনীটি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখা যায়। হয়তো বা প্রেম কাহিনীর এই সব পৌরাণিক উপাখ্যানকে উপলক্ষ্য ক'রেই আমরা বিদ্রূপ ক'রে বলে থাকি যে—"দেবতার বেলায় লীলা খেলা, আর যত দোষ মানুষের বেলা"।

সংশয়বাদীর দৃষ্টিতে— বৈদিক-তান্ত্রিক চিকিৎসা বিপ্লবের সময় মানবকল্যাণকর অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় এমন সব অনেক ভেষজকে উপাখ্যানের মাধ্যমেই সংস্কারের দড়ি বেঁধে আমাদের খুবই সান্নিধ্যে রাখা হয়েছে। তুলসী ভেষজটি কিন্তু অপরিসীম উপকার সাধনের অধিকারী, হয়তো বা এই জন্যই নারায়ণের প্রতীক শিলাপূজার প্রধান উপচার হিসাবে তুলসীকে অপরিহার্য করা হ'য়েছে, আর নাম দেওয়া হয়েছিল তুলসী— অর্থাৎ যার তুলনা নেই।

এই নামকরণই যেন সে যুগের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের প্রতীক। প্রাক্-আর্য বা অনার্যগণ আজও তুলসীকে তুলসীই বলেন, বিশেষ ক'রে মুণ্ডারা।

এই ক্ষুদ্র জাতীয় গাছটিতে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কয়েকটি অধ্যায়েই রাধাকৃষ্ণের মানবীয় চরিত্রের সঙ্গে একীভূত ক'রে আদিতে তুলসী যেন মানবী আর নারায়ণ যেন

মানব—উভয়ে শাপাশাপি ক'রে একজন শিলা আর অপরজন বৃক্ষে রূপান্তরিত হ'য়েছেন অর্থাৎ অভিশপ্ত বিষ্ণু হ'লেন শিলা আর অভিশপ্তা তুলসী হ'লেন এই বৃক্ষ। কিন্তু কোথায় এ'রা শিলা ও বৃক্ষ? উত্তরে ব'লেছেন, গণ্ডকী নদীতে, এবং সেই তুলসীর মাথার চুলগুলিই রূপান্তরিত হ'লো বৃক্ষের মঞ্জরীতে।

এই উপাখ্যানের মাধ্যমে পাওয়া গেল একটি নদীর নামও, সেটি আজও প্রবাহিতা গণ্ডকী নদী। নামটি এসেছে গোণ্ড থেকে।

গোণ্ডজাতি ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী। এরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এ'দের কয়েকটি শাখা বা উপজাতি আছে। তবে উন্নত শাখা দুটি—তার একটি শাখা মুণ্ডা। এদেরই ভাষায় তুলসী শব্দ আজও সদানিবদ্ধ। এদের কাছে গণ্ডকী নদী এবং তুলসী খুব মাননীয়া বা পূজনীয়া।

আর একটি দিক—এই গণ্ডকী নদীটি উত্তর ভারতের তুষারখণ্ড থেকে বাহির হ'লেও নেপালের পার্বত্য উপত্যকাকেই এর উৎপত্তিস্থান বলা হয়। কিন্তু নেপালে এর নাম শালগ্রামী নদী, আর যখন গণ্ডক নাম হচ্ছে, তখন এসেছে চম্পারণ, গোরক্ষপুর, সারণ, মুজাফ্‌ফরপুর এবং পাটনার কাছে অর্থাৎ যেখানে আদিবাসী মুণ্ডাদের বাস বেশী। নদীটির প্রান্তভাগে শোণপুর। এখানে বাৎসরিক মেলা হয়, এখানে আদিবাসীরাই বেশী আসেন।

কেশ ও তুলসী প্রসঙ্গে

আমাদের বলবীর্যের একান্ত নিকেতন শিরোদেশ। তুলসীমঞ্জরী যেন সেই উর্ধ্বভাগেরই প্রতীক। তুলসীর মূল, কাণ্ড বা ত্বকের ব্যবহার নেই যে তা নয়, পরবর্তীযুগে তাকেও রোগ-প্রতিকারের কাজে লাগানো হয়েছে। মানবীয় সৌন্দর্য যেমন কেশে, তুলসীর সমস্ত কার্যকরী শক্তির উৎসও তার শীর্ষভাগে।

পৌরাণিক রূপক উপাখ্যানটির দ্বারা আরও একটি অনুশীলনের আছে, সেটি হোলো—অথর্ব-বৈদিক উপবর্হণ সংহিতার সূত্র। তাতে আছে কীট-সংচ্ছেদি—এই তুলসীর রস শিলাকীটের প্রাণশক্তি বাড়ায়, কিন্তু অন্য যে কোন কীট বিনাশ করে। এমনকি সাপের বিষেরও পচন-ক্রিয়ায় কীট উৎপন্ন হতে দেয় না। সেইজন্য সর্পবিষ শোধনের জন্য তুলসীপাতার রস ব্যবহার করা হয়। শরীরের যেকোনও স্থানে রক্তদোষ এবং পূজের জন্য কীট হলেই তুলসীর রস অব্যর্থ কাজ করে কীট বিনাশ করতে।

প্রবাদ আছে—যে বাড়িতে তুলসীর বন থাকে, সেখানে কোন virus infection-জনিত রোগ হয় না।

অনুপ্রবেশ:— রমণীরত্ন কুলহীন হলেও যেমন মনুসম্মত কুলীনা হ'য়ে থাকে, তাকে গ্রহণ করার উপদেশ। আবার মনুর নীতিবাক্যের অনুরূপ ভেষজ-জগতেও প্রাক্-আর্যদের আবিষ্কৃত এই তুলসীকে গ্রহণ করা হয়েছে; অর্থাৎ কোন বৈদিক সূক্তে স্বনামে বা বেনামে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং তার বৈদিক কুলমর্যাদাও নেই; তবে তার বহুকাল পরে উদ্ভূত অথর্ববেদের উপবর্হণ সংহিতায় তুলসী নামের উল্লেখ দেখা যায়, সেখানের একটি শ্লোক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

'সুভগা কীট সংচ্ছেদি অন্তঃমার্গং বিশোধয়েৎ'

(উপবর্হণ ৩।২৪)।

ওখানে ভাষ্যকারের মতে—এই সুভগাই হচ্ছে তুলসী এবং সুরসাও এর অপর নাম; এখানে আরও বলেছেন যে, এর মঞ্জরীর পানক অর্থাৎ সরবৎ পান করলে শ্লেষ্মা ও রক্তজব্যাধি দূর হয়।

আয়ুর্বেদ সংহিতার স্বর্ণযুগে—চরকে সুরসা নামে যার উল্লেখ, সেইটিই আমাদের তুলসীরই নাম এবং তারই ব্যবহার করা হয়েছে শ্বাস-কাসের উপশমের ক্ষেত্রে; যার বোটানিক্যাল নাম Ocimum sanctum Linn. এবং এটি Labiatae ফ্যামিলীভুক্ত; কিন্তু সুরসাদিগণে (Group) বর্তমানে ব্যবহৃত কয়েক প্রকার তুলসীর উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু তার নাম-ধাম ও আকারে বর্তমানে সামঞ্জস্য করা কঠিন; এই গ্রন্থের মতে এই তুলসীগুলি কফ, ক্রিমি, প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস ও কাস দূর করে এবং ব্রণশোধক; তবে কোন্ তুলসী এবং তার কোন্ অংশ কি রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী, সেটা নির্দিষ্ট ক'রে বলা নেই।

বর্তমানে আমরা যে কয়েকপ্রকার তুলসীগাছ সাধারণতঃ দেখতে পাই—

১। বাবুই তুলসী— Ocimum basilicum Linn. (একে দুলাল তুলসীও বলে)।

২। **রাম তুলসী**—Ocimum gratissimum Linn. এই গাছের বীজ ইউনানি সম্প্রদায় খুবই ব্যবহার করেন। নব্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীগণের মতে এই দু'টির আদিম বাসস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

৩। বনবর্বরিকা— যাকে চলতি কথায় 'বনতুলসী' বলে; বর্তমানে এটির বোটানিক্যাল নাম Ocimum americanum Linn.

৪। কর্পূর তুলসী— ল্যাটিন নাম Ocimum Kilimandscharicum Guerke. এই গাছ থেকে কর্পূর (camphor oil) পাওয়া যায়; এটির আদিম জন্মস্থান নাকি আফ্রিকার কিলিমানজারো পর্বত। এ ভিন্ন এই গণের আরও ৪টি প্রজাতিও ভারতে পাওয়া যায়। বর্তমান বক্তব্য প্রধানতঃ হিন্দুদের পূজোপচারে ব্যবহৃত তুলসী দুটির রঙের সম্পর্কে। একটি কৃষ্ণবর্ণের, অপরটি হরিৎবর্ণের।

উপযোগিতা—

প্রথমেই বলে রাখি—

'হরিৎ কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্তিতা'

অর্থাৎ হরিৎবর্ণের ও কৃষ্ণবর্ণের দুটি তুলসীর একই গুণ।

১। তুলসীগাছের স্পর্শ পাওয়া হাওয়া সংক্রামক ব্যাধিকে দূরে রাখে ব'লে প্রাচীনকাল থেকে ধারণা। এটির যৌক্তিকতার অনুকল্প ব্যবস্থা আমাদের দেশে (অন্ততঃ এতদঞ্চলে) বদ্ধমূল হয়ে আছে; যার জন্য সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় খাদ্যে দুই-একটি তুলসীপাতা দিয়ে রাখি। এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের হিন্দুদের মৃত্যুর পর তাদের চোখে-কানে-নাকে তুলসীর পাতা দিয়ে দেওয়ার একটা রীতি আছে। এর অন্তর্নিহিত রহস্য হয়তো বা সেই দেহের রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। নব্যমতে অবশ্য এটি anti-bacterial.

২। যেসব শিশুদের মধ্যে সর্দি-কাসির প্রবণতা আছে; অতি তুচ্ছ কারণেও সর্দি হয়, তাদের প্রত্যহ প্রাতে ৫।১০ ফোঁটা তুলসীপাতার রস (২।৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে

অথবা শুধু) খাওয়ালে সে অসুবিধা থাকবে না। এমন কি এর দ্বারা শিশুদের কোষ্ঠ-কাঠিন্যও দূর হয়; এটা অবশ্য সব বয়সেই ব্যবহার করা চলে।

৩। তরুণ সর্দিসহ যেকোন প্রকার জ্বরে আদা ও তুলসীপাতার রস সেযুগে আবাল-বৃদ্ধের সর্বজনীন ঔষধ ছিল; যেহেতু জ্বরের মূল কারণকে (আয়ুর্বেদ মতে) সে দূরীভূত করে।

৪। শিশুদের পেটকামড়ানি, কাসি ও লিভারের দোষে প্রাচীন বৈদ্যগণ এই পাতার রস ও মধু ব্যবহার ক'রে থাকেন।

৫। যাঁদের অকালে শরীর ও মন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, তাঁরা আধ ইঞ্চি পরিমাণ তুলসীর মূল (কালতুলসী হলে ভাল হয়) পানের সঙ্গে সকালে ও বৈকালে চিবিয়ে খেলে কয়েকদিনের মধ্যে উদ্দীপনা উপলব্ধি করবেন; তবে আনুষঙ্গিক কারণগুলিও নিরসন করার প্রয়োজন আছে। (সুশ্রুতের দৃষ্টিতে বৃষ্য ও বাজীকর দ্রব্যের গুণ এতে আছে।

৬। তুলসীপাতা ও কাঁচা হলুদের রস একটু আখের (ইক্ষু) গুড় মিশিয়ে খেলে আমবাতের উপশম হয়; এ ভিন্ন এটি ব্লাডসুগারকেও শাসন করে। এটি একজন প্রাচীন বৈদ্যের মুখে শোনা।

৭। প্রায় সব জাতের তুলসীর বীজ জলে ভেজালে পিচ্ছিল হয়, কারণ জলগুণ প্রধান বলে (বিশেষতঃ বাবুই ও রামতুলসীর) এই জলে চিনি মিশিয়ে খেলে প্রস্রাবঘটিত পীড়ায় (প্রস্রাবের জ্বালা-যন্ত্রণার ক্ষেত্রে) বিশেষ উপকার হয়। যেহেতু লেখন গুণ এতে আছে।

৮। এই গাছের পাতা ও দূর্বা কাঁজি দিয়ে বেটে গায়ে মাখলে চুলকণা ও ঘামাচি ভাল হয়।

৯। কোন কোন প্রদেশে যেকোন প্রকার পোকামাকড় এমন কি বোল্‌তা বিছাতে কামড়ালে তুলসীপাতার রস লাগিয়ে থাকেন।

১০। মুখে বসন্তের (নূতন) কাল দাগে তুলসীর রস মাখলে ঐ দাগগুলি মিলিয়ে যায়; এমন-কি হামের পর যেসব শিশুর শরীরে কালদাগ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তুলসী-পাতার রস মাখলেও শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরে আসে।

১১। তুলসীপাতা ছেঁচে পুঁটলি ক'রে সেই রসের নাস নিলে (নাকে টানলে) নাসারোগের শান্তি হয়।

১২। শ্লেষ্মার জন্য নাক বন্ধ হলে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না—সে সময় শুষ্ক পাতা চূর্ণের নস্যি নিলে সেরে যায়।

১৩। হাম ও বসন্ত বেরুতে দেরী হচ্ছে; তুলসীপাতার রস খাওয়ালে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।

১৪। কোন কারণে রক্ত দূষিত হলে কাল তুলসীপাতার রস কিছুদিন খেলে তজ্জনিত উপসর্গ নিরাময় হয়।

১৫। কানে ব্যথা ও যন্ত্রণায় (শ্লেষ্মাজনিত) পাতার রস অল্প গরম ক'রে তুলি দিয়ে কানে লাগালে উপশম হয়।

১৬। তুলসীপাতা চায়ের মত তৈরী ক'রে অনেক সাধু, সন্ত, বাবাজী মহাশয়গণ খেয়ে থাকেন নীরোগ থাকার জন্যে।

১৭। তুলসীপাতার রসে লবণ মিশিয়ে দাদে লাগালে উপশম হয়।

এ ভিন্ন আরও বহু রোগনিরাময়ের শক্তি এই সাধারণ গাছটির আছে; তাছাড়া অন্যপ্রকার তুলসীগুলিরও রোগনাশক শক্তি কম নেই। এই তুলসীর প্রভাব ইউনানী

চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের উপর কম পড়েনি—তাঁদের গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ হয়েছে। বৈশিষ্ট্য দেখলাম—তাঁরা এটা হৃদ্‌রোগেও ব্যবহার ক'রে থাকেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এটা জানিয়ে রাখি—আজ তুলসীর মালাও ভেজাল। বাঁকুড়া জেলার বামিরা বাল্‌সি গ্রামাঞ্চলের এটি একটি কুটির শিল্প; এখান থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চালান যায় বৎসরে অন্ততঃ ২০।২৫ হাজার টাকার বিভিন্ন ধরণের মালা। এই ভেজাল মালা তৈরী হয় এক ধরণের বুনো শক্ত লতা বা ছোট সরু গাছ থেকে। এ কথা জানালেন মালাব্যবসায়ী জনৈক ভদ্রলোক।

মোট কথা কফের প্রাধান্যে যেসব রোগ সৃষ্টি হয়, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুলসী কার্যকরী; তবে এই বিচার—প্রবীণ চিন্তাধারায় (বায়ু, পিত্ত, কফ) না হ'লে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

দুঃখের বিষয়—আয়ুর্বেদের মূল চিন্তাধারাটি সংস্কৃত (reform) হওয়াতে তদ্‌ভাবে ভাবিত নবীনের মনের সাজ যেন—"গায়ে চাদর পরণে প্যাণ্টুলুন;" এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ও নবীনপন্থী আয়ুর্বেদসেবিগণের মধ্যে গ'ড়ে উঠেছে শিয়া-সুন্নী সম্প্রদায়ী মনোভাব, তারই পরিণতিতে আয়ুর্বেদ আজ "গজভুক্ত কপিত্থবৎ"।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Phenolic constituents viz., eugenol, methyl eugenol, carvacrol, traces of phenol. (b) Terpenoids viz., caryophyllene, citral, citronellal, citronellol. (c) Camphor. (d) Traces of acid viz., acetic acid.

শ্বেতচন্দন

দেবভূমি এই ভারতের সনাতনধর্মী জনসাধারণ গ্রীষ্মের প্রাকৃতিক তাপ যখন অসহ্য মনে করেন, তখন সর্বাঙ্গে শৈত্য লেপনের প্রয়োজন বোধ ক'রে থাকেন, কিন্তু তাঁরা ভাবতে পারেন না শ্রীনারায়ণের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন না ক'রে নিজের দেহে চন্দন লেপন করা কি চলে? তাই তাঁরা প্রত্যহ স্নানান্তে একটি শিলাকে নারায়ণের প্রতীক ক'রে তাতে শ্বেতচন্দন মাখা তুলসী দিয়ে সেই অর্পিত চন্দনের অবশেষ দিয়ে নিজ দেহে চন্দন লেপন করেন, তা ছাড়া অন্য ঋতুতেও তাঁরা সুগন্ধ লেপনের মুখ্য প্রসাধন হিসেবে চন্দনচর্চিত তুলসী অর্পণটিকে বলেন, এটি প্রসাদী তুলসী। সনাতনীদের এই আচারে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—কেনই বা এই আচারকে আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ক'রেছেন তাঁরা? তা ছাড়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রাধান্যই বা পেলো কি ক'রে? আবার পুণ্যকামিতার ও স্বর্গকামিতার (চন্দন ধেনুর ক্ষেত্রে) সোপান হিসেবেও দেখি চন্দনের ব্যবহার। এ প্রশ্ন অপরের শুধু নয়—বহুদিন থেকে নিজের মনেও জেগেছে আর আজীবন খুঁজে আসছি এসবের বাস্তব সত্ত্বার সূত্র কোথায়? এটা কি পুরোহিতের জীবিকার অন্যতম পথ প্রশস্ত করার একটি উপায় মাত্র? আমি কেন, বৌদ্ধ জৈন নিয়ে আরও ভারতবাসী আছেন, তাঁদের মনেও তো এ প্রশ্ন জেগে আসছে। অবশ্য এ নিয়ে কয়েক শতাব্দী ধ'রেই পৃথিবীর বস্তুতত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় ধার্মিকতত্ত্বের সামঞ্জস্য নিয়ে অনুসন্ধিৎসু মনীষিগণের কাছে এটা খুবই আকর্ষণের হয়ে আছে। তাছাড়া ভারতের সাধু, সন্ত ও যোগীকুল আর তাঁদের সংস্কৃতি এবং ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও চন্দনকে বিশেষ স্থান দেওয়া হ'য়েছে, এ ঔৎসুক্য আজও তাঁদের কমেনি; এখনও অনুশীলিত হ'চ্ছে। এ'দের আচরণের মধ্যে এইসব পদ্ধতি গ্রহণের রহস্য কি?

আমার আলোচ্য বিষয়ের নিবন্ধ তারই একটা সূত্র ধ'রে; আপাততঃ সেটা শ্বেত-চন্দনকেই কেন্দ্র ক'রে।

জাত-কুল-মান—একটা কথা আছে—

'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'

অর্থাৎ নীচকুলের মধ্যেও যদি রমণীরত্ন পাওয়া যায় তাকে গ্রহণ ক'রতে দোষ নেই। এটা মনুসংহিতার একটি বিশেষ উক্তি। অনুসন্ধানে দেখা যায়, এই শ্বেতচন্দনকেও পূর্বসূরিগণ তেমনি দুষ্কুলজাত জেনেও গ্রহণ করেছেন; অর্থাৎ মাননীয়ের পর্যায়ে তাকে স্থান দিয়েছেন, কারণ তার বৈদিক আভিজাত্য নেই। বেদ চতুষ্টয়ে তার সন্ধানই পাওয়া যায় না, এমন-কি, সূত্র ও সংহিতা নির্মাণের সময়েও কোন গ্রন্থে তার নামোল্লেখ করেননি; তবে দীর্ঘকাল পরে রচিত এমন গ্রন্থে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যে গ্রন্থকে

বলা যায় বেদানুবর্তি সংহিতা; কিন্তু সেটা শ্বেত কি রক্ত তেমন স্পষ্টোক্তি নেই। হ্যাঁ, প্রসঙ্গত বলি—রক্তচন্দনটি কিন্তু অথর্ববেদের যোজিত অংশে স্থান পেয়েছে। সেখানে দেখা যায় যে, সর্বপ্রকার দাহ প্রশমনের জন্য রক্তচন্দনের কাথ পান ও লেপনে তাকে ব্যবহার করা হ'য়েছে।

এখানেই প্রশ্ন আসে যে—কোন পূজার প্রারম্ভে সূর্যদেবকে যখন অর্ঘ দিতে হয়—তার উপাচারেও তো রক্তচন্দন অপরিহার্য; তবুও কেন তার বৈদিককৌলিন্য হয়নি!

তা যাক্, সূর্যার্ঘেই বা এটাকে কেন বিশেষাঙ্গ ব'লে গ্রহণ করা হ'লো—তার রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে? অথবা রোগের দাহিকা প্রশমনের শক্তিকে প্রতীক ক'রে? সংক্ষেপে একটা কথা ব'লে রাখি—আর্যরা সূর্যপূজার বিধান দেননি; এটা মগ দেশ থেকেই আগত, যার প্রসঙ্গটি মহাভারতে "মগধ" এই নামেই বিধৃত।

অনুপ্রবেশ— যাঁরা মনে করেন, প্রাক্‌আর্য সংস্কৃতি থেকেই পৌরাণিক যুগে এটাকে গ্রহণ করা হ'য়েছে তার গুণপনায় মুগ্ধ হ'য়ে, সে কথাও ফেলা যায় না। যাই হোক্, জাত-কুল-মানের তাঁরা প্রাধান্য দেননি এর ক্ষেত্রে। তার গুণ সত্যই সমাজকে মুগ্ধ করেছিল বলেই পরবর্তীযুগে কি পূজার অঙ্গে অথবা অঙ্গলেপনে সে প্রাধান্য পেয়েছে। নীতি-নির্ধারণ কমিটীর কার্যের মত আমাদের ঔষধ প্রস্তুতকরণ ও তার উপকরণ গ্রহণের কতকগুলি বিধিনিষেধ সম্বলিত যে গ্রন্থ, তার নাম 'পরিভাষা', সেখানে বলা হয়েছে—'চন্দনে রক্তচন্দনম্' অর্থাৎ গ্রন্থে যদি চন্দন শব্দের উল্লেখ থাকে, তবে সেখানে রক্তচন্দনকেই গ্রহণ করতে হবে। ঔষধার্থে তৎকালীন যুগে সাদা চন্দনের ব্যবহার হতো কিনা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেকার গ্রন্থে তেমন উক্তি পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে এটি বহু রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। নিঘণ্টু গ্রন্থকারের (দ্রব্যগুণের) যুগেও অর্থাৎ ১৬ শতকের পর শ্বেতচন্দনের জন্মস্থান ভেদে তার বিভিন্ন নাম রাখা হয়েছে। যেমন তৈলপর্ণ, গোশীর্ষ, মলয়জ, বেট্র, সুকড়ি ইত্যাদি। আমার বর্তমান আলোচ্য নিবন্ধটি মহীশূর রাজ্যের মলয়জ চন্দনকে কেন্দ্র ক'রে।

জন্মভূমি :— প্রধানভাবে মহীশূর, কুর্গ, কোয়েম্বাটোর, মাদুরা প্রভৃতি অঞ্চলে অর্থাৎ ভারতের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে সাধারণতঃ ২-৪ হাজার ফুট উঁচু স্থানের মধ্যে এই গাছের চারা বসানো হয়, গাছ বেশি মোটা হয় না, বাড়তে বহু দেরী হয়। ২০ বৎসর বয়সের নিচের কোন গাছ কাটা হয় না। ৩০।৪০ বৎসরের গাছের ব্যাস ৭।৮ ইঞ্চির বেশী মোটা হয় না; তবে তার সারভাগ বেশী হয়। অসার কাঠে বা পাতায় কোন গন্ধ নেই। চিরসবুজ গাছ, ছোট সাদা ফুল হয়; ফলগুলি কাঁচায় সবুজ কাবলী মটরের মত, পাকলে বেগুণে রঙের হয়। আমরা চন্দন ব'লে যেটা ব্যবহার করি, সেটা কাঠের সারাংশ, এর মধ্যে উদ্বায়ি তৈল আছে, তার বোটানিক্যাল নাম Santalum album. Linn. ফ্যামিলি Santalaceae.

খাঁটি চন্দন কাঠ :— সকলের একই অভিযোগ—চন্দন কাঠ শুঁকলে গন্ধ পাই, কিন্তু ঘষলে আর গন্ধ থাকে না কেন? আমার বক্তব্য—দ্রব্যের দুর্মূল্যতার জন্য বহু জিনিষের নকল চলছে, অনেকে আসল ভেবে পুরো দামে কিনেও প্রতারিত হচ্ছেন। জনস্বার্থে এগুলি কি বন্ধ করা যায় না? তবে এটাও ঠিক—'ঘরের ঢেঁকি কুমীর' হলে সেক্ষেত্রে কিছু করার নেই—তা না হলে নকল সৈন্ধবের কারখানা চলে? খাঁটি কোথায় পাবেন? —সরকার পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান থেকে চন্দন কাঠ কিনলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

অজানার সন্ধান :— বায়ুর চাপে (হাই ব্লাড্-প্রেসারে) কাতর শিষ্যের প্রতি গুরুর উপদেশ—তুমি সকালে তুলসীর পাতা খেয়ো, ভাল থাকবে। এই রকমই আর একটি ক্ষেত্রের উপদেশ—তুমি শ্বেত (সাদা) চন্দন ঘষা দুধে মিশিয়ে খেয়ো, ভাল থাকবে। এই কথা দুটি পরম্পরায় আমার কানে আসাতে কৌতূহলী হয়ে সে কথাটাকে বাস্তবে যাচাই ক'রে দেখেছি, শুধু আমিই নই—দেখেছেন পাশ্চাত্য চিকিৎসকও (cardiologist); তাঁর সমীক্ষা—এটা Benign hypertension এ খুবই আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাচ্ছে; সব থেকে বড় কথা Diastolic প্রেসারটাও সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু বেশী প্রেসারের ক্ষেত্রে চন্দন ঘষাটা একটু বেশী খেতে দিতে হচ্ছে; তবে আনুষঙ্গিক

উপসর্গের সুবিধে-অসুবিধেগুলিও খতিয়ে দেখার দরকার হয়; কিন্তু সীমিত ক্ষেত্রে পরীক্ষার দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন নয়; আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন।

কিভাবে ব্যবহার করতে হয়ঃ— সকালে খালিপেটে ৭।৮টি তুলসী পাতা চিবিয়ে খেতে হয় (খুব ছোট হলে ১০।১২টি); তার ঘণ্টাখানেক বাদে শ্বেত (সাদা) চন্দন ঘন ক'রে ঘষা এক চা-চামচ আধ কাপ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হয়, তবে এটা লক্ষ্য করেছি যে, তুলসী পাতার ক্রিয়াশালিতা ক্ষেত্রবিশেষে গৌণ; একটি ক্ষেত্রে দেখেছি—দু'টি একসঙ্গে ব্যবহারে ব্লাড্-প্রেসার স্বাভাবিক হওয়ার পর চন্দনঘষা খাওয়া বন্ধ ক'রে দেওয়াতে (তুলসীপাতা খাওয়া কিন্তু চলছিল) কয়েকদিন বাদে আবার একটু প্রেসার উঠেছিল; পুনরায় চন্দন ঘষা খেতে সেটা স্বাভাবিক হ'ল। সাধারণতঃ দেখা যায় যে—Systolic প্রেসার ১৮০র মধ্যে থাকলে এক চা-চামচ ঘন ক'রে ঘষা চন্দন খেলেই চলে।

বৈশিষ্ট্যঃ— এটাতে Diastolic কমিয়ে দিচ্ছে, তার সঙ্গে প্রস্রাবও পরিষ্কার হচ্ছে, অথচ কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

বিশেষ ক্ষেত্রেঃ— যাঁদের Chronic Bronchitis (পুরাতন ব্রংকাইটিস) আছে, অথচ প্রেসারে কষ্ট পাচ্ছেন, তাঁরা অল্প পরিমাণে খাওয়া আরম্ভ ক'রে দেখবেন, কারণ এটা একটু শৈত্যকারক, উষ্ণবীর্য। তবে তুলসীর পাতা তাঁদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। সর্বক্ষেত্রে দু'য়ের একসঙ্গে ব্যবহার পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করছে কিনা, সেটাও বিচার্য বিষয়।

শ্বেত চন্দনকে নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করার প্রারম্ভে তার একটিমাত্র গুণকে কেন্দ্র ক'রেই অল্প কিছু বলার পরই অন্যান্য রোগ-প্রতিকারে তার প্রভাব কতটুকু এবং প্রয়োগ-বিধিই বা কি—সেইটিই এ ক্ষেত্রে আলোচ্য।

প্রাচীন বনৌষধি গ্রন্থে যে গুণগুলির কথা লেখা আছে, তাদের মধ্যে দাহ প্রশামক, পিপাসার শান্তিকারক, বর্ণপ্রসাদক, মূত্রকারক, গায়ের দুর্গন্ধহারক, হৃদয়-সংরক্ষক ও বিষনাশক প্রভৃতি; অর্থাৎ শৈত্যগুণসম্পন্ন এবং ভূতপরিচয়ে এটি জলগুণসম্পন্ন, এর এই প্রকৃতিটিকে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কেমন ক'রে প্রয়োগ ক'রতে হয়, প্রধানতঃ সেইটিই এখানে আলোচ্য।

১। **জ্বরেঃ—** পিপাসা, শরীরে জ্বালা অথবা শুধু পিপাসা থাকলে চন্দন ঘষা আধ চা-চামচ থেকে এক চা-চামচ (বয়স এবং অবস্থা বিবেচনায়) কচি ডাবের জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে দুই-ই প্রশমিত হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে জ্বরও কমে যায়; তবে সর্দির প্রকোপ বেশী থাকলে না দেওয়াই সমীচীন।

২। যখন পেনিসিলিনের আবিষ্কার হয়নি, তখন গনোরিয়ার (ঔপসর্গিক পূষ-মেহের) জ্বালা-যন্ত্রণা, পুঁজ পড়া ইত্যাদির প্রশমনে পাশ্চাত্য চিকিৎসক গোষ্ঠীর বিশেষ ঔষধই ছিল চন্দনের তৈল এবং তার সঙ্গে আরও দুই-একটা জিনিষ মিশিয়ে 'ইমালসান' ক'রে খেতে দেওয়া। এটাও হয়তো অনেক চিকিৎসকের মনে আছে যে, ফ্রান্স্ থেকে চন্দন তৈলভরা জিলোটিনের বটিকা আসতো, তার নাম ছিল Santal midi—এটি সে সময়কার শ্রেষ্ঠ ঔষধ; আর ইউনানি সম্প্রদায় চিনির সঙ্গে ৫।১০ ফোঁটা ক'রে খাঁটি চন্দনের তৈল খেতে দিতেন, আর বৈদ্যকগোষ্ঠী এটিকে ব্যবহার করতেন—অন্যান্য ভেষজের সঙ্গে আসব বা অরিষ্ট ক'রে; তবে চন্দনের কাঠেরই বেশী ব্যবহার হয়ে থাকে।

এখানে আর একটু বলে রাখি—ঢেঁকিতে ছাঁটা চাল ধুয়ে সেই জলে চন্দন ঘষে ওর সঙ্গে একটু মধু মিশিয়ে খাওয়ালে যে কোনও কারণে প্রস্রাবে জ্বালা অথবা আটকে যাওয়া, এমন-কি রক্তপ্রস্রাবেও উপকার পাওয়া যায়।

৩। **নারীর ক্ষেত্রে:—** যাঁদের ঋতুস্রাবে দুর্গন্ধ, পুঁজ বা মজ্জাবৎ স্রাব হতে থাকে—সে ক্ষেত্রে চন্দন ঘষা অথবা ঐ কাঠের গুঁড়ো গরম জলে ভিজিয়ে রেখে সেটা ছেঁকে নিয়ে দুধে মিশিয়ে খেতে হয়।

৪। **অপস্মার রোগে** (Epilepsy):—প্রাচীন বৈদ্যগণ ঔষধের অনুপান হিসেবে চন্দন ঘষা ব্যবহার করেন; তবে যদি রোগের প্রাবল্য না থাকে, দেখা যায় যে শুধু চন্দন ঘষা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলেই অনেকটা ভাল থাকেন।

৫। **বমিতে:—** আমলকীর রস অথবা শুকনো আমলকী ভিজানো জলে চন্দন ঘষা মিশিয়ে খেতে দিলে বমি বন্ধ হয়ে যায়।

৬। **শীতল পানীয়:—** গ্রীষ্মকালে শরীরে স্নিগ্ধতা সম্পাদনের জন্য ঘষা চন্দন ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে খেয়ে থাকেন; এটাতে পেটও ঠাণ্ডা থাকে।

৭। **হিক্কায়:—** চালধোয়া জলের সঙ্গে চন্দন ঘষা মিশিয়ে ঐ জল দু' ঘণ্টা অন্তর একটু একটু ক'রে খাওয়ালে হিক্কা বন্ধ হয়। এমন-কি দুধে ঘষে (ছাগদুগ্ধ হলে ভাল হয়) নস্য নিলেও হিক্কা বন্ধ হয়।

৮। **বসন্তরোগে:—** পিপাসা থাকলে মৌরীভিজান জলে চন্দন ঘষা মিশিয়ে খেতে দিয়ে থাকেন এ রোগের স্পেশালিষ্ট যাঁরা।

৯। **বিষফোড়ায়:—** ঘষা চন্দনে গোল মরিচ ঘষে সেটা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ৩।৪ বার লাগালে বিষানি কেটে যায়।

১০। **অস্বাভাবিক ঘর্মে:—** ঘাম বেশী হলে এই ঘষা চন্দনের সঙ্গে বেনামূল বেটে একটু কর্পূর মিশিয়ে গায়ে মাখতে দিতেন প্রাচীন বৈদ্যেরা।

১১। **ঘামাচি:—** সাদা চন্দন ঘষার সঙ্গে হলুদবাটা ও অল্প একটু কর্পূর মিশিয়ে অথবা চন্দন ও দারুহরিদ্রা একত্রে ঘষে মাখলে মরে যায়।

১২। **মাথাধরা:—** যখন মাথাধরার ঔষধ বেরোয়নি, তখন চন্দন ঘষার সঙ্গে একটু কর্পূর মিশিয়ে কপালে লাগাতে হতো।

১৩। **শরীরে বসন্ত দেখা দিলে:—** হিঞ্চে (Enhydra fluctuans) **শাকের রসে** শ্বেতচন্দন ঘষা মিশিয়ে খেতে দিলে গুটি শীঘ্র বেরিয়ে পড়ে ও তার ভয়াবহতা চলে যায়।

১৪। **নাভিপাকে:—** শিশুদের নাভি পাকলে ওটা ঘষে পুরু ক'রে লাগিয়ে দিলে জ্বালা-যন্ত্রণা কমে যায় এবং সারেও।

১৫। **হুপিং কাশিতে (শিশুদের):—** শুধু চন্দন ঘষা ২।৪ বিন্দু এবং একটু হরিণ শিং ঘষা (এক মসুর পরিমাণ) তার সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে তৎক্ষণাৎ দীর্ঘস্থায়ী কাসিটা কমবেই, এটি প্রখ্যাত কবিরাজ স্বর্গীয় বারাণসীনাথ গুপ্ত মহাশয়ের ব্যবস্থা।

১৬। **শিশুদের মাথার ঘায়ে:—** ২।৩ মাসের শিশুর মাথায় এক ধরণের চাপড়া ঘা হয়—সে ক্ষেত্রে শুধু শ্বেতচন্দন ঘষা লাগিয়ে দিলে অচিরেই সেরে যায়।

১৭। **শূল রোগে:—** চন্দন ঘষা এবং বেনামূলের ক্বাথ (প্রত্যেকবার ১০।১২ গ্রাম হিসাবে) ব্যবহার করলে বুকের আকস্মিক শূলরোগ (বায়ুজন্য) উপশমিত হয়।

রোগ প্রতিকারের এরকম কত অজানা দ্রব্যগুণ এখনও আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে কথাগুলি সর্বসাধারণে প্রকাশ করতে আজও আমরা নারাজ।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Santalol 89-96%. (b) Allo-hydroxyproline. (c) Anthocyanins. (d) Phenols. (e) Tannins. (f) Essential oil.
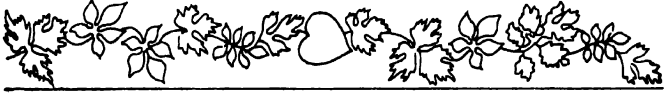
রুদ্রাক্ষ

হিমালয়ের দুর্ধর্ষ অসুর ত্রিপুর বধের জন্য বহু বৎসর অপলক দৃষ্টিতে রুদ্রকে (শিব) যুদ্ধ ক'রতে হ'য়েছিল, যার জন্য তাঁর অবসাদগ্রস্ত চোখ থেকে জল ঝ'রে পড়ে, সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মার আদেশে তা থেকে যে বৃক্ষের উদ্ভব হ'লো তার নাম দেওয়া হ'লো—রুদ্রাক্ষ। এটি পুরাণের কথা; তবুও পৌরাণিক উপাখ্যানে যে সব রূপক কাহিনীর মাধ্যমে ঘটনাগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে, সেগুলির মধ্যে উপমা ও উপমেয়র সঙ্গে বক্তব্যের লক্ষ্য কি সেগুলির দিকে মনোনিবেশ ক'রলে অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে রুদ্রাক্ষের বক্তব্যে রুদ্রের উত্তেজনা, অবসাদ ও অশ্রুপাতের উপমার অন্তর্নিহিত রহস্য আছে বলে মনে হয়।

রুদ্রাক্ষ প্রধানতঃ শৈব, শাক্ত, সৌর গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা মালা ধারণ অথবা মন্ত্রজপের সংখ্যা রাখার জন্য মাল্যরূপে ব্যবহার ক'রে থাকেন। উত্তরকালে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভাবধারার প্রতীকস্বরূপ বহু সাধারণ সংসারী লোকের মধ্যে এটি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। বাস্তববাদীদের কাছে এসবের উপযোগিতা গৌণ। কিন্তু এটা কি মনে হয় না যে, তাঁরা কি অহেতুক এই ভূতের বোঝা বয়ে বেড়ান?

কিন্তু কেন? আমরা কি কোনদিন একথা ভেবেছি বা অনুসন্ধান ও বিচার ক'রেছি? আর অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এ সম্পর্কে অনুধাবন ক'রেছেন? আলোচনা প্রসঙ্গে এক

বিহারবাসী ফকিরছায়েব মন্তব্য ক'রলেন যে—

> "সন্দল (চন্দন) আউর রুদ্রাকস্ ইয়ে দোনো দিমাগ্ আউর দিল্ কো কুবত্ দেতা হ্যায়"।

অর্থাৎ চন্দন এবং রুদ্রাক্ষ, এই দুটি জিনিস মস্তিষ্ক ও হৃদ্‌যন্ত্রকে বল দান করে। কথাটা খুব যৌক্তিক, প্রাচীন কাহিনীর এইখানেই বাস্তবতা, কারণ এটি রক্তস্রোত ও স্নায়ুর স্নিগ্ধতা সাধন করে বলেই রুদ্রের অশ্রুপাত ও অবসাদের অবতারণা।
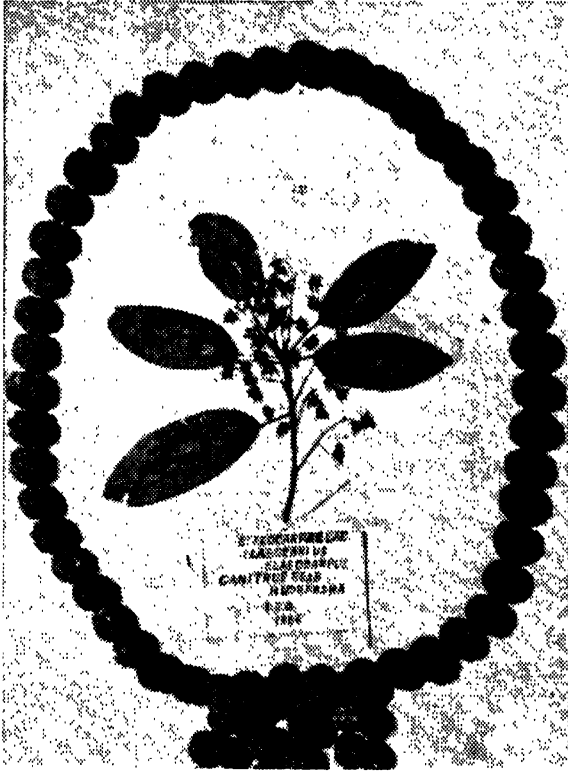
তা ছাড়া আমরা রত্ন ধারণ করি, সেও দ্রব্যের এক স্বতন্ত্র প্রভাব স্বীকার করি ব'লে। মনে হয় ধর্মের অনুশাসনে স্বাস্থ্যরক্ষার এটিও একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আয়ুর্বেদের সংহিতাগ্রন্থে রুদ্রাক্ষ নামীয় কোন দ্রব্যের ব্যবহার, এমনকি নামোল্লেখ পর্যন্ত দেখা যায় না, তবে অন্য কোন নামে এটি ব্যবহৃত হ'য়েছে কিনা, সেটা আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। যদিও সেটা আলোচনার বিষয়বস্তু নয়, তথাপি এটাও চিন্তনীয়

যে, হিমগিরির সানুদেশের উদ্ভিদগুলিকেই ঔষধার্থে যাঁরা ব্যবহার ক'রেছেন, এই রুদ্রাক্ষ তাঁদের কাছে উপেক্ষিত হওয়া খুবই আশ্চর্যের বিষয়। তবে এটা দেখতে পাই যে, রসতান্ত্রিকদের ঔষধ (বসন্ত রোগের) "দুর্লভ রস" নামক ঔষধে এই রুদ্রাক্ষের ক্বাথ ব্যবহার করা হ'য়েছে এবং রাজনিঘণ্টু নামে আমাদের এক বৈদ্যক দ্রব্যাভিধানে এই গাছটির গুণাগুণের বর্ণনা লেখা আছে যে, এটি উষ্ণগুণসম্পন্ন; ইহা বাত, কৃমি, শিরোরোগ, ভূতগ্রহ, বিষনাশক এবং রুচিকারক।

স্বরূপনির্ণয় ও পরিচিতি

এটি এলিওকারপাসি (Elaeocarpaceae) ফ্যামিলিভুক্ত, সমগ্র পৃথিবীতে এর ৯০টি প্রজাতি (species) আছে; তার মধ্যে ভারতবর্ষে ১৯টি বর্তমান। গাছটি দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের মাঝারি ধরণের বকুল (Mimusops elengi) গাছের সংগে সাদৃশ্য আছে। তার গুচ্ছবদ্ধ ফল আকারে ও বিন্যাসে পিটুলি গাছের (Trewia nudiflora) মত। ফলের শাঁস টক, এই শাঁস মৃগী রোগে উপকারী। নেপালে এটির আচার তৈরী ক'রে খাওয়ার রেওয়াজ আছে। এর বীজগুলি সাধারণতঃ ৫টি কোষ (কোয়া) একত্রীভূত অবস্থায় থাকে, প্রতি দুটি কোষের মাঝখানে একটি রেখা বর্তমান, এই রকম ৫টি রেখাযুক্ত রুদ্রাক্ষকে 'পঞ্চমুখী' বলা হয়, এইটি হচ্ছে স্বাভাবিক। এভিন্ন বীজের গঠনের অস্বাভাবিকতার জন্যে এক থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত রেখাযুক্ত রুদ্রাক্ষও পাওয়া যায়, তবে তার দামও অস্বাভাবিক।

এটা প্রধানভাবে জন্মে নেপাল, আসাম ও দক্ষিণ কঙ্কনঘাট অঞ্চলে, অন্যান্য স্থানেও কখনও কখনও দেখা যায়, তবে রোপণের প্রয়োজন হয়। এটির বোটানিক্যাল নাম Elaeocarpus ganitrus Roxb., (এলিওকারপাস্ গ্যানিট্রাস)। আর একটি জাতির রুদ্রাক্ষ জাভা থেকে আসে, ওখানকার সোরাবায়া, কাবুমেন্ সোলো, সামারন ও কাডোরীর পাহাড়িয়া অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়; এই জাতীয় বীজগুলি ছোট, উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে এটির নাম Elaeocarpus tuberculatus. নকল রুদ্রাক্ষও বাজারে বিক্রি হয়।

ঔষধার্থে লৌকিক ব্যবহার—

(১) সংক্রামক রোগ, বিশেষতঃ বসন্তরোগ প্রতিষেধক ব'লে বহু লোক ধারণ করেন। রাজস্থানের বৈদ্য সম্প্রদায় এই রোগে রুদ্রাক্ষ ঘষে গায়ে লাগাতে দিয়ে থাকেন।

(২) শ্লেষ্মার আধিক্যে যে সব রোগ সৃষ্টি হয়, কোন কোন প্রদেশে এটি ঘষে খাওয়ানো হয়।

(৩) টি, বি, রোগের (ক্ষয়রোগ) প্রথমাবস্থায় তুলসীমঞ্জরীর সংগে রুদ্রাক্ষ ঘষে (চন্দনের মত) খাওয়ালে চমৎকার ফল হয়।

(৪) আর একটি বিশিষ্ট শক্তি হ'চ্ছে, রোগীর নাড়ী ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকলে হৃদ্‌যন্ত্রকে সক্রিয় রাখার জন্যে গ্রামবাংলার প্রাচীন বৈদ্যকুলের 'কোরামিন্' ছিল রুদ্রাক্ষ ঘষা ও মধু দিয়ে মকরধ্বজ খাওয়ানো।

ভেষজ বিজ্ঞানীগণের কাছে আমার আর একটি আবেদন আছে—আয়ুর্বেদের মূল সিদ্ধান্ত হ'চ্ছে—প্রতি দ্রব্যের মধ্যে ৪টি জিনিসের অস্তিত্ব বর্তমান। যথা—রস, বীর্য, বিপাক ও প্রভাব, প্রথমোক্ত তিনটির প্রত্যক্ষতা প্রমাণ করা যায়, শেষোক্ত প্রভাবটি কিন্তু দ্রব্যগুণাদির সম্পর্কশূন্য নয়; কারণ প্রতিটি দ্রব্যের প্রভাবের ক্ষেত্রটিও বিশেষ গুণান্বিত;

অর্থাৎ শ্লেষ্মানাশক দ্রব্যের প্রভাব কখনও বাত পিত্তকে প্রকুপিত ক'রে হয় না, আর বিরোধীও হয় না। অতএব প্রভাব একটি বিশেষ গুণেরই স্বতন্ত্রতার সূচক। ভাল বা মন্দ যাই হোক, এটা ঋষিসিদ্ধান্ত। সুতরাং যন্ত্রবিজ্ঞানের বিচারে কিছু পাওয়া গেল না বলেই যে সে দ্রব্যের কোন উপকারিতা বা অপকারিতা নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে প্রয়োগের ফলাফল দেখতে অনুরোধ করি।

এ সম্পর্কে একটি প্রসঙ্গ উদ্ধৃত ক'রছি—

গত ১৯৬৫ সালে অক্টোবর মাসে লস এঞ্জেলস (Los Angeles) কালিফোর্ণিয়া থেকে প্রকাশিত Self-Realization নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় এই রুদ্রাক্ষ সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ করে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন। তাঁরা লিখেছেন—ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের চিরবিশ্বাস যে—রুদ্রাক্ষে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক প্রভাব বর্তমান। এটি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। "It conveys electro magnetic influences" ।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Vitamin viz., vitamin-C. (b) Acid viz., citric acid. (c) Traces of fixed oil. (d) Alkaloids viz., elaeocarpidine, (+) elaeocarpiline, (—) isoelaeocarpiline, (±) elaeocarpine, (±) isoelaeocarpine, (+) isoelaeocarpicine.

হরিদ্রা

সমাজে, সাহিত্যে আচার-আচরণে, মাঙ্গলিক কাজে যেটি অপরিহার্য তাকেই আর একটি প্রতিষ্ঠিত দ্রব্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলা হয় 'সর্ব ঘটে কাঁঠালী কলা' অর্থাৎ দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের মধ্যে প্রাক্-আর্যকাল থেকে এমন একটি ভেষজ ও আহার্যকে আমরা পরমাত্মীয় ক'রে নিয়েছি যেটি আমাদের বহুক্ষেত্রেই অপরিহার্য দ্রব্য, তাই গ্রামাঞ্চলে আজও একটা কথা আছে—'সব বিষয়ে যে মাথা গলায়', তাকে নিয়েই আমরা উপমা দিয়ে থাকি হলুদের গুঁড়োর সঙ্গে। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই হরিদ্রার (যার চল্‌তি নাম হলুদ) উপযোগিতার এটি একটি উপমা। লোকসাহিত্যেও তার শ্রেষ্ঠত্বের গাথা দেখা যায়, যেমন বলা হ'য়েছে "তোদের হলুদ মাখা গা (দেহ), তোরা সোজা রথে যা। আমরা হলুদ কোথায় পাবো, আমরা উল্টোরথে যাবো"। এটি বর্ণের উজ্জ্বলতা ও কান্তি রক্ষার একটি বিশিষ্ট উপাদান ব'লেই কৃষ্ণকায়ার খেদোক্তি ও অস্ফুট মর্মকথা।

এই হরিদ্রা বা হলুদের ব্যবহার যে এ যুগেই হচ্ছে তা নয়—কি আর্য কি প্রাক্-আর্য সর্বযুগেই তার প্রাধান্য দেওয়া হ'য়েছে।

বৈদিক যুগের সমীক্ষা—ঋক্‌বেদ ১০।৮৬।৩ এবং শুক্ল যজুর্বেদ ১৩।২০।১৩ এই দুই বেদেই হরিদ্রাকে বর্ণ, রুচি ও দীপ্তির জন্য চিহ্নিত করা হ'য়েছে।

> হরিতা ত্বমিমা ওষধিঃ সোমঃ সাদন্যং বিদুথ্যা সভেয়ং।
> হিরণ্যগর্ভা ত্রিদিবাসু শোণিতং ইচ্ছন্তি গ্রাবাণঃ সমিধানে অগ্নৌ॥

সায়ণ কৃত ভাষ্যে বলা হয়েছে—

> ওষধিষু ত্বং হরিতা, হরিদ্রা সোমস্য=চন্দ্রস্য সভেয়ং
> কান্তি=মণ্ডলং দধাতু। ত্রিদিবাসু দেবানাং
> শোণিতং গ্রাবাণঃ ত্বং সমিধানে অগ্নৌ।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—হে হরিদ্রে তোমার বর্ণ সূর্যের একটি উজ্জ্বল কিরণের মত, তাই হরিৎ; তুমি দেবতাদের দেহ উজ্জ্বল স্বর্ণ-বর্ণ ক'রে দাও। শোণিতের মন্থন ক'রে তাকে স্বর্ণ-বর্ণ ক'রে দাও।

যজুর্বেদের পরবর্তী আর একটি সূক্ত—

হরিৎ হরিদ্রং প্রতনু বিশ্বমস্য শোণং রুক্ম মাস্যং দেবানাং।

এর ভাষ্যে সায়ণ ব'লেছেন—

হে হরিদ্রং=হরিদ্রে, ত্বং হরিৎ সূর্য্যাশ্ব বর্ণে অস্য
শোণং=শোণিতং রুকম্ বর্ণং কুরু।

হরিদ্রার শব্দবিন্যাসে বলা হয়েছে—

হৃ+ইতচ হরিৎ তৎ দ্রবতি হরিদ্রম্।

শুক্ল যজুর্বেদের আর একটি সূক্ত—

"যাস্তে রুচো আতন্বন্তি রশ্মিভিঃ তাভির্নো
সর্ব্বাভৌ রুচে জনায় ন কৃধি হরিদ্রে"

মহীধর ভাষ্য—

হে হরিদ্রে তে যা রুচঃ তিষ্ঠন্তি তাভিঃ=রশ্মিভিঃ
অস্মাভীরুচো কৃধি"।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—হে হরিদ্রা, তোমার শরীরে যে অগ্নিতুল্য কান্তি রয়েছে সেই কান্তি আমাদিকে দাও।

এখানে একটি কথা বলা দরকার যে, বেদভাষ্যকার যাঁরা, তারা ৩টি ধারাকে অবলম্বন ক'রে ব্যাখ্যা ক'রেছেন। প্রথমটি হলো—পরোক্ষ বৃত্তিক, এটা হলো—যেখানে কোন কিছুকে বোঝাতে অপর কতকগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারা বলা হয় সেইটি হ'লো পরোক্ষ বৃত্তিক। দ্বিতীয়টি হ'লো—অপরোক্ষ বৃত্তিক, এটা হ'লো—যেখানে সোজাসুজি কোন কিছুর অর্থ বোঝানো হয় সেটা হ'লো অপরোক্ষ বৃত্তিক। তৃতীয়টি অধ্যাত্ম বৃত্তিক এটিতে চেতন বা আত্মাকে বোঝাতে কিছু উপলক্ষ্য ক'রে বলা হয়—এই অধ্যাত্ম বৃত্তিকের নামই "উপনিষৎ"।

বেদোক্ত এই আয়ুর্বেদের অংশটি পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বৃত্তিককে অবলম্বন ক'রে বর্ণনা করা হ'য়েছে।

বেদোত্তর যুগে— গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু ঐ বৈদিক সূক্ত, তাকেই বিশ্লেষ করা হ'লো জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের ক্ষেত্রভেদে মৌলিক উপাদানকে নিয়ে, সেটি তার প্রকৃতিগত পার্থক্যের উপরই বেশী নির্ভর করে। তারপর করা হ'লো তার পৃথক পৃথক নামকরণ। কারণ রস, বীর্য, বিপাক প্রভাবও লুকিয়ে র'য়েছে দ্রব্যের মধ্যে।

শরীরের উপর দ্রব্যের প্রভাব— দ্রব্য মাত্রেরই মূল উপাদান হ'চ্ছে—পঞ্চমহাভূত, শরীরেরও পৃথক সত্ত্বা তার থেকে অন্য কিছু নেই। মানব শরীরের সেই মূল উপাদানকে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটির মধ্যে সন্নিবেশ করা হ'য়েছে; ক্ষিতি ও অপ্ হোলো কফ, তেজ হ'চ্ছে পিত্ত, আর মরুৎ ও ব্যোম হ'লো বায়ু—এরই স্থিতাবস্থায় নীরোগ দেহ, আর যে কোন একটির অস্বাভাবিকতায় রোগ সৃষ্টি; উপকরণ হিসেবে ঐ পঞ্চমহাভূতাত্মক দ্রব্যই তার রোগ প্রতিকারে সহায়ক হয়। কোন ক্ষেত্রে বিপরীতধর্মী দ্রব্যের দ্বারা প্রতিরোধ বা প্রতিষেধ অথবা অভাবের পোষক দ্রব্যের দ্বারা তার স্বধর্ম রক্ষা; এ ভিন্ন আবার সদৃসবাদী চিকিৎসার একটা ধারাও প্রচলিত আছে। রোগের ক্ষেত্রে দ্রব্যের প্রয়োগও এই সদৃসবিধান চিন্তাধারায় স্থিরীকৃত হ'য়েছিলো।

চরক সংহিতায় দেখা যায় হরিদ্রাকে ব্যবহার করা হ'য়েছে মল সঞ্চয়হারিত্ব দ্রব্য হিসেবে; আবার রোগের ক্ষেত্রেও তাকে ব্যবহার করা হ'য়েছে লেপনক দ্রব্য হিসেবে, কারণ বহিরাগত সংক্রামক বীজ থেকেও যে বহু রোগের প্রজনন হয়, সেইজন্যই কুষ্ঠ ও বিষদোষ নাশে হরিদ্রার ব্যবহার। সুশ্রুত সংহিতায় তৎকালের সমীক্ষালব্ধ জ্ঞানে হরিদ্রার প্রভাব নামক শক্তির একটি ক্ষেত্র আছে এটা স্বীকৃত হ'য়েছে; বোধ হয় সেইজন্যই আমাদের ব্যঞ্জনাদির উপস্কার বা মশলা হিসেবে হরিদ্রাকে সহযোগী ক'রে নিয়েছি, কারণ আহার্য জীর্ণ হওয়ার পর দেহকে পোষণ করে রস এবং তা থেকে রক্ত মাংস মেদ প্রভৃতি ধাতুতে রূপান্তরিত হয়, তাই সপ্তধাতুর মধ্যে রসও একটি ধাতু। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমাতিসারে আমদোষের পাচনে, শীতপিত্তে (Urticaria)

ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, শোথ ও সর্বপ্রকার মেহ রোগে, এমন কি শুক্রদোষেও হরিদ্রার ব্যবহার। তা ছাড়া সর্বপ্রকার কফপিত্তজ ব্যাধিতেও।

আয়ুর্বেদের সুপ্রাচীন চিন্তাধারায় বিসর্প, কর্দমক বিসর্পের মত রোগেও হরিদ্রার ব্যবহার, এ সবই কফপিত্তজ ব্যাধি; এগুলি রস, রক্ত, মাংস এই তিনটি ধাতুকে দূষিত ক'রে এককালে সৃষ্ট হয়, তখন রোগের বিচরণ ক্ষেত্র দেহ জগতে প্রায় সর্বত্র, বিশেষ ক'রে গ্রন্থিগুলিতে।

প্রকার ভেদ

বনৌষধির গ্রন্থে চারপ্রকার হরিদ্রার কথা উল্লেখিত হ'য়েছে (১) হরিদ্রা (চলতি নাম হলুদ), (২) আম্রগন্ধি হরিদ্রা, (৩) বন হরিদ্রা, (৪) কর্পূর হরিদ্রা। এরা সবই কন্দ জাতীয় (tuberous root.), কিন্তু নব্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের গ্রন্থে এই গণে (genus) বহু প্রকারের উল্লেখ দেখা যায়। আমার বর্তমান নিবন্ধোক্ত হরিদ্রার বোটানিক্যাল নাম Curcuma longa Linn. একে বর্তমানে Curcuma domestica Valeton বলাও হয়, ফ্যামিলি zingiberaceae.

কোথায় কি ভাবে কাজে লাগে

১। **খাদ্যে**— নিত্য আহার্য ব্যঞ্জনের রং করার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ এটার যে ব্যবহার হয়েছে তা নয়; নিত্য সেবনের ব্যবস্থাও দেওয়া আছে শারীরিক প্রয়োজনে।

২। **উদ্বর্তনে**— পূর্বে শিশুদের মাঝে মাঝে 'তেল হলুদ' মাখিয়ে স্নান করানো হ'তো, এমন কি আমাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীও বাদ যেতো না; ওদের মাখানোর উদ্দেশ্য কোন রকম ব্যাক্‌টিরিয়াল্ ইনফেক্‌শন (Bacterial infection) না হয়, সাধারণতঃ যার দ্বারা চুলকণা, খোস্ (পাচড়া) প্রভৃতি হয়ে থাকে। তা ছাড়া এর দ্বারা আরও একটি উদ্দেশ্য সাধিত হ'তো—দেহের রং-এর ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো (বৃদ্ধি করা)। এই জন্যই হরিদ্রার আর একটি নাম "বর্ণ বিধায়িনী"; কিন্তু সে রীতি বর্তমানে উঠে যাচ্ছে, সেটা বেশী লক্ষ্য পড়ে বাংলায়। এখনো অনেকে ঝরা বয়সেও মসুর ডাল ও কাঁচা হলুদ বেটে দুধের সর মিশিয়ে মুখে হাতে মেখে থাকেন, মুখের লালিত্য কিছুটা বজায় রাখার প্রয়াসও বলা যায়।

৩। **প্রমেহে**— প্রস্রাবের জ্বালার সংগে পুঁজের মত লালা ঝ'রলে, কাঁচা হলুদের রস ১ চামচ একটু মধু বা চিনি মিশিয়ে খেতে হয়। এমন কি এর দ্বারা অন্যান্য প্রকার মেহ রোগেরও উপশম হয়।

৪। **কৃমিতে**— কাঁচা হলুদের রস ১৫।২০ ফোঁটা (অবশ্য বয়স হিসেবে) সামান্য লবণ মিশিয়ে সকালে খালি পেটে ব্যবহার ক'রতে দিয়ে থাকেন গ্রামাঞ্চলের বৈদ্যগণ। এই জন্যই হলুদের একনাম 'কৃমিঘ্ন' অর্থাৎ কৃমিনাশকারী।

৫। **যকৃৎ দোষে**— পাণ্ডু রোগে ফ্যাকাসে রং আসছে বুঝলে হলুদের রস ৫।১০ ফোঁটা থেকে আরম্ভ ক'রে (বয়স হিসেবে) এক চামচ পর্যন্ত (চা চামচ) একটু চিনি বা মধু মিশিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন প্রাচীনপন্থী বৈদ্যগণ।

৬। **তোত্‌লামিতে** (Stammering)—ছোটবেলায় যাদের কথা আটকে যায় অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে দ্রুত কথা বলার অভ্যাসে, সে ক্ষেত্রে হলুদকে গুঁড়ো ক'রে (কাঁচা হলুদ শুকিয়ে গুঁড়ো করা চাই); এটা নিতে হবে ২।৩ গ্রাম, সেটাকে ১ চা-চামচ আন্দাজ

গাওয়াঘিয়ে একটু ভেজে সেটাকে ২।৩ বার অল্প অল্প ক'রে চেটে খেতে হয়, এর দ্বারা তোতলামি কমে যায়; এসব খানদানী কবিরাজ গোষ্ঠীর ব্যবহারিক যোগ।

৭। **ফাইলেরিয়ায়—** এই রোগটির আয়ুর্বেদিক নাম শ্লীপদ—এক্ষেত্রে কাঁচা হলুদের রসে (১ চামচ আন্দাজ) অল্প গুড় ও ১ চামচ আন্দাজ গোমূত্র মিশিয়ে খেতে ব'লেছেন আমাদের প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থকার চক্রপাণি দত্ত। আমবাতেও তাঁর এই ব্যবস্থা।

৮। **হামজ্বরে—** কাঁচা হলুদকে শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে সঙ্গে উচ্ছেপাতার রস ও অল্প মধু মিশিয়ে খাওয়ালে হামজ্বর সেরে যায়।

৯। **এলার্জিতে—** খাদ্য বিশেষে অনেকের দেহ চাকা চাকা হ'য়ে ফুলে ওঠে, চুলকোয়, লাল হয়—সেক্ষেত্রে নিমপাতার গুঁড়ো ১ ভাগ, কাঁচা হলুদ শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে সেটা ২ ভাগ এবং শুষ্ক আমলকীর গুঁড়ো ৩ ভাগ একসঙ্গে মিশিয়ে সেটা থেকে ১ গ্রাম (১৫ গ্রেণ) মাত্রায় সকালে খালি পেটে বেশ কিছু দিন খেতে হয়। ক্রিয়া আছে, প্রতিক্রিয়া নেই।

১০। **পিপাসায়—** পাঁচ/সাত গ্রাম কাঁচা হলুদ থে'তো ক'রে দেড় কাপ আন্দাজ জলে ৫।১০ মিনিট সিদ্ধ ক'রে ছে'কে নিয়ে সেই জলে অল্প চিনি মিশিয়ে এক চামচ ক'রে মাঝে মাঝে খেলে শ্লেষ্মাজনিত পিপাসা চ'লে যায়।

১১। **হাঁপানিতে—** হলুদ গুঁড়ো, আখের (ইক্ষু) গুড় আর খাঁটি সরষের তেল একসঙ্গে মিশিয়ে চাটলে একটু উপশম হয়।

১২। **চোখ উঠলে—** (নেত্রাভিষ্যন্দে) হলুদ-থে'তো জলে চোখটা ধোওয়া আর ঐ রসে ছোপানো ন্যাকড়ায় চোখ মুছে ফেলা। এর দ্বারা চোখের লালও কাটে আর সারেও তাড়াতাড়ি।

১৩। **জোঁকে ধ'রলে—** জোঁকের মুখে হলুদ বাটা বা হলুদ গুঁড়ো দিলে জোঁকও ছাড়ে রক্তও বন্ধ হয়।

১৪। **বিষাক্ত ক্ষতে—** বিশেষ ক'রে কার্বাঙ্কল জাতীয় (আয়ুর্বেদিক ভাষায় 'বল্মীক স্ফোটক') ফোড়ায় কাঁচা হলুদ বাটায় গোমূত্রে মিশিয়ে, সেটি অল্প গরম ক'রে দিনেরাত্রে কয়েকবার লাগালে কয়েকদিনেই দূষিত পু'জপড়া বন্ধ হ'য়ে যায়। এসব ভুক্তভোগীর দেওয়া নামচা।

১৫। **মচকানো ব্যথায়—** কোন জায়গায় মচকে গেলে বা আঘাত লাগলে চুণ, হলুদ ও নুন (লবণ) মিশিয়ে গরম ক'রে লাগালে ব্যথা ও ফুলো দুই-ই কমে যায়। এ কথা তো সকলেরই জানা।

১৬। **ফোড়ায়—** পোড়া হলুদের ছাই জলে গুলে সেটা লাগালে ওটা পাকে ও ফেটে যায়। আবার গুঁড়ো লাগালে শীঘ্র শুকিয়েও যায়।

১৭। **স্বর ভঙ্গে—** কোন সাধারণ কারণে গলা ধ'রে (স্বর রুদ্ধ) গেলে ২ গ্রাম আন্দাজ হলুদের গুড়োর সরবৎ (চিনি মিশিয়ে) একটু গরম ক'রে খেলে চমৎকার উপকার হয়।

এ সব ছোট ছোট প্রক্রিয়া করার অর্থ—(১) স্বল্প ব্যয়, (২) অনাড়ম্বর ব্যবহার পদ্ধতির প্রবর্তন, (৩) ত্বরিত উপশম, (৪) স্থায়ী নিরাময়।

যদিও এ সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা যেন বালুকার দ্বারা সেতুবন্ধের সাহায্যে কাঠবিড়ালীর ভূমিকার মত; কারণ চিকিৎসা কার্যটির পরিধি ক্ষুদ্র নয়, তবে অনেক ব্যাধিই অকস্মাৎ বৃহৎ হ'য়েও দেখা দেয় না, সে সব ক্ষেত্রে কু-চিকিৎসা না হ'লে এমনি স্বল্পায়াস চিকিৎসাতেই সুস্থ হওয়া যায়।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Colouring matter viz., curcumin. (b) Alkaloid viz., zingiberine.. (c) Antiseptic oil containing p-toylmethyl carbinol, ketonic and alcoholic constituents.

দূর্বা

পুরাণ কাহিনীতে জন্মরহস্য— ক্ষীর-সমুদ্রে মন্থনের সময় বাসুকীকে নাকি রজ্জু করা হয়েছিলো, দেব আর অসুর উভয় পক্ষই ছিলেন সেই রজ্জুর দুটি প্রান্তের ধারক। ঘর্ষণের দণ্ড ছিল মন্দর পর্বত। সেই ঘর্ষণের সময়েই বিষ্ণুর শরীরও ঘর্ষিত হয়, তাতে তাঁর গাত্রের রোমগুলি উঠে যায়; সেগুলি সমুদ্রের তরঙ্গে ভেসে ভেসে তীরে লাগে; তা থেকে জন্ম হ'লো দূর্বার। দূর্বার জন্মরহস্যটি এমনি এক রূপকের ঘেরাটোপে ঢাকা। তাতেই মনে হয়—বিশ্বকে বিষ্ণুরূপ এবং তাঁরই দেহ থেকে উদ্ভূত দূর্বাকে তাঁর রোম-স্বরূপে কল্পনা।

এর অন্তরালে আছে দূর্বা যে সর্বপ্রকার জীবকল্যাণকারী এটিও একটি রহস্যবাদ। ভারতীয় সংস্কৃতির মুগ্ধসমাজ পূজা ও ব্রত-পার্বণে তাঁকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথিতে, দূর্বাষ্টমী ব্রতান্তে দূর্বাকে অঙ্গে ধারণবিধি, তাই তাঁরা বলেন—

"যথা শাখা প্রশাখাভিঃ বিস্তৃতাসি মহীতলে।
তথা মমাপি সন্তানং দেহি ত্বমজরামরম্"।

অর্থাৎ হে দূর্বে, তুমি যেমন পৃথিবীতে শাখা-প্রশাখায় নিজেকে বিস্তৃত কর, তেমনি

কর আমার সন্তান-প্রবাহ, আর কর আমার দেহকে অজর ও অমর। দূর্বার বিস্তৃতি ও স্নিগ্ধতা ভাদ্রের পূর্বে হয় না, মধুর রসের সঞ্চারও ভাদ্রের পর থেকে, ইতঃপূর্বে দূর্বায় থাকে কিছু কষায়তিক্ত রস, তাই এইসব সূত্রের অন্তঃরহস্যকে কেন্দ্র ক'রেই উত্তরকালে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে দূর্বাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা তাতে উপলব্ধজ্ঞানটি যে আরও বহু নূতন তথ্যের আবিষ্কারে আবদ্ধ করা হ'য়েছে। বৈদিক তো বটেই, প্রায় লৌকিক সব শুভ অনুষ্ঠানেই দূর্বাকে উপস্থিত করা এবং তাকে অঙ্গে ধারণ করার রীতি। রসকৌতুকী সাহিত্যিকগণ আর একটু আক্ষেপ বিমর্শের রসান দিয়ে ব'লে থাকেন—

'এই দুব্বো কিন্তু হাড়ে গজায়' শুনতে কৌতুকবোধ হ'লেও শব্দটি বাস্তবজীবনের তৃতীয় চতুর্থাংকে এসে বোধ করি এমন অনেক হিন্দুই উপলব্ধি ক'রেন যে, সংসার-পারাবার মন্থন ক'রতে অনেকেরই যেন অস্থি চূর্ণ হ'য়ে দূর্বার মত জীবন-সাগরে ভেসে যায়।

উত্তরকালে এমনি প্রশ্ন তুলেই আরও জানতে ইচ্ছে হয়, এত জিনিস থাকতে এই দূর্বাকে কেন হাতে বাঁধা হ'লো? এর তাৎপর্যই বা কি? কেনই বা সর্বভারতীয় বৈদিক লৌকিক ও মাঙ্গলিক কার্যে যব বা ধানের সঙ্গে দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদের বিধি হ'লো?

তাতে সামাজিক উপযোগিতা না দৈহিক উপকারিতা—না উভয়ই? সেইটাই বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তু।

ধান-দূর্বা— ধান, যব ও তিল হ'চ্ছে সমগ্র মানবশ্রেণীর প্রাণৈষণার প্রথম উপাদান; আর দূর্বা সেই খাদ্যশস্যগুলির জন্মভূমিকে সবলে ধারণ ক'রে রেখে তার ক্ষয় নিবারণ এবং আধিভৌতিক বিপদ থেকে রক্ষা করে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে যক্ষ, রক্ষ, অসুর, গ্রহ প্রভৃতির আধিভৌতিক বিপত্তিকে দূরীভূত করার দৈব প্রয়াসও দেখা যায়; তাই উভয়তঃ এইসব ব্যাপক কল্যাণের প্রতীকরূপে দূর্বাকে গ্রহণ করা হ'য়েছে। এর গূঢ় তথ্যটি কিন্তু লুকিয়ে আছে বৈদিক চিন্তাধারার একটি দিকে। আর বাহ্যদৃষ্টিতে ধান বা যব যেমন প্রাণ উজ্জীবনের সম্পদ তেমনি দূর্বাও হ'চ্ছে প্রজাস্থাপনের (Fecund) বা জননীয় (জননোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি-কারী) উপাদান। তাই তাকে "ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্" এইটারই প্রতীক স্বরূপ ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদের প্রচলন। কারণ—দূর্ব্বে "বংশো বর্দ্ধতাম্" অর্থাৎ এই দূর্বার মত তোমার বংশবৃদ্ধি হোক্।

নাম-মাহাত্ম্য—

"দূর্ব্বা ইব তন্তবঃ" (ঋক্‌বেদ ১০।১৩৪।৫ সূক্ত)

মহীধর ভাষ্য ক'রলেন—

"দূরোসু ভূমিষু বায়তে যজতে দূর্ব্বা"

অর্থাৎ দূরের ভূমিতেও যে যায়, সেই দূর্বা। আর অথর্ববেদের ভাষ্যে বলা হয়েছে—

"দূর্ব্বা হিংস্রাশ্রয়া তৃণলতা" অন্যান্ ভূমিজান্ দূর্ব্বায়তে=
হিংসতে দূর্ব্বা ৫।১৯।৩২৭।

উপমা দেওয়া আছে—নারীচরিত্রের সঙ্গে—স্বভাবে সে সমগোত্রীয়? অর্থাৎ সে তার আত্মএলাকায় কোন তৃণকে বিস্তার লাভ ক'রতে দিতে চায় না; তাই দূর্বার একনাম হিংস্রা।

শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয় সংহিতার ১৩।২০ সূক্তে—

'কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পুরুষঃ পরুষস্পরি।
এব নো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ।'

এই সূক্তটির পরবর্তী সূক্তগুলিতে—দূর্বার ভৈষজ্য শক্তির পরিচয় দেওয়া আছে। যজুর্বেদের ঐ স্থানের আর একটি সূক্ত—

'যা তে শতেন প্রতনোষি সহস্রেণ বিরোহসি।
তস্যাস্তে দেবীষ্টকে বিধেম হবিষা বয়ম্॥'

আরও পরে—

যাস্তে অগ্নে সূর্য্যে রুচো দিবমাতন্বন্তি রশ্মিভিঃ।
তাভি র্নো অদ্য সর্ব্বাভীরুচে জনায় ন স্কৃধি॥'

আরও পরে—

'যাবো দেবাঃ সূর্য্যে রুচো গোস্বশ্বেষু যারুচঃ।'

এর পরে পরে ঐ দূর্বাকে নিয়েই কয়েকটি সূক্তের উপস্থাপনা। প্রতিটি সূক্তের সার বক্তব্য—দূর্বার কান্তি, দূর্বার শক্তির সঙ্গে ঘৃতের এবং সূর্যকান্তির যোগের কথা।

এইসব সূক্তের অর্থকে নিয়েই পরবর্তী আয়ুর্বেদ সংহিতার যুগে ভৈষজ্যশক্তির উন্মেষ। দূর্বার সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় শক্তি সে পিত্তঘ্ন।

অতএব বিকারপ্রাপ্ত পিত্তের প্রকোপে লাবণ্য নষ্ট হয়, শরীরে তাপের মাত্রা বাড়ে, শরীরের দৃঢ়তা নষ্ট করে, কৃশতা আনে, উৎসাহ দূর করে। এছাড়া আলস্য, ক্লীবতা, অজ্ঞানতা, বিকৃতি-দর্শন, ক্রোধ, অহর্ষ, মোহ, অশৌর্য, অবিপাক (বদহজম) প্রভৃতি আসে। তাই বিকারপ্রাপ্ত পিত্তকে সাম্যাবস্থায় আনতে দূর্বার তুল্য দ্বিতীয় বস্তু নেই। পিত্ত-বিকারে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা 'অন্তর্মাজন'—অর্থাৎ যেসব ঔষধ শরীরে প্রবেশ ক'রে আহারজাত দোষগুলির মার্জনা করে, তারই নাম অন্তর্মাজনী চিকিৎসা। যে দ্রব্য অন্তস্থঃ বিকৃতপিত্তকে সাম্যাবস্থায় আনে, তাই অন্তর্মাজনী চিকিৎসা।

এই বিকৃতপিত্তের প্রভাবে ৪০ প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। (সেই ৪০টি পিত্তবিকার রোগের তালিকা চরকের সূত্রস্থানের ২০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

শুধু মানবদেহে নয়—অখিল জগতের প্রাণীর দেহেই পিত্ত-বিকারের দ্বারা সাংঘাতিক সাংঘাতিক রোগের সৃষ্টি হয়।

আজকের আলট্রা-ভায়োলেট চিকিৎসার মধ্যে যে বিজ্ঞান—তার আদি সূত্র কিন্তু বেদেই পাওয়া যায়; সে সূক্তটি এই—

'সূর্য্যে রুচৌ দিবামাতন্বন্তি রশ্মিভিঃ।'

আরও দু'টি সূক্তে দেখা যায়—সূর্যরশ্মি এবং সূর্যের সঙ্গে দূর্বার যোগের উল্লেখ করে তারই সঙ্গে দেওয়া আছে ঘৃতের মধ্যেও সূর্যশক্তি ও দূর্বার শক্তি নিহিত আছে।

বেদে আরও পাওয়া যায়—দূর্বার দ্বারা পুত্রলাভ হয়—শুধু মানবেরই নয়, গো-অশ্বেরও সন্তানলাভ হয়।

সৌরশক্তির ও খাদ্যপ্রাণ শক্তির আধান রয়েছে দূর্বায়। সেই জন্য সংহিতাগ্রন্থগুলির এবং নিঘণ্টু গ্রন্থগুলির বিশেষ কয়েকটি পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—দাহ থেকে আরম্ভ ক'রে পিত্তের বিকারে যাবতীয় রোগ এক দূর্বার রস ও ঘৃতের দ্বারাই উপশমিত হয়।

আজকের দিগ্‌বিজয়ী নূতন বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হয়েছে 'ভাইরাস'—ভাইরাস কোনও প্রাণী নয়, অথচ জড় দ্রব্যও নয়; আবার প্রাণীও বটে এবং জড় দ্রব্যও সে। কেবল পরিবেশের অপেক্ষায় থাকে এই ভাইরাস। পরিবেশ পেলেই প্রাণবান, না পেলেই জড়। শেওলাও জড়, আবার সে প্রাণীও। পিত্তবিকার একাধারে জড়, একাধারে রক্তকণায় সে প্রাণ-সঞ্চার করে। ভাইরাসকে দূর করতে পারে দূর্বা, অর্থাৎ বেদের সূক্তে বলা হয়েছে—

'ইন্দ্রাগ্নীঃ তাভীঃ সর্ব্বাভীঃ রুচং নো ধত্তে বৃহস্পতে'
(যজুঃ—১৩।২০।২৩)

দূর্বার হরিৎ বর্ণটির দ্বারা জানতে হবে—এতে অদৃশ্য জড়াজড় প্রাণীটি নাই। যেমন সূর্যরশ্মি। যখনই সূর্যের কিরণ মেঘে বা কুয়াসায় অথবা অন্য কোন কুজ্‌ঝটিকায় আবৃত হয়, তখনই ভাইরাসের প্রাণশক্তির বিকাশ হবে। সেইজন্য কোন স্থানে ওকে 'যাতুধান', কোথাও ক্রিমি, কোথাও রক্ষাংসি প্রভৃতি ভাষায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। যাতু অর্থে হিংসা, আর ধান অর্থে যে তাকে পালন পোষণ করে। ভাইরাস জড়াজড় বস্তু; হিংস্রাশ্রয়ী প্রাণীকে সে পোষণ করে।

যার দেহে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ কম, তার দেহে লাবণ্যও তত কম, প্রভা কম।

তার মানে এই যে—সে দেহে সহজেই ভাইরাসের সঞ্চার হবে। দূর্বার রস সেক্ষেত্রে অমোঘ শক্তির প্রকাশ করে। অতএব দূর্বার মধ্যে পিত্তের সাম্যবিধায়িনী শক্তি, সূর্যের রশ্মি এবং ঘৃতের প্রভাধারিণী শক্তি নিয়েই সে জন্মগ্রহণ করে। ভারতে আয়ুর্বেদ সংহিতার সূত্রগুলির মধ্যে দূর্বার শক্তিরহস্যের বিশেষ উন্মেষই দেখা যায়। যে কোন পিত্তবিকারের ক্ষেত্রে দূর্বা আশ্চর্য শক্তি দেখায়—অন্তঃমার্জন চিকিৎসাটি দূর্বার দ্বারাই হয়।

তাই শোণিত-বিকারে দূর্বা যেমন ফলদা, তেমনি রজোবিকারেও। আবার অম্লপিত্ত, অম্লশূল ইত্যাদি পিত্তবিকারের সর্বক্ষেত্রে দূর্বা অপ্রতিহতবীর্যা।

যেগুলি ভাইরাস বা যাতুধান অথবা পিত্তবিকারজাত রোগ— হাম, বসন্ত, চোখ-ওঠা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও প্রভৃতি; এসবই যেমন ভাইরাসজাত, তেমনি অন্য ভাষায় এগুলি পিত্তবিকারদুষ্ট শ্লেষ্মা-সঞ্জাত—এটি চরকের 'জনপদ ধ্বংসনীয়' অধ্যায়ের ইঙ্গিত। এগুলি ছাড়াও ঋষিদের আবিষ্কৃততম আরও ৩২টি রোগ পিত্তবিকারজাত।

এসবের ক্ষেত্রেও দূর্বার রসকে ব্যবহারের তারতম্যের দ্বারা অনেকক্ষেত্রে আরোগ্য করানো যায় এর রসে পাক-করা ঘৃতের নস্য, ঐ ঘৃতের পান এবং ঐ ঘৃতের দ্বারা সিঞ্চন, ঐ রসের প্রলেপন এবং ধৌতীকরণ—উক্ত রোগগুলির নিরাময়ের সহায়ক হয়।

শ্রেণীভেদ

পরবর্তী যুগে বৈদ্যক গ্রন্থে নীল, শ্বেত বর্ণের এবং গণ্ড ও মালা সংজ্ঞার—এই ৪ প্রকার দূর্বার নামোল্লেখ দেখা যায়। এদের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে মতভেদ বর্তমান; যেমন নব্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের মতে—শ্বেত-দূর্বা পৃথক প্রজাতি নয়, ওটি এক ধরণের রোগগ্রস্ত। যাহোক, আলোচ্য নিবন্ধ সাধারণ দূর্বাকে কেন্দ্র ক'রেই; যার বোটানিক্যাল নাম Cynodon dactylon (Linn.) Pers. এটি Gramineae ফ্যামিলীভুক্ত।

কুসংস্কার না বৈজ্ঞানিক তথ্য?

এমন একটি যুগও ছিল, যে যুগের বস্তুবিজ্ঞান—বর্তমানের মত চুলচেরা অধ্যায়-গুলির যোজনায় নিযুক্ত ছিল না, কিন্তু সে বিজ্ঞান অনুশীলন করলে মনে হয়—তাঁদের পদ্ধতিগুলি বিজ্ঞানোন্মুখী। তারই একটি পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে এই দূর্বাকে কেন্দ্র ক'রে। এখনও বহু জায়গায় একটা অগভীর পাথর বা পিতলের পাত্রে জল নিয়ে বেশ কয়েকটা দূর্বা দিয়ে সকালে রোদ্রে রাখা হয়। ৩।৪ ঘণ্টা বাদে সেই জলে শিশুকে স্নান করানো হয়, জন্মের পর প্রথম কয়েক মাস পর্যন্ত। এ নিয়ে প্রশ্ন ক'রেছিলাম গ্রামের এক নিরক্ষরা প্রাচীনাকে—তাঁর সে উত্তরটা আজও আমার মনে আছে—'জান না ঠাকুর, এই জলে নাওয়ালে (স্নান করালে) ওদের পুঁয়ে পায় না'।

উত্তরকালে এই পুঁয়ে শব্দের অর্থ জেনেছি—সেটা বর্তমানের রিকেট রোগ; হয়তো মাটিতে এ রোগের সৃষ্টি তাই ভুঁইএর অপভ্রংশে পুঁয়ে।

আচ্ছা, এই সংস্কারের মধ্যে কি কোন বিজ্ঞান নিহিত আছে? অবশ্য বৈজ্ঞানিক বলেন যে সূর্যের কিরণে উদ্ভিদই রঞ্জনরশ্মি বেশী সংগ্রহ করে, কিন্তু এক দূর্বাকেই এত গুরুত্ব কেন দেওয়া হ'ল? এর ক্লোরোফিলে কিংবা বস্তু-সত্তায় এমন কিসের অস্তিত্ব রয়েছে যার দ্বারা রিকেট্ রোগের প্রতিষেধক হয়—সেটি গবেষণার বিষয়।

ব্যবহার—কোথায়—কেন ও কিভাবে

১। **রক্তপিত্তে:—** এই রোগটির অভিব্যক্তি শরীরের বিভিন্ন পথে হয়ে থাকে; মুখ, নাক ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন দ্বার দিয়ে রক্তস্রাব হতে পারে। এমন-কি রোমকূপ দিয়েও ঘর্মবৎ বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গত হতেও দেখা যায়। আয়ুর্বেদ মতে—এটা রক্তপিত্তের ক্ষেত্র; এক্ষেত্রে দূর্বার রস কাঁচা দুধ মিশিয়ে খাওয়ালে নিশ্চিত উপশম হয়। এ কথা চরকের। শুধু তাই নয়, এটি পরীক্ষিত এবং চিরাচরিত। উক্ত ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের শারীরবিদ্যার অন্য একটি বাস্তব দিগ্‌দ্রষ্টা সম্প্রদায়ের সংহিতা সুশ্রুতে বলা হয়েছে—দূর্বা শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে মধু মিশিয়ে চেটে খেলে একই কাজ হয়।

২। **সন্তান-লাভার্থে:—** যেকোন কারণেই হোক, গর্ভধারণে অসমর্থ হলে অথবা মৃতবৎসা হ'লে (জীবিত সন্তান প্রসূত না হলে) সেক্ষেত্রে দূর্বা ও আতপচাল একসঙ্গে বেটে বড়া বা ফুলুরি ক'রে সপ্তাহে ৩।৪ দিন—২।৩টি ক'রে ভাত খাওয়ার সময় কিছুদিন খেলে—সে অভাব থাকবে না বা গর্ভদোষ নষ্ট হবে। এ ভিন্ন অকালে রজঃরোধে অথবা অধিক বয়স পর্যন্ত রজঃ অদর্শনেও এইভাবে ব্যবহারেও ফলপ্রসূ হয়।

৩। **শ্বেতপ্রদর** (Leucorrhoea) **জনিত দুর্বলতায়:—** দূর্বা এবং কাঁচা হলুদের রস সমান পরিমাণ মিশিয়ে অথবা শুধু দূর্বার রস ২ চামচ (২।৩ চা-চামচ) অল্প কাঁচা দুধের সঙ্গে খেতে দিয়ে থাকেন প্রাচীন বৈদ্যেরা। তবে বাতগ্রস্তা হলে এটা ব্যবহার করতে দেন না। এ ভিন্ন এই মুষ্টিযোগটিতে পুরাতন রক্ত আমাশাও সেরে যায়।

৪। **কেশপতনে:—** এই একটি রোগ—অনেকক্ষেত্রে যার প্রকৃত হেতু এখনও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়—দূর্বার রস দিয়ে তৈল পাক ক'রে মাথায় মাখলে চুল ওঠা বন্ধ হয়।

৫। **ক্ষতে:—** দূষিত ও দুষ্ট ব্রণের ক্ষত শীঘ্র পুরে যায়—৪ গুণ দূর্বার রসে পাক করা ঘৃত লাগালে। এ কথা চরকের।

৬। **ত্বক্‌গত রোগে:—** স্বেদজ অদৃশ্য জীবাণুর (কোন ছত্রাক জাতীয়) আক্রমণে শরীরের কোন স্থানে দাগ হলে—কাঁচা হলুদ ও দূর্বা বেটে লাগালে সেরে যায়।

৭। **কাটা ও ছেঁড়ায়:—** দূর্বা থেঁতো ক'রে সেখানে বসিয়ে চেপে বেঁধে দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয়ে থাকে, এটা তো সকলেরই জানা।

৮। **মূত্র-কৃচ্ছ্রতায়:—** প্রস্রাব হ'তে কষ্ট অথচ পাথুরী নয়—সে ক্ষেত্রে দূর্বার রস দেড়/দুই চামচ দুধ ও জল মিশিয়ে খেলে সুন্দর ফল হয়; তবে অর্শ থাকলে নয়।

৯। **পায়োরিয়ায়:—** দূর্বাঘাস শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে সেই গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজলে পায়োরিয়া সেরে যায়।

১০। **আমাশায়:—** সাদা বা রক্ত আমাশা যাই হোক্ না—জামপাতা ২টি ও দূর্বাঘাস ৫।৭ গ্রাম একসঙ্গে বেটে সেই রস ছেঁকে নিয়ে একটু গরম ক'রে অল্প দুধ মিশিয়ে খেলে ২ দিনেই সেরে যায়।

১১। **বমন নিবারণে:—** সর্বদা গা বমি বমি করা—এ ক্ষেত্রে দূর্বার রস আধ চামচ থেকে ১ চামচ পর্যন্ত অল্প একটু চিনি মিশিয়ে খানিকক্ষণ অন্তর অন্তর একটু একটু ক'রে চেটে খেতে হয়, এর দ্বারা বিবমিষা (গা বমি ভাব) চ'লে যায়।

১২। **রক্তদাস্তে—** মলের সঙ্গে মিশে রক্ত প'ড়ছে, অথবা মলত্যাগের পর পৃথক রক্ত পড়ছে, অথচ জ্বালা যন্ত্রণা নেই, এ ক্ষেত্রে দূর্বার রস ১ তোলা আন্দাজ, একটু গরম ক'রে, অল্প চিনি, সম্ভব হ'লে ৭।৮ চামচ ছাগল দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে দিনে দুইবার খেতে দিলে রক্তদাস্ত বন্ধ হয়।

১৩। নারীদের অনেকক্ষেত্রে মাসিকের মতই রক্তস্রাব হয়, সে ক্ষেত্রে এই দূর্বার রসও ফলপ্রসূ হয়।

১৪। **নাসা-অর্শেঃ—** মাঝে মাঝে নাক টনটন্ করে; আবার নাক থেকে রক্তও পড়ে অথচ হাই-ব্লাডপ্রেসার নেই; সে ক্ষেত্রে দূর্বা ঘাসের নস্য নিলে রক্তপড়া বন্ধ হয়। এটা চরকের বিধি। প্রাচীন বৈদ্যগণ এর সঙ্গে একটু কাঁচা দুধ মিশিয়ে ব্যবহার ক'রতে বলেন।

১৫। **কচ্ছু রোগেঃ—** গায়ে বিশেষ কিছু নেই অথচ চুলকোয়, সে ক্ষেত্রে তিল তৈলের সঙ্গে দূর্বাঘাসের রস পাক ক'রে গায়ে লাগাতে হয়। যতটা তৈল তার সিকি ভাগ রস।

প্রস্তুত পদ্ধতি— সরিষার বা নারিকেল তৈল আগুনে চড়িয়ে নিষ্ফেন হ'লে তাকে নামিয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'লে পর ঐ রস দিয়ে পুনরায় পাক ক'রে নিতে হয়। এমন সময় নামাতে হবে যে রসও থাকবে না অথচ ওর সিটেগুলি পুড়েও যাবে না, তারপর ওকে ছেঁকে নিতে হবে।

আমার বক্তব্য হ'চ্ছে—দূর্বার একটি বিশিষ্ট গুণ যে রক্তরোধক সেটা বহু পরীক্ষিত। এখন প্রশ্ন—কেন রক্তরোধ ক'রছে—ষ্টিপ্টিক্ (Styptic) হ'য়ে, না রক্তের কোয়াগুলেশন্ (Coagulation) অর্থাৎ জমাট বাঁধার শক্তি বাড়িয়ে অথবা 'কে' (K) ভিটামিনের প্রভাবে?

আয়ুর্বেদের দ্রব্যগুণ বিচারে দূর্বা শীতগুণ সম্পন্ন, জল ধাতুর ভূতগুণ সম্পন্না এবং মধুর ও ঈষৎ কষায় রস ব'লেই এটি পিত্তঘ্ন এবং স্তম্ভক। আর এই গুণটি কিন্তু বর্ষার পর থেকেই বৃদ্ধি পায়।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Terpenoid constituents, viz. 28 triterpenes and its methyl ethers. (b) Sterols. (c) Fattyol.

সিন্দুবার

সুবাদের নাম ভালবাসা আর অপবাদের নাম কলংক, আর সংবাদ মানে খবর, অভিবাদের নাম নমস্কার, আবার প্রতিবাদের অর্থ জবাব—এমনি সব বাদের পিছনেই আছে যুক্তি, অতএব প্রশ্ন ওঠে তাহ'লে প্রবাদ মানে কি? 'যেমন নির্মানিসিন্দে যেথা, রোগ কি থাকে সেথা?'—এই প্রবাদ বাক্যটি যে বাংলায় বহুদিন থেকে প্রচলিত রয়েছে তারও পিছনে কি আছে?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই বলি—ব্যক্তি যেমন বহুগুণের অধিকারী হ'লেই জনাকর্ষী হ'য়ে থাকেন, কোন দ্রব্যও তেমনি বিশিষ্টগুণের অধিকারী হ'লেই সেটি উপমার ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে থাকে, এবং কালে তাকে ঘিরে গ'ড়ে ওঠে প্রবাদ। নিসিন্দের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি। এটি একটি প্রখ্যাত ভেষজ হ'য়েও আমাদের দেশের জনসাধারণের একরকম উপেক্ষিত গাছ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা সাধারণের কাছে কেবলমাত্র ক্ষেত-খামারের বেড়ার জীবন্ত খুঁটি হিসেবেই। এই বেড়ার আর একটা সুবিধে হ'চ্ছে গরু বা ছাগলে খায় না, ডাল কেটে বসালেই গাছ হয়। কিন্তু গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য এর যে আরও উপযোগিতা আছে এবং বিশেষ ক'রে সমাজকল্যাণে, সেটা কিন্তু প্রায় অজ্ঞাত।

আভিজাত্যের প্রতীক

অভ্যাবর্ত্তস্ব পৌলোমী ভিষজা অশ্বিনাশ্ব ভিষং ধেনুঃ ভেষজং পয়ঃ।
(ঋক্ ১৭।১১২)

মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

পৌলোমী সিন্দুবারিকা। ত্বং ভিষজাসহ অভ্যাবর্ত্তস্ব।
ভিষজাং ধেনুস্ত্বং। ভেষজং পয়রিবাসি'

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'চ্ছে—তুমি পৌলোমী (পুলোমার অর্থ পুলোমানামা অসুর, সেই ক্ষেত্রে সে জন্মগ্রহণ করে, কোন যুক্তি না মেনে যে কাজ করে তার নাম পুলোমা)।

এখানে নিসিন্দাকে পৌলোমী বলার সার্থকতা এই জন্য যে—মাত্র পুঁথিগত যুক্তিতেই তার রসগুণ বীর্যের শক্তি আবদ্ধ নয়, অথবা কল্পনাসম্বল যুক্তিতেও আবদ্ধ নয়, তার প্রভাব অচিন্তনীয়; যাকে বলা যায় একগুঁয়ে, তাই সে পৌলোমী।

হে পৌলোমী, তুমি ভিষকের সঙ্গে এসে তাকে সমৃদ্ধ কর। ভিষক্‌বর্গের কাছে তুমি কামধেনুর মত। গো-দুগ্ধের মত তুমি জীবন-রক্ষা কর।

সার্থক নামাবলীঃ— এই গাছের তিনটি নাম—(১) নির্সিন্ধু, (২) সিন্দুবার, (৩) নির্গুণ্ডী।

(১) **নির্সিন্ধুঃ—** যা থেকে নির্সিন্দা নামটি এসেছে। বৈদিক শব্দাভিধান 'যাস্কে' বলা হয়েছে যে—

> নিতরাং সিন্ধুরিব বহুদ্রবপত্রাদিমত্ত্বাৎ=নিতরাং
> গজমদস্য ক্ষরণবৎ—

অর্থাৎ যে দ্রব্যের রস শরীরে প্রবেশ ক'রে হস্তির যৌবনের মদক্ষরণের মত ঝরে অথবা বহুপত্রের আচ্ছাদন করলে শরীরস্থ রস ঝরিয়ে দেয়। এই কথার দ্বারা এইটি বোঝানো

হয়েছে যে, সে শরীরের রসের শোষক। এইজন্যই রসগত বাতে নিসিন্দা পাতার সে'কের ব্যবস্থা।

(২) **সিন্দ্বুবারঃ—**

সিন্দুং গজমদং বারয়তি বৃ+উন্=

যে দ্রব্য হস্তির যৌবনের কামোন্মাদনা বন্ধ করে। (অন্য কোন দ্রব্যে তা হয় না।)

(৩) **নির্গুণ্ডী:—**

নির্গতা গুড়াৎ বেষ্টনাৎ, গুড়=বেষ্টনে।

যে দ্রব্য নিষ্পীড়িত করলেও রস বেরোয় না। এই প্রসংগে আর একটা কাজও লক্ষ্য করার মত—কোন ক্রমেই এই গাছের শুকনোপাতাকে সূক্ষ্মচূর্ণ করা যায় না, সেইজন্যেও একে নির্গুণ্ডী বলা হয়েছে।

প্রাক্-আর্যদের তন্ত্রযুগেও নিসিন্দা অজানা ছিল না এবং রসতান্ত্রিকগণ একে জানতেন, কারণ 'নির্গুণ্ডীকল্প' নামে একটি পৃথক অধ্যায় রচিত হয়েছে 'গোরী-কাঞ্চলিকা' তন্ত্রে। ঋষি যুগেও এ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে তার কিছু অংশের আলোচনা করা যায় এবং তার সংগে লৌকিক ব্যবহারও যতটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে সেইটুকুও।

বিভিন্ন প্রাদেশিক নামঃ— সংস্কৃত—নির্গুণ্ডী, বাংলা—নিসিন্দা বা নিসিন্দে, হিন্দী—সাম্ভালু, উড়িয়া—বেগুনিয়া (উড়িষ্যা সন্নিকটবর্তী পশ্চিমবংগেও একে বেগুনিয়া বলে), আরবি—আসলক (Aslaq), ফারসি—ফানজান্ খিস্ত্ ইত্যাদি। এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম Vitex negundo Linn. ফ্যামিলি Verbenaceae.

বনৌষধির প্রাচীনগ্রন্থে পুষ্পভেদে এই গাছটির দুটি নামকরণ করা হয়েছে—শ্বেতপুষ্পা (সাদা ফুল) নিসিন্দাকে সিন্দুবার এবং নীলপুষ্প নিসিন্দাকে নির্গুণ্ডী। এভিন্ন কোন কোন গ্রন্থে কর্তরী নির্গুণ্ডী ও অরণ্য নির্গুণ্ডীর উল্লেখ দেখা যায়। অনেকের মতে—শেফালিকাই (শিউলি— Nyctanthes arbortristis Linn.) ফ্যামিলি Nyctanthaceae, অরণ্য নির্গুণ্ডীর নামান্তর। কিন্তু বৈদিক নির্গুণ্ডী নামটির যাথার্থ বুঝলে শেফালিকাকে গ্রহণ করা চলে না। এর আরও একটি লোকায়তিক নাম 'কর্তরী' (সংস্কৃত ভাষায় এই কর্তরীটি পরে—কাঁচি)—এর পাতাগুলির আকৃতি কাঁচির ফলার মত। কর্তরী শব্দ 'করাত' নয়। করাতের প্রতিশব্দ ক্রকচ এবং করপত্র। তাছাড়া নীল নির্গুণ্ডী নামে আর একপ্রকার গাছের উল্লেখও আছে, এর ফুলগুলি ঈষৎ নীলবর্ণের হয়।

আয়ুর্বেদে ও লোকায়তিক ব্যবহারে

১। **স্মৃতিশক্তি বর্ধনেঃ—** ঘিয়ের সংগে নিত্য দুটি নিসিন্দাপাতা ভেজে খেলে স্মৃতির ধারক হয়। অবশ্য এটাও দেখতে হবে, যে ক্ষেত্রে আকস্মিক কোন কারণে শ্লেষ্মাবিকারে মস্তিষ্কের স্মৃতিকেন্দ্রটির কাজ ব্যাহত হ'চ্ছে—সেই ক্ষেত্রেই এটির কার্যকারিতা।

২। শিশু ও বৃদ্ধদের তরল পায়খানা হ'তে হ'তে মলদ্বারে ক্ষতের উপদ্রব হ'লে—এর পাতার রস ২।৩ দিন লাগালেই সেরে যায়।

৩। **ফোড়ায়ঃ—** তিল তৈলের সংগে এর রস মিশিয়ে পাক করলে (তেলের দ্বিগুণ রস) সেই তেলে ফোড়া পাকে, ফাটে ও শুকোয়।

৪। **খুস্‌কি ও টাকেঃ—** নিসিন্দা পাতার রসে পাক করা তৈল ব্যবহারে মাথার খুস্‌কি সারে। এমন-কি অকালের টাকও উপশমিত হয়।

৫। **গাঁটের ব্যথায়ঃ—** নিসিন্দার পাচন অব্যর্থ। যদি তাতে জ্বর থাকে, তবে খুব সুন্দর উপকার হয়। ৩।৪ গ্রাম পাতা সিদ্ধ ক'রে ছেঁকে সেই জলটা খেতে হয়, তবে তার সঙ্গে হাই ব্লাডপ্রেসার থাকলে খাওয়া উচিত নয়।

৬। **পেটে বায়ুজন্য শূল ব্যথায়ঃ—** নিসিন্দার চূর্ণ (পরিমাণ মত) ২।৩ রতি গরম জল দিয়ে খেলে অনেক ক্ষেত্রে তক্ষুনি ব্যথা কমে যায়, কিছুদিন খেলে আর বায়ুর শূল থাকে না।

৭। **মেদবৃদ্ধিতেঃ—** স্থূল দেহ অর্থাৎ পেটমোটা লোক কিছুদিন নিসিন্দাপাতার গুঁড়ো খেলে (জল সহ) ভুঁড়ি কমে। মাত্রা আধ গ্রাম পর্যন্ত।

৮। **গৃধ্রসীবাতে** (Sciatica):— নিসিন্দার চূর্ণ ½ গ্রাম বা ৩।৪ রতি গরম জল সহ খেলে খুব ভাল কাজ করে। এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধ বৈদ্যদের উপদেশ শিউলিফুলের পাতা ৮।১০টি সিদ্ধ ক'রে সেই জল খাওয়া। এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম Nyctanthes arbortristis.

৯। **শিরোগত শ্লেষ্মারঃ—** ১ চা-চামচ মাত্রায় দিনে ৩ বার (পাতা বা ছালের) রস খেলে শ্লেষ্মাটা বমন হয়ে বেরিয়ে যায়। অবশ্য সব ক্ষেত্রে বমন করানো উচিত নয়। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন এবং মাত্রা বিচারও অবশ্য কর্তব্য।

১০। **কুচো ক্রিমিতেঃ—** নিসিন্দাপাতা চূর্ণ সিকিগ্রাম মাত্রায় খেলে ক্রিমির উপদ্রব উপশমিত হয়। (এটি পূর্ণবয়স্কের মাত্রা)

১১। **শ্বেতপ্রদর জন্য যোনিক্ষতেঃ—** নিসিন্দার কাথ দিয়ে সেচন করলে ২।৪ দিনেই ক্ষত সারে।

১২। **অগ্নিমান্দ্যেঃ—** নিসিন্দার চূর্ণ ভাতের সঙ্গে খেলে (আন্দাজ সিকিগ্রাম) কিংবা নিম-বেগুনের মত বেগুন দিয়ে ঐ পাতা খেলে ক্ষুধা বাড়ে।

১৩। **কুষ্ঠেঃ—** প্রথম প্রথম কুষ্ঠের যন্ত্রণায় নিসিন্দার কাথ সেচন, নিসিন্দার প্রলেপ, নিসিন্দার কাথ খুব ভাল কাজ করে। সেরে যায়, তবে এক্ষেত্রে দুধ-ভাত পথ্য করতে হয়।

১৪। **চুলকানিতেঃ—** নিসিন্দার তৈল ব্যবহার করলে চুলকানি সেরে যায়। (তিল তেলের সঙ্গে নিসিন্দার রসের পাক)

১৫। **অরুচিতেঃ—** নালতে পাতার মত নিসিন্দাপাতার সুক্তো (ঘিয়ে ভেজে) খেলে (একটি বোঁটায় ৩।৪টি পাতা থাকে, সেই রকম একটি বা দুটি পাতা) পুরানো অরুচি সারে। নিসিন্দার ফুলও ঐভাবে খেলে অরুচি সারে।

১৬। **হাঁপানিতেঃ—** নিসিন্দাগাছের ছালের কাথ চায়ের মত খেলে হাঁপ কমে যায়। ছাল সিকি তোলা (৩ গ্রাম) থেকে আধ তোলা (৬ গ্রাম) মাত্রার বেশী না হয়।

১৭। **ঘুংড়ি কাশিতেঃ—** নিসিন্দাপাতা ও তার গাছের ছালের কাথে নিশ্চয়ই তা সারে। বয়সানুপাতে মাত্রা ঠিক করতে হয়।

এইজন্য বেদে একে কামধেনুর সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। এর কোন্ শক্তির দ্বারা এই সব কাজ হয়, তা বুদ্ধির গোচরে আনার চেষ্টা ক'রেও তাঁরা বুঝেছেন, এর মধ্যে অচিন্ত্য শক্তি রয়েছে, তাই এর পুলোমী নাম দিয়েছেন। এর বীর্য ও প্রভাবই নিশ্চয় এতগুলি ক্ষেত্রে অমোঘ ফল দেয়।

তা ছাড়া জনহিতার্থে কোথায় কোন পরিবেশে কি ভাবে ব্যবহার করা যায়

(১) যখন ন্যাপথলিন্ এ দেশে জন্মেনি, কালজিরেও আসেনি (আদিম জন্মস্থান দক্ষিণ ইউরোপে), তখন দামী জামা-কাপড় ও বই পোকার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে

নিসিন্দের শুকনো পাতা বস্তে দিয়ে রাখা হ'ত। এই পাতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—কাপড় জ'রে যায় না বা কোন দাগ লাগে না।

(২) গ্রামাঞ্চলে সংগৃহীত ডাল-কলাইয়ের উপর শুকনো পাতা দিয়ে রাখেন, তাহলে নাকি পোকা জন্মে না এবং বাইরে থেকেও আসে না।

(৩) মশা তাড়াতে এর জুড়ি নেই—এ কথা বলেছেন পণ্ডিতপ্রবর এক কবিরাজ বন্ধু। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা ধুনোর সঙ্গে দু'টো শুকনো পাতা ছড়িয়ে ধোঁয়া দেন। এই পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে ধূপ তৈরী করাও তো অসম্ভব নয়।

(৪) স্তন্যবৃদ্ধিজনিত শিশুদের পেটের দোষে—গ্রামাঞ্চলে এই পাতা সিদ্ধ জল অল্প গরম অবস্থায় মায়ের গায়ে রোজাকে ঢালতে দেখেছি। এই দ্রব্যটির গুণ স্তন্যশুদ্ধির সহায়ক।

(৫) সূতিকা রোগে—এই পাতা-সিদ্ধ জলে স্নান করলে ভাল হয়—এ কথা বলেছেন উদ্ভিদবিজ্ঞানী মনীষী রক্সবর্গ। তাছাড়া নিম-নিসিন্দার পাতা সিদ্ধ জলে যেকোন প্রকার ঘা (ক্ষত) ধোয়ালে তাড়াতাড়ি বিষদোষ কেটে যায়। এটি আমাদের দেশী antiseptic বলা যেতে পারে।

(৬) গলরোগে— ফেরিন্‌জাইটিস্ (pharyngitis), টনসিলাইটিস (tonsilitis), যার আয়ুর্বেদোক্ত নাম কণ্ঠশালুক, প্রভৃতি রোগে ও দাঁতের মাড়ির ফুলায় এই পাতা সিদ্ধ জলে অল্প গরম অবস্থায় ২।৪ গ্রেণ ফিট্‌কিরির গুঁড়ো মিশিয়ে ৫।৭ মিনিট মুখে রাখলে (যাকে আয়ুর্বেদের ভাষায় কবল ধারণ বলে) বা গারগেল (gurgle) করলে উপশম নিশ্চয়ই পাবেন।

(৭) দেহের কোন জায়গায় অর্বুদাকার (আব) (Tumour) হচ্ছে দেখলে এই পাতা বেটে গরম ক'রে একদিন অন্তর বা প্রত্যহ লাগালে কিছুদিনের মধ্যেই অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। এভিন্ন মাংসগত বাতের জন্য পেশী-বিকৃতিতে শরীরের স্থানে স্থানে মাংস পিণ্ডাকার হ'তে দেখা যায়, সেরূপ ক্ষেত্রে এই পাতা বেটে গরম ক'রে গায়ে মাখলে কমে যায়। তাছাড়া বাতে বা কোন গ্রন্থি (Gland) ফুলাতে অনুরূপভাবে প্রলেপ দিলে একদিনেই ফুলা ও ব্যথার কিছু উপশম হবে।

(৮) কানের পুঁজে— পাতার রস বা পাতা বাটা দিয়ে তৈল পাক ক'রে সেই তৈল ২।১ ফোঁটা ক'রে কানে দিলে সপ্তাহ মধ্যে পুঁজ পড়া বন্ধ হয়ে যায়, এভিন্ন সর্বপ্রকার ক্ষতে এটি ব্যবহার করা যায়।

(৯) জ্বর বা বাতের ঔষধের অনুপানে পাতার রস সর্বদা ব্যবহার হয়ে থাকে।

(১০) জিভে বা মুখে ঘা (ক্ষত)—কিছুতেই সারে না, এই পাতার রস দিয়ে পাক করা ঘি দিনে-রাতে দুইবার লাগালে উপকার হয়। এমন-কি যেকোন দূষিত ক্ষতে বিশেষ উপকারী।

(১১) শয্যামূত্রে— দীর্ঘদিন পর্যন্ত অনেক ছেলেমেয়েকে নিয়ে মায়েদের ভুগতে হয়, এ ক্ষেত্রে এই পাতার গুঁড়ো ২ গ্রেণ মাত্রায় (৬।৭ বৎসর বয়স হ'লে) বৈকালে জলসহ খাওয়ালে ৪।৫ দিনের মধ্যে এ জ্বালা থেকে মায়েরা রেহাই পাবেন। যদি ৭ দিন ব্যবহারে না কমে, তবে সকালে-বিকালে ২ বার খাওয়াবেন। এটি ব্যবহারের সব থেকে সুবিধে হচ্ছে যে—কোন প্রতিক্রিয়া (Reaction) নেই।

(১২) বৃদ্ধবয়সে যাঁদের রাত্রে প্রস্রাবের পরিমাণ বা বারে বেশী হয়, তাঁরা ২।৩ রতি মাত্রায় পাতার গুঁড়ো জলসহ বিকালের দিকে একবার খেলে কয়েকদিনেই উপকার পাবেন। প্রয়োজনবোধে ২ বারও খেতে পারেন।

(১৩) বাতের দোষে— শরীরে ব্যথা ও যন্ত্রণায় যাঁরা মাঝে মাঝে কষ্ট পান,

পূর্বলিখিত মাত্রায় একটু বেশীদিন ব্যবহার ক'রে দেখুন কি অপূর্ব ফল পাওয়া যায়।

(১৪) মাথার যন্ত্রণা ও সর্দিজনিত কারণে যাঁদের প্রায়ই নাক বন্ধ হয়ে যায় অথবা সান্নিপাতিক দোষে গাল, গলা ও কর্ণমূলের ব্যথায় কষ্ট পান, তাঁরা এই পাতা শুকিয়ে বালিশের মত ক'রে মাথায় দেবেন।

(১৫) শয্যাক্ষতে (Bedsore)— শুকনো নিসিন্দা পাতার মিহি গুঁড়ো ক্ষতে ছড়িয়ে দিলে শীঘ্র শুকিয়ে যায়। আরও ভাল উপকার পাওয়া যায়—যদি নিসিন্দা পাতার রসে পাক করা তৈল দিনে একবার করে লাগান যায়। এটা বহু পরীক্ষিত।

ঋষিদের গবেষণা:— 'ফণাধারী সর্প কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তিকে শ্বেত নিসিন্দার মূলত্বক্ পেষণপূর্বক শীতল জলের সহিত সেবন করাইবে।' এ কথা চরকের চিকিৎসিত স্থানের ২৫ অধ্যায়ে দেখা যায়। আর নীল নিসিন্দার মূলের ছাল জলে পেষণপূর্বক নস্য গ্রহণ করলে গণ্ডমালা প্রশমিত হয়—এ কথা বলেছেন চক্রদত্ত নিজের চক্রদত্ত গ্রন্থে (গণ্ডমালা চিকিৎসা)। এ ভিন্ন এই গাছটি যে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়কারী, এ ভিন্ন এই অনায়াসলভ্য গাছটি বহুভাবে আমাদের উপকারে আসতে পারে—যদি এটির আরও গবেষণা হয়।

আজ কালপ্রভাবে পশ্চিমাভিমুখী দৃষ্টি আমাদের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। ত্বরিত উপশমের জন্য আমরা অনেক synthetic ঔষধ ব্যবহার ক'রে যাচ্ছি, কিন্তু এর দ্বারা যে শারীর-ক্রিয়ার অশুভ বিবর্তনও আসছে, সেটা এখন অনেক বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি করছেন। কেন—আয়ুর্বেদোক্ত ঋষিরা কি এ কথা বলেনি?

'প্রাণোহ্যাভ্যন্তরো নৄণাং বাহ্যপ্রাণ গুণান্বিতঃ।
ধারয়ত্যবিরোধেন শরীরং পাঞ্চভৌতিকম্'

(সুশ্রুত সূত্রস্থান—১৩ অধ্যায়)

প্রাণের দ্বারাই কেবল প্রাণের তর্পণ হতে পারে—পাঞ্চভৌতিক দেহকে পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যই বাঁচাতে পারে।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz., nishindine & unidentified alkaloids. (b) Essential oil. (c) Sterols. (d) Terpenoid constituents.

বিকল্প

কোন সৎ কথা মনোমত না হলেই অনেক সময় আমরা সেটা মানি না এবং তাতে শ্রদ্ধাও প্রকাশ করি না, বরং সে সম্পর্কে দু'টো বক্র মন্তব্য ক'রে থাকি। এটা তো প্রায় গতানুগতিক রীতি।

গ্রামের বৈদ্য অশ্বিনী ঠাকুর গুরুমুখী বিদ্যের দৌড়েই বলেছিলেন—'পাকা বেলের শাঁস, শরীরে পাকার মাস।' শুনেই গাঁয়ের খুড়ো হোঁক ক'রে ঠেলে উঠে মন্তব্য করেছিলেন—'আঃ! তুমি রাখো ঠাকুর, সকালবেলা পেটটা যখন খোলসা হয়, তখন?'

যুগ যুগ ধ'রে চলছে—পাকা বেল পেট সাফ রাখে। পুরাতন ছড়া আর যুগ-যুগান্তরের ব্যবহার এই দু'টি বিপরীত মতবাদে কেমন যেন স্থবির হয়ে যেতে হয়। তাই আজ উত্তর বয়সে তাঁদের অমন ধরনের বিপরীতধর্মী মন্তব্যগুলি মনে ক'রেই আমার এই আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা।

হয়তো কোন অসতর্ক মুহূর্তে যে ভুল জন্মেছিল—পরম্পরায় তাই চলে এলে সেটা যে কোন অবিধির ও অহিতকর পদ্ধতি হতে পারে, তা সামাজিক জীবনে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, ফলে এটা গবেষণার বিষয়ই হয় না। সেইরকম কোন দোষ যদি আপাতঃদৃষ্টিতে ধরা না পড়ে—তাহলে সেটা নিয়ে কোন কথা বলার অর্থই হয়—একঘরে হওয়া। এই বেলই তার একটি মোক্ষম উদাহরণ। কেন তা বলছি—

অথর্ববেদিক উপবর্হণ সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের ৪৩ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে—

'মা স্থানি বর্ধনীয়াং মালুরঃ ধূমগন্ধিঃ যঃ।
ইষ্টং বীত মভিগগুর্ত্তং বষট্‌কারং বিগাহতু॥'

বৈদিক শব্দাভিধানকার যাস্কের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—

> মালূর! ত্বং মাং প্রিয়ং পক্কং লূনাতি ইতি লূন্নক্।
> তৎ সেবনাৎ ত্বক্কান্তিমপোহতি। অগ্নিং ত্বং বর্দ্ধয়। ত্বং ধূম্রগন্ধিঃ
> ইষ্টং মঙ্গলং বীতং যৎ তৎ অভিগন্তুং বষট্কারং বিগাহত্তু।
> ব্যতিকরং কুরু॥

এই ভাষ্যের তাৎপর্য হ'ল—তুমি মালূর, তুমি ধূম্রগন্ধি, তাই তুমি শ্রীকে নষ্ট কর; আবার ব্যতিকর হয়ে অগ্নিকে বর্ধন কর এবং যে মঙ্গলস্পর্শ দূরে হয়ে যায়—তুমি তাকে স্থাপন কর।

এই ভাষ্যটির অন্তর্নিহিত তথ্য হলো অপক্ক ও পক্ক বিল্বফলের দোষগুণের বিচার নিয়ে—

এবারে আর একটি, বেলের নাম-মহিমা— 'গোদামামী' বললে যেমন মামীর চেহারাটির ধারণা হয়, সেই রকম বিল্ব বললেই তার আকৃতি-প্রকৃতির বিচার হয়ে যায়। এই বিল্

অর্থ ছিদ্র, তার উত্তরে বন্ প্রত্যয় ক'রে বিল্ব হয়েছে। এই ছিদ্র সম্বন্ধকারী বলেই তার নাম বিল্ব; চলতি কথায় আমরা একে বেল ব'লে থাকি। পাকা বেল দীর্ঘদিন খেলে অন্ত্রে সূক্ষ্ম ছিদ্র পথ তৈরী হতে পারে। বৈদিক সূত্রে 'ব্যতিকর' শব্দটির প্রয়োগ করার গূঢ় অর্থই হলো তাই—কাঁচা বেল তার বিপরীত ক্রিয়া করে। অর্থাৎ ছিদ্রগুলি বন্ধ করে, তাই আমাবস্থায় এটি উপকারী।

পরবর্তী সমীক্ষা [সংহিতা পর্ব]

এই বিল্ব সম্পর্কে চরকের অভিমত হচ্ছে—

দুর্জরং বিল্বসিদ্ধন্তু দোষলং পূতি মারুতম্।
স্নিগ্ধোষ্ণ তীক্ষ্ণং তম্বালং দীপনং কফবাতজিৎ॥

অর্থাৎ পাকা বেল হজম হয় খুব কষ্টে এবং বহু দোষের আকর, যার জন্য এটি উদরে দুর্গন্ধ বায়ুর সৃষ্টি করে। আবার বিপরীত গুণ নিয়েও এটি আত্মপ্রকাশ করে—বেলকে কচি বা কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করা হ'লে, তখন সে স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য অথচ তীক্ষ্ণ এবং অগ্নির উদ্দীপক; তার ফলে সে কফ ও বায়ুকে জয় করে।

আর একটি সংহিতার মন্তব্য হচ্ছে—

'পক্বং বিল্বং বিষোপমম্, আমং তুং অমৃতোপমম্।'

অর্থাৎ পাকা বেল বিষবৎ, শরীরের ক্ষতিকারী আর কাঁচা বেল অমৃতের সমান গুণকর। এ সম্পর্কে সুশ্রুত ও অন্যান্য সংহিতাকারগণেরও ঐ একই প্রতিধ্বনি—

'ফলেষু পরিপক্কেষু যে গুণা সমুদাহৃতাঃ।
বিল্বাদন্যত্র বিজ্ঞেয়া বিল্বং আমং গুণোত্তরম্'

অর্থাৎ সব ফল পাকলেই তার গুণোৎকর্ষ হয়, বেলের ক্ষেত্রে সেটা উল্টো। এর অর্থ হলো—কাঁচাই গুণকরী।

এই বিল্ব সম্পর্কে প্রাচীন সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এই বৃক্ষটির সমগ্র অংশেরই ভৈষজ্যগুণ প্রচুর। হলে কি হবে, তাঁদের ইঙ্গিতের তাৎপর্য না বুঝেই তো গড্ডলিকা প্রবাহের মত আমরা পাকা বেল নির্বিচারে ব্যবহার ক'রে আসছি—এই ধারণা নিয়ে যে, এটি নিশ্চয় অন্ত্র ও মলভাণ্ডের দোষ নিরসন ও দাস্ত পরিষ্কার করে। এটা খুবই ভ্রান্ত ধারণা। পাকা বেলের ব্যবহারে যে তার উল্টোফল হয়—এটা আজও আমাদের চিন্তাধারার বাইরে। কাঁচা বেলের স্বভাবগুণ সংগ্রাহী, সংগ্রহী নয়; পাকা অবস্থার বিপরীত, কারণ—পাকা বেল অন্ত্র বা মলভাণ্ডের দোষকে সংশোধন না ক'রে দাস্তকে জোরপূর্বক বের ক'রে দেয়। কিন্তু কাঁচা বেল পাচক এবং অগ্নিবল বাড়িয়ে দিয়ে আমদোষ পরিপাক করায়; যার জন্য কোন জীবাণুই ওখানে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। এটা তো আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, ছায়া জায়গায় বিষ্ঠা পড়ে থাকলে সেখানে পোকা হয়, আর রৌদ্রে থাকলে সেটা হয় না। সুতরাং মানুষের অগ্ন্যাধিষ্ঠান নাড়িকে বলবান্ রাখতে পারলেই মানুষের চৌদ্দ আনা রোগই আসে না। এবার বিষয়বস্তুতে ফিরে যাই।

এই গাছটির পরিচয় ভারতের কোন প্রদেশবাসীর কাছে অজানা নেই। এর আর

একটি নাম হ'ল—'সদাফল'। আপনারা অনেকেই দেখে থাকবেন, কোন কোন গাছে সব বেল তখনও পড়ে না, অথচ নূতন কচিপাতা ও ফুল হয়ে আবার ফলবান হচ্ছে। এইজন্যেই তাকে 'সদাফল' বলা হয়েছে। এইসব নামকরণই ছিল প্রাচীন বোটানী; আর বর্তমানের বোটানিক্যাল নাম Aegle marmelos, ফ্যামিলী Rutaceae. রোগ প্রতিকারে কাজে লাগে—মূলের ছাল, পাতা, ফুল ও কচি ফলের শাঁস।

উপযোগিতায়

১। **পাতা:—** মেদস্বী যাঁরা, যাঁদের গায়ের ঘামে দুর্গন্ধ হয়, তাঁরা বেলপাতার রস জলে মিশিয়ে সেই জলে শরীরটা মুছলে, তার দ্বারা ঐ দোষটি নষ্ট হয়। তবে বেলপাতা আগুনে সেঁকে নিয়ে ঢেকে রেখে থেঁতো করলেই রস বেরোয়।

২। **সর্দির প্রবণতায়:—** পাতার রস ১ চামচ (৬০ ফোঁটা) আন্দাজ খেলে (বালকের মাত্রা বয়সানুপাতে) কাঁচা সর্দি ও তার সংগে জ্বর বা জ্বরভাব সেরে যায়। এটি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে খুব প্রচলিত।

৩। **শর্করা রোগে:—** ৪।৫টি বেলপাতার রস একটু মধু মিশিয়ে খেতে দেওয়া পশ্চিমাঞ্চলের দেহাতী বৈদ্যদের একটি সাধারণ ব্যবস্থা।

৪। **যৌবনের উদ্দীপনা রোধে:—** সহজাত প্রবৃত্তির প্রশমনের জন্য ব্রহ্মচারীদের ১৬ বৎসর বয়স হলে কিছুদিন পাঁচটি ক'রে বেলপাতার রস খেতে হয়। শুনেছি এটি দীর্ঘদিনের ব্যবহারে শুক্রের সুষুপ্তিও হয়। এটার যথাযথ সমীক্ষার প্রয়োজন আছে।

৫। **শোথে:—** হাত-পা ব্যাঙের মত ফুলে গিয়েছে, সেক্ষেত্রে বেলপাতার রস ও মধু দিয়ে ঔষধ খেতে দেওয়া সুপ্রাচীন ব্যবস্থা।

৬। বারো বছরের ছেলে পড়াশুনো ক'রেও মনে রাখতে পারে না—সেটা নজরে পড়লো বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের। তিনটি বেলপাতা ঘিয়ে মুড়মুড়ে ক'রে ভেজে অল্প মিছরীর গুঁড়ো মিশিয়ে ছেলেটিকে খেতে উপদেশ দিলেন। অবশ্য-করণীয় নিত্যসন্ধ্যার মতই সে উপদেশ পালন করলো ছেলেটি, তারপর তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো—এটির দ্বারা শুক্ররক্ষাও যেমন হয়, স্মৃতিশক্তিও বাড়ে তেমনি। হয়তো এই ঔষধের গুণের পরিণতিতেই প্রখর স্মৃতি-শক্তির প্রভাবে সেই ছেলেটি তাঁর প্রৌঢ়াবস্থায় বাবাজী মহাশয়ের বিশাল 'জীবনচরিত' লিখেছিলেন।

এ ক্ষেত্রে আমার অভিমত হচ্ছে—এটা কিশোর বয়স থেকে ব্যবহার করাই শ্রেয়, কারণ—প্রকৃতি চাপল্য ওই বয়সেই সুরু হয়।

৭। **বিল্বের ফুল:—** বেলের ফুল ২ গ্রাম আন্দাজ মাত্রায় বেটে ওর সংগে গোলমরিচের গুঁড়ো ২৫০ মিলিগ্রাম মিশিয়ে খেলে পিপাসা, বমি ও অতিসার প্রশমিত হয়।

৮। **মূলের ছাল:—** ৩।৪ গ্রাম মাত্রায় (আন্দাজ ৪।৫ আনা ওজন) গরম জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে ছেঁকে তার সংগে একটু বার্লি বা খই-এর মণ্ড ও অল্প চিনি মিশিয়ে খাওয়ালে শিশুদের বমি ও অতিসার বন্ধ হয়।

৯। যাঁরা দীর্ঘদিন আন্ত্রিক ক্ষতে ভুগছেন, তাঁরা কচি বেলের শুকনো টুকরো (৭।৮ গ্রাম) শঠী বা বার্লি রান্নার সময় একসংগে সিদ্ধ ক'রে, পরে ওটাকে ছেঁকে সেই বার্লি বা শঠীটা খাবেন।

১০। বেলশুঁঠকে (কচি বেলের চাকা কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে নিলেই বেলশুঁঠ হয়)

পাঁউরুটির মত সেঁকে গুড়ো ক'রে আধ বা এক চা-চামচ মাত্রায় সদ্যপাতা সাদা দই-এর ঘোলে মিশিয়ে খেলে (দই-এর ৪ গুণ জল দিলে ঘোল হয়) পুরানো আমাশায় চমৎকার ফল পাওয়া যায়। তবে একথা ঠিক—তরকারী, মসলা কম না খেলে আমাশা সারে না।

আর একটা কথা—যদি এর সঙ্গে রক্ত থাকে, তাহ'লে বৃদ্ধ বৈদ্যেরা মুথোর (Cyperus rotundus) রস মিশিয়ে ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

১১। **রক্তার্শে**:— কাঁচা বেলপোড়ার শাঁস বাড়িতে পাতা সাদা দই-এর ঘোলে মিশিয়ে খেলে খুব উপকার হয়।

১২। **হৃদ্দৌর্বল্যে**:— বেলের মূলের ছালচূর্ণ ৬—১২ গ্রেণ মাত্রায় (অবস্থাভেদে) দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে ওটা দূর হয়, অধিকন্তু এটিতে অনিদ্রা ও ঔদাসীন্যভাবও কেটে যায়।

১৩। **শুক্রতারল্যে**:— বিল্বমূলের ছাল ১২—১৪ গ্রেণ ও জীরে ৬ গ্রেণ মাত্রায় একসঙ্গে বেটে গাওয়া ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়।

হয়তো বা এসব ছাড়া আরও বহু অজানা গুণ রয়েছে এতে। আজ হয়তো সেই খুড়োর মত লোকে চিন্তা ক'রবেন যে, 'ভাল ক'রতে পারি না, মন্দ ক'রতে পারি—কি দিবি বল?' অর্থাৎ ঠিক যেন পাকা বেল খাওয়ার উপদেশ।

পরিশেষে জানাই যে, বৈদিক চিন্তাধারায় যে তথ্যটি দেওয়া আছে, সেটি যে অমূলক, এ কথাটা বলার পূর্বে নূতন ক'রে সেটার সমীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। সমীক্ষার উৎস আছে কিন্তু সমীক্ষকের তো প্রয়োজন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক সমাজের চোখে কবিরাজ মহাশয়দের অবস্থা যেন 'বাসর ঘরে বিধবার প্রবেশের সঙ্কোচ', তবে বৈধব্য প্রাপ্তির মূলে কি তাঁদেরই স্বকৃত দোষ?

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz. dictamine, gamafagarine skimmianine, aegeline, aegelenine, tambamide and haplopine. (b) Coumarins viz. umbelliferone, imperatorine, alloimperatorine, marmin, marmisin, geranyl, psoralen, aegelionol, kanthotoxin, 6, 7-dimethoxy coumarin and scopoletin. (c) Sterols viz. betasitosterol and gamasitosterol (d) Triterpenoids viz. lupeol.

আম্র

প্রকৃতির গর্ভে জন্ম সবারই, বিকাশও প্রকৃতির বক্ষে, কিন্তু নিরুপদ্রবে জীবন-সাফল্য লাভ কেবা পায়? এই যে ফল-ফুল তারাও কি সুস্থির জীবনের সুষমা ভোগ করে?

প্রৌঢ় শীতের আম্রকে ধরেই বলি—প্রকৃতির সঙ্গে তাকে বহু লড়াই ক'রেই তো এই ফলটিকে বেঁচে থাকতে হয়। ভ্রূণকালেই তাকে মেরে ফেলতে চায় কুজ্‌ঝটিকা, শিলাবৃষ্টি, প্রচণ্ড খরা; এদের উপদ্রবে আম্রের মুকুল বা গুটিগুলি অসময়ে ঝ'রে যায় ব'লেই তার নাম রাখা হ'য়েছে 'চুত'। গ্রামের মানুষ নিশ্চয়ই জানেন যে—আম্র ভিন্ন অন্য কারও মুকুল বা কচি ফলের জীবন কুয়াশায় যায় না; তাইতো লোককথায় প্রচলিত—"যত কুয়ো আমের ক্ষয়, তাল তেঁতুলের কিছু নয়"। অর্থাৎ সোহাগী প্রাণে যেন কোন ধকলই সয় না।

তা ছাড়া এই ফলটির জন্মের প্রাচুর্যে ও অপ্রাচুর্যে প্রকৃতির এমন একটা ইঙ্গিতও নিহিত থাকে যে—এ বৎসর বর্ষণ কেমন হবে, অথবা ধানের ফলনই বা কেমন হবে; এ ক্ষেত্রে সেই খনার বচন "আমে ধান, তেঁতুলে বান"—এ যেন প্রকৃতির র‍্যাডারে ঘোষিত হয় মেঘ-বর্ষণের আগাম সংকেত।

ফলটি আর্য-স্বীকৃত কিনা? হ্যাঁ, তার প্রমাণঃ—

> ঊর্জস্বানঃ পয়সা পিন্বমানঃ অস্মৎ সীতে পয়সা।
> পবস্ব মাকন্দঃ অভ্যাবৃৎ স্ব॥
> স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোমধারয়া।
> সমুদায় ভিষক্ পাতবে সুতঃ যোনিময়।

(অথর্ববেদ বৈদ্যকল্প ১৫৭।২৯-৩)

মহীধর ভাষ্য—

ত্বং মাকন্দোঽসি। মা=পরিমিতো কন্দোঽসি আম্র ইতি। অমতি সৌরভেণ দূরং গচ্ছতি, ততঃ উর্জ্জস্বানঃ=বলমাদধানঃ, সীতে ভূমৌ=অহল্যাভূমৌ জাতঃ অসি। ত্বং পিন্বমানঃ=পূরয়ন্ পয়সা দুগ্ধাদিভিঃ অভ্যাবৃতস্ব অস্মদভিমুখং আবৃত্তোভব। অস্মাকং অনুকূলো ভব। তব সোমধারয়া পক্কস্য রসধারয়া=স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব পূতং কুরু। ভিষক্ সমুদয় আমরসং গৃহীত্বা পাতবে বৃক্ষস্য পত্ররসেণ সুতঃ অভিষুতোসি, যোনিময়ো অপি ত্বমিতি গর্ভদোঽপি।
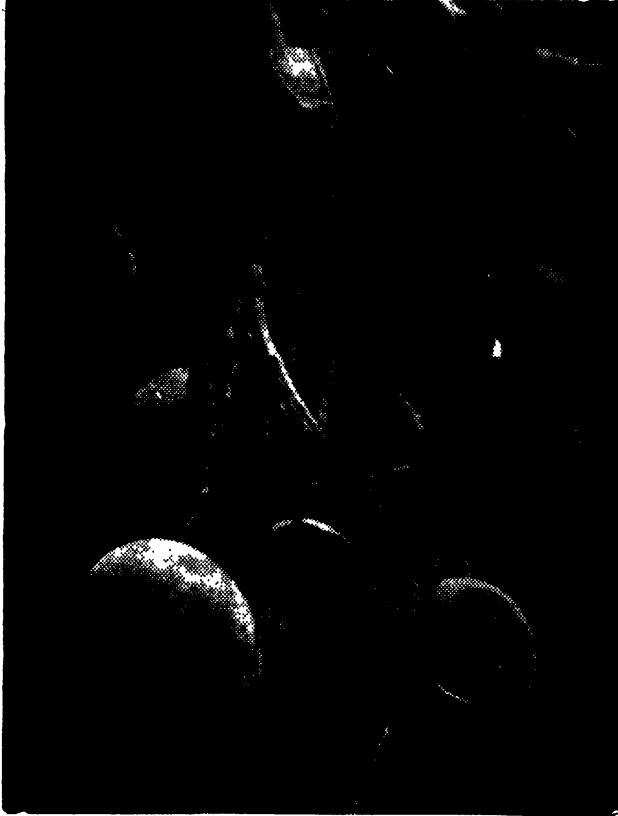
অনুবাদ

তুমি মাকন্দ, মা=পরিমিত কন্দ তোমার, দূর থেকে তোমার সৌরভ আগমন করে। তুমি বলাধান কর। তুমি অকর্ষিত ভূমিতে জন্মগ্রহণ কর। তোমার রস দুগ্ধ সহ যুক্ত

হয়ে আমাদের সম্মুখে এস। আমাদের অনুকূল হও। তোমার পক্করসের ধারা খুব স্বাদিষ্ঠ ও মত্ততাকারক। তোমার বৃক্ষ ও পত্রের রস যোনি ও গর্ভদ ব'লেই ভিষক্ গ্রহণ করেন।

অথর্ববেদের এই সূক্তটির মহীধরের ভাষ্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাকন্দ এই বৈদিক নামটির অর্থ সার্থক বলা যেতে পারে; কারণ এর অন্যান্য শিকড়ে চারদিক থেকে বিস্তৃত হলেও অবশেষে গাছের প্রধান শিকড়টিই পচে যায় এবং গুঁড়ির নিম্নাংশকে কন্দের আকার ধারণ করায় পরিমিত কন্দ—তাই মাকন্দ। আর একটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন—আম্র, অর্থাৎ অমতি ব'লেই আম্র। যেহেতু তার ভ্রূণাবস্থা থেকেই দূর থেকে এর সৌরভ পাওয়া যায়; যার জন্য কচি পল্লব থেকেই বিভিন্ন প্রকার মাছি, মৌমাছি, কোকিল—এরা সব ছুটে আসে; তাই এর অপর নাম 'সহকার'। সহ কারয়তি সঙ্গময়তি স্ত্রীপুংসৌ, অর্থাৎ বায়ুর দ্বারা সৌরভ ছড়িয়ে যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে মিলিয়ে দেয়। আমের পুষ্প মধুর রসসম্পন্ন। এই স্বভাব থাকার জন্যই সে সহকার।

আর একটি অর্থবহ ভাষ্য হ'লো—দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াকে বলা হ'য়েছে 'সোমধারা'। এই সোমধারার শক্তি বলাধান করা ও শুক্রবহ স্রোতকে শুদ্ধ করা। এই জন্যই সে হয় গর্ভপ্রদ। তবে হ্যাঁ, এর আঁটিও অবহেলার বস্তু নয়।

যুগান্তরের সমীক্ষা

আর এক প্রশ্ন—পক্ক বা অপক্ক আম্র কি সমগুণ?
এখানে চরক বলেছেন—

> "আম্রং বালং রক্তপিত্তকরং মধ্যং তু পিত্তলম্ পক্কং বর্ণকরং মাংস-শুক্র-বলপ্রদম্।"

অর্থাৎ কচি আম রক্তপিত্তকর, মধ্য বয়সের (ডাঁসা) আম পিত্তকর এবং পাকা আম বর্ণ, মাংস, শুক্র ও বলদান করে। অর্থাৎ এখানে গুণের প্রসঙ্গে নয়, রসের স্বভাবকেই বিবৃত করা হ'য়েছে, কারণ রস বহুপ্রকারেই পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে।

তাই কাঁচা বা পাকা আমের রস ও গুণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক; যেহেতু দ্রব্যের রস পরীক্ষাটিই সর্বাগ্রে দেখা হয়। তা ছাড়া আম্রের যে বলাধানের একটি গন্ডী আছে, সেটি হ'লো অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, অর্থাৎ আপনার পরিপাকশক্তি যদি দুর্বল থাকে, তবে বেশী খেলে উপকারের থেকে অপকারই বাড়াবে। এইজন্যই চরক বলেছেন—

> 'হিতং অপি মিতং ভুঞ্জাৎ'

অর্থাৎ ভাল হলেও পরিমিত খাওয়া উচিত। আর একটা সাবধান বাণী সেখানে দেওয়া আছে যে, 'রাত্রে ফল খেতে নেই।'

অনেকের প্রশ্ন—আম খেলে ফোঁড়া হয় কেন?

এখানে কারণ দু'টি। যদিও আপনি পাকা আম খাচ্ছেন, সেটি যদি এ'চোড়ে পাকানো অর্থাৎ কাঁচাকে কৃত্রিম উপায়ে পাকানো হয়ে থাকে, তাহলে এটি কাঁচা আম্রের দোষ থেকে মুক্ত হলো না। দ্বিতীয়তঃ অনেকের শরীরে পিত্তবাহুল্য থাকে, তার সঙ্গে এটা বেশী খেলে ফোঁড়া হওয়াটা স্বাভাবিক। এটা চরক, সুশ্রুতের সমীক্ষা।

প্রশ্নঃ— পাকা আম গরম না ঠান্ডা?

এক্ষেত্রে মন্তব্য হলো—হ্যাঁ, শীতবীর্য অর্থাৎ তার মৌলিক শক্তিটি শীতগুণ

সম্পন্ন, অর্থাৎ ঠাণ্ডা, অবশ্য স্বভাবে পাকলে তবেই। কৃত্রিম উপায়ে পাকানো আমের দ্রব্যশক্তিতে সে গুণ থাকা কি সম্ভব?

এই গাছটির পরিচিতি নিষ্প্রয়োজন। গার্হস্থ্যজীবনে এর উপযোগিতা উপলব্ধি ক'রেই একে কৃষি-লক্ষ্মীর পূজায় বা অন্য কোন মাঙ্গলিক কর্মেরও উপচার হিসাবে চিহ্নিত করা আছে। প্রাচীন বোটানীতে তার বহু পর্যায়েও নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের দেওয়া নামটি হলো— Mangifera indica Linn., Family—Anacardiaceae.

রোগ প্রতিকারে

১। **আমাশায়ঃ—** কচি আমপাতা ও জামপাতার রস (২।৩ চা-চামচ) একটু গরম ক'রে খেলে আমাশা সারে।

২। **দাহ ও বমিভাবেঃ—** যাঁদের শরীরে দাহ বেশী এবং বমি বমি ভাব প্রায়ই ঘটে, তাঁরা আমপাতা (৩।৪টি) জলে সিদ্ধ ক'রে সেই জলটাকে সমস্ত দিনে একটু একটু করে খেলে দাহ ও বমির ভাবটা চলে যাবে।

৩। **অকালে দাঁত পড়ে যাওয়ায়ঃ—** আমপাতা (কচি হলে ভাল হয়) চিবিয়ে তা দিয়ে দাঁত মাজলে অকালে দাঁত নড়েও না, পড়েও না। (ওড়িশায় এখনো বাসি বিয়ের দিনে আমপাতা দিয়ে বরের দাঁত মাজাটা রীতি-ঐতিহ্য।

৪। **পোড়া ঘায়ে (দগ্ধ ব্রণে)ঃ—** আগুনে পুড়ে গিয়ে ঘা হলে আমপাতার পোড়া ছাই (মুষাবদ্ধাবস্থায় পোড়াতে হবে, অর্থাৎ—পাত্রের মুখ লেপে-শুকিয়ে পোড়াতে হবে, সেটা কালো হবে) ঘিয়ে মিশিয়ে লাগালে পোড়া ঘা শুকিয়ে যায়।

৫। **পা ফাটায়ঃ—** যাঁদের পা (গোড়ালির অংশ) ফেটে চৌচির হ'য়ে যায়, তাঁদের ফাটা আরম্ভ হ'লে প্রথম থেকেই ঐ ফাটায় আমগাছের আঠা লাগালে আর বাড়ে না; তবে আমের আঠার সঙ্গে কিছু ধুনোর গুঁড়ো মিশিয়ে দিলে আরও ভাল হয়।

৬। **নখকুনিতেঃ—** যাঁরা নখকুনিতে কষ্ট পান, তাঁরাও আমগাছের নরম আঠার সঙ্গে একটু ধুনোর গুঁড়ো মিশিয়ে নখের কোণে টিপে দিলে, এ থেকে রেহাই পাবেন।

৭। **কেশপতনেঃ—** আমের কুশি (কচি আমের আঁঠির শাঁস) থেঁতো ক'রে জলে ভিজিয়ে ছেঁকে নিয়ে সেই জল শুষ্ক চুলের গোড়ায় লাগালে কেশপতন (চুল উঠে যাওয়া) উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। ও সময় মাথায় তৈল ব্যবহার না করাই ভাল।

৮। **অকালপক্কতায়ঃ—** থেঁতো করা আমের কুশি ৫।৬ গ্রাম ও শুকনো আমলকী ২।৩ টুকরো একসঙ্গে ১০।১২ চা-চামচ নিয়ে লোহার পাত্রে জলে ভিজিয়ে সেটা ছেঁকে নিয়ে চুলে লাগালে অকালপক্কতা রোধ করে।

৯। **খুস্কিতেঃ—** আমের কুশি ও হরীতকী একসঙ্গে দুধে বেটে মাথায় লাগালে খুস্কি কমে যাবেই; তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে উচিত—ওটি ছেঁকে নিয়ে মাথায় লাগানো।

১০। **রক্ত পড়াতেঃ—** আঁঠির শাঁসের রসের বা গুঁড়োর নস্যি নিলে নাক দিয়ে রক্তপড়া বন্ধ হয়। তবে ব্লাডপ্রেসারের রক্তপড়া বন্ধ করা সমীচীন নয়।

১১। **প্রদরেঃ—** বীজের শাঁসের গুঁড়ো ১০।১২ গ্রেণ মাত্রায় জল দিয়ে খেলে শ্বেতপ্রদর কমে যায়। আমের ফুল (মুকুল) চায়ের মত করে পান করলে প্রদর সারে।

১২। **রক্ত আমাশায়ঃ—** আমগাছের ছালের রস ১।২ চা-চামচ মাত্রায় আধ পোয়া দুধে (ছাগলের দুধ হলে ভাল হয়) মিশিয়ে খেলে রক্ত-আমাশা সেরে যায়। তবে এর সঙ্গে বৃদ্ধ বৈদ্যরা একটু চিনি, না হয় মধু মিশিয়ে খেতে বলেন।

১৩। **অতিসারে:—** আমগাছের ছালের উপরের স্তরটা চেঁছে ফেলে দিয়ে সেই ছাল গো-দধিতে বেটে খেলে পেট গুড়্ গুড়্ শব্দ ও পাতলা দাস্ত বন্ধ হয় এবং সেজন্য দাহ ও বেদনা নষ্ট হয়। আমের কচিপাতা ও কাঁচা কয়েদ্‌বেলের শাঁস সমভাবে বেটে চালধোয়া জলের সঙ্গে খেলে পক্কাতিসারের উপশম হয়।

১৪। **রক্তপিত্তে (হেমোপ্‌টোসিসে):—** এ রোগীর পক্ষে খুব মিষ্টি পাকা আম্র ঔষধ ও পথ্যরূপে ব্যবহার করার ব্যবস্থা রয়েছে আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য গ্রন্থ চক্রদত্তে।

১৫। **প্লীহাবৃদ্ধিতে:—** পাকা আমের (মিষ্টি) রস ৭।৮ চা-চামচ মাত্রায় ২-১ চা-চামচ মধু মিশিয়ে খেলে প্লীহাবৃদ্ধি ও তজ্জনিত উপসর্গের উপশম হয়। তবে বায়ুপ্রধান প্লীহা রোগেই ব্যবহার্য।

১৬। **অজীর্ণে:—** অতিরিক্ত মাছ খাওয়ার জন্য অজীর্ণ হলে সেজন্য কাঁচা আম সেব্য। অতিরিক্ত মাংস ভোজনে অজীর্ণ হলে আমের আঁঠির শাঁস সেব্য।

১৭। **পাঁচড়ায়:—** আমের আঠা লেবুর রস অথবা তৈলে মিশিয়ে পাঁচড়ায় ব্যবহার্য।

১৮। **উদরাময়ে:—** আমবীজের শাঁসের ক্বাথ আদার রস সহ সেব্য।

১৯। **বহুমূত্রে:—** আমের নতুন পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে ব্যবহার করলে বহুমূত্র প্রশমিত হয়।

২০। **গলাব্যথায়:—** আমপাতার ধোঁয়া গলা-বেদনা নিবারিত করে।

হারানো দিনের স্মৃতির হিতৈষী যাঁরা—তাঁদের অনেকেরই মনে জাগে, আম্রখণ্ড ঔষধে কবিরাজগণ এককালে কত রোগই না সারাতেন—অম্লপিত্ত, উদাবর্ত, শূন্যগর্ভ, গুল্ম প্রভৃতি; সেসব কি শুধু গল্পকথায়ই প্রচলিত? সেই সব লোককথাগুলির সঙ্গে ভৈষজ্য বিদ্যাটিও কি কোন মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রসূত হয়েছিল?

উত্তরে বলা যায়, হ্যাঁ—প্রতিটি লোককথাকে অনুধাবন ক'রলে তাই পাওয়া যাবে—কোনটাই নিরর্থক নয়। এ সব এককালের সমাজ-জীবনের বাস্তব সত্যের উপলব্ধির ফসল। জনদরদী কবিরাজগণ সত্যই তেমনি ফলপ্রদ ঔষধ প্রস্তুত ক'রতেন। তবে পরিবর্তিত যুগধারায় সে সব আমাদের মনে আজ এখন স্মৃতির সাগরে অবগাহন ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করা মাত্র। এখন এসবের স্থান যেন—"বন্ধ্যার কাছে প্রসব বেদনার অনুভূতি জ্ঞাপন করানো"।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Vitamin viz., vitamin A, B, C and D, ascorbic acid. (b) Carotenoid pigments. (c) Glycosides viz., pesnidin 3-galactoside. (d) Other constituents viz. UDP-glucosepyrophosphorylase, ADP-glucosepyrophosphorylase, UDP-glucose fructose-6-phosphate, nucleoside diphosphate kinase (e) Ethylgallate, phenol, starch

জম্বু

সমাজে, সংসদে, সভা-সমিতিতে কত কথাই তো শোনা যায়; কোন কথায় ক্রোধ হয়, কোন কথায় পুরাতন স্মৃতি জাগায়, আবার কোন কথায় বৈরাগ্য আসে, আবার এমন কথাও শোনা যায়, যার দ্বারা নূতন এক অভিজ্ঞতার সংবিৎ ফিরে আসে, তেমনি এক জাগরণী স্মৃতি দিয়েই এই প্রসঙ্গ।

সে প্রায় দুই যুগ আগের কথা—ফারেন্দা ফারেন্দা হাঁক শুনে কৌতূহল জেগেছিল ফয়জাবাদ স্টেশনে। মুখ বাড়িয়ে দেখি গাবের মত বড় বড় কালজাম নিয়ে ফেরিওয়ালা হাঁকছে ফারেন্দা। চমক লাগলো এই নামে।

বৈদ্যক জীবনে সুরু হ'লো অনুশীলন। শব্দ গবেষণাও ভৈষজ্যবিজ্ঞানের একটি দিক, তাই এর সম্পর্কে আলোচনা ক'রতে গিয়ে দেখি—সেই ফারেন্দাই আমাদের প্রাচীন ভেষজবিজ্ঞানীর দেওয়া নাম "ফলেন্দার" বিবর্তিত শব্দ—এটির অর্থ হ'লো "ফলশ্রেষ্ঠ", অর্থাৎ জম্বুই সেই ফলশ্রেষ্ঠ ফারেন্দ্রা।

এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেল এই ভূমণ্ডলের পুরাণ পরিচয়ে জানা যায় যে পৃথিবী সাতটি দ্বীপে বিভক্ত; তার মধ্যে এই জম্বুদ্বীপাঞ্চলের অন্তর্গত ইলাবৃত, রুক্মবর্ষ, হর্যাশ্ববর্ষ (হরিয়ূপা) প্রভৃতি বর্ষের মত ভারতও একটি বর্ষ। আরও দেখা যায় স্বর্ণের একটি নাম জাম্বুনদ, দ্বিতীয়তঃ এই অঞ্চলের উত্তরাখণ্ডের একটি প্রদেশের নামও যেমন জম্বু, আবার ওখানকার একটি নদীর নামও ঝিলাম। কাশ্মীরী ভাষায় ঝিলামের অর্থই হ'লো স্বর্ণোজ্জ্বল বা স্বর্ণঝরণা; এও সেই প্রাচীন স্বর্ণস্মৃতিরই ঐতিহ্য ধারণা জাগায়; অবশ্য এই নামকরণের ঐতিহ্য যথাযথ কিনা, সেটা প্রত্নতাত্ত্বিকের বিচার্য বিষয়।

প্রসঙ্গে ফিরে এসে ভাবছি, পৃথিবীর মধ্যে এই ভারত ভূখণ্ডটি স্বর্ণপ্রসবা বলেই কি জম্বুদ্বীপ তার নামকরণ?

এ সম্বন্ধে বৈদিক তথ্যঃ—

> শূনং সুফালা জম্বলঃ শুনা সীরা বপোতহ বীজম্।
> তোষমানা সুন্যু পক্বমেয়াৎ নাদেয়ম্॥
>
> (অথর্ববেদ ২২৩।৩৬।৫)

এই সূক্তটির মহীধরের ভাষ্য হলো—

> ত্বং শুনা সীরা শুনো=বায়ুঃ সীরঃ আদিত্যঃ শূনং=আন্তরীক্ষং নাদেয়ং বীজং তোষমানা সন্যুঃ পক্বমেয়াৎ আদিত্য-বায়ুভ্যাং কষায়-মধুরা-শ্রম-পিত্ত-দাহ-কণ্ঠ-শোষঘ্নস্ত্বং তোষমানা সফলা= শোভন ফলা যুয়ং ভবতঃ। বীজানি নাদেয়ং জল-সংঘাত বহমানানি ফলিনো ভবন্তি। জম্=ভক্ষণে বল্=অট্।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হলো—তুমি জম্বল, তুমি বায়ু ও সূর্যের আন্তরীক্ষ শক্তিতে

সফল হও। তোমার বীজ নদের জলে বাহিত হয়ে দেশে দেশে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করে। তোমার অন্তঃশক্তি বায়ু ও আদিত্যের দ্বারা পুষ্ট হয়, তাই তুমি কষায়-মধুর রসে সিক্ত হও; শ্রম, পিত্ত, দাহ, কণ্ঠশোষ (পিপাসা) নিবৃত্ত কর।

পরবর্তী পর্যায়

সংহিতার যুগে এসে উক্ত বৈদিক সূক্তের ইঙ্গিতটিতে পাওয়া যায়—'তোমার অন্তঃশক্তি বায়ু ও আদিত্যের দ্বারা পুষ্ট হয়, তুমি কষায় ও মধুর রসধর্মী', এমনি অর্থবহ ইঙ্গিতকে সামনে রেখে রোগোপশমের ক্ষেত্রে হেতুবিপরীত চিকিৎসার যে পদ্ধতি, তাতে তাঁরা জামকে কাজে লাগিয়েছেন, এছাড়া আরও অনুশীলিত হ'য়েছে যে, এই বৃক্ষের ত্বক্ (ছাল), পত্র ও ফলের বীজের দ্রব্যশক্তি স্বতন্ত্র বীর্যধারণ করে।

চরক সমীক্ষায় পাকা জাম কষায় ও মধুর রস সম্পন্ন। তবে শীতল ও গুরু এবং বিপাকেও গুরু; কিন্তু কষায় রসের জন্যই পেটে বায়ু হয়। তা হ'লেও এটা কফ ও পিত্তের বিরোধী নয় তবে গ্রাহী। রস ও গুণের সমীক্ষায় সুশ্রুতের ঐ একই কথা।

চরক সুশ্রুতে এর ফলগুলির ভৈষজ্যগুণ কতখানি সে সম্পর্কেই আলোচিত হয়েছে বেশী, এর গাছের অন্যান্য অংশের দ্রব্যশক্তি কতখানি সে সম্পর্কে ততটা আলোচনা হয়নি। অবশ্য পরবর্তী অন্যান্য আয়ুর্বেদিক সংগ্রহ গ্রন্থে সেই অনুক্ত অংশগুলি অর্থাৎ গাছের বিভিন্নাংশের ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়।

জাতিভেদ

অথর্ববেদ, চরক, সুশ্রুত—এমন-কি একাদশ খৃষ্টাব্দের 'চক্রদত্ত' নামীয় সংগ্রহ গ্রন্থে জামের প্রকারভেদের উল্লেখ দেখা যায় না, তবে ষোড়শ শতকের গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে জম্বু (ফলেন্দ্রা) ও ক্ষুদ্র জম্বুর কথা বলা আছে। আরও পরবর্তীকালে বনৌষধির যেসব গ্রন্থ লেখা হয়েছে, সে সবে তিন প্রকার জামের উল্লেখ দেখা যায়। যেমন—রাজজম্বু, কাকজম্বু ও ভূমিজম্বু; অপর পক্ষে পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের মতে—ভারতে এই গণের (Genus) শতাধিক প্রজাতি আছে। তার মধ্যে জামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে—এমন গাছও কয়েক প্রকার আছে। তবে আমাদের বনৌষধির গ্রন্থোক্ত রাজজম্বুর বোটানিকাল নাম Syzygium cumini (Linn.) Skeels, কাকজম্বুর Syzygium fruticosa আর ভূমিজম্বু ব'লতে কোনটি তাঁরা ব্যবহার ক'রতেন, সেটা এখনও আমাদের সন্দেহের বিষয় হয়ে আছে। তবে এ সম্পর্কে বাংলার পূর্বাংশের ও উত্তরাংশের প্রাচীন বৈদ্যক সম্প্রদায় 'হামজাম' বলে একটা লৌকিক নামের এক শ্রেণীর গাছকে ব্যবহার করেন, তার পাতায় ও ফলে জামের গন্ধ-আস্বাদ পাওয়া যায়, তা হ'লেও সব দিক থেকে সেটি আকৃতিতে ছোট; তার বোটানিক্যাল নাম Polyalthia suberosa. Glossary of Indian medical plants নামক পুস্তকে Syzygium operculatum Gamble গাছটিকে ভূমিজম্বু বলে উ'ল্লখ করা হয়েছে। হিন্দিতে তাকে "রাই জামুন" বলে। এই তিন প্রকারের গাছ ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিকারে

১। **সাদা বা রক্ত আমাশায়ঃ—** জামের কচি পাতার রস (সংস্কৃত—কষন্ থেকে কচি, কষন্=অপক্ব) ২।৩ চা-চামচ একটু গরম ক'রে ছে'কে নিয়ে (অনেকে গরম লোহা ছ্যাঁকা

দিতে বলেন) খেলে ২।৩ দিনের মধ্যে সেরে যায়। সম্ভব হলে একটু ছাগল দুধও তাতে মিশিয়ে নেওয়া ভাল।

২। যাঁদের জ্বরের সঙ্গে পেটের দোষ থাকে, তাঁরা এই পাতার রস ২।৩ চা-চামচ একটু গরম ক'রে ছেঁকে নিয়ে খাবেন; উপকার নিশ্চয়ই পাবেন।

৩। **শয্যামূত্রে:—** এ রোগে শিশু-বৃদ্ধ অনেকেই অসুবিধায় পড়েন এবং অনেক মা-কেও সন্তানের জন্য ভুগতে হয়। সেক্ষেত্রে ২।৩ চা-চামচ জামপাতার রস (বয়সানুপাতে মাত্রা কম) ½ চা-চামচ গাওয়া ঘি মিশিয়ে প্রত্যহ ১বার ক'রে খাওয়ালে সপ্তাহ মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপকার হবে।

৪। **বমনে:—** পিত্ত-বিকৃতিতে যেখানে বমি হতে থাকে, সেখানে ২।১টা কচি জাম পাতা জলে সিদ্ধ ক'রে ছেঁকে নিয়ে ১০।১৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে খেতে দিলে বমি বন্ধ হয়।

৫। **রক্তরোধে:—** হঠাৎ হাত-পা কেটে বা ছ'ড়ে গেলে জামপাতার রস সেখানে লাগালে তৎক্ষণাৎ রক্তপড়া বন্ধ হয়, অথচ বিষিয়ে যাওয়ারও ভয় থাকে না।

৬। **পচা ঘায়ে (ঘৃত):—** এর পাতাকে সিদ্ধ করে সেই ক্বাথ দিয়ে ঘা ধুয়ে দিলে ২।৪ দিনেই বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এমন-কি পশুপক্ষীর ক্ষেত্রেও ওটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৭। **ক্ষতে:—** যে ঘা (ক্ষত) তাড়াতাড়ি পুরে উঠছে না, সেখানে জামছালের মিহি গুঁড়ো ঐ ঘায়ের উপর ছড়িয়ে দিলে তাড়াতাড়ি পুরে যায়।

৮। **রক্তদাস্তে:—** জামছালের রস ১।২ চা-চামচ ছাগলের দুধে মিশিয়ে খেতে দিলে রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যায়। এটা চক্রদত্তের ব্যবস্থা।

৯। **দাঁতের মাড়ির ক্ষতে:—** যাঁদের মাড়ি আলগা হয়ে গিয়েছে, একটুতে রক্ত পড়ে, তাঁরা জামছালের গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজুন, উপকার নিশ্চয়ই হবে; তবে দাঁতে একটা ছোপ পড়ার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য ২।১ দিন অন্তর মাজলে এ দাগ হয় না। অনেক বৃদ্ধ বৈদ্য এর সঙ্গে পাতার গুঁড়োও সমান-পরিমাণ মিশিয়ে ব্যবহার করতে বলেন।

১০। যেসব বালক-বালিকার সর্বদা পেটের দোষের জন্য শরীর ভাল থাকে না, তাদিকে ৫।৬ গ্রেণ মাত্রায় জামছাল চূর্ণ ৫।১০ ফোঁটা গাওয়া ঘি ও অল্প চিনি মিশিয়ে কিছুদিন খাওয়ালে স্বাস্থ্য ভাল হয়।

১১। **হাত-পা জ্বালায়:—** পাকা জামের রস মাখলে তৎক্ষণাৎ কমে যায়।

১২। পাকা জাম সৈন্ধব লবণ মাখিয়ে ৩।৪ ঘণ্টা রেখে, সেটা চটকে, ন্যাকড়ার পুঁটলি বেঁধে টানিয়ে রাখলে যে রস ঝরে পড়বে, সেটা ২০।২৫ ফোঁটা প্রয়োজন বোধে ১ চা-চামচ জল মিশিয়ে খেতে দিলে পাতলা দাস্ত, অরুচি ও বমিভাব কমে যায়। তবে লবণ একটু বেশী থাকলে ওটি শীঘ্র নষ্ট হয় না এবং মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিতে হয়।

১৩। **ডায়াবিটিসে:—** জামবীজের ব্যবহার বহুদিন থেকে হয়ে আসছে, এ ক্ষেত্রে একটি বক্তব্য আছে—আয়ুর্বেদ মতে এটি বায়ুবর্ধক, যেহেতু এটি কষায় রসধর্মী। যাঁদের ডায়াবিটিসের সঙ্গে হাই ব্লাডপ্রেসার আছে, তাঁদের এটি ব্যবহার করা সমীচীন নয়।

নিষেধ:— আধ পাকা (ডাঁসা) জাম খাওয়া উচিত নয়। আর যাঁদের পেটে বায়ু হয়, তাঁদের না খাওয়াই ভাল।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloid viz., jambesine. (b) Glycoside. (c) Ellagic acid. (d) Essential oil.

হরীতকী

সৎকুলে জন্ম হ'লেও পূর্বসংস্কারের বশে অনেকে ভুল পথে চলে, আবার মন্দকুলে জন্ম পেয়েও সৎ-এর সংস্কারে অনেকে উজ্জ্বল জীবন লাভ করে। অনেক সময় কারও গুণ বিচার না ক'রেই শুধু নাম শুনেই শিহরণ কম্পনে গ্রস্ত হয়। ঠিক এমনি "পূতনা" নাম শুনলে আঁতকে উঠি, কারণ পূতনা মেয়ে রাক্ষসী; কিন্তু না, এই শব্দবিন্যাসটি অপূর্ব, তাই বৈদিকযুগের শ্রেষ্ঠফল হরীতকীরই এই নামকরণ করা হ'য়েছিল।

এই হরীতকীর গুণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ক'রলেই পণ্ডিতজী এক কথায় জবাব দিতেন,

'কদাচিৎ কুপ্যতি মাতা নোদরস্থা হরীতকী'

এই কথাটির ভাবার্থ হ'লো—হয়তো কখনও মা ক্রোধান্বিতা হ'তে পারেন, কিন্তু হরীতকী নয়। এটির সেবনে শরীরে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। দ্বিতীয়তঃ পৌরোহিত্য সংস্কারে এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এত বড় স্থান দেওয়া হ'য়েছে যে, এটি কাঞ্চন মূল্যের তুল্য। সমাজের স্বাস্থ্য-কল্যাণের প্রয়োজনেও স্বর্ণের সমান এটি; তাই তার এই মর্যাদা? এর আভিজাত্যের নজিরও পাওয়া যায় আয়ুর্বেদের উৎস অথর্ববেদের বৈদ্যককল্প ৪।৩২৩।১১ সূক্তে।

সেখানে উক্ত হয়েছে—

পূতনা পয়াংসি সমূযন্তু বাজাঃ সংবৃষ্ণ্যান্যভিমাতি ষাহঃ।
আপ্যায়মানা অমৃতায় দিব্যা শ্রবাংস্যুত্তমানি ধিস্ব॥

মহীধর এই সূক্তটির ভাষ্য করেছেন—

পূতনাসি ত্বং। পূতং করোতীতি নিচ্ যুচ্। পূতমিতি=তাপনীত-বৃষে। ত্বগ্ বিরহিতা অভয়া ইতি। তব পয়াংসি=রসাঃ পাতব্যাঃ।

সং যন্তু=সঙ্গচ্ছতামৃতঅপি বাজা=অন্নানি সমৃযন্তু, বৃষ্ণানি=রেতাংসি তে সংযন্তু। কীদৃশস্য তে অভিমাতি বাহঃ। অভিমাতিং=পাপ্মানং। মহতে=অভিভাতি। তে তব পয়ো অন্নবৃষ্ণৈঃ আপ্যায়মানা=বর্ধমানা সতী অমৃতায়=অমর ধর্ম্মিণ্যৈ প্রজাত্যৈ=পুত্রাদি বৃদ্ধ্যৈ ভব। দিবি ইতি দিব্যা=উত্তমানি অন্নানি ধিস্ব=ধারয়।

এটির অর্থ হ'লো—তোমার নাম পূতনা, তুমিই ত্বগ্-বিরহিতা হ'য়ে অভয়া নামে অভিহিতা হও। তোমার রস পান করতে হয়। তুমি অন্নাদিকে ও রেতকে (শুক্রকে) পাপমুক্ত কর। তুমি অন্নাদিকে বর্ধিত ক'রে প্রজা অর্থাৎ পুত্রাদিকে অমৃতের ধর্ম দান কর। তুমি অন্নাদির উত্তম রসকে দিব্যশক্তি দাও।

কালান্তরে এসে

উপরিউক্ত অথর্ববেদের এই সূক্তটি সংহিতার যুগে এসে বিস্ময়কর গবেষণার ক্ষেত্র হ'য়ে দাঁড়ায়।

তার বৈশিষ্ট্যের নজীর হ'চ্ছে—প্রায় অধিকাংশ বৃক্ষ-লতাদি ওষধির বিভিন্নাংশ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রোগোপশমে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু হরীতকীর ক্ষেত্রে গাছের

ফল ভিন্ন কোন অংশেরই প্রকৃতি পরিচয় সম্পর্কে কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। এ কারণটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়—তার ১৫।২০টি নাম রাখা হ'য়েছে, কিন্তু সব নামই "স্ত্রীবাচক"। অথচ ফলশব্দ ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু হরীতকীর ক্ষেত্রে অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, বয়স্থা, প্রাণদা, অমৃতা প্রভৃতি। এখানে স্ত্রীবাচক শব্দ দিয়ে নাম রাখার অন্তর্নিহিত কারণ—এই ফলটি ক্ষিতিগুণাত্মক। পরিষ্কার বোঝা যায়—এর অধিকাংশ নামই তার দ্রব্যশক্তির স্বভাবধর্মিতার পরিচয় দিতেই স্ত্রীবাচক শব্দের প্রয়োগ। প্রতিটি দ্রব্যের মধ্যে দুটি কার্যশক্তি বিদ্যমান থাকে, একটি হ'লো সংযোগের আর একটি হ'লো বিয়োগের। সংযোগশক্তি দেহ সমৃদ্ধ করে এবং বিয়োগ নিষ্কাশন করে।

এই হরীতকীর বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে যে—বিয়োগেতেই অর্থাৎ নিষ্কাশনেই এর কার্যকারিতা (সর্বশরীরগত বিভিন্ন রোগোৎপাদক দূষিত মলাংশের নিষ্কাশন অর্থাৎ দোষ দূর করিয়েই দেহে পোষণের উপযোগী উপচয় সৃষ্টি ঘটিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করায়; সেই কারণেই বা মায়ের সঙ্গে তুলনা করে এ উপমার সৃষ্টি। তবে উপচয়ের ক্ষেত্রটিও অর্থাৎ সংযোগের ক্ষেত্রটিও এর গৌণ কর্ম।

পরিচিতি

বিরাট গাছ, ৭০।৮০ ফুট উঁচু হয়, পাতাগুলি আকারে অনেকটা জামরুলের ছোট পাতার মত, তবে ওর মত চকচকে নয়, ফাল্গুন চৈত্রে পাতা প'ড়ে গিয়ে অতি অল্পদিনের মধ্যেই নূতন পাতা হয়। এর পল্লবের উপরিভাগে যে ফুলের শিস হয়, সেটা ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা—এইটি পুষ্পদণ্ড; তার চারিদিকে নাকচাবির মত ফুল হয়, তারপর ফল আসে, অগ্রহায়ণ পৌষে পরিপুষ্ট হ'য়ে আপনা-আপনি প'ড়ে যায়; এইটাই তার সংগ্রহকাল। এই গাছের প্রাচুর্য আছে দাক্ষিণাত্য, বিহার, ওড়িষা, মধ্যভারত প্রভৃতি একটু পাহাড়িয়া অঞ্চলে। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় কেবলমাত্র ফল। গাছটির বোটানিক্যাল নাম Terminalia chebula Retz., ফ্যামিলি Combretaceae. এর আর একটি প্রজাতির উল্লেখ দেখা যায়, সেটা পাওয়া যায় আসাম ও বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে, তার নাম Terminalia citrina Roxb. এ সম্পর্কে আর একটি কথা জানার আছে; আর এক রকম হরীতকীর প্রচলন আছে যেটি আকারে ছোট ও রং-এ কালো, যাকে বলা হয় জাঙ্গী হরীতকী। আসলে সেটা এই হরীতকী'কে কচি অবস্থায় সংগ্রহ ক'রে শুকিয়ে নেওয়া হয়। জাঙ্গী শব্দটিও বহিরাগত; এর অর্থ নিগ্রো অর্থাৎ যেমনি কালো, তেমনি শক্ত।

হরীতকীর বিশেষ প্রয়োগ

প্রদেশান্তরের প্রাকৃতিক পরিবেশ ভেদে আমরা একই কালের শীত-গ্রীষ্মাদির হ্রাস-বৃদ্ধি সর্বদা অনুভব করি। এই ভারত ভূখণ্ডে ঋতুকাল গণনার দু'-রকমের রীতি প্রচলিত—(১)—অয়নকে কেন্দ্র ক'রে আর (২) অম্বুবাচীকে সামনে রে'খ; অর্থাৎ আগ্নেয় ও আপ্য বা সৌম্য ধারায়। এই অম্বুবাচী শব্দটি এসেছে 'অম্বুবাক্' থেকে (এটি আপ্য), অর্থাৎ ধরণীতলে প্রাকৃতিক নিয়মে জলস্ফীতির প্রারম্ভিক কাল; আর জল বর্ধনেরও সূচনার কাল। এই হ'লো বিসর্গকালের আরম্ভ, আর আদান কালেরও শেষ, এই আদান অর্থে গ্রহণ। এতদিন সূর্য কেবল গ্রহণই ক'রছিলেন। এবার বিসর্গ বা বিসর্জন সুরু করেন। আদানকালে ৩টি ও বিসর্গকালে ৩টি—এই ৬টি ঋতুর

ভোগকাল। তাহলেও বিগত ও আগত ঋতুর প্রভাব উভয়কালে সর্বদাই থাকে। একে বলা হয় ঋতু-সন্ধি। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার চিন্তাধারায় সেই অম্বুবাচী থেকে আরম্ভ ক'রে ২ মাস হরীতকী চূর্ণ সৈন্ধবলবণ মিশিয়ে খেতে হয়। তারপরের ২ মাস চিনির সঙ্গে, এইভাবে পর্যায়ক্রমে প্রতি ২ মাস অন্তর শুঁঠ, পিপুল ও মধু অথবা ইক্ষুগুড়ের সেবনের কথা বলা আছে। এইবার প্রশ্ন আসছে—তার মাত্রা কতটুকু? তার উত্তরে বলা যায়—অগ্নিবলানুসারে ২ গ্রাম থেকে ৪ গ্রাম পর্যন্ত বৈদ্যক-সম্প্রদায় ব্যবহার করার উপদেশ দিয়ে থাকেন। এই নিয়মে ৬টি ঋতুতে ব্যবহার করলে বল, বীর্য, স্মৃতি ও কান্তি বৃদ্ধি হয়; তবে একটা কথা ব'লে রাখি—১৬ বৎসর বয়সের নিম্নে ঋতু-হরীতকী ব্যবহার করা সমীচীন নয়। তবে এটাও ঠিক—দুধে চুমুক দিয়েই বল পাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে চলবে না; নিয়ম ক'রেই ৬টি ঋতুতেই খেতে হবে এবং এটি ১ বৎসর কেন—বরাবরই খাওয়াই বিধি। তবে অথর্ববেদে সর্বদাই হরীতকীর উপরের খোসা ও বীজটা বাদ দিয়ে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

বিভিন্ন রোগ প্রতিকারে

(১) **অর্শরোগে:—** হরীতকীর চূর্ণ ৩—৫ গ্রাম (কোষ্ঠকাঠিন্যের অবস্থাভেদে) মাত্রায় ঘোলের সঙ্গে একটু সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে খেলে উপশম হয়ে থাকে।

(২) মৃদু-বিরেচক হিসেবে একটু সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে এটি সর্বদাই ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে ঘিয়ে ভাজা হরীতকী চূর্ণ ক'রে বৈদ্যরা ব্যবহার করেন।

(৩) জাঙ্গী হরীতকী ঘিয়ে ভেজে গুঁড়ো ক'রে মৃদু বিরেচক হিসাবে ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। মাত্রা দেড় গ্রাম থেকে ৩ গ্রাম।

(৪) **শোথে:—** হরীতকীর চূর্ণ গুলঞ্চের রসের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে যে কোন প্রকার শোথে উপকার পাওয়া যায়।

(৫) **রক্তার্শে:—** ইক্ষুগুড়ের সঙ্গে হরীতকী চূর্ণ মিশিয়ে খেলে অল্প দিনেই ফল পাওয়া যায়।

(৬) **পিত্তশূলে:—** অল্প গাওয়া ঘিয়ের সঙ্গে এই চূর্ণ খেতে হয়।

(৭) **চর্মরোগে:—** রক্ত বা পিত্ত বিকৃত হয়ে এই রোগ হলে ১ চা-চামচ নিসিন্দা পাতার রসের সঙ্গে এই চূর্ণ (আন্দাজ ৩ গ্রাম) খেলে বিকৃতি নষ্ট হয়।

(৮) **পিত্ত-পাথুরীতে:—** হরীতকী ও গোক্ষুর চূর্ণ একসঙ্গে কুলথ কলাই ভিজানো জল দিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা বহুদিন থেকে চলে আসছে; তবে এটাও ঠিক দীর্ঘদিনের হলে দূরীভূত করা সম্ভব হয় না।

(৯) **স্বরভঙ্গে:—** মুথা (Cyperus rotundus) ও হরীতকী চূর্ণ মধুর সঙ্গে চেটে খেলে স্বর স্বাভাবিক হয়। অথবা যোয়ানের সঙ্গে খেলে একই কাজ হয়।

(১০) **আঙ্গুল-হাড়ায়:—** হরীতকী লোহার পাত্রে জলসহ ঘষে অল্প গরম ক'রে বারে বারে প্রলেপ দিলে ২।৩ দিনেই উপশম হয়। শুধু তাই নয়, এটাতে হাজাও সারে।

(১১) **হাঁপানিতে:—** এর মোটা গুঁড়ো সিগারেটের পাইপে ভ'রে কিংবা বিড়ির মত পাকিয়ে আগুন ধরিয়ে টানলে উপশম হয়।

(১২) দেহের কোন স্থানে পুড়ে বা ছ'ড়ে গেলে হরীতকী শিলে ঘষে রেড়ির তৈলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে তাড়াতাড়ি আরোগ্য হয়।

(১৩) হরীতকীর একটি টুকরো জলে ভিজিয়ে সেই জলে চোখ ধুলে চোখউঠা ইত্যাদি সাধারণ চোখের রোগে উপকার হয়।

(১৪) **ক্ষতেঃ**— যে কোন প্রকার ঘায়ে হরীতকীপোড়ার ছাই মাখন মিশিয়ে লাগালে ঘা সেরে যায়।

নিষেধঃ— গর্ভিণী, দুর্বল, ক্লান্ত ও রুক্ষ প্রকৃতির লোকের হরীতকী ব্যবহার উচিত নয়।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Tannins. (b) Polyphenolic compounds viz. chebulinic acid chebulagic acid, gallic acid, corilagin, number of unidentified phenolic constituents. (c) Anthraquinone dye stuff.

ধাত্রী

যে ফল এককালে ব্রহ্মর্ষি ও ব্রহ্মাবর্ত দেশের শ্রেষ্ঠফল, সে দেশ এখন ভারতের নাগালের বাইরে, তবুও অবশিষ্ট ভারতের যে অংশের মধ্যে আমাদের পূর্বসূরিদের পবিত্র পদ-চারণা ঘটেছিল, তার মধ্যে আর্যাবর্তেরই (বর্তমান মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ) শ্রেষ্ঠ ফল ব'লে আজও চিহ্নিত এবং যে ফলটি তেমনি সমগুণের অধিকারী কিন্তু কালপ্রভাবে আমাদের কাছে তার মূল্য পূর্বের মত আছে কি?

শীতাগমে তার মন ভোলানো রূপে গাছ আলো করে, সর্বাঙ্গে হরিৎঝরা শীর্ণ পল্লবের ওড়নাপরা থাকে আজও। সে বৃক্ষের অঢেল রূপের মাঝে যে ফলগুলি শোভা পায় তাদের রূপ, রস, গুণ যে অসামান্য তা সে বৈদিক সংস্কৃতিতে সর্বোচ্চস্থান

পেয়েছিল, এবং তার নাম দেওয়া হ'য়েছিল "তিষ্যফলা"; তিষ্য অর্থ দীপ্তিকারক। লোকসংস্কৃতিতে নাম তার আমলক বা আমলকী।

বৈদিক সমীক্ষা—

> যক্ষৎ আজুহানঃ ইন্দ্রায় তিষ্যং
> যবৈঃ লাজৈঃ সোমং ঘৃতং ব্যন্ত্বাজস্য হোতর্যজ।
>
> (যজুর্বেদ ১১।৩১।৪ সূক্ত)

বেদভাষ্যকার মহীধর লিখেছেন—

> যক্ষৎ=যজতু। কিং কর্বন ঋত্বিগ্‌ভিঃ আজুহানঃ=ইড়াদীন্ আহবায়ান্। ইন্দ্রায় বলেন বর্দ্ধয়ন্ যবৈঃ লাজৈঃ তিষ্যং=ধাত্রীফলং সোমং ঘৃত চ যোজয়ন্ ওদনং কৃত্বা বীর্য্যকরং পিবন্তু. হে হোতঃ. ত্বং চ যজ।

এই বেদভাষ্যটির অর্থ হ'লো—ওহে ঋত্বিকবৃন্দ, জনগণের সঙ্গে ইন্দ্রকে বলের দ্বারা বর্ধিত কর। যব, লাজ সহ এই তিষ্যফল গ্রহণ কর। এতে সোম এবং ঘৃত মিশ্রিত ক'রে উৎকৃষ্ট ওদন প্রস্তুত কর। সকলের বল-বীর্য বর্ধিত হবে।

তখন বৈদিক সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট আমলক ওদন অর্থাৎ যব, লাজ (খই), তিষ্যফল, ঘৃত ও সোম এই সকল দ্রব্য মিশিয়ে "ওদন" প্রস্তুত করা হ'তো। ভাষ্যকারের মতে তাই তিষ্যফলই আমলকী। সেই তিষ্যফল বা আমলকী শুধু এই ভারতেই বা কেন, বিশ্বের অন্যত্রও তার গুণকারিতা নিশ্চয়ই নানাভাবে পরীক্ষিত হ'য়েছে, তা তার প্রতিটি গুণের জন্যই বা হবে।

নামাবলী— তাদের মধ্যে প্রাচীন অভিধানগুলিতে যেমন একই ভেষজের বহুনাম দেখা যায়, এই আমলকীর ক্ষেত্রেও কায়স্থা, বয়স্থা, বহুফলা, শ্রীফলী, ধাত্রী, শিবা, শান্তা, অমৃতফলা, বৃষ্যা, বৃত্তফলা, রোচনী প্রভৃতি আরও অনেক। এগুলি যেন সেকালের থেরাপিউটিক্ ইনডেক্স্ (Theraputic index)

নামের তাৎপর্য— (১) আ অর্থাৎ সম্যকরূপেণ মলতে (মল অপসৃত হয়) এই অর্থেই আমলকী নাম। এই নামটির দ্বারা তার স্বরূপ প্রকাশ করা হ'য়েছে।

(২) **ধাত্রীফল—** যে রস সেবনে পুষ্টি হয়, সেই-ই ধাত্রী। দ্বিতীয়তঃ—এই ফলের রস স্তন্য বৃদ্ধি করে; তাই বা তার এই নামটি। হয়তো বা ইঙ্গিতও বহন করে; কারণ মাতৃস্তন্যেই তো ধাত্রী নামের সার্থকতা।

(৩) **বয়স্থা—** এর রস অকালবার্ধক্য আনতে দেয় না; তাই তার নাম বয়স্থা।

(৪) **রোচনী—** নিজের স্বাদ রুচিকর না হ'লেও অন্যের স্বাদে রুচি বাড়ায় আর অরুচিও নষ্ট করে।

(৫) **বৃষ্যা—** বৃষ্যগুণ সম্পন্না (Rejuvenative) ব'লেই তার নাম বৃষ্যা—বৃষ্+যাৎ অর্থাৎ বৃষ বা শুক্রের হিতকর, তাই বৃষ্য। এমনি প্রতিটি নামকরণের সার্থকতা নিহিত রয়েছে। অবশ্য আরও অনেক নামের অর্থ আমাদের কাছে সুখবোধ্য নয়, যেহেতু গুরু পরম্পরায় তদ্বিদ্যসম্ভাষার ধারা আজ বিলুপ্ত।

ভৈষজ্যবিধানে ব্যবহারিক আচারধর্মের প্রবেশ—

বৈদিকসূক্তে পাচ্ছি যে—বৈদিক আর্যগণ আমলকী সহ ওদন প্রস্তুত (পিণ্ডের মত) ক'রতেন, এবং যজমান সহ সকলে তা গ্রহণ ক'রে দিব্য কান্তিমান দেহের অধিকারী হতেন। চরক সুশ্রুতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা অনুশীলনের পরেই আমলকীকেই লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছিলো এর সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যের জন্য, তা ছাড়া এর দোষ-গুণ বিচারের উল্লেখও আছে; কিন্তু এই একটি মাত্র ফল—যেটি কেবল গুণেরই আকর।

আমলকীর অন্তর্নিহিত গুণ হ'চ্ছে—সে বায়ু পিত্ত বা কফের যে কোনটির বিকৃতিকে স্বাভাবিক করে দেয়; এবং শরীর রক্ষার জন্য প্রথম এবং প্রধান উপাদানের প্রয়োজন হয় শুদ্ধ রসের, তা ছাড়া দেহে ক্ষয় পূরণের প্রয়োজনে যে পার্থিব সত্তার প্রয়োজন হয় সেটা এই ফলে সৃষ্টি হয়, যেটা কিনা শোণিত সৃষ্টির মূল উৎস।

পরিচিতি— আমলকী বৃক্ষ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও অল্পবিস্তর দেখা যায়, তবে উত্তরপ্রদেশে অনেকে রোপণ করে থাকেন, এই প্রদেশেই সাধারণতঃ এর ফল বড় হয়। এ ভিন্ন মধ্যভারতের জঙ্গলে ও হিমালয়ের পাদভূমিতে আরণ্যক বৃক্ষ রূপেও প্রচুর দেখা যায়। এই গাছের পাতার আকার সরু তেঁতুলপাতার মত। বন্য আমলকীর ফল আকারে ছোট হ'লেও বৃহৎ ফল অপেক্ষা গুণবত্তায় তারতম্য হয় না। এই গাছটির

বোটানিক্যাল নাম Emblica officinalis Gaertn. ফ্যামিলি Euphorbiaceae. এই ফল ঔষধার্থে ব্যবহারোপযোগী হয় নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে।

নব্য বৈজ্ঞানিকদের সমীক্ষায়

আমলকী ফলের মধ্যে আছে প্রোটিন বা চর্বিজাতীয় পদার্থ ও মিনারেল্, তবে সেটা খুবই ভগ্নাংশে। অবশ্য কার্বোহাইড্রেটও আছে কিন্তু এটি বিশেষভাবে ভিটামিন সি, নিকোটিনিক্ এসিড ও পেক্‌টিন্ সমৃদ্ধ। তাঁরাই মন্তব্য ক'রেছেন যে, কমলা-লেবুর রসে যেটুকু খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন আছে, তার বিশগুণ বেশী আছে আমলকীতে।

বৈদিক সংস্কৃতির ক্রমোত্তর যুগেও আমলকী, যব, লাজ ও ঘৃতাদি যোগে ওদন প্রস্তুত করা হ'তো; পরবর্তীযুগে তারই যে পরিবর্তিত সংস্করণ "চ্যবনপ্রাশ" নামে আয়ুর্বেদের প্রখ্যাত ঔষধ এটা বেশ বুঝতে পারা যায়। তবে কিছুদিন থেকে আমলকী ভিন্ন চ্যবনপ্রাশে ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে আরও অন্যান্য বিশিষ্টগুণসম্পন্ন ভেষজ। তবে কালান্তরে প্রায় সেগুলি দুষ্প্রাপ্য ও সন্দিগ্ধ; তাই আরও পরবর্তীকালে এসে পণ্ডিতগণ প্রায় সমগুণ সম্পন্ন অন্য আরও কয়েকটি প্রতিনিধি ভেষজ দ্রব্য গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন চ্যবনপ্রাশের সঙ্গে। তাতেও যেটুকু উপকার পাওয়ার কথা তাও আজকাল কৃত্রিমতার ধাক্কায় অনুকল্পেরও নকল হ'য়ে প'ড়েছে, অর্থাৎ নকলেরও নকল হ'য়ে প'ড়েছে। এখনও দেখতে পাই গ্রন্থোক্ত যথাযথ প্রতিনিধি ভেষজগুলির সমন্বয়ে প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রয়োজনীয় উপকার উপলব্ধি ক'রতে পারা যায়; কিন্তু এ সবের আসল নকল পরিচিতির ক্ষেত্রটাই আজ বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে।

বৈদিক সংস্কৃতির যুগ থেকে সংহিতার যুগ পর্যন্ত ভারতে ভৈষজ্যবিদ্যার যেসব অনুশীলন হ'য়েছে, তার চরম নিরীক্ষায় তাঁরা জেনেছেন জঙ্গম, উদ্ভিদ আর পার্থিব দ্রব্যেই প্রাণিদের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়ের কারণগুলি যেমন নিহিত রয়েছে—তেমনি রয়েছে তাঁদের মধ্যে ব্যাধি বিনাশন শক্তিও। সেই শক্তি আহরণ ক'রতে হবে ঐ সব উপাদান থেকে। এই আমলকী ভিন্ন আরও যে কয়টি প্রধান ঔদ্ভিদ দ্রব্য আছে তাদের মধ্যে আর একটি হ'লো "হরীতকী"। এই দুটি ফলকে রোগের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগ ক'রতে পারলে স্বল্পব্যয়ে বহু রোগোপশম ও নিরাময় করা যায়। সেইজন্য বলা যায় জ্বরহারিত্ব থেকে যে কোন রোগহারিত্বের দক্ষতা হরীতকীর যেমন আমলকীরও তেমনি; কিন্তু একটি গুণের ক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য জেনে রাখতে হবে। হরীতকীতে লবণ রস ভিন্ন বাকী অন্য ৫টি রস (মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত ও কষায়) বর্তমান। কিন্তু আমলকী একটিমাত্র ফল, যেটি মুখ্য রসে অম্ল হ'য়েও আরও পাঁচটি রসকে (মধুর, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়) ধারণ করে; সেই হেতু সে অম্লজনিত রোগের বিনষ্টি সাধন করে। তাই তার নাম দেওয়া হ'য়েছে "অমৃতফল"।

চরক সুশ্রুতাদি প্রাচীন গ্রন্থে আমলকীকে একক অথবা মুখ্য উপাদান ক'রে অন্যান্য দ্রব্যের সমন্বয়ে বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার করার উল্লেখ দেখা যায়, যেমন কয়েকটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগের উল্লেখ ক'রছি।

(১) **অম্লরোগ** (Acidity) একে আয়ুর্বেদের ভাষায় বলা হয় অম্লপিত্ত রোগ। এ রোগে সহযোগিরূপে আত্মপ্রকাশ করে পিত্তবিকৃতি। সে ক্ষেত্রে শুষ্ক আমলকী ৩।৪ গ্রাম এক গ্লাস গরম জলে পূর্বদিন রাত্রে ভিজিয়ে রেখে পরদিন ভাত খাওয়ার সময় সাধারণ জলের পরিবর্তে এই জল খেতে হয়। তবে এই আমলকী কোন ধাতুপাত্রে

ভিজানো উচিত নয়। এর দ্বারা সেই পিত্তবিকৃতি নষ্ট হয়; এটি বহু পরীক্ষিত।

(২) যাঁরা প্রস্রাব সংক্রান্ত কোন রোগে আক্রান্ত (এমন কি ডায়াবেটিস diabetes পর্যন্ত) তাঁরা ৩।৪ গ্রাম আমলকী কোন না কোন আকারে সেবন ক'রবেন। কাঁচা রস ক'রেই হোক আর মুখশুদ্ধি হিসেবেই হোক।

(৩) **বিসর্পজ্বরে—** কোন প্রকার Sepsis- এর জ্বর; কিছুতেই ছাড়ছে না—সে ক্ষেত্রে আমলকীর রসে অল্প ঘি মিশিয়ে খেতে বলা হয়েছে চরক সংহিতায়।

(৪) **হিক্কায়—** আমলকীর রস আন্দাজ ১ চামচ অথবা শুষ্ক আমলকী ভিজানো জলে ১০।২০ ফোঁটা মধু ও ২।১ গ্রেণ পিপুলের গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়ার কথাও চরকীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে লিখিত হ'য়েছে।

(৫) **বমন (বমি)—** বন্ধ হ'চ্ছে না—সে ক্ষেত্রে শুষ্ক আমলকী (৩।৪ গ্রাম) ১ কাপ জলে ভিজিয়ে রেখে ঘণ্টা দুই বাদে ছেঁকে নিয়ে সেই জলে শ্বেতচন্দন ঘষা (আধ চামচ আন্দাজ) ও একটু চিনি মিশিয়ে অল্প অল্প ক'রে খেতে দিতে হয়।

(৬) **শ্বেতপ্রদরে** (Leucorrhoea) যে রোগটি আজকাল মাতৃজাতির মধ্যে কৈশোরারম্ভ থেকেই প্রায় ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে, এ রোগে একটা (বীজ সমেত) অথবা ছোট হ'লে দুটো কাঁচা আমলকী রস ক'রে একটু চিনি বা মধু মিশিয়ে খেতে হবে। অভাবে আমলকী চূর্ণ এক বা দেড় গ্রাম আন্দাজ মধু দিয়ে খেলেও কাজ হবে না তা নয়।

(৭) **পিত্তশূলে** (Biliary Colic) আমলকীর রসে (১।১½ চামচ) অল্প চিনি মিশিয়ে খেলে উপশম হয়।

(৮) **শীতপিত্তে—** যাকে আমরা চলতি কথায় আমবাত বলি (যদিও প্রকৃত আমবাত পৃথক রোগ), এ ক্ষেত্রে আমলকীর সিকি ভাগ নিমপাতা মিশিয়ে (দুটোই গুঁড়ো) ১২ গ্রেণ (এক গ্রামের একটু কম) মাত্রায় প্রাতে খালিপেটে খেতে হয়। কিছুদিন ব্যবহার ক'রলে এ রোগ প্রশমিত হবেই।

(৯) **দৃষ্টি ক্ষীণতায়—** অল্প বয়সে যাঁদের দৃষ্টিশক্তি ক'মে যাচ্ছে, যার জন্য কিছুদিন অন্তর চশমার শক্তি বাড়াতে হ'চ্ছে; এ ক্ষেত্রে তাঁরা নিয়মিত বেশকিছুদিন এই আমলকীর রস ২।৩ চামচ এক চামচ মধু মিশিয়ে সকালের দিকে খেয়ে দেখুন। তবে পুরাতন অজীর্ণদোষে প্রথম প্রথম কোন কোন ক্ষেত্রে অম্বল বা গলা ও বুক-জ্বালা দেখা দেয়—সে সব ক্ষেত্রে প্রথমে মাত্রা কম ক'রে খেয়ে অভ্যাস ক'রতে হয়।

(১০) **অনিদ্রায়—** কাঁচা বা শুষ্ক আমলকী কাঁচা দুধে বেটে একটু মাখন মিশিয়ে মাথায় লাগালে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। এর সঙ্গে অনেকে শতমূলীর রস মিশিয়ে ব্যবহার করেন।

(১১) **আমলকী ও থুলকুড়ি** (প্রচলিত নাম থানকুনি, Centella asiatica) এক সঙ্গে বেটে চন্দনের মত পেটে লাগালে আমজনিত কামড়ানি ক'মে যায়।

(১২) তলপেটে বায়ু হ'লে আমলকী বেটে (চন্দনের মত) নাভির নীচে প্রলেপ দিলে সুন্দর কাজ হয়। এবং বায়ুর প্রশমন হয়। অনেক সময় দেখা যায়, যে সব ক্ষেত্রে প্রস্রাব আটকে যাচ্ছে, সে ক্ষেত্রেও বেশ উপকার পাওয়া যায়।

(১৩) **চোখ উঠলে—** ছোট ২ টুকরো আমলকী গরম জলে ধুয়ে নিয়ে ৪।৫ চামচ গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন সকালে ছেঁকে নিয়ে ৩।৪ ফোঁটা চোখে দিতে হবে। এইভাবে ২।৩ দিন চোখে দিলে চোখ ওঠা সেরে যাবে।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Vitamin viz. ascorbic acid. (b) Aminoacid viz. glycine. (c) Tannin. (d) Polyphenolic compounds viz. corilagin, ellagic acid, terchebin, gallic acid, chebulic acid, chebulagic acid, chebulinic acid. (e) Fixed oil. (f) Lipids viz. phosphatides. (g) Essential oil.

উদুম্বর

শুধু প্রাক্‌-আর্যজাতির জীবন-ইতিহাসের ক্ষেত্রেই বা বৃক্ষপূজার অনুষ্ঠানকে ঐকান্তিক করি কেন? আর্যোত্তর অথবা আর্যপুরুষদের জীবনেই কি বৃক্ষপূজাদি সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়নি? হ'য়েছিল ব'লেই তো যজ্ঞডুমুর এককালের কল্পতরু বৃক্ষ বলে গণ্য। তাই বৈদিক সংস্কৃতিবান ভারতবাসীর দশবিধ সংস্কারের মধ্যে অন্যতম সংস্কার "সূতিকা হোমে" (সূতিকা গৃহে হোমের ব্যবস্থা) প্রয়োজনীয় উপাদান যজ্ঞডুমুরের পল্লব। অবশ্য পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের যেন এই ব্যবস্থা, কিন্তু আসলে সূতিকা গৃহের মধ্যে দূষিত আবহাওয়া বিতাড়ন। সেই হোমের প্রধান আহুতির উপাদান সমিধ্‌ (যজ্ঞডুমুরের শাখার অগ্রভাগ); তারপর সেই যজ্ঞডুমুরের আরও প্রয়োজন থাকে—অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদির হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়ার জন্য। আবার মরণোত্তরকালে পারলৌকিক শ্রাদ্ধকৃত্যের এবং বৃষোৎসর্গের হোমাহুতিতে এই মহাবৃক্ষ-টির সর্বাঙ্গ অপরিহার্য উপচাররূপে গণ্য হয়। অপরপক্ষে এর ভৈষজ্যগুণ আমাদের বহু-রোগকে প্রতিরোধ ও নিরাময় করে।

এইভাবে ডুমুরের যে উপযোগিতা সৃষ্টি, তা কেন? এর উত্তর পাওয়া যায়—জাতির ঐতিহ্যের ধারাসূত্র বেদে অনুসন্ধান করলে। ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব—এই তিনটি বেদেই এই উদুম্বর বৃক্ষটির নাম উল্লেখিত হয়েছে 'উম্বর'—একথা বলেছেন বেদের প্রাচীন ভাষ্যকার সায়ণাচার্য।—

বৈদিক তথ্য—ঋক্ ১৭।২।৪২

> 'উম্বর স্ত্বমসিপাপ্মানং বলাসং শতস্য পাকারোরসি পৃশ্নিরশ্মা বিচক্রমে।'

এই সূক্তটির সায়ণ ভাষ্য করলেন—

> 'ত্বং উম্বরঃ, বর্ণাগমাৎ উদুম্বরঃ। বিদারণপূরকঃ। পাপমানং রোগং অন্তঃক্ষতং তথা শতস্য পাকক্ষতস্য পাকারোরসিঃ, শোণিত পাকায় উপশামক ইতি, ত্ব অশ্মা বিচক্রমে, পৃশ্নিবোরসি। অর্শসাং বলাসং চ বল্যাদিকং পৃশ্নিঃ=ছেত্তাসি'।

অনুবাদ:— তুমি উম্বর। বর্ণাগমের এই আখ্যা অর্থাৎ বিদারণ করার সামর্থ্য আছে তোমার, তারই বর্ণ বিপর্যয়ে তোমার এইরূপ, অর্থাৎ উম্বর থেকে উদুম্বর। উদুম্বরের অর্থই হোলো বিদারণ শক্তি সম্পর্কে যার কৃতিত্ব। এই উদুম্বর পাপরোগ অর্শাদির নাশক। শোধক, অন্তঃক্ষত এবং পাকক্ষতের শোধক। ঐসব পাপজ রোগের তুমি ছেদনকর্তা।

আজও মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে এটি উম্বর ব'লে পরিচিত। ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে উম্বর হ'লো রক্তদুষ্টির অপহারক এবং ক্রিমির অপসারণকারক। শুক্ল যজুর্বেদে বলা হয়েছে—এই বৃক্ষের ত্বক্ ক্রিমিনাশক আর অথর্ববেদে এই বৃক্ষটির ভেষজ পরিচয়ই বেশী লেখা আছে। এটি ত্বক্‌রোগ, অন্তঃক্ষত (সাইনাস), শোথ, রক্তদুষ্টি ও ক্ষতবিকার নাশক, অধিকন্তু এর দ্বারা কুষ্ঠ ও অর্শরোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহের শোধন ও তার প্রতিকার সাধিত হয়, একথা বলা আছে।

আজকের বস্তুনিষ্ঠ যুগে বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মানুষের কাছে বোধ হয় অবিশ্বাস্য যে, কোন অশরীরী শক্তির জীব এবং অতি সূক্ষ্ম শরীরী প্রাণী আছে, এবং তারাও যে তাদের প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারে, এটা আজ সূক্ষ্মতম শক্তির দূর-বীণের দ্বারা তা লক্ষিত হচ্ছে; কিন্তু এরূপ শক্তিসম্পন্ন প্রাণীর অস্তিত্ব সেই স্মরণা-তীত কালের বৈদিক ঋষিগণ কত আগেই তা প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন। তা ছাড়া তন্ত্রাভিধানের আভিচারিক ক্রিয়াতে এদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তাদের দ্বারা রোগবিস্তার শক্তির দূরীকরণের জন্যই তাঁদের এই সব প্রক্রিয়া। সেই বিজ্ঞান কি আমাদের প্রাচীনতম দৃষ্টিকেই সমর্থন করে না?

আরও একটি আশ্চর্য তথ্য এখানে লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে যে, পিপ্পল (অশ্বত্থ), বট, শিখণ্ডী, ময়ূর, উদুম্বর প্রভৃতি বৃক্ষ ও পাখী যেখানে সেখানে ওদের স্পর্শলাগা বহমান বায়ুদ্বারা দূষিত রোগের সংক্রামণ দূর হয়।

বৈদিকযুগের ভেষজগুলি কালান্তরে মাতৃতান্ত্রিক ও পৌরাণিক মূর্তিপূজার উপচার হিসেবেও গৃহীত হ'য়ে সেকালের মনীষীদের দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন ক'রে আসছে মনে করি। যাতে জনপদে এই জীবকল্যাণকর গাছগুলির অবলুপ্তি না ঘটে,

তারই পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চপল্লবরূপে বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও আম—এই গাছগুলির শাখা মাতৃতান্ত্রিকদের দেবীর পূজার্চনায় অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হ'য়ে আসছে।

এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় উদুম্বর সম্পর্কে—যাকে বাংলায় যজ্ঞডুমুর বলা হয়, একে হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে গূলর বলে, ওড়িষা রাজ্যের চলতি নাম যজ্ঞাডিম্বিরী; পাশ্চাত্য মতে এটি Moraceae ফ্যামিলীভুক্ত, ল্যাটিন নাম Ficus racemosa Linn. ফ্যামিলী Moraceae ; এর পাতাগুলি কর্কশ (খসখসে) ও আকারে যজ্ঞডুমুরের পাতার থেকে বড়। অতি সাধারণ গাছ। আমরা কথায় কথায় উপমা দিই 'ডুমুরের ফুল', কিন্তু

দেখা না গেলেও ফুল তার হয়, ফলটি কাটলেই দেখা যায়—তার ভেতরে বহু ফুল; ডুমুরটি হচ্ছে পুষ্পাধি, এইজন্য একে অন্তঃপুষ্পও বলা হয়। এই ডুমুর পাকলে লাল হয়, খেতে অল্প মিষ্ট রসাস্বাদ। এটায় খুব পোকা হয়, তাই তাকে বলা হয় জন্তুফল। বট, অশ্বত্থ, পাকুড় সকলেই এক জাতীয়। আয়ুর্বেদের অন্য একটি পরিভাষায় এগুলিকে ক্ষীরীবৃক্ষ বলা হয়, অর্থাৎ এসব গাছে ঘন দুধের মত আঠা (নির্যাস) আছে। বর্তমানে এদেশে আরও কয়েকটি জাতের ডুমুর দেখতে পাওয়া যায়—যেমন, কাকডুমুর (Ficus hispida Linn.f.)— এগুলিকে আমরা তরকারি হিসেবে খেয়ে থাকি, বলাডুমুর

(Ficus heterophylla Linn.f.), জয়াডুমুর (Ficus cunia Ham.ex Roxb.), কালিফোর্ণিয়ার ডুমুর (Ficus carica Linn.), আরবে এটি আঞ্জির নামে পরিচিত। এর মধ্যে আমাদের ভৈষজ্য নিঘণ্টুতে তিনটি জাতির নাম পাওয়া যায়—উদুম্বর, কাকোদুম্বর ও নদীউদুম্বর। একে অন্তঃপুষ্প বানস্পত্য সংজ্ঞায় বৃক্ষ পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে, কারণ ছেদন করলেও এটিতে আবার শাক্ষা-প্রশাখার উদ্‌গম হয়।

উপযোগিতা :— বেদের যুগে রোগগুলির শব্দনাম দেখে বর্তমান যুগে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার সদর্থ না জানলে তার প্রয়োগ করার ব্যাপারে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া কঠিন, যেমন লেখা আছে 'অন্তঃক্ষত নাশক', সেই অন্তঃক্ষতের সংজ্ঞার্থ উপলব্ধি ক'রে তার ক্ষেত্রটি বিচার ক'রে ওষধি প্রয়োগ করা খুবই সমস্যা, তবে তৎকালীন গবেষণালব্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞানের যে ধারাগুলি লিপিবদ্ধ করা আছে বিভিন্ন সংহিতায়, সেইসব সূত্র থেকেই আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানও পরম্পরাক্রমেই চলে আসছে ধরে নিই, তারই অংশ-বিশেষ এখানে পরিবেশন করা হচ্ছে।

এই গাছটির ফল, মূল, পাতা, গাছের ও মূলের ছাল (ত্বক্) ও ক্ষীর (দুধের মত আঠা বা নির্যাস)—সব অংশই ঔষধার্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ক্ষীর (দুধের মত নির্যাস বা আঠা) :— শরীরের কোন জায়গায় গ্রন্থিস্ফীতিতে (Gland inflamation) লাগিয়ে দিলে প্রদাহ ও ব্যথা কমে যায় এবং ব'সেও যায়, গ্রামাঞ্চলে এটা লাগিয়ে তার উপর লবণ ছড়িয়ে দিতে দেখেছি এবং অর্শরোগে ও অতিসারে খাওয়ার জন্য একে ব্যবহার করা হয়, এটা লেখা আছে ওয়াট সাহেবের সংগ্রহ গ্রন্থে।

পল্লব :— এই অংশটি পল্লীবাসির ও চিকিৎসকগণের বিশেষভাবে কাজে আসবে, এ থেকে ঘনসারও Semi-solid extract তৈরী ক'রে রাখা যায়।

ঘনসার প্রস্তুতিবিধি :— ৫।৭ ইঞ্চি সরু ডাল সমেত কাঁচা পাতা ছে'চে নিয়ে সিদ্ধ ক'রে সেই জল ছে'কে নিয়ে নরম জ্বালে আবার পাক করতে করতে ঘন হয়ে চিটে গুড়ের থেকেও একটু মোটা বা ঘন ক'রে (লেই বা কাই) রাখুন। এটা ক'রে রাখলে মাত্রা মত ব্যবহার করার সুবিধে হবে। এতে অল্প মাত্রায় সোহাগা খৈ মেশালে নষ্ট হয় না।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে

১। কোন জায়গায় কেটে রক্তপাত হ'তে থাকলে—ঐ ঘনসার লাগালে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে, ব্যথা হবে না এবং ওটাতেই সেরে যাবে।

২। বিড়াল, ইঁদুর, বোল্‌তা, ভীমরুল বা কোন জানা-অজানা বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড়ে অথবা কুকুরের আঁচড়ে (আঁচড়ে দিয়েছে এমন ক্ষেত্রে) ওটা লাগালে জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হবে এবং বিষোবে না।

৩। দেহের কোন জায়গা থে'তলে গেলে বা আঘাত লেগে ব্যথা হলে ওটায় ২ গুণ জল মিশিয়ে পেস্টের মত লাগালে ব্যথা ও ফুলা দুই-ই কমে যাবে।

৪। **ফোড়ায় :—** এই ঘনসার ৪ গুণ জলে গুলে ন্যাকড়া বা তুলোয় লাগিয়ে বসিয়ে দিলে ওটা ফেটে পুঁজ-রক্ত বেরিয়ে যাবে। এইভাবে ব্যবহারে কয়েকদিনেই সেরে যাবে।

৫। মুখের দুর্গন্ধ, দাঁতের গোড়া বা মাড়ী ফোলা ও ব্যথা, গলায় বা মুখের ক্ষতে এই ঘনসারে আটগুণ জল মিশিয়ে কবল (Gargle) করলে অথবা মুখে কিছুক্ষণ রেখে দিলে ২।১ দিনেই উপশম হবে এবং এইভাবে ব্যবহারেই সেরে যাবে।

৬। ক্ষেত্র হিসেবে ৮—১২ গুণ জলে গুলে ডুস দিলে স্ত্রীরোগজনিত স্রাব নিশ্চিত প্রশমিত হয়।

এবার আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ (Internal application) সম্বন্ধে জানাই—উর্ধ্বগ রক্তপিত্তে (Haemoptysis), রক্তার্শে (Bleeding piles) ও রক্তস্রাবে ১২ গ্রেণ আন্দাজ মাত্রায় ২ আউন্স বা এক ছটাক জলে মিশিয়ে দিনে ২।৩ বার খেলে বিশেষ উপকার হয়।

এই পাতার গুণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের ২।১টি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি।

পাশ্চাত্য গবেষকগণও পরীক্ষিত ঔষধ হিসাবে বলেছেন যে, ডুমুরের পাতার গুঁড়ো মধুর সঙ্গে খেলে পিত্তবিকৃতিজনিত রোগ (Bilious affections) নিরাময় হয়। আর একটি—এই যজ্ঞডুমুরের পাতার উপর যে অর্বুদ (Gall) হয় (একে আয়ুর্বেদের ভাষায় বলা হয় শূন্যগর্ভ), সেটা দুধে ভিজিয়ে মধুর সঙ্গে বসন্তে (Small pox) ব্যবহার করলে বিশেষ উপকার হয়। এখানে একটা কথার উল্লেখ করি—এই পাতার অর্বুদটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখেছেন—সায়েন্স কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়।

বৃক্ষটির অন্যান্য অংশে বহুরোগ উপশম ও নিরাময় হয়। ভারতের প্রান্তে বিভিন্ন রোগ-নিরাময়ে এই পত্রের ব্যবহার হয়তো হ'চ্ছে, কিন্তু তার ফল কতখানি কাজে লাগে সেটা অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে আদান-প্রদানের অভাবে এবং পুরাতন সংস্কারে গোপন ক'রে রাখার স্বভাব আজও প্রচুর বলেই এ সম্পর্কে বহু তথ্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছে ও যাচ্ছে। কালপ্রভাবে তা.ক তুলে নেওয়ার আগ্রহ এখনও কারও আসছে না।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Dichlorobenzoic acid. (b) Dihydropsoralen. (c) Hydroxy-coumarin. (d) Enzyme.

বাসা (শ্বেত পুষ্প)

অতীত ভারতের আয়ুর্বেদ চিকিৎসক মানে সর্বপ্রকার রোগেই বিশেষবিদ্, মধ্যযুগে এসে তাঁরা হ'লেন মাত্র কায়চিকিৎসাবিদ্, আবার ইংরেজ আমলের মাত্র ৩শত বৎসর পূর্ব থেকে হ'লেন নাড়ীজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ কবিরাজ; সেই সময় থেকেই তাঁদের পূর্ব-গৌরবের গাম্ভীর্যে মালিন্য দেখা দেয়।

ইংরেজ জাতির উত্থানের সঙ্গে তাঁদের জাতীয় চিকিৎসাবিদ্যারও উন্নতি হয়, তাঁরা সাধারণভাবে চিকিৎসাবিদ্যাটিতে প্রতিভার সর্বতোমুখী অভ্যুদয় ঘটিয়েছেন, তার সঙ্গে এক একটি দিককেও বিশেষ গবেষণার মাধ্যমে প্রভূত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চ'লেছেন, এ'দের এই রীতিটিকে দেখে আমরা আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুশীলন ক'রে বুঝেছি যে, আয়ুর্বেদের সংহিতার যুগেও এ রীতির অবশ্য প্রবর্তন হ'য়েছিলো; তখন এইসব রোগের প্রতিকারের জন্য তাঁরা যেসব বৃক্ষলতাদির মধ্যে বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার ক'রে-ছিলেন—তাদের অন্যতম বনৌষধি এই ক্ষুপ জাতীয় বৃক্ষ বৃষ। এর প্রকৃতি পরিচয়ের আবিষ্কার সেই বৈদিক যুগে; এবং ব্যবহারের নির্দেশও শরীরের উর্ধ্বভাগের রোগে অর্থাৎ যে রোগগুলির আয়ুর্বেদোক্ত নাম উর্ধ্বজত্রুগত রোগ।

এই বনৌষধিটির গুণ উপরিউক্ত তিনটি অঙ্গের রোগের ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ থাকলেও তার আর একটি বিশেষ কার্যকারিতা প্রকাশ পায় ফুস্‌ফুস্-সংক্রান্ত (Pulmonary diseases) বিভিন্ন রোগেও।

অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৫।১১৩।২৭০ সূক্তে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে—

> বিদ্মা তে বৃষ ত্রেধা। বিদ্মা তে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা। বিদ্মা তে নাম গুহা তমুৎসংযৎ রুক্ম উর্ব্যা শ্রিয়ে রুচানঃ।

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্যে বলা হ'য়েছে—

> বৃষ তে ত্রিধা বিদ্মা বয়ং ত্রিস্থানানি জানীমঃ। বৃষঃ সেচনে অটরূষকোহয়ং। অটন্তি=ভ্রমন্তি যে দোষাঃ তান্ হিনস্তি ইতি অটরূষকঃ। তে ত্রিস্থানানি উরঃ কণ্ঠঃ শিরঃ এতানি ত্রিস্থানানি বিদ্মা বয়ং। তে ধাম বিভৃতা বিহৃতানি উরঃ কণ্ঠঃ শিরঃ এতানি ত্রিস্থানানি বিদ্মা বয়ং। তে ধাম বিভৃতা বিহৃতানি ধামানি বয়ং বিদ্ম গুহামর্ম্মসু গোপ্যং যদস্তি কফ-পিত্তশোনিতং তদপি অজগন্থ বৈদ্যকর্ম্ম বিদ্ম। উর্ব্যা-শ্রিয়ে সাম্যং বিদধাসি ত্বং রুচানঃ ক্ষয়াপহশ্চ।
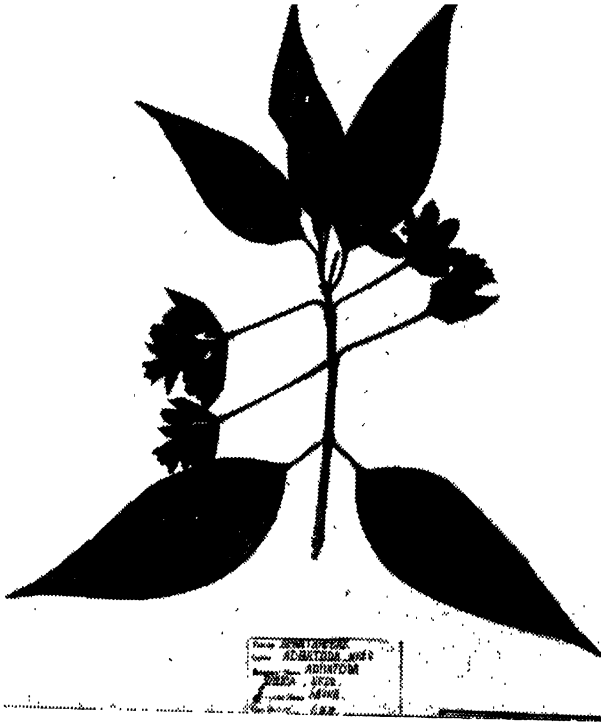
এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—ওহে বৃষ, তুমি অটরূষক (অর্থাৎ যে দোষগুলি দেহে ভ্রমণ করে তাকে যে হিংসা করে, তারই নাম অটরূষক), আর বৃষ মানে সেচন করা। তোমার তিনটি স্থান কি কি তাও যেমন জানি, তেমনি তোমার যে তিনটি গোপন গুহায় নিবাস তাও আমরা জানি।

যুগোত্তরের সমীক্ষা

বৈদিক সূক্ত যেন সমুদ্র আর ভাষ্যগুলি যেন জাহাজের দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র; এইটাই সংহিতাযুগের গবেষকদের লক্ষ্যে পেঁছে দিয়েছে।

এই বনৌষধিটি সম্পর্কে ভাষ্যকারের ভাষ্যে মামলার আরজির "ইস্যুর" মত পাওয়া গিয়েছে এই সব তথ্যরাজি।

(১) বৃষ ও অটরূষক নামকরণের রহস্য—
(২) কোন্ তিনটি মর্মস্থানে বৃষের আধিপত্য—
(৩) কোন্ তিনটি ধাতুর অসাম্য নিরসন করায়—
(৪) এর যোগফলে কি পাওয়া যাবে—

ভাষ্যকারদের আকার ইঙ্গিতে বলা এইসব কথার দ্বারা চিকিৎসাক্ষেত্রে বস্তুসত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠা করানোর অনুশীলন, এইটাই সংহিতা যুগের বিশেষ দান। এ যেন পেটের কথা টেনে বার ক'রে মামলা সাজানো। যেমন বলা হয়েছে বৃষ=সেচনে=আদ্রীকরণে এটি কিন্তু বনৌষধিটির গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞানাম, আর অটরূষকও তাই। বৃষ বা অটরূষকের দ্রব্যশক্তি শরীরের ৩টি মর্মস্থানের (উর, বক্ষ, শির ও কণ্ঠ) বিকৃত কফ, পিত্ত ও শোণিতজ দোষের সংশোধনের রাস্তা সে পরিষ্কার করে, যার দ্বারা স্বাভাবিক-ভাবেই শারীর-ক্রিয়া প্রবর্তিত হয়। সংহিতার যুগে সেই সব দোষাভিত্তিক রোগের ক্ষেত্রে একে প্রয়োগের পর তাঁদের উপলব্ধ জ্ঞানকে আরও প্রসারিত করা হয়েছে।

স্থান সম্পর্কে বক্তব্য

শরীরের শ্লেষ্মা (অপ্ ধাতু) তিনটি স্থানে তিনটি পৃথক নামে থেকে জীবনকে ধারণ করে। উর বা বক্ষে থাকে "অবলম্বক" শ্লেষ্মণ ধাতু, এর সন্ধি বা মিলন স্থান আমাশয়। শীতে, দিবসের প্রথমে এবং ভোজনের পরেই, আর বসন্তকালে এ স্থানটি স্বভাবতই কুপিত হয়; তার ফলে সৃষ্টি করে জড়তা, কণ্ডূ (চুলকানি) ও মুখে লবণাক্তভাব, এর থেকে রেহাই পেতে এই বৃষের রস খুব প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় স্থানঃ— শিরঃস্থান—এখানকার শ্লেষ্মণ ধাতুর নাম "তর্পক", এটি বিকৃত না হ'লে শিরোভাগের সমস্ত কাজই সুষ্ঠুভাবে চলে; এখানের কাজ হ'লো চিন্তা, স্থৈর্য, প্রতিভা এবং সমগ্র দেহের ক্রিয়াশক্তির শৃংখলা রক্ষা করা; আবার বিকৃত হ'লেই বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই বৃষের শক্তি আছে তাকে স্বভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আনার।

তৃতীয় স্থানঃ— কণ্ঠ—এখানে অবস্থানের সময় অপ্ ধাতুর নাম "বোধক"; এটি রসনার (জিহবার মূল স্থানে থেকে ক্রিয়া করে।) উর্ধ্বজত্রুগত সমস্ত স্রোতের এই স্থানটি হ'লো সংযোজক; গলরোগের কারক; শ্বাসরোগের প্রকাশক, কাসরোগের বাহক। বৃষ এই বিকারগ্রস্ত বোধক শ্লেষ্মণ ধাতুকে স্বাভাবিক করে। এইভাবে ত্রিস্থানগত ব্যাধিতে বৃষ নামক বনৌষধিটির ক্রিয়া সুপ্রশস্ত হয়। তারপর বৃষ বনৌষধির তিনটি স্থানের উল্লেখও বৈদিকসূক্ত থেকে নিয়ে মূল, ত্বক্, (বৃক্ষ ত্বক্) ও পত্র—বৃক্ষের এই তিনটি অংগের গবেষণার ফল চরক, সুশ্রুত সংহিতায় এবং পরবর্তীকালে মনীষী-বৃন্দের রচিত বা সংগৃহীত গ্রন্থে এমন কি সপ্তদশ শতকেও এর ফুল নিয়ে গবেষণা হয়েছে।

কে এই বৃষ?

গঙ্গাতীরে বসবাসকারীর গঙ্গাভক্তি যে পর্যায়ে, আমাদের কাছে এই বৃষ বনৌষধির কদরও সেই পর্যায়ের, কারণ আমরা ভারতবাসী, আমাদের সর্বভাষার জননী সংস্কৃত-ভাষাকে অনেকদিন থেকেই উপেক্ষা ক'রে আসছি, তাই সেই বৃষ এখন আগাছারই সামিল হ'য়ে থাকে আমাদের বেড়ার ধারে, নাম তার বাসক। যাকে সাধুভাষায় বলা হয় "বাসা"। বাসক গাছটি শুধু বাংলায় কেন, ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এর হিন্দি নাম আড়ুষা, এটি অটরুষকের বিবর্তিত শব্দনাম।

ক্ষুপজাতীয় গাছ হলেও প্রায় ৫।৬ ফুট উঁচু হয়; আষাঢ়-শ্রাবণে সাদা ফুল হয়। এর বোটানিক্যাল নাম Adhatoda vasica Nees. । সাদা ফুলের বাসক ছাড়াও অপেক্ষাকৃত নবীন বনৌষধির নিঘণ্টু গ্রন্থে তাম্রপুষ্পী বাসকের উল্লেখ দেখা যায়; এর ফুলগুলি হরিদ্রাভ রক্তবর্ণ; এটির বোটানিক্যাল নাম Phlogacanthus thyrsiflorus Nees. এদের ফ্যামিলি Acanthaceae. এই দুটি ভিন্ন বর্তমানে এদেশে এই ফ্যামিলির আর একপ্রকার বহিরাগত ক্ষুপ জাতীয় গাছ বাসক বলে প্রচলিত হয়েছে; তার ফুলগুলি লাল। এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম Jacubinia tinctoria Hemsl.

ভিতর বাহিরের উপদ্রবে

প্রথমেই বলে রাখি বাসক, নিম প্রভৃতি কয়েকটি ভেষজকে কাঁচা ব্যবহার করতেই বলা হয়েছে; তবে হাওয়ায় শুকিয়ে নিলে একই গুণ পাওয়া যায়।

(১) **অম্লপিত্ত রোগে—** এ রোগে দীর্ঘদিন ভুগতে থাকলে আসে অম্লশূল, হৃদ্‌রোগ, ব্লাডপ্রেসার এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত। এই অম্লপিত্তকে দমিত করতে গেলে ৭।৮ গ্রাম বাসক ছাল ৪ কাপ আন্দাজ জলে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে সেই জলটা দুই তিন বারে নিত্য খেলে বিশেষ উপকার হয়।

(২) **ক্রিমিতে—** বয়সানুপাতে মাত্রামত উপরিউক্ত পদ্ধতিতে বাসক ছালের ক্বাথ করে খাওয়ালে ক্রিমিও মরে যায়।

(৩) **রক্তস্রুতিতে—** রক্তপিত্তজনিত যে কোন জায়গা থেকে রক্তস্রাবে বাসক ছাল ও পাতা (১০।১১ গ্রাম) একসঙ্গে সিদ্ধ করে সেই ক্বাথের সঙ্গে চিনি বা মিছরির সিরাপ মিশিয়ে খাওয়ালেও রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(৪) **শ্বাসরোগে—** নূতন বা পুরাতন যাই হোক না, উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ক্বাথ প্রস্তুত ক'রে সিরাপের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে শ্বাসের উপদ্রবেরও উপশম হয়। অনেক-ক্ষেত্রে শ্বাসরোগের সঙ্গে শরীরে এক্‌জিমাও থাকে; কারণ ঔপসর্গিক রক্তদুষ্টির দ্বারা ঐ দুটি রোগ এককালেই দেখা দেয়; এটার দ্বারা সে দু'ক্ষেত্রের প্রভাবও ক'মে যায়।

(৫) **হাঁপের টানে—** বাসকের শুষ্ক পাতার চুরুট বানিয়ে বা বিড়ি ক'রে অথবা কলকেতে সেজে ধোঁয়া টানলেও বেশ উপশম হয়।

(৬) **গাত্র-দৌর্গন্ধে—** গায়ের স্থানবিশেষের ঘামে দুর্গন্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে বাসক পাতার রস লাগালে ওটা হয় না।

(৭) গায়ের রং ফর্সা কে না চায়—এই বাসক পাতার রসে দুই-এক টিপ শঙ্খ-

ভষ্ম মিশিয়ে স্নানের দুই-তিন ঘণ্টা পূর্বে গায়ে লাগাতে হয়, এর দ্বারা শ্যামবর্ণও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হয়।

(৮) **খোস পাঁচড়ায়**— গোমূত্রে বাসক পাতা বেটে লাগালে নিশ্চিত নিরাময় হয়।

(৯) **অর্শের বলির যন্ত্রণায়**— থেঁতো বাসক পাতা অল্প গরম ক'রে পুঁটুলি বেঁধে মলদ্বারে সেঁক দিলে যন্ত্রণা ও ফুলো দুইয়েরই উপশম হয়।

(১০) **বসন্তের সংক্রমণে**— পাড়াজুড়ে বসন্ত, এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে বাসক পাতা সিদ্ধ জল খাওয়ার জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রত্যহ খেতে হয়, তাহলে আর সংক্রমিত হওয়ার ভয় থাকে না। আয়ুর্বেদ মতে এর দ্রব্যশক্তিটি রোগ হওয়ার কারণটাকেও প্রতিহত করে।

(১১) **জীবাণু নাশে**— এক কলসী জলে ৩।৪টি বাসক কুচি করে কেটে ৩।৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে সেই জল জীবাণুমুক্ত হয়। শুধু তাই বা কেন, পুকুরের পোকা-মাকড় মারতেও সেকালে বাসক পাতা জলে ফেলা হতো।

(১২) **টিউমার না গর্ভ**— চরকসংহিতার যুগে বাসক পাতার রস খাইয়ে নির্ণয়-করা হতো।

এই নিবন্ধের ইতিতে একটি কথা বলে রাখি—দূষিত রক্ত ও শ্লেষ্মাজনিত যে সব রোগ আসতে পারে, সে সব ক্ষেত্রে বিচার করে বাসক প্রয়োগ করতে পারলে বেড়ার ধারে বসেই অনেক রোগ সারানোর ব্যবস্থা করা যায়।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Vasicine. (b) 1-peganine. (c) Small amount of essential oil.

বাসা (তাম্র পুষ্প)

এটা নূতন কথা নয় যে, ভারতীয় মানুষই কেবল বৃক্ষলতাদির গুণাগুণ সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল; বিশ্বের সব মানুষই তাদের জন্মভূমির গাছগাছড়ার গুণদোষ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন, এমনকি কুকুর-বিড়ালও জানে তাদের শারীরকষ্ট লাঘবের জন্য কোন্ কোন্ তৃণ, কোন্ কোন্ লতাগুল্ম নির্দিষ্ট করা আছে; তাই তো আমরা পরিষ্কার ধারণা ক'রতে পারি, কেন এই গাছটি জ্যোতিষ-সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ পরিচিত হ'য়ে আছে। ওঁরা জানেন শুক্রগ্রহের কোপদৃষ্টি ও তজ্জনিত রোগ প্রশমনের জন্য সিংহপুচ্ছীর মূল ধারণ অবশ্যকরণীয়। এ কথা জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। বাংলায় এই সিংহপুচ্ছীর প্রচলিত নাম "রামবাসক"।

এই ভেষজটি কয়েকটি বিশিষ্ট শক্তির অধিকারী হ'য়েও আজও আয়ুর্বেদীয় ভেষজ-বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক সম্প্রদায়ের বিশেষ দৃষ্টিতে এখনও আসেনি। তথাপি রামবাসকের মধ্যে যে বিশেষ রসশক্তি নিহিত আছে, সেই অজ্ঞাত শক্তি সম্পর্কে কিছুটা আলোক-সম্পাত করার জন্য বর্তমান আলোচনা ও তার স্বরূপনির্ণয় করাই (identification) এখানকার প্রাসঙ্গিক।

এ সম্পর্কে জানাই যে, বনৌষধির প্রাচীনগ্রন্থে শ্বেত ও তাম্র বর্ণের পুষ্পভেদে দুই প্রকার বাসকের উল্লেখ আছে, কিন্তু বেদে বৃষ বা বাসক সম্বন্ধেই যেটুকু উল্লেখ আছে, তাতে নানান্ ভেদের উল্লেখ নেই, অথচ দুটি অংশবিশেষের পার্থক্য বর্তমান।

ভারতের কবিরাজবৃন্দ একমাত্র শ্বেতপুষ্প বাসকেরই ঔষধার্থে ব্যবহার ক'রে থাকেন, কারণ এটি ভারতের প্রতি প্রদেশেই যত্রতত্র পাওয়া যায়। আর তাম্রপুষ্প বাসক, যার অপর এক নাম সিংহপুচ্ছী বা রামবাসক, সেটি কিন্তু বিদ্যমান থেকেও ব্যবহারগত পরিচয় (ঔষধার্থে) তার নেই।

এটি হিমালয়স্থ গাড়োয়াল থেকে ভুটান পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত উষ্ণভাবাপন্ন অঞ্চলে

এবং আসাম ও খাসিয়া পর্বতে প্রচুর পাওয়া যায়, তবে এতদঞ্চলে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনেই এর চাষ বা রোপণ করা হয়। এটির বোটানিক্যাল নাম Phlogacanthus thyrsiflorus Nees. ফ্যামিলি Acanthaceae.

বাসকের এক নাম 'সিংহাস্য'—আস্য অর্থে মুখ; এই গাছের তাম্রবর্ণ ফুলের গঠন দেখতে কতকটা সিংহের হাঁ করা মুখের মত, অনেকক্ষেত্রে অনেকিছু উপমা নিয়ে ফুলের নামকরণ হ'য়ে থাকে। অবশ্য Acanthaceae ফ্যামিলির সব গাছেরই ফুলের গঠন বিন্যাস এই ধরণের। তা ছাড়া তাম্রপুষ্প বাসকের আর একটি বিশিষ্ট নাম "সিংহ-

পুচ্ছ" বলা হ'য়েছে, এখানেও নামকরণের উপমাটা তার পুষ্পদণ্ডের বিন্যাসটিকে দেখেই; সিংহের পুচ্ছের (লেজ) মত, এবং সেই পুচ্ছে থাকে সূক্ষ্ম তন্তুগুলির সঙ্গে গুচ্ছ গুচ্ছ স্তবকিত পুষ্প। হয়তো এই কারণেই সার্থক এই নামকরণ। তবে এই বাসকের সঙ্গে রাম শব্দটির সংযোগ কেবল বাংলাতেই দেখা যায়। হয়তো বা এই রাম শব্দটি শ্রেষ্ঠত্বের ও বৃহত্ত্বের নির্দেশক। সেইজন্যই সম্ভবতঃ এই নামে তাকে ভূষিত করা হ'য়েছে। এই গাছগুলি বেশীরভাগ গাড়োয়াল অঞ্চলেই ৬।৭ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়, দ্বিতীয়তঃ স্বাদে অত্যন্ত তিক্ত। এটি কলিকাতার সায়েন্স কলেজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে জানানো হ'য়েছে যে, প্রচলিত শ্বেত বাসকের সমধর্মী দ্রব্যশক্তিগুলিও এই গাছে বর্তমান। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের বর্তমান প্রামাণ্য যে সব গ্রন্থ আছে, সে সব গ্রন্থের মধ্যে এই ভেষজটির গুণাগুণ সম্পর্কে কোন আলোচনা দেখা যায় না। তবে কোন কোন প্রদেশে শ্বেতপুষ্প বাসকের স্থলে এই বাসকের ব্যবহার হয়, এটা লেখা আছে।

এই রামবাসকটি ফলদায়ক হয় স্ত্রীরোগের অতিরজঃ ব্যাধির ক্ষেত্রে। আয়ুর্বেদে

একে অসৃগ্দের বা রক্তপ্রদরে ব্যবহারের জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে একে মেনোরিজিয়া (Menorrhoegia) বলা হয়। এই রোগ সম্পর্কে আয়ুর্বেদের নিজস্ব চিন্তাধারার চিকিৎসা পদ্ধতিও ভেষজগুণের সমন্বয় সাধনেই এই রোগোপশম সম্ভব হয়ে থাকে। এই রোগ সম্পর্কে আয়ুর্বেদের সংহিতাকারগণ বলেছেন—

'রক্তপিত্ত বিধানেন প্রদরাংশ্চাপ্যুপাচরেৎ'।

অর্থাৎ এই রোগ অধোগত রক্তপিত্তের ন্যায় চিকিৎসা করার বিধি। রক্তপিত্তের চিকিৎসায় (চক্রদত্তে) ঔষধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেই অধ্যায়ে লেখা আছে—

"বাসায়াং বিদ্যমানায়ামাশায়াং জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসীদতি",

অর্থাৎ বাসক বিদ্যমান থাকতে রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও কাস রোগী কেন মুষড়ে পড়বেন? এইভাবে এর প্রশস্তির উল্লেখে ভেষজটির বিশেষ গুণের অভিব্যক্তিই প্রকাশ পায়। মেনোরিজিয়া রোগে রামবাসক প্রয়োগের এই সূত্র ধরেই করা হয়। এই রোগ সম্পর্কে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের অভিমত হচ্ছে যে, নারীদেহে অবস্থিত ডিম্বকোষ (overy) থেকে দু'টি হরমোন্ নিঃসৃত হয়, যাদের Estrogen ও Progesterone বলা হয়। এই Estrogen-এর মাত্রাতিরিক্ত ক্ষরণ এবং Progesterone-এর স্বল্প ক্ষরণই অতিস্রাবের মুখ্য কারণ। এখন দেখা দরকার বনৌষধিটির এই দু'টি হরমোনের উপর কোন প্রভাব আছে কিনা, অথবা (রক্ত তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধে যাওয়ার শক্তি) (coagulation) বৃদ্ধি ক'রে রক্তস্রাব রোধ করে কিনা?

হুপিং কাসিতে এই রামবাসকের সিরাপ দুরারোগ্য হুপিং কাসিকে সংযত করে। এটা ২।৩ দিনের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়।

আরও একটি কথা জানা দরকার যে, ভেষজটির মাত্রাবিচারের উপরই এর ক্রিয়ার প্রকাশ নির্ভর করে। এটাও লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, একটু বেশী মাত্রায় ব্যবহার করলে তন্দ্রার ভাব আসে, তবে কোন ক্ষতিকারক নয়। সুতরাং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বনৌষধির প্রয়োগের জন্য ব্যাপকভাবে গবেষণার প্রয়োজন।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) β-sitosterol—Sito. (b) Lupeol. (c) Betulin. (d) One diterpene lactone. (e) A number of other terpene type compounds have also been isolated.

মুস্তক

শ্লেষাত্মক শব্দবিন্যাসে বক্তব্য প্রকাশ করার রীতি অতীত যুগের লেখার ধরণ ছিল, তাই বলা হ'য়েছে—

> 'অভদ্রাণাং ভয়াল্লোভাৎ নিমিত্তাৎ পশুপক্ষিণাম্।
> ভদ্রাণাং সংহতির্নিত্যা কল্যাণায় জনৈষিণাম্॥'

অর্থাৎ অভদ্রগণ ভয় ও লোভের বশীভূত হ'য়ে সংঘবদ্ধ হয়; প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে (ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প) পশু, পক্ষী, সিংহ, মৃগাদিও সংঘবদ্ধ হয়, আর ভদ্রগণ সংহতি সাধন করেন জনকল্যাণে। আমার আলোচ্য সেই 'ভদ্র' নামের বনৌষধিটি; সেটি জন-কল্যাণের সংহতি সাধক।

আমাদের সমাজে প্রচলিত বহু সংস্কৃতিরই উৎস বৈদিক সূক্ত। এই বনৌষধিটির ভৈষজ্য-উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। গুণ-কর্ম বিভাগানুসারে তার নামকরণ এবং তার পাঞ্চভৌতিক দেহগঠনের যে মূল উপাদান এবং তার হ্রাস-বৃদ্ধি—এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচারের সঙ্গে বনৌষধির পরিচিতি এবং আরও পরবর্তীকালে আবার এসবের তদ্‌বিদ্যসম্ভাষায় (সিম্‌পোসিয়াম্); তারই ফলস্বরূপ জন্ম নিয়েছে 'সংহিতা গ্রন্থ', যাকে সে যুগে বলা হতো গুরুসূত্র ও শিষ্যপ্রবচন।

বস্তুবাদের পূর্বরূপ

"আকাশাদ্ বায়ু বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী জায়তে।"

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির এই মূল সূত্রটির অর্থ হলো—আকাশ থেকে বায়ুর সৃষ্টি, বায়ু থেকে

অগ্নির সৃষ্টি, অগ্নি থেকে জল, তারই ঘনীভূত পরিণতিতেই ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবীর বাস্তব রূপ। এর পরই পঞ্চ মহাভূতের (উপরিউক্ত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) পঞ্চীকরণ অর্থাৎ একটির মধ্যে অপর চারটির অনুপ্রবেশ এবং অবস্থান। যেকোন দ্রব্যই হোক, এদিক বাদ দিয়ে সৃষ্টিই হয়নি বা হয় না; তবে দ্রব্যের জন্মলগ্নে এই পাঁচটি মূল উপাদানের সংযোগ বিভাগের ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটার জন্যই স্বাদে ও গুণে পার্থক্য হয়। পরবর্তীযুগে এইসব দ্রব্য পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলিত হয়েছে।
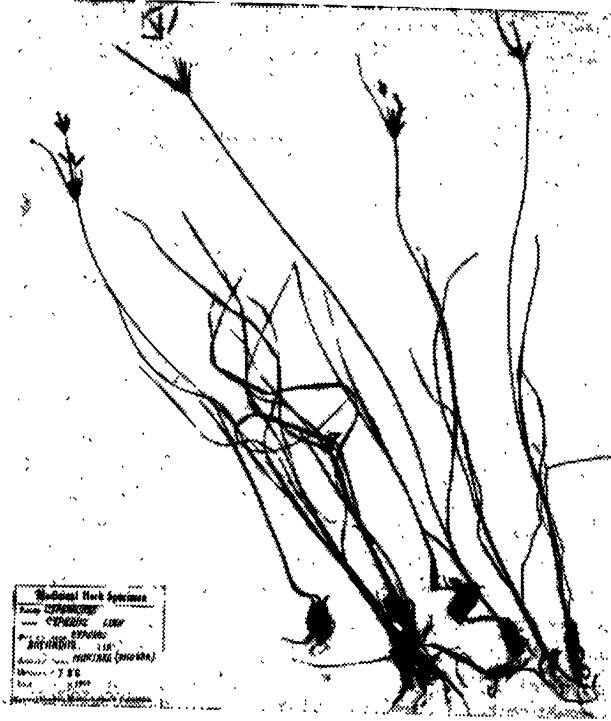
বনৌষধিটির বৈদিক সমীক্ষা

"অপ্সু সাধিঃ ত্বং স্তনয়িত্নুঃ অনুরুন্ধসে গর্ভে ভদ্রং ভূতস্যাগ্নৌ মাতৃভিষ্টং জন্তুন্ অন্তরস্য উপস্থে পিব্বস্ব।"

(অথর্ববেদ—বৈদ্যককল্প—৭।২৩২।৪৬)

ভাষ্যকার মহীধর বলেছেন—

অপ্সু=জলেষু, সাধিঃ=স্থানং তে। স্তনয়িত্নুঃ অনুরুন্ধসে স্তনঃ =সংহতৌ ইত্নঃ। মেঘৈঃ তৈঃ মঙ্গলং=মেঘকালে ওষধীরূপেণ স্বীকরোসি জঠরাগ্নিনা তস্য ভূতস্য=প্রাণিজাতস্য গর্ভে ত্বং ভদ্রং।

ভদি=রক্, মুস্তকমিতি। মাতৃভিঃ=অদ্ভিঃ সংসৃজ্য=একীভূয় জন্তূন=ক্রিমীন্ তান্ অন্তরস্য=অন্তঃ মধ্যে। উপস্থে=জনন-স্থানে পিন্বস্ব=গোপায়সি।

এই ভাষ্যটির অর্থ হলো—মেঘের উদয়ের সংগে তোমার দেহ ঔষধিরূপে গঠিত হয়। তুমি স্তনয়িত্নু বা মেঘবারির সংহতিতে জন্মলাভ কর, তাই তুমি মুস্তক। জলেই তোমার বাসস্থান। জঠরে প্রবেশ ক'রে তুমি অগ্নিরূপ ধারণ কর; তাই তুমি ভদ্র বা মঙ্গল। জলের সংগে তুমি একীভূত হও। তুমি জন্তুর জননস্থান ঢেকে রাখ।

বৈদিক ঋষি থেকে প্রায় সবগুলিই পাওয়া গিয়েছে—(১) জন্মস্থান ও কাল, (২) স্বভাব-ক্রিয়া, (৩) প্রকৃতি ও (৪) তার বৈশিষ্ট্য। এখন প্রয়োজন, বিচার বিবেচনা ক'রে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ।

চরক-সুশ্রুতাদি সম্প্রদায়ের মনীষীগণ প্রথমেই বিচার করেছেন তার পাঞ্চভৌতিক গঠন বৈচিত্র্যের—এই মুস্তক বর্ষাকালেই হৃষ্টপুষ্ট হয়, কিন্তু তার দেহগঠনের মূল উপাদানে নির্দিষ্ট দু'টির আধিক্য থাকাতে, এমন-কি জলে বাস ক'রেও তার গর্ভে অগ্নি আছে। অর্থাৎ এটি জলে বাস ক'রেও অগ্নিগুণের অধিকারী, যেহেতু সে তিক্ত-কষায় রস-সমৃদ্ধ।

কার্যকারণ সম্পর্কের অনুশীলন

বস্তুবাদের মধ্যে একটি নিমিত্ত কারণ তো থাকবেই। তাছাড়া যেকোন দ্রব্য-সৃষ্টিতে ক্ষিতি-অপ্-তেজ প্রভৃতি মূল উপাদান তো আছেই। এই মূল উপাদানের স্বভাব পরিণতিতেই দ্রব্যেরও রস, গুণেরা হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তাদের স্বাদের পার্থক্য; তেমনি গুণেরও। স্বাদের দ্বারাই সৃষ্ট দ্রব্যের মৌলিক উপাদানে কোন্‌টির হ্রাস কোন্‌টির বৃদ্ধি ঘটেছে, সেটার বিচার হ'য়েছে। আবার রোগের ক্ষেত্রেও যখন তারা দ্রব্য বিচার ক'রেছেন, তখনও সেই পঞ্চ মহাভূতের গুণবিচার ক'রেই এবং রোগ নির্ণয়ও ক'রেছেন সেই একই চিন্তাধারায়। হয়তো আয়ুর্বেদের প্রতি তথাকথিত সেই বিদ্রূপাত্মক 'বায়ু, পিত্ত, কফ ছাড়া আর কিছুই নয় এই পরিহাস; কিন্তু পঞ্চমহাভূতের Concise form- এর মধ্যে যে ক্ষিতি ও অপ্ রয়েছে—তা তো কফই, আর তেজ পিত্ত এবং মরুৎ ও ব্যোম যে বায়ু এটার রহস্য না বুঝলে আয়ুর্বেদের বিজ্ঞানই দুর্বোধ্য। এদের স্বাভাবিক অবস্থা চলাকালে নীরোগ, আর অস্বাভাবিকতায় রোগ। অধিকাংশ রোগের ক্ষেত্রেই দ্রব্যের প্রয়োগ প্রধানতঃ হয় উল্টোপথে, অর্থাৎ রোগাক্রমণের হেতু কোন্‌টির আধিক্যে বা হ্রাসে সৃষ্ট—আবার দ্রব্যের মধ্যে কোন্ দ্রব্যটি সে আধিক্যকে কমাবে বা ক্ষেত্রবিশেষে বাড়াবে, সেইটাই রোগ ও দ্রব্যের ভক্ষ্য-ভোজ্য সম্পর্ক।

এই আলোচ্য ভদ্র-মুস্তকটি কষায় ও তিক্তরস। কষায়ের স্বভাব শোষণধর্মী, আর তিক্তের স্বভাবেও সেটি আপ্য হ'য়েও এই দুটি গুণ-ধর্মের প্রাধান্য নিয়েই ভদ্র-মুস্তকের উৎপত্তি।

পরিচিতি

বৈদিক তথ্যে পাওয়া যাচ্ছে এক শ্রেণীর মুস্তকের কথা; আর সপ্তদশ শতকে এসে সেটির চার প্রকারের উল্লেখ; অবশ্য তাদের প্রত্যেকের গুণ ও উপযোগিতাও পৃথক পৃথক বলা হয়েছে। আলোচ্য বস্তু—ভদ্রমুস্তক সম্পর্কে। এটি এক জাতীয় ঘাস,

ঔষধার্থে এর মূল ব্যবহার করা হয়, মূলটি গ্রন্থি আকারের (Tuberous root)। এটি জন্মে বালি-প্রধান স্যাঁতসেঁতে জমিতে, সাধারণে বলে মুথো ঘাস, এর মূলগুলিই ভ্যাদ্‌লা মুথো। এই নামটি ভদ্রমুস্তকের বিবর্তিত চলতি নাম। এই ঘাসটির বোটানিক্যাল নাম Cyperus rotundus Linn. ফ্যামিলি Cyperaceae। আর একই প্রজাতির আর একটি ঘাস জন্মে জলাসন্ন ভূমিতে। তার পাতা চওড়া, সে ঘাসগুলি এক/দেড় ফুট উঁচু হয়, তার বোটানিক্যাল নাম Cyperus Scariosus cyperaceae। এছাড়া কৈবর্ত মুস্তকের নামোল্লেখ আছে, সেটি আজও সন্দিগ্ধ ওষধি ব'লে চিহ্নিত। কিন্তু কৈবর্ত মুস্তক এই শব্দটি জলজ মুস্তকেরই ইঙ্গিত বহন করে।

রোগ প্রতিকারে

বৈদিক সূক্ত থেকে তাঁরা পেয়েছেন—এটি স্তনয়িত্নু অর্থাৎ মেঘের জল-সিঞ্চনে তার গর্ভে অগ্নি সৃষ্টি হয়। এদিকে বর্ষাকালেই জলদোষে ও কালধর্মে মানুষের যখন অগ্নিমান্দ্য হয়, তখন সে বিষমতা দূর করতে পারবে এই মুস্তক। এইটাই তাঁদের অনুশীলন।

১। **অজীর্ণে:—** দমকা পাতলা দাস্ত হয়—সেক্ষেত্রে ৪।৫ গ্রাম কাঁচা মুথো একটু থে'তো ক'রে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে ৪।৫ বারে একটু একটু ক'রে খেতে হয়; এটাতে ২।১ দিনেই বিশেষ উপকার হয়।

২। **আমাশায়:—** এ রোগে অনেকের পেট কুন-কুন করে, ব্যথা করে, সেক্ষেত্রে এই মুথোর ক্বাথ খেলে আম ও ব্যথা দুই-ই কমে যায়।

৩। যাঁদের পাতলা দাস্ত হয় না, অথচ হজমও হয় না—এক্ষেত্রে কাঁচা মুথো ৩।৪ গ্রাম, যোয়ান আধ চা-চামচ একসঙ্গে থে'তো ক'রে এক কাপ গরম জলে ভিজিয়ে সেটা ছে'কে সকালে-বিকালে দুই বারে খাওয়া; এর দ্বারা অগ্নিবল ফিরে আসবে।

৪। **জ্বরের পিপাসায়:—** মুথো-সিদ্ধ জল (উপরিউক্ত মাত্রায়) একটু একটু ক'রে খেলে জ্বর ও পিপাসা দুই-ই যায়।

৫। **জ্বালায়:—** পিত্তবিকৃতি-জনিত গায়ে বা হাত-পায়ের জ্বালায় মুথোর রস ক'রে লাগালে উপশম হবে।

৬। **অপস্মারে** (এপিলেপ্‌সিতে):— মুথোর রস ১ চা-চামচ ৪।৫ চা-চামচ দুধে মিশিয়ে সেইসময় খাওয়াতে পারলে ওটার তীব্রতা কমে যায়। একটা কথা বলে রাখি—যাঁদের এ রোগ আছে, তাঁরা এটা নিয়মিত ব্যবহার করবেন।

৭। **মাতাল হলে:—** মদের নেশা বেশী হলে মুথোসিদ্ধ জল খাওয়ালে ওটা কেটে যায়।

৮। **ক্ষতে:—** কোন কিছুর খোঁচা লেগে ঘা হলে মুথোর রসে পাক-করা ঘি লাগালে অদ্ভুত ফল পাওয়া যায়।

৯। **ঠুনকো হ'লে:—** মায়ের স্তনে ঠুনকো হলে এই মুথো বাটা লাগালে ২।১ দিনেই যন্ত্রণার উপশম হয়।

১০। **পায়োরিয়ায়:—** মুথোর রস ক'রে অল্প জল মিশিয়ে খানিকক্ষণ ক'রে মুখে রেখে দিলে ওটা সেরে যায়।

১১। **বোলতার কামড়ে:—** বোলতা কিংবা বিছে হুল বসালে মুথো বে'টে ওখানে লাগিয়ে দিয়ে থাকে গাঁয়ের লোকেরা, ওটাতে যন্ত্রণার উপশম হয়।

গত ত্রয়োদশ শতক থেকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র বিপাকে পড়ে আছে। তার মধ্যে

আবার সে বিশেষ ঘূর্ণিপাকে পড়েছে সপ্তদশ শতকের পর থেকে, এখন সে ছিন্নভিন্ন; তাহলেও তার চিকিৎসার সূত্রগুলি এখনও মজুত আছে কিন্তু এগুলিকে দিয়ে যুগোচিত রূপসৃষ্টির ভার নেয় কে?

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Unstable alkaloids. (b) Acids viz., linolenic, linotie, oleic, myristic & stearic acid. (c) Other compounds viz., pinene, cineole, sesquiterpenes iso-cyperol & glycerol. (d) Essential oil. (e) Fatty oil.

উদ্দানক

চিকিৎসক রোগীর রোগ নিরাময়ে অগ্রসর হয়ে সর্বাগ্রে খোঁজেন রোগের কার্যকারণ সম্পর্কটা কি, কিন্তু স্তব্ধ হ'য়ে যান যখন রোগের সাক্ষাৎ কারণগুলো কি তা খুঁজে পান না; কারণ রোগীর স্বকৃত দোষে রোগ হ'লে তার কারণ থাকে, কিন্তু এমন রোগও হয়, যেগুলি এসব থেকে পৃথক—এই সব রোগের ক্ষেত্রে পুরোহিততন্ত্র তার ঐহিক দোষ নিরাময়ের জন্য জীবিতাবস্থায় চান্দ্রায়ণ বা মৃত্যুর পর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন, কারণ রোগীর রোগ উৎপত্তির কারণকে তাঁরা জন্মান্তরের রোগ ব'লে মনে করেন; অতএব প্রশ্ন থাকে—তা হ'লে কি রোগসৃষ্টির মূলে এই দেহ এই মন ছাড়াও অন্যত্র কারণ থাকে?

এ প্রশ্ন যাঁদের মনে আসে, আজকের ভারতে হয়তো তাঁরা সংখ্যায় লঘু; কিন্তু

পুরোহিততন্ত্রের স্মৃতিশাস্ত্রের এ বিধানকে তো ভারতের বহু পুরাতন বিশেষ একটা সমাজ নিজেরাও মেনেছেন, অপরকেও মানিয়ে নিয়ে চ'লেছেন। সেখানে তাঁদের যুক্তি আছে—

'যান্তি কর্ম্ম ক্ষয়াৎ ক্ষয়ম্'

অর্থাৎ যেসব রোগের ঐহিক কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না সেগুলি কর্মজ, সেই কর্মজন্য ব্যাধিগুলি পূর্বজ কর্মক্ষয়েই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

বিশ্বের অন্যান্য মানবসমাজে এ ধরণের সংস্কার না থাকলেও তাঁরা রোগের দৃষ্ট
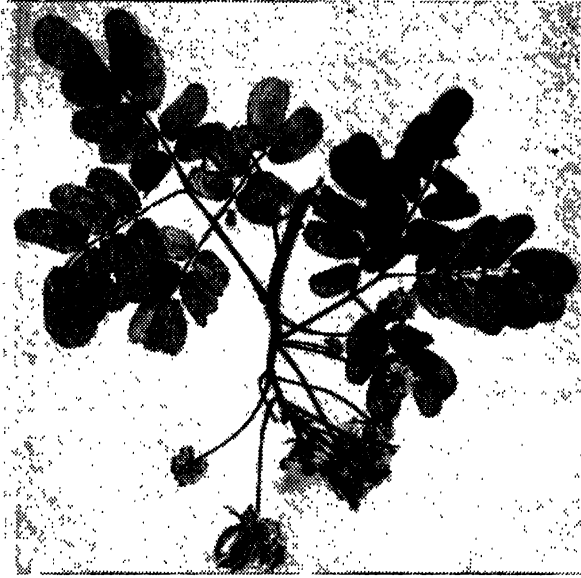
কারণের মধ্যে অ-দৃষ্ট হেতুকেও বাদ দেন না, তাই তাঁরা বিশেষ কতকগুলি রোগোৎপত্তির ক্ষেত্রে তাদের মূলীভূত কারণ যে আছে তা অস্বীকার করেন না; তার প্রমাণ তাঁদের শোণিত বিজ্ঞানের অনুশীলন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র-বিজ্ঞানের মধ্যে তা আপাততঃ ধরা যায় না ঠিকই, কিন্তু তাঁরা সেখানে কিন্তু এসব রোগের অস্তিত্ব যে বহুদিন থেকে রয়েইছে এটায় তাঁরা নিঃসন্দিগ্ধ; তাই বৈজ্ঞানিকগণ সেখানে এসে থমকে যান। তা হ'লে এটা অবশ্যই মনে করা যায় রোগের বর্তমান রূপই সবটা নয়। জন্মসূত্রেও তা বাহিত হ'য়ে আসে এবং সেই কারণগুলি শোণিতধারায় সুষুপ্ত অবস্থায় থাকে। সে পিতৃ বা মাতৃকুলের মধ্যে যে কুল থেকেই আসুক; যেমন হাঁপানি, এক্‌জিমা, অর্শ, কুষ্ঠ, হার্ণিয়া, যক্ষ্মা, এমন কি মধুমেহ পর্যন্ত। সুপ্রাচীন ভারতের ধর্মশাস্ত্র প্রণেতৃ-পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত—এ সব রোগ পাপজ; সেগুলি যোগ্য প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অপসৃত হয়। সেইজন্য এই চান্দ্রায়ণ বা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা।

বর্তমান বস্তুবিজ্ঞানের বিপ্লবের যুগে আমরা কি সে সম্পর্কে আর কোন তথ্যের অস্তিত্ব আছে কিনা সেটা অনুসন্ধান করতে পারি না? নাকি সেইটাকেই অভ্রান্ত ব'লে মেনে নিতে চিকিৎসাশাস্ত্রকে স্থবির ক'রে রাখবো?

অথবা কোন্ পথে সেসব পাপজ রোগ (তাঁদের মতে) থেকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের বাস্তবানুগ পথে অনুসন্ধান ক'রতে পথ দেখাবো?

এই প্রশ্ন সামনে রেখে সেই বংশানুক্রমিক শোণিতবীজী রোগের সন্ধান ও বনৌষধি সম্পর্কে এই নিবন্ধে আলোচনা।

ক্ষেত্র, কাল ও বীজ

অনেকেই দেখে থাকবেন মাটিতে বেতো বা গিমে (Chenopodium album or Mollugo spergula) শাকের বীজ চৈত্রমাসে ক্ষেতে পড়ে, তারপর হেমন্তের পরিবেশ পেলেই সে অঙ্কুরিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে; সুতরাং অঙ্কুর ও বৃক্ষলতাদির জন্ম-সূত্রটি কেবল ক্ষেত্র ও বীজ থেকেই আসে না; উপযোগী কালও তার প্রয়োজন। এসব রোগের ক্ষেত্রেও তেমনি যথাকালেরও উপযোগিতা আছে।

টপকানো রোগ জীবাণু

বংশগত রোগের অস্তিত্ব যে একটি বিশিষ্ট রক্তবীজকোষে নিবন্ধ থাকে এবং ক্ষেত্র (system)ভেদে তার রূপও বদলায় এটা প্রত্যক্ষ।

যেমন দেখা যায়, একজনের চারিটি সন্তান; তার মধ্যে একজনের হাঁপানি, একজনের এক্‌জিমা, একজনের হাঁপানি ও একজিমা দুই-ই, আবার একজনের কিছুই নেই; এ থেকে আরও বিচিত্র যে, এ আবার টপকায়—যেমন পিতামহের ছিল, পিতায় এলো না; কিন্তু পৌত্রতে এসে সেটা বর্তালো। এইভাবে মাতৃকুলের দিক থেকেও অমনি টপকে আসে। মোটকথা, রক্তবীজের ব্যাধি থেকে রেহাই পাওয়াই সম্ভব হয় না। যাকে বলে "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা"।

উপেক্ষিত পাদপের আভিজাত্য

এমনি এক টপ্‌কাধর্মী রোগের বংশবিস্তারে

> অপেতবীত বিচ সর্পতাতো যে অত্র বসুনীথ উন্দানকঃ। তম্বং বর্ধয়স্ব কামাঃ ঘৃতেন॥ (অথর্ববেদ ২২।১০।৮ সূক্ত)

মহীধর ভাষ্যঃ—

> 'উন্দানকঃ শিরীষঃ তস্য ত্বক্ ক্ষীরং চ গৃহমানীয় সর্পদীনাং মূষিকাদীনাং চ বিষস্য অপনোদনায় স্তৌতি=অপেতবীচঃ তব শিখরস্থ লোমশঃ কুসুমানি দক্ষিণাং দিশং নিরূপয়তি, ঘৃতেন কামান্ তম্ব=শান্তিং চ বর্ধয়াথ।'

এর ভাবার্থ—উন্দানক-এর (শিরীষ) ত্বক্ (ছাল) ও ক্ষীর গৃহে এনে রাখ; সর্প ও মূষিকের বিষকে দূর কর; তোমার শিখরের কুসুমগুলি দক্ষিণ দিক্‌কে নিরূপিত করে; তুমি ঘৃতের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাম এবং কান্তিকে বর্ধন কর। এইভাবে তাকে স্তব করা হয়েছে।

নামকরণের তাৎপর্য

'উদ্ অর্থে উত্তমরূপে যে দানক, যার অর্থ সে বন্ধনী করে'। ভাষ্যকার সায়ণ বলেছেন,

'রক্ত স্রোতসাং গ্রন্থি বন্ধনং'

অর্থাৎ এই শিরীষের ব্যবহারে রক্তবহ স্রোতকে গাঁট বেঁধে দেয় বা সংহত করে। আর শিরীষ নামকরণের তাৎপর্য—শৃ+ঈষ্ বা ঈষণ্=শৃ শোণিতং ঈর্ষতি, অর্থ, সর্পতি অর্থাৎ যার দ্বারা শোণিত-গতি পরিবর্তিত হয়। উপরিউক্ত ভাষ্যের উন্দানক বা শিরীষ নামকরণের তথ্যই পরবর্তী গবেষণার উৎস।

পরবর্তী সমীক্ষা

চরক সংহিতার কালে এটি ব্যবহৃত হ'য়েছে বিষনাশক দ্রব্য হিসেবে এবং কুষ্ঠে, সর্পবিষে, বিসর্পে ও শ্বাসরোগে। সুশ্রুতেও তাকে স্থান দেওয়া হ'য়েছে। সালসারাদিগণে এই গণের (গ্রুপের) ভেষজগুলির কাজ হ'লো কুষ্ঠ, মেহ ও পাণ্ডু (Anaemia) নাশ করা; এ ভিন্ন গাছটির ব্যবহার ক্ষেত্র বিসর্পেও দেখা যায়।

গত দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে মৌলিক ও অনুলিখিত আয়ুর্বেদিক গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে শিরীষের ব্যবহার নানান দিকে রেখে বিশেষ ক্ষেত্রে তার রক্তজ রোগেই করা হ'য়েছে; সর্বশেষে ১৭ শতকের দু'টি বনৌষধির বিশিষ্ট গ্রন্থ 'ধন্বন্তরি' ও 'রাজনিঘণ্টুতে' বলা হ'য়েছে—এই গাছটি বিকৃত রক্তবিকারজনিত রোগে, যেমন কুষ্ঠ, দদ্রু, গাত্রচর্মের বিবর্ণতা, কণ্ডু (চুলকণা) নাশ করে; অধিকন্তু শ্বাস-কাস হরণ করে। এই গাছের একটি বিশিষ্ট শক্তি আছে, যাকে আয়ুর্বেদের পরিভাষায় বলা হয় "ব্যবায়ী" (যে দ্রব্য পরিপাক হওয়ার পূর্বেই তার দোষগুণ শরীরে প্রকাশ করে), যেমন কাঁচা সুপারি, তামাক পাতা প্রভৃতি।

পরিচিতি

এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম Albizzia lebbeck Benth. —ফ্যামিলি (Leguminosae.) একে মহীরুহ বলা চলে, রাস্তার ধারে সাধারণতঃ এ গাছকে লাগানো হয় ছায়াতরু হিসেবে; এই গণের (genus) আরও কয়েকটি প্রজাতি (species) এ দেশে আছে। আয়ুর্বেদে আরও দুই প্রকার শিরীষের নামোল্লেখ দেখা যায়—যেমন —কৃষ্ণশিরীষ, কাঁটা শিরীষ ইত্যাদি।

রোগের প্রতিকারে ব্যবহার করা হয় মূল বা গাছের ছাল (ত্বক), আর পাতা, ফুল, বীজ ও কাঠের সারাংশ।

বংশানুক্রমিক কোন রোগ বিশেষে

একথা সবারই স্বীকার্য যে এক্‌জিমা ও হাঁপানির মৌলিক কারণটি দ্রুত অপসৃত তো হয়ই না—তাছাড়া এখনও পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি যে, এটাকে ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়, এই দু'টি রোগের যেকোন একটির রূপ নিয়ে (যেকোন বয়সেই) আত্মপ্রকাশ প্রায়ই করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সুদীর্ঘদিন অল্পমাত্রায় উন্দানকের মূলত্বক ব্যবহার করলে আনুষঙ্গিক (যাকে বলে নাছোড়বান্দা) রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাব্যতা থাকে; আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করার যে, এই গাছের ফুল হাঁপানিতেও ব্যবহার করার নির্দেশ আছে সপ্তদশ শতকে রচিত বঙ্গসেনের গ্রন্থে।

বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারায় দেখা যায়—এই দু'টি রোগের উৎস একই।

(১) **মূষিক বিষেঃ—** ইঁদুরের কামড়ে প্রথমটা অনেক সময় আমরা তা উপেক্ষা করি, কিন্তু তার বিষক্রিয়া যে নানাপ্রকার উপসর্গ সৃষ্টি করে—এটা কিন্তু প্রাচীন ভারতের চিকিৎসকবৃন্দ জানতেন, তাই সে যুগের মনীষীবৃন্দের সমীক্ষা ছিল, তার প্রতিকারের ব্যবস্থায় সর্বাগ্রে শিরীষ ছাল বেটে দষ্টস্থানের চারিদিকে প্রলেপ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, তাছাড়া এর রসও পান করা উচিত ব'লে নির্দেশ দিয়েছেন।

(২) বিষাক্ত পোকায় কামড়ালে বা আরশোলা উচ্চিংড়ে বা মাকড়সায় চাটলে শিরীষ গাছের মূলের ছাল বেটে লাগালে তাদের বিষক্রিয়া আর হয় না। (এটা চরকীয় পন্থা)।

(৩) **আধকপালিতেঃ—** আধকপালে ব্যথায় মূলের ছাল চূর্ণ বা বীজ চূর্ণের নস্য নিলে উপশমিত হয়। প্রথমে খুব অল্প পরিমাণ নিতে হয়, তাও দিনে দু'বারের বেশী নয়।

(৪) **চলিত দন্তে** (দাঁত ন'ড়তে থাকলে)ঃ— এই গাছের মূলের ছাল চূর্ণ দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত ও মাড়ী দুই-ই শক্ত হয়।

(৫) যাঁদের রক্ত দূষিত হ'য়ে গায়ে কালো দাগ হয়, সে ক্ষেত্রে গাছের ফল বেটে অল্প ঘি মিশিয়ে লাগালে স্বাভাবিক হয়।

একটি মূল্যবান তথ্য

ঘাম— সংস্কৃত ভাষার স্বেদ শব্দ ঘাম এবং সেঁক দেওয়া, তাই পরিবেশভেদে এর দুটি অর্থ—আমার বক্তব্য ঘামের ক্ষেত্রে। স্থূলকায় ব্যক্তির ঘাম হয়, অবশ্য আয়ুর্বেদমতে সেটা মেদেরই মলাংশ; শরীরের বারটি মলের মধ্যে এটি একটি। স্বেদ শব্দ বৈদিক। স্থূলকায় ব্যক্তির ঘাম হওয়ার না হয় একটা যুক্তি আছে; কিন্তু যেখানে স্থূলকায় নয় অথচ ঘাম হয়, বিশেষতঃ হাতে ও পায়ের তলায়—সে ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন সকলেরই মনে আসা স্বাভাবিক, কেন? তাহ'লে এটা কি? এক্ষেত্রে আমার অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতায় এইটুকু বুঝেছি যে, এ সব ব্যক্তির বংশে (জন্মসূত্রে) হাঁপানি বা এক্‌জিমার সম্পর্ক অবশ্যই আছে। এক্ষেত্রে শিরীষের মূলের ছাল স্বেদবাহী স্রোতের গতি পরিবর্তনে আশ্চর্যরকম প্রভাব বিস্তার করে; তবে রোগীর বলাবল, বয়স, আনুষঙ্গিক লক্ষণ ও সার্বিক অবস্থা বিবেচনা ক'রে মাত্রার তারতম্য করতে হয়।

ক্ষয় রোগে— যাদের ঘুমুলে ঘাম হয় (যাকে বলে নৈশ ঘর্ম), এক্ষেত্রেও এর মূলের ছালের চূর্ণ খাওয়ালে কয়েকদিনের মধ্যেই ঘাম কমিয়ে দেয়, অথচ কোন প্রতিক্রিয়া হয় না; এই ক্ষয় বন্ধ হলে রোগীর দুর্বলতাও কমে যায়। এক্ষেত্রেও সেই মূল বক্তব্য—

স্রোতধারাটির গতির পরিবর্তনে সার্থকতা এই কারণেই—এটি তার গুণপ্রকাশক সংজ্ঞা নাম।

এছাড়া বিভিন্ন রোগ প্রতিকারে এই গাছের পাতা, বীজ, গাছের সারাংশ ব্যবহার করা হয়েছে; এসব তথ্য বিভিন্ন বনৌষধির গ্রন্থে পাওয়া যায়; যেমন—বলা হয়েছে, পাতার রস রাতকাণায় খাওয়ানো, চোখ উঠলে শিরীষের বীজ ঘষে চোখে কাজলের মত লাগানো, গলগণ্ডেও বীজ বেটে গলায় প্রলেপ, শুক্র স্তম্ভনের জন্য শিরীষফুলের চূর্ণ খাওয়া ইত্যাদি—তবে ইউনানি সম্প্রদায় প্রধানভাবে ব্যবহার করেন কাঠের সারাংশ ও বীজ। তাঁরা রক্তবিকারে, চর্মরোগে ও রক্ত শোধনে দ্রব্যের সঙ্গে এই শিরীষ কাঠের সারাংশ চূর্ণ পাচন করার পদ্ধতিতে সিদ্ধ ক'রে ক্বাথ খেতে দিয়ে থাকেন। অবশ্য এই কাষ্ঠসারের ব্যবহারের কথা সুশ্রুতেও উল্লেখ আছে। আর তার বীজচূর্ণ মিছরীর সঙ্গে মিশিয়ে গরম দুধ সহ খাওয়ার ব্যবস্থা করেন—যাঁদের শুক্রতারল্য ঘটেছে, বীজের চূর্ণের মাত্রা সাধারণতঃ ১। ২ গ্রাম।

এই গাছটির ঔষধার্থে ব্যবহার কেবল ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নেই, বহু দেশেই এটি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। এটিকে নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রলে এই অযত্নসম্ভূত গাছটিতে যে একটি বিশেষ শক্তি নিহিত আছে, এবং আজও যা বহু উন্মুখ বিজ্ঞানীবৃন্দের মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে—জীন্-জেনেটিক্সের (Gene-Genetics) মাধ্যমে জীবের বিচিত্র দেহবিকাশের সঙ্গে রোগেরও বীজ নিহিত রয়েছে। প্রাচীন ভারতের ঋষিবৃন্দ কি বহুপূর্বেই সেটির সন্ধান পাননি? দেহ এবং ব্যাধির সবটাই যখন প্রজ্ঞাপরাধজাত নয়। তবে প্রাচীন ও নবীনের এই ভাবধারা পৃথক হ'লেও অন্তর্নিহিত সত্য আজ অম্লান।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Aminoacids viz. cystine, aspartic acid, threonine, serine, glutamic acid, proline glycine, alanine, valine, methionine, isoleucine, leucine, tyrosine, phenylalanine, lysine, histidine, arginine, tryptophan. (b) Essential oil.

বংশ

গোত্র-কুলের পুত্রপৌত্রাদির একই ধারায় অবস্থান থাক অনন্তকাল, এ কামনা শুধু মানবেরই নয়, প্রাণীকুলেরও। সেই কুলই তো ভারতে স্বতন্ত্র নাম নিয়েছে বন্+শ অর্থাৎ অঙ্কুর প্রত্যঙ্কুর হ'য়ে যে সত্তা অনন্তকাল বিদ্যমান থাকে, এমনি নাম নিয়েই তো এই স্বনামখ্যাত তৃণরাজ বংশবৃক্ষটি বহুল উপমার বস্তু। তাই বাংলার লোকসাহিত্যেও স্থান নিয়ে আছে অনেক প্রবচন প্রখ্যাতি। যেমন—

(১) 'বাঁশ পাকলে সরু, বাড়ির কর্তা পাকলে গরু'।
(২) 'দাতার নারকেল, বকিলের (কৃপণ) বাঁশ'।
(৩) 'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাঁস্‌ট্যাঁস'।
(৪) 'বাঁশ বনে ডোম কানা'।
(৫) 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো'।
(৬) 'বাজালে বাঁশি ঘুরুলে কোৎকা'।
(৭) 'ছেলেটি বংশের বাঁশ'।
(৮) 'বাঁশ মরে ফুলে, আর মানুষ মরে ভুলে', প্রভৃতি।

এ ভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষে উৎসন্নকারক বংশকেন্দ্রিক ভাষা নানা বিশেষণেও প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। এগুলি সবই কিন্তু কার্যকারণের অভিব্যক্তি। তাছাড়া পারিবারিক জীবনে ও শিল্পসমৃদ্ধিতে তার উপযোগিতারও সীমা পরিসীমা নেই। পুরাতন সমাজে জন্মের পরক্ষণেই নাড়ীচ্ছেদের জন্য চ্যাচারির ব্যবহার ছিল; এখনো কোথাও কোথাও এ রীতি বর্তমান। তা ছাড়া মৃত্যুর পর শেষকৃত্যেও তার উপযোগিতা কতখানি তাও অজ্ঞাত নয়। এছাড়া গৃহস্থালীর কত জিনিষই তৈরী হয় ওর দেহ-তন্তুতে।

এবার বলি বাঁশ গৃহচিকিৎসকও হয়। এই গাছটির প্রতিটি অংশ বিভিন্ন ব্যাধির

নিবারক ও নিয়ামক। এ রকম ন্তন ন্তন বহু তথ্যের সন্ধান মিলতে পারে বিভিন্ন বনৌষধির মধ্যেও, কিন্তু এগুলির গুণ-বিচারের ক্ষেত্র কোথায়? আমি কি আমার দেশের বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এটা আশা ক'রতে পারি না যে তাঁরা এইসব দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক তথ্য উদ্ঘাটিত ক'রে আমাদের পূর্বপুরুষদের গভীর জ্ঞানগরিমার খ্যাতি বিশ্বে প্লাবিত ক'রবেন।

শব্দনাম— সংস্কৃত ভাষায় বং অর্থ অঙ্কুর, এই শব্দের উপর শক্ প্রত্যয় ক'রে বংশ হ'য়েছে. এটি বৈদিক শব্দ, ঋক্‌বেদে আছে। আপাতদৃষ্টিতে শব্দবিন্যাস হ'লেও পরিচয়ের বৈশিষ্ট্যে যেন অভাব থেকে যায়, এর আর একটি নাম 'তৃণধ্বজ'। এটিও সার্থক নাম বলা যেতে পারে, আবার বেণু অর্থেও বাঁশ এও বৈদিক শব্দ। বেণ্ অর্থ শব্দ করা—এর সঙ্গে উফ্ প্রত্যয় ক'রে বেণু হ'য়েছে। ১২ শতকের লেখায় জয়দেব বেণু অর্থে বাঁশের বাঁশী লিখেছেন।

এই তৃণধ্বজের বোটানিক্যাল নাম Bambusa bambos (Roxb.) Druce; ফ্যামিলি Gramineae.

সর্বনাম— ক'লকাতায় যেমন সর্বজাতের সমন্বয় দেখা যায়—তেমনি শিবপুরে

বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেউর বাঁশ(B. spinosa Roxb.), তালদা বা তল্‌তা(B. tulda Roxb.), ভাল্‌কো(B. balcooa Roxb.), কারাইল (Dendrocalamus Strictus Nees), বার্সান বাঁশ (Bambusa vulgaris), বাওয়া বাঁশ প্রভৃতি নানা জাতের বাঁশের সহাবস্থান দেখা যায়; এ ভিন্ন ব্রহ্মদেশ, মালয়, শ্যাম প্রভৃতি দেশের নানাজাতীয় বাঁশের সমাবেশও এখানে করা হ'য়েছে। এরা ফ্যামিলিতে Gramineae, এদের প্রজাতি (Species) ও গণ (Genus) ভেদে গঠন ও আকৃতি ভিন্ন। সব জাতের বাঁশে ফুল হওয়াটা স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু সেটা আমাদের নজরে আসার আশা কম, কারণ ২৫। ৩০ বৎসর বয়সের পর সাধারণতঃ বাঁশে ফুল হয়, তারপর যবের মত ফল হয়; তারপর পাতা আস্তে আস্তে প'ড়তে থাকে এবং দুই-এক বৎসরের মধ্যেই ম'রে যায়—এ কথাটা কিন্তু রামায়ণেও লেখা আছে; এ জন্য তার আর এক নাম 'ফলান্তক' ও 'যবফল'। যা হোক্, আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু দ্রব্যগুণগুলিকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা।

প্রসঙ্গত বলি জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক চেষ্টা রোগমুক্ত থাকা, তাই যুগে যুগে রোগ প্রতিকারের উৎসের সন্ধান চ'লেছে। ঋষি সংস্কৃতি চ'লে গেলেও মানুষের বা কোন জীবের অস্তিত্ব তো যেমন চলে যায় না, তাদের রোগ, শোক তো থেকেই যায়, তেমনি শতাব্দীর পর শতাব্দীতে যখন কোন নূতন গ্রন্থ প্রণীত হ'য়েছে, তখন কিছু কিছু নূতন তথ্যও তাতে সন্নিবেশিত হ'য়ে থাকে। এখনও তো তেমন বহু তথ্য অপ্রকাশিত রয়ে গিয়েছে, হয়তো কিছু কিছু আছে লোকমুখে। যেগুলি হ'য়েছে বা হয়নি, তা থেকেও নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে; এইজন্য চাই যথাযথ অনুশীলন।

কোন বনৌষধির বা জান্তবৌষধির আলোচনায় যুক্তি ও বাস্তব এ দুটির সমন্বয়-সাধনই আমার লক্ষ্য থাকে, এ ক্ষেত্রেও আমি তার ব্যতিক্রম করিনি।

ব্যবহার

(১) আপনারা অনেকে দেখে থাকবেন—গরুর বাচ্চা হবার সময় তাড়াতাড়ি ফুল (অমরা- placenta) বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে দুই-এক মুঠো বাঁশপাতা এনে খাওয়ানো হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ফলও পাওয়া যায়। এখনও গ্রামাঞ্চলে গরুর অল্পদিনের গর্ভস্রাবের জন্য বাঁশের শীষের রস ক'রে খাওয়ানো হয়ে থাকে, এ ভিন্ন প্রসবে দেরী হ'তে থাকলে বা প্রসবান্তিক স্রাব ভাল না হলেও অনুরূপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটা যে ঋতুস্রাবকারক, একথা পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের সংগ্রহ গ্রন্থেও উল্লেখ আছে। এ তো গেল একটা দিক, অন্যটি হচ্ছে—বেশী দুধ পাওয়ার জন্য আজও বহুলোক গরুকে একমুঠো বাঁশপাতা খাইয়ে থাকেন। এই তথ্যটির সমর্থন পাওয়া যায় আমাদের প্রাচীন প্রামাণ্য দ্রব্যগুণ গ্রন্থের একটি শ্লোকে—

'বংশপত্রিকা—মধুরা শীতলা পিত্তঘ্নী,
রক্তদোষহরী রুচ্যা পশুদুগ্ধস্য বর্দ্ধিনী।' (রাজনিঘণ্টু)

প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত কার্য দু'টি পোষ্টিরিয়ার ও পিটিউটারী গ্রন্থির প্রধান কাজ। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এই পিটিউটারী গ্রন্থিকে 'মাষ্টার গ্ল্যান্ড' ব'লে থাকেন, কারণ এটির বহুমুখী ক্রিয়া বহুগ্রন্থির উপরে।

গরুর পাতলা দাস্ত হলে গো-বৈদ্যরা এই পাতা খেতে দেন, এটি ধারক।

(২) অর্শের যন্ত্রণায় কাতর রোগীকে গায়ে তেল মাখিয়ে বাঁশ পাতা-সিদ্ধ জলে

অবগাহন করতে বলেছেন আত্রেয় ঋষি (চরকে)। এ ভিন্ন নানা প্রকার রোগে এই বাঁশ-পাতার লৌকিক ব্যবহার হ'য়ে আসছে, তার মধ্যে কতকগুলি বনৌষধির গ্রন্থে উল্লেখ আছে। যেমন—গে'টেবাতে (Gout) কাঁচ পাতা বেটে গরম ক'রে প্রলেপ দিলে ব্যথা ও ফুলো দুই-ই কমে যায়। এইভাবে ফোড়া ফাটিয়ে দেওয়ার জন্য অথবা ঘায়ে (ক্ষত) পোকা হলে বের ক'রে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(৩) ইউনানি গ্রন্থে লেখা আছে—পাতার রস মধু মিশিয়ে খেলে কাসি ভাল হয়।

(৪) বাঁশের শিকড় (মূল):— (ক) অন্যান্য বনৌষধির সঙ্গে ব্যবহার হয় মূত্র-কৃচ্ছ্রে (strangury) ও শোথ রোগে (oedema) । তামিল বৈদ্যরা বলেন—এটি ডাইলুয়েণ্ট অর্থাৎ ঘন পদার্থকে তরল করে। (খ) কুকুর বিষে—এই শিকড় ও ধলা আঁকড়ার (Alangium salvifolium) শিকড় গোদুগ্ধে বেটে ব্যবহার করতে বলেছেন ভাবপ্রকাশকার (ষোড়শ শতকের গ্রন্থ)।

(৫) বাঁশের গোড়া (মূলের স্থূলাংশ):— পুড়িয়ে ছাই ক'রে চামেলী বা তিল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে টাকে ব্যবহার হয় এবং এই কয়লা দিয়ে দাঁত মাজলে মাঢ়ী ভাল থাকে ও দাঁত চকচকে হয়—এটা ইউনানি সম্প্রদায়ের গ্রন্থে লেখা দেখি।

(৬) বাঁশের ত্বক্ (সবুজাংশ):— যাকে আমরা নীল বলি। এটায় পীড়কা আরোগ্য করে। (Watt.) বাঁশের নীলের ধোঁয়া খেলে হাঁপানির টান নষ্ট হয়।

(৭) বাঁশের কাঁটা— বেউড় বাঁশের (Bambusa spinosa) কাঁটা বেটে ফোড়ার চারধারে লাগালে ফোড়া পেকে যায়।

বংশলোচন:— কিংবদন্তী শুনি—স্বাতী নক্ষত্রের জল বাঁশের মধ্যে পড়লে নাকি বংশলোচন জন্মে; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি—এ দেশের ২।১ শত পাকা বাঁশের মধ্যে মাত্র ২।৪টিতে পাওয়া যায়, তাও কালো কাদার মত। কিন্তু আমরা ব্যবহারের জন্য যেটি সর্বদা কিনে থাকি, সেগুলির জন্মস্থান জাভা-সুমাত্রা দ্বীপ অঞ্চলে। এগুলি যখন আসে, তখন দেখতে অনেকটা ফ্যাকাশে রঙের ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছোট কাঠকয়লার মত। এখানে সেটাকে পুড়িয়ে সাদা চকচকে করা হয়। রাসায়নিক পরীক্ষকের মতে—এটির মধ্যে আছে ৫০ ভাগ সিলিকা, বাকী ভাগ পটাশ, আয়রন, অ্যালুমিনিয়া ও জল। ঔষধার্থে আমরা চূর্ণ ক'রে ব্যবহার করি—কফজনিত ক্ষয়রোগে ও কাসিতে। এটি চ্যবনপ্রাশেরও একটি অন্যতম উপাদান। আর ইউনানি সম্প্রদায় ব্যবহার করেন বৃষ্য (Aphrodisiac) ও বলকারক রসায়ণ হিসাবে। নামটি তাঁদের 'তাবাশির্'। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে আমদানী বন্ধ থাকাতে এ দেশে নকল তৈরী হচ্ছে। বর্তমানে আসলের দম ১০০ টাকা কিলো, আর নকলের দাম ৮।১০ টাকা মাত্র।

এ প্রশ্ন আপনাদের সকলেরই মনে আসা স্বাভাবিক যে, রোগ-প্রতিকারে এই বনৌষধির যথাযথ নির্বাচন কি ক'রে সম্ভব হয়েছিলো—তখন তো এরকম ল্যাবরেটরী ছিল না?

হ্যাঁ, ছিল না সত্যি, কিন্তু তাঁরা একটা জিনিষ অধিগত করেছিলেন, সেটা হচ্ছে দেহের অগ্নিতত্ত্ব (Metabolism) সম্বন্ধে।

বর্তমান ল্যাবরেটরিতে বুদ্ধিমান মানবের মস্তিষ্ক-প্রসূত বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার কৌতূহল নিবারণের জন্য যেসব উপায় গৃহীত হয়, সেই সুপ্রাচীন ভারতের উন্নত চিন্তাশীল মানবগণ বস্তু-বিজ্ঞানের এবং অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের মৌলতত্ত্ব অধিগত করার জন্য ভূমি, অগ্নি, মেঘ, সূর্য, দেহ ও আকাশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বতঃ বিশ্লেষণী শক্তির উপর প্রতিটি ক্ষেত্রে তন্নতন্ন ক'রে অনুসন্ধান করতেন। বেদে তারই উল্লেখ ভূরি ভূরি।

কয়েকটি নমুনা দিই— (১) ঋক্ ৫ম/১১৭ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে আছে—

'আপো বাক্ আপো ঋত্বিক্ তনুরাতাতানো ঔষধীঃ মেঘঃ সংধ্রিয়াম।'

সায়ণ ভাষ্যঃ—

ওষধীঃ উদ্ভিজঃ আপঃ বাক্চ ঋত্বিক্ তনুং আতনোতি মেঘ-সংধ্রিয়াম।

অনুবাদঃ— ওষধীসকল, জল এবং ঋত্বিকের বাক্য ও দেহ এবং ভূমির তনুকে মেঘ সংবহন করে, শক্তিবর্ধন করে। এই সূক্তটির অনুশীলন করে সংহিতাযুগে প্রতিটি ভেষজকে নিজেদের দেহে প্রয়োগ ক'রে এবং ভূমির গুণগত তারতম্যে তাদের গুণ-ক্রিয়া বীর্যের যে তারতম্য হয় এবং মেঘের ও জনগণের দেহে যে তারতম্য, তার বল-বীর্যেরও তারতম্য হয়—এই অনুশীলনই করেছেন।

(২) অর্ক ও বংশ (বাঁশ) তার একটি নমুনা—এই বাঁশটিকে ধ'রে ঋক্‌বেদ (১৭।২৩।৫২ সূক্তে বলেছেন—

'আতৎ ইন্দ্রায় পর্বস্তং সুপর্বঃ তৃণকেতুকঃ বলায় তিতৃৎসান্। শক্তৎস্বং সহস্রধারাং মহীং সহস্রধারাং অপাং পুরুপুত্রাং বৃহতীং দুদুক্ষণ্॥'

ভাষ্যকার সায়ণ লিখেছেন—

'হে ইন্দ্র তে আপনন্তঃ=সুপর্বঃ=তৃণ কেতুকং বংশঃ বলায় তিতৃৎ-সান্। ধনু রুদম্য দেহবলং বিদধ্যাৎ। স সহস্রধারাং মেঘৈঃ সহ সহস্রপর্বাং অপাং পুরুপুত্রাং কুর্যাৎ। আপনন্তঃ সুপর্বাণঃ বংশঃ শ্লেষ্মঘাতিনঃ দীপনাঃ ভবেয়ুঃ। শ্লেষ্মদাহঃ ইতি তহ ঘ্নন্তি শ্লেষ্মনঃ।'

অনুবাদঃ— হে ইন্দ্র, এই তৃণ কেতুবংশ ইনি। ইনি সুপর্বা। এ'র দ্বারা তোমার ধনু-র্বল বৃদ্ধি পাবে। মেঘের সহস্রধারায় এর সহস্রধারার পর্বগুলি গঠিত হয়। এর দ্বারা ধেনু-দোহন সুখদা হয়। পুত্রবতী হয়। ইনি সর্বদা দীপনশীল, শ্লেষ্মঘাতী। শ্লেষঃ =দাহঃ। দাহ দূর করে।

বৈদিক সূক্তটির দ্বারা বাঁশকে অবলম্বন করেই ভূমি ও মেঘাদির গতি-বিধিতে ভেষজের বলবীর্য ও কার্যকরী শক্তির অনুশীলন করে। সংহিতাকারগণ আরও এগিয়ে বলেছেন—সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪৫ অধ্যায়ে। বাঁশের কন্দর, বাঁশের পাতার গুণ সম্বন্ধে নিরীক্ষণের ফল জানানো হয়েছে। বংশকবীর, বংশতণ্ডুল, বংশত্বক্, বংশ-দল, বংশধান্য বা বংশবীজ সম্বন্ধে আরও গবেষণার ফল ভাবপ্রকাশের সময়েই বেশী হয়েছে। এর পাতা দিয়ে পাখা তৈরী ক'রে সেই পাখার হাওয়া শরীরে লাগালে শরীরের বায়ু-পিত্ত বৃদ্ধি পায়—এটির মূল সূত্র পাওয়া গেছে বৈদিকসূক্ত অর্থাৎ সায়ণ ভাষ্যের 'আপনন্তঃ' এই সূত্র থেকে।

সমস্ত রোগের প্যাথোলজি তারই মধ্যে নিহিত। আর দ্রব্যবিচারও হয়েছিল অগ্নিতত্ত্বের ভিত্তিতে।

দ্রব্যগুণ সম্পর্কে যে যাই অনুসন্ধান করুক না কেন, উৎস তাঁদেরই সেই উৎস-সঞ্জাত জ্ঞান-বিচারের।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Terpenoids viz. lupeol, betaamyrin, alphaamyrin, friedelin, taraxerol, alphaamyrin methyl ether, ferneol. (b) Polysaccharides. (c) Other constituents viz. 2-furaldehyde, lignins hemicellulose, holocellulose, miliacin, glutinone, glutinol, cylindrin, crusgallin, cholin, betain, cyanogenetic glycoside. (d) Sterols viz. betasitosterol, stigmasterol. (e) Acids viz. oxalic acid, benzoic acid.

কদম্ব

অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, শাল্মলী, শমী, জয়ন্তী প্রভৃতি প্রখ্যাত বৃক্ষগুলির ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠালাভের মূলে আছে জানপদিক ভূমিরক্ষায় তাদের অসাধারণ দক্ষতা, তাই তারা কেউ গীতা, কেউ ভাগবত, কেউ বা মহাভারত, আবার কেউ বা রামায়ণের পৃষ্ঠায় পবিত্র ও স্মরণীয় বৃক্ষরূপে চিহ্নিত হ'য়ে আছে ঠিক এমনিভাবেই :—

রাধাকৃষ্ণের লীলাবাদের উপাখ্যানের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে কদম্ব বৃক্ষও আমাদের কাছে পরিচিত। কদমতলায় ভক্তিরসের দুটি দিব্যমূর্তির সঙ্গে জড়িত কাহিনীগুলি আমাদের মনের রসতন্ত্রীগুলিকে উদ্বেলিত ক'রে তোলে আজও।

কিন্তু এই গাছটি যে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার সঙ্গেও জড়িত এবং তার আর একটা দিকও আছে—সমাজের কল্যাণসাধনে, সে দিকটা আমাদের মধ্যে অনেকের অজানা রয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া এই বৃক্ষের নামকরণের মধ্যেও কি অপূর্ব বিচক্ষণতা, এ কথা বাস্তব ধর্মানুরাগিদেরও ভাবতে হয় যে, প্রাচীন যুগে দ্রব্যগুণের অনুভূতিলব্ধ

যোগজ অথবা প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানও তো আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছে। বৃক্ষের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবই বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কতপ্রকার রোগ নিরাময় করে। নীরব এই কদম্ব বৃক্ষটি শীতাতপসহিষ্ণু হ'য়ে বর্তমানে শুধু আমাদের কাছে কাঠের উপযোগিতাই জানিয়ে প্যাকিং-বাক্স ও ব'সবার পিঁড়ি তৈরীর কাজে আত্মদান ক'রে আসছে।

কিন্তু প্রাচীনকালে সে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের স্বগোত্রও ছিল, কারণ কদম্ব তো বৈদিক শব্দ।

> 'বনেষু ব্যন্তরীক্ষং এতান্ কদম্বং বাজমর্ব'ৎসু পয় উৎস্রিয়াসু অদধ্যাৎ সোমমদ্রৌ'। (শুক্ল যজুর্বেদ—৪।৩১)
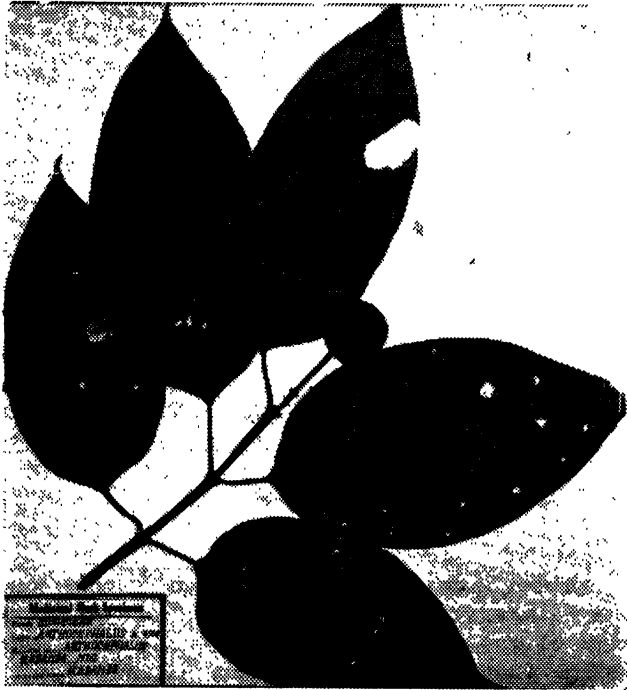
মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> ত্বং কদম্বঃ কদি=অচ্, অম্বং=বৈবশ্যাকরং। ব্যন্তরীক্ষং বাজং=বীর্য্যং ততান। তথা অর্বৎসু বাজং=বীর্য্যং বলং ততান। পয়ঃ শীকরোৎক্ষিপ্তং বায়ুং রেণুং উৎস্রিয়াসু পুমস্সু ততান। ত্বং অদ্রৌ ভূসু সোমং অদধাৎ। বৈবশ্যং করোসি। ভূসু=পৃথিবষু সোমং=রসং ধারয়সি।

উপরিউক্ত ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—তুমি কদম্ব। তুমি বিবশতা আন পৃথিবীতে। অন্তরীক্ষে অর্থাৎ শূন্য স্থানে (ক্ষয় জন্য শূন্য স্থানেও) বীর্য স্থাপন কর। বায়ুর মধ্যে রেণু ছড়িয়ে অপরের দেহ-মনে বলাধান কর। তুমি পর্বতে ভূমিতে জন্ম নাও।

বৈদিক সূক্তে লক্ষণীয় কয়েকটি শব্দ

অর্থে পাই কদম্বরেণু শরীরে বলাধান করে, মত্ততা আনে, অদ্রি অর্থাৎ পর্বতে এবং মাটিতে ওর জন্ম প্রভৃতি।

অনুশীলন ক'রে পাওয়া যায়—বর্ষা, শরৎ ঋতুতে যখন প্রাকৃতিক কারণেই আমাদের শরীরে বলহানি ঘ'টে, তখনই প্রাকৃতিক ভৈষজ্য কদম্বরেণু ও কদম্বকুসুমের ব্যবহার করা কর্তব্য। তা ছাড়া রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যানের মধ্য দিয়েও কদম্বের ফুল সুগন্ধ এবং মধুর, তাও গ্রহণ করা হয়েছে এবং কাব্যে **'প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ'** (কাব্য প্রকাশ) **"ছায়া-বদ্ধ কদম্বকং মৃগকুলং"** (মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে ২।৬) রঘুবংশ কাব্যের ১৫।৯৯; মেঘদূত কাব্যের পূর্বমেঘের ২৫ শ্লোক **'প্রৌঢ় পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ'**, ঋতুসংহার ২।৪ **'বিকচনবকদম্বম্'**-এ। তাই বৃক্ষটি যে অনেকদিন থেকেই প্রখ্যাত হ'য়ে র'য়েছে এ তো স্পষ্ট।

প্রাচীনগণ দেখেছেন—এ বৃক্ষ গিরিকদম্ব ও ভূকদম্ব এই দুটি নামে প্রখ্যাত হওয়া ছাড়া তার আর একটি প্রজাতির (species) কদম্বকেও তাঁরা দেখেছেন। বৃক্ষটির প্রকারভেদে মতভেদ থাকলেও ধারাকদম্ব (Anthocephauls indicus A. Rich.) ও কেলিকদম্ব (Adina cordifolia) এই দুই প্রকারেই তাকে দেখা যায়; এরা একই (Rubiaceae) ফ্যামিলিভুক্ত।

কদম্বকে সাধারণ ভাবে নীপ বলা হয়ে থাকে. আবার নীপ অর্থে গিরির অধোভাগ, ঐসব অঞ্চলে বেশী জন্মাতো বলেই সম্ভবতঃ তার আর একটি নাম নীপ রাখা হয়েছে।

নাম-মাহাত্ম্যঃ— যে কোন নামের শব্দ-নির্বাচন এবং সংগঠনের একটি তাৎপর্য ছিল, সেই হিসেবে এই কদম্ব হ'চ্ছে 'কত্' (বিবশতা) থেকে 'কদি' আর অম্বচ্ একটি প্রত্যয়, এই প্রকৃতি প্রত্যয় যোগে এর নাম সৃষ্টি। এর সমষ্টিগত অর্থ হ'চ্ছে অসাড় (বিবশ) করা। এখানে প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি—এই কদমপাতা সম্পর্কে আমার অনুসন্ধানের উৎস একদা এক বৃদ্ধার মুখে আবেদন শুনে—"দুটো কদমপাতা পেড়ে দেবে বাবা, নাতিদের কির্মি (ক্রিমি) হ'য়েছে, খাওয়াবো।"

সংহিতা রচনার যুগে

চরকের সময় (অর্থাৎ আনুমানিক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী থেকে দ্বিতীয়) বলা হয়েছে—হাত-পায়ের তলায় জ্বালা বোধ হলে এবং সেই জ্বালায় পাতলা চামড়া উঠে গেলে ঐ পাতার রস মাখালে অবশ্য কমে যায়। চরকীয় চিকিৎসা পদ্ধতির যুগের গবেষণায় দেখা যায়—ব্রণ ঢেকে রাখার জন্য কদমপাতার ব্যবহার। ব্যথা নিরাময়ে যেসব বনৌষধির ব্যবহার হয়েছে, কদমপাতা তার মধ্যে একটি।

তা ছাড়া এটিতে যে আরও বহু রোগনাশক শক্তি আছে, সেটা বলা হ'য়েছে সুশ্রুতে। সুশ্রুতের বক্তব্যকে অনুশীলন ক'রে পাওয়া যায় যে, এর বাতনাশকত্ব শক্তি আছে; এই অংশটুকুকে গবেষণা ক'রে পরবর্তী চিকিৎসকবৃন্দ বুঝেছেন—বাতনাশক অর্থে শ্লেষ্মা সমন্বিত এবং অমাবস্যা তিথিতে বর্ধিত একপ্রকার রসগত রোগ। তাকে উপশমিত

করে, কারণ গ্রন্থিস্ফীতির সঙ্গে ব্যথা বুঝলেই কদমপাতার সেঁক এবং কদমপাতা গরম ক'রে ফুলো জায়গায় বেঁধে রাখলে ফুলো এবং ব্যথা কমে, এ ব্যবহারের আদি উৎস সুশ্রুত থেকেই। কিন্তু কৃমিনাশক ঔষধার্থে কোথাও এটির ব্যবহার হয়নি। বর্তমানে এই গাছটি চিকিৎসক বা জনসাধারণের কাছে যে খুব দরকারী—এমন প্রচার নেই।

গ্রামীণ ব্যবহার:— (১) **কোষবৃদ্ধিতে** (Hydrocele) অনেকে কদমপাতা বেঁধে থাকেন। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে—যদি গাছের ছালকে (ত্বক্) চন্দনের মত বেটে কোষে লাগিয়ে তারপর কদমপাতা দিয়ে বাঁধেন, তাহলে ব্যথা ও ফোলা দুই-ই কমে যাবে।

(২) শিশুদের **কৃমিতে** এই পাতার রস খাইয়ে থাকেন, কিন্তু বয়সানুপাতে মাত্রা বেশী হলে বমি হতে পারে, এ ক্ষেত্রে সব থেকে নিরাপদ—পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে খাওয়ানো। ৪।৫ বৎসরের শিশুদের ৩ গ্রেণ মাত্রায় সকালে একবার খাওয়ানো যায়; যদি না কমে তাহলে সকালে ও বিকালে ২ বার দিতে হবে। সপ্তাহ মধ্যে উপদ্রব কমে যাবে। এটায় প্রত্যহ মলের সঙ্গে কিছু কিছু বেরিয়েও যাবে, এমন-কি কেঁচো ক্রিমি বা গোল ক্রিমি (Round worm) ও সুতা ক্রিমি (Thread worm)— বেরুতে দেখেছি।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি—পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে ক্রিমিনাশক ঔষধের দু'টি ধারা আছে। একশ্রেণীর ঔষধ পোকাগুলির জীবনক্রিয়াকে স্তব্ধ ক'রে (Metabolic poison) তাদের মৃত্যু ঘটায়; এদের বলা হয় ভারমিসাইডস্ (Vermicide)। এটির ব্যবহার কিন্তু সীমিত। আর এক শ্রেণীর ঔষধ—যেগুলি ক্রিমি কীটের মৃত্যু না ঘটিয়ে কীটগুলিকে অসাড় করে, ওদের ক্রিয়া অনেকটা নারকোটিক ধরণের; এগুলিকে বলা হয় ভারমিফিউজেস্ (Vermifuges)। আমাদের কদমপাতা এক্ষেত্রে শেষোক্ত ধরণের কাজ করে।

(৩) **অর্বুদে** (Tumour):— কচি ছাল চন্দনের মত বেটে সহ্যমত গরম ক'রে লাগালে কমে যেতে থাকে, ব্যথা থাকলে সেটাও সেরে যায়।

(৪) যাঁদের মুখে মাঝে মাঝে দুর্গন্ধ হয়, তাঁরা কদম ফুল কয়েকটা নিয়ে কুচিয়ে কেটে জলে সিদ্ধ ক'রে সেই জল দিয়ে দিনে-রাত্রে কুল্লি করলে অবশ্যই তা দূর হয়।

(৫) ওয়াট সাহেবের বইতে লেখা—তদানীন্তন যুগের সার্জেন ডাঃ আনন্দমোহন মুখার্জি লিখছেন—শিশুদের মুখের ঘায়ে ও স্টোমাটাইটিসে (Stomatitis) কদমপাতা-সিদ্ধ জলের কবল ধারণ (মুখে রাখা) বা কুলকুচায় শীঘ্র সেরে যায়। এই গাছের ছাল জ্বরে ব্যবহার হয় এবং টনিকেরও কার্য করে, এ ভিন্ন বহু রোগের ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার করা হয়েছে।

(৬) **নেশার আশায়:**— আজকালকার কথা নয়, সেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের যুগ থেকে চলে আসছে। গাছের ছালে গর্ত ক'রে শুকনো ছোলা ও লবঙ্গ পুরে রাখা হতো, পরদিন ছোলাগুলি কদমের রস টেনে ফুলে গেলে সেগুলি খাওয়া হ'ত। এটাতে অল্প নেশাও হয় এবং বৈবশ্য (বিবশতা) সৃষ্টি করে। এখনও উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে গাঁজার কলিগুলোকে কদম গাছের গায়ে পুঁতে রেখে পরের দিন যথানিয়মে সেবিত হয়ে থাকে। তাই তাকে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে সেকালের কোকেন।

নূতন তথ্যের সন্ধানে:— কদমগাছের ছালে (ত্বকে) সিনকোনার সহধর্মী দ্রব্য পাওয়া যায়, এটি পাশ্চাত্য ভেষজ-বিজ্ঞানীদের পরীক্ষিত। এই সিনকোনা ও কদমগাছ এ দু'টির

ফ্যামিলী একই (Rubiaceae) এবং আলোচ্য বনৌষধিটি বিবশতাকারক, সেজন্য কৌতূহলবশতঃ কদমছালের ট্যাবলেট জিয়ারডিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্যে এক ডাক্তার বন্ধুকে দিয়েছিলাম, তিনি রিপোর্ট দিলেন যে, ১২ দিনের মধ্যে নেগেটিভ হয়ে গিয়েছে। তবে দেখা যায়—কচি ছালে উপকার বেশী হয়। আবার ঋতুভেদে দ্রব্যের গুণ কম-বেশী হয়।
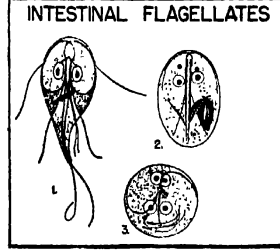
চরকঃ— (১) **ব্রণাচ্ছাদনার্থ কদম্ব পত্রঃ**— কদম্বের পত্র দ্বারা ক্ষত আচ্ছাদিত করিবে।

(চ. চি.—১৩অঃ)

(২) **মূত্রের বৈবর্ণ্যে ও কৃচ্ছ্রতায় কদম্বঃ**— কদম্বের ক্বাথ ও গব্যদুগ্ধ সহ যথাবিধি ঘৃত পান করিলে মূত্রের বিবর্ণতা ও কৃচ্ছ্রতা নিবৃত্তি পায়।

(ঐ. চি.—২২ অঃ)

(৩) কদম্বের ছাল জ্বরনাশক ও বলকারক। ইহার ছালের চূর্ণ, অহিফেন ও ফিটকিরি সমপরিমাণে মিশাইয়া অক্ষিকোটরের চতুর্দিকে দিলে চক্ষুপ্রদাহ আরাম করে (Dymock)।

(৪) কদম্ব পত্রের ক্বাথ ক্ষতে ও মুখের ঘায়ে দিলে সেরে যায়।

(৫) কদম্ব ত্বকের রস জীরাচূর্ণ ও চিনির সহিত সেবনে **শিশুর বমন** নিবারিত হয়।

(৬) **জ্বরের প্রবলাবস্থায়ঃ**— যখন অতিশয় পিপাসা হয়, তখন কদম্বফলের রস সেবন করলে পিপাসা নিবারিত হয় (R. N. Khory)।

(৭) কোন স্থানে বেদনা, শুক্রশোধন ও বমনের জন্য কদম্ব-নির্যাস হিতকর। (চরক)

(৮) কদম্ব পাতার **কল্কঃ**— বালকদিগের মুখের ঘায়ে এবং যেকোন মুখের ঘায়ে 'কুল্লি' হিসাবে ব্যবহারে উপকার হয়।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Acids viz., quinonic acid, cinchotannic acid. (b) Tannins.

পদ্ম

প্রকৃতির রূপ, কালের রূপ, দেহের রূপ, বয়সের রূপ, কোথায় না রূপের প্রশস্তি; কিন্তু ভূষণে ভূষিত না হ'লেও যে সবারই দৃষ্টি ও মনকে টানে সেও তো রূপ! হয়তো বা রূপের আসল ব্যাখ্যা তাই; এই যে কমল, তারও সমাদর ওই রূপের জন্য, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—পদ্মের কি শুধুই রূপ? নাকি ওকে রূপক করার জন্যই তার রূপের প্রশস্তি; কিন্তু এত কথার মধ্যে ঘুরেফিরে আসে—ওসব রূপাভিলাষ তো কবিরই মানসক্ষেত্রে! হ্যাঁ, তা কেবল কবিই দেখেছেন, কিন্তু তার ভৈষজ্যগুণের বিচার ক'রেছেন বৈদ্যককুল। রূপের বন্দনা করার সময় কোথায় তার? জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের বাধা দূর ক'রতে একমাত্র বৈদ্যকেই অগ্রসর হ'তে হয় রোগ নিরাময়ের পথ বেছে নিতে। তিনি স্পষ্ট বলেন, পাথরের কালো নুড়ি হ'লেই যেমন শালগ্রাম শিলা হয় না, তার বিশিষ্ট লক্ষণ থাকা চাই, সেইরকম তো কমলও; রূপময় কুসুমরাজির মধ্যে কমলও একটি, এর আরও নাম আছে এবং তার প্রকারভেদও আছে। এটির রং প্রধানতঃ সাদা, লাল ও নীল হয়, তবে নীল কমলের অস্তিত্ব নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে; আবার মিশ্রবর্ণ ও আকৃতি ভেদে আরও পাঁচ প্রকার পদ্মের নামোল্লেখ দেখা যায়। যে সব জলজ ফুল সূর্যোদয়-বিকাশী অর্থাৎ দিনের বেলায় ফোটে, তারাই প্রচলিত ভাষায় পরিচিত পদ্মের পর্যায়ভুক্ত; আবার অনেকটা এই ধরণের যে সব ফুল জলজ ফুল রাত্রিবেলায় ফোটে, তারা কুমুদের (শালুক বা সাঁপলা) গোষ্ঠীভুক্ত; এদেরও পৃথক নাম আছে এবং গুণেরও তারতম্য আছে। এক কথায় জলজ কুসুমের ঐক্যবদ্ধ নাম কমল বলা যেতে পারে; কেন তা পরে ব'লছি, তবুও কমল আর পদ্ম নাম অভিন্ন।

নামের তাৎপর্য—

কং=জলং অলতি=ভূষয়তি=কমলং,

অর্থাৎ জলকে সে ভূষিত করে, সেইই কমল। আর পদ্ম? পদ+মন্, সেখানে বলা হয়েছে—

পদ্=মূলং তেন মনতে=সর্পতি
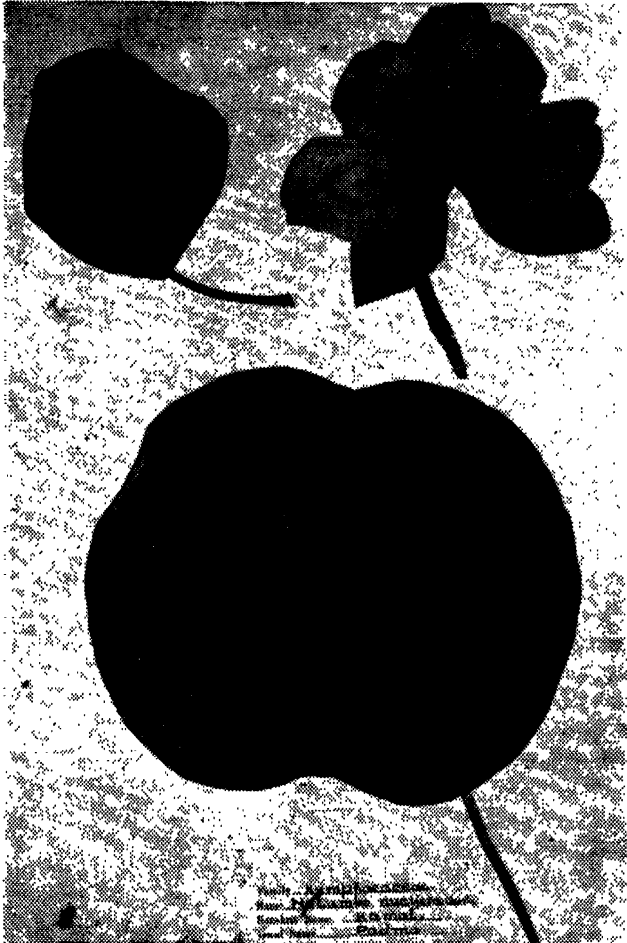
অর্থাৎ মূলের দ্বারা সে গমন করে। অর্থাৎ জলজ কুসুমগুলির সকলেই পদ্ম নয় ব'লেই কমল আর পদ্ম অভিন্ন নয়। কিন্তু পদ্ম ও কমল অভিন্ন।

আপনারা অনেকেই দেখে থাকবেন—পদ্মের কন্দ থেকে ফে'কড়ি (একে মৃণাল

বলা হয়) বেরিয়ে আবার আর একটি গাছের সৃষ্টি হয়। এই জন্যই তার নাম পদ্ম রাখা হয়েছে। এই অর্থেই কমল ও পদ্ম নাম অভিন্ন।

বৈদিক সমীক্ষা:—

'যুক্তায় সবিতা দেবান্ স্বর্যতো ধিয়াদিবং পদ্মং সবিতা প্রসুবাতি তান্' (অথর্ববেদ—বৈদ্যককল্প ৩।৫।৭ সূক্ত)

মহীধর ভাষ্য:—

সবিতা (সূর্য্যঃ) প্রেরয়িতা প্রজাপতি র্বা তান্ দেবান্ ধিয়া দিবং পদ্মং যথা প্রসুবাতি সর্ব্বতঃ নিয়ম্য বুধধিয়া বুদ্ধ্যা যথা প্রকাশয়তি তথা পদ্মং চ রসবদ্ অপি তন্নিরস্য বিকাশয়তি।

এর অর্থ হ'ল—সূর্য বা প্রজাপতি যেমন দেবতাদিকে রস বিষয়ের মধ্যে থেকেও তাদিকে বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত করেন, তেমনি সূর্য জলস্থ কমলকে জলের মধ্যে রেখেও নিজ তেজগুণের দ্বারা বিকশিত করেন।

পরবর্তী সমীক্ষা:— বৈদিক সূক্তের অন্তর্নিহিত তথ্যকে সুশ্রুতে রোগ-প্রতিকারের কাজে প্রয়োগ করা হ'য়েছে। ওখানে হ'ল পদ্ম প্রকৃতিগত জলজ কুসুম হ'য়েও সূর্যের তেজপ্রভাবেই সে বিকশিত হয়; আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ পিত্ত ও শ্লেষ্মা যখন বিকারগ্রস্ত হয়, অর্থাৎ শ্লেষ্মাক্রান্ত পিত্ত তেজ বা অগ্নিবল হারিয়ে ফেলে, তখন পদ্মফুলের সেই তেজপ্রভাব তাকে পুনরায় উদ্দীপ্ত করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর এক কথা জানিয়ে রাখি, যে কোন দ্রব্যের জন্মকাল ও জন্মস্থান ভেদে কালজ ও স্থানজ শক্তিটি তার অন্তর্নিহিত হ'য়েই স্বতন্ত্র দ্রব্যশক্তির গুণগত পার্থক্য সৃষ্টি করে। এটা অনুরূপভাবে প্রতিটি জীবদেহেও থেকে অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

এই যেমন গম ও ধান—দুটি সর্বভারতীয় মানুষের খাদ্য, কিন্তু একটির জন্ম প্রধানভাবে বর্ষাকালে, অন্যটির হেমন্তকাল।

ডায়াবেটিস্ (Diabetes) হ'লে আমরা রুটি খেতে দিই, কিন্তু ভাত খেতে নিষেধ করি। আবার শুষ্কতা রোগে ভাত পথ্য দিই, কারণ ভারতীয় চিকিৎসার চিন্তাধারা হ'লো—যারা হিমবর্ষণে সিক্ত ও সূর্যের তেজে শুষ্কভূমিতে জন্মে (একে রবিশস্যও বলা হয়), তারা তেজগুণসমৃদ্ধ হয়; আর যারা বিসর্গকালে (বর্ষাকালে) জন্মে, প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে সোমগুণের আধিক্য থাকে।

এই ডায়াবেটিস্ রোগটিতেও সোমধাতুর আধিক্য থাকায় এটার ব্যবহার সমীচীন নয়; ঠিক এমনিভাবে অপতর্পণজনিত রোগে উপবাসোত্থ রোগে শুষ্কতা এলে তাকে অন্ন বা ভাতই খাদ্য দিতে হয়। শুধু খাদ্যেই নয়, রোগের ক্ষেত্রে এবং কোন ওষধির বিচারেরও এটি একটি দিক। ভিন্ন প্রদেশেও এইভাবে পথ্যের বিবর্তন ঘটাতে হয়।

জাতি ও কুল:— এই জলজ উদ্ভিদটির সাধারণ পরিচিতি সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সমগ্র ভারত ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে সাধারণতঃ পুরাতন পাঁক-জমা পুকুরে, বিলে বা ঝিলে জন্মে।

কোন কোন অঞ্চলে এক এক রঙের পদ্মফুলের প্রাচুর্য দেখা যায়। এই ফুলের রঙের পার্থক্যের জন্য তাদের বিশেষ বিশেষ নামও আছে, যেমন—শ্বেতপদ্মের নাম পুণ্ডরীক, রক্তপদ্মের কোকনদ, নীলপদ্মের ইন্দীবর ইত্যাদি; এর অঙ্গভেদে নামও

পৃথক—যেমন কচিপাতার নাম সংবর্তিকা, কেশরের নাম কিঞ্জল্ক, পুষ্পনিঃসৃত রসের নাম মকরন্দ ইত্যাদি; এদের প্রত্যেকেরই গুণগত পার্থক্যও আছে। আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় হ'ল—স্থলপদ্মের সঙ্গে কিন্তু জলপদ্মের কোন সম্পর্ক নেই। ওটির বোটানিক্যাল নাম– Hibiscus mutabilis, ফ্যামিলি Malvaceae. কিন্তু আলোচ্য এই পদ্মের বোটানিক্যাল নাম Nelumbo nucifera Gaertn.; ফ্যামিলি Nymphaeaceae. এই জলজ উদ্ভিদটির মূল থেকে ফুল পর্যন্ত প্রতিটি অংশই রোগ-প্রতিকারের কাজে লাগানো হয়েছে।

গুণপণা (গুণ এখানে ব্যবহারগত প্রশংসা)

(১) পদ্মের পাতা (সহজ প্রাপ্য হ'লে) গরীবের ভোজনপাত্র বা তীর্থস্থানের প্রসাদ বিতরণের পাত্র হিসাবেও এর ব্যবহার আজও চলে আসছে, কিন্তু রোগ-প্রতিকারে তার বিশেষ উপযোগিতাও আছে—এ তথ্য ঋষিকল্প কবিরাজ গঙ্গাধরের শিষ্যধারার জানা। তাঁরা শ্বেতী রোগীকে (শ্বিত্র রোগে) কচি পদ্মপাতায় গরম ভাত ঢেলে খেতে বলেন। এ সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহকালে এইটুকু জানতে পেরেছি যে, রাঢ় অঞ্চলে লৌকিক টোট্‌কা ঔষধ হিসাবে এর ব্যবহার এখনও প্রচলিত। রোগের প্রারম্ভে একনাগাড়ে এই পাতায় গরম ভাত ঢেলে খেতে হয়; কিন্তু বর্তমানকালে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এ ব্যবস্থা হয়তো সকলের পক্ষে সম্ভব হবে না সত্যি, কিন্তু গবেষকদের গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। তবে এটা লক্ষ্য করেছি যে, পদ্মপাতায় কোন মিষ্টদ্রব্য বেঁধে রাখলে পরদিন তার স্বাদ পরিবর্তিত হয়। এটা সংযোগ-বিকার। আমরা আয়ুর্বেদের সেই সূত্রগুলির পুনরুজ্জীবনে অসমর্থ হ'য়েছি, যে সূত্রগুলির দ্বারা জানতে পারি কেন এমন হয়, কি আছে এর মধ্যে।

(২) **জ্বরের দাহে**— পদ্মপাতার উপর শুয়ে থাকলে গায়ের জ্বালা ক'মে যায়। এটা চরকের ব্যবস্থা।

(৩) **হারিশে** (এও এক ধরণের অর্শরোগ) (Rectal prolapse)— যেসব শিশুর পায়খানার সময় মলদ্বারের উপর অংশ খানিকটা বেরিয়ে আসে (যাকে গ্রামাঞ্চলে হারিশ বা হালিশ বলে); সে ক্ষেত্রে কচি পদ্মের পাতা (যেগুলি তখনও প্রসারিত হয়নি) ৩—৮ গ্রাম মাত্রায় (বয়সানুপাতে) অল্প চিনির সঙ্গে খেতে দিলে ওটি আর বাইরে আসে না। এ ব্যবস্থা কিন্তু আজকালের নয়, একাদশ খৃষ্টাব্দ থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে। এভিন্ন অনেক বৃদ্ধ বৈদ্য এই রোগে পদ্মের কচিপাতা বেটে কিছু মাখন মিশিয়ে মলদ্বারে কয়েকঘণ্টা ক'রে কয়েকদিন বেঁধে রাখতে ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। (কৌপিন এঁটে)

(৪) **মায়েদের রোগ**— প্রসবের পর বা যেকোন কারণে নাড়ী সরে এলে (prolapse of uterus) পদ্মের কচিপাতা চিনি দিয়ে খেতে দেওয়াটা প্রাচীন ব্যবস্থা। এ রোগের চিকিৎসার সমারোহ করার পূর্বে এটা খেয়ে দেখতে দোষ কি?

(৫) **হৃৎ-শূল রোগে** (Angina pectoris)—আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় বিকৃত কফ ও পিত্ত ওই ধাতু দুটি রক্তাশয় বা হৃদ্‌গত হলে বায়ুর সাবলীল সঞ্চরণশীলতা স্বাভাবিক কারণেই বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং শূলবৎ বেদনা সৃষ্টি করে; এ ক্ষেত্রে প্রাচীন বৈদ্যগণ পদ্মফুলের পাপড়ির রস খেতে দিতেন, এর দ্বারা হৃদ্‌গত সেই বিকৃত কফ ও পিত্ত সংশোধিত হয়—যার ফলে এই ব্যথা থেকে রোগী নিষ্কৃতি পায়।

(৬) **রক্তপিত্তে**— যাঁদের মাঝে মাঝে গলা সুড়্ সুড়্ করে, হঠাৎ মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে বা দাস্তের সময় রক্ত পড়ে অথচ পেটে বা মলদ্বারে কোন জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে

না, সেক্ষেত্রে পদ্ম-কেশর চূর্ণ ৩—৬ গ্রেণ মাত্রায় চিনি বা মধুর সংগে খেলে রক্ত নির্গমন বন্ধ হয়। অনেকে এর সংগে একটু বাসক পাতার (Adhatoda vasica) রস মিশিয়ে খেতে দিয়ে থাকেন।

(৭) **রক্তার্শে—** এই পদ্মকেশরই উপরিউক্ত মাত্রায় উপশমদায়ক।

(৮) **চলিত গর্ভে—** যাঁদের অকালে গর্ভপাত হয়ে যায়—সেক্ষেত্রে ৩।৪টি পদ্ম-বীজের শাঁস বেটে সরবৎ ক'রে ২।১ দিন অন্তর খেলে এ দোষটি সেরে যায়।

(৯) **পিত্তাতিসারে—** যাঁদের পাতলা ও সবুজাভ দাস্ত হতে থাকে—সেক্ষেত্রে পদ্মের ফেঁকড়ি বা নতির (যাকে মৃণাল বলা হয়) ২।৩ চা-চামচ রস চালধোয়া জলের সংগে ১০।১২ ফোঁটা মধু মিশিয়ে খেতে দিলে ওটার নিবৃত্তি হয়।

(১০) **প্রস্রাব রোধে—** পদ্মের কন্দমূল তিল তৈলে ভেজে খেলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়; তবে ঐটি গোমূত্রে বেটে খেলেই আরও ভাল কাজ হয়। চরক সম্পদায় এক্ষেত্রে পদ্মফুলের ক্বাথ খেতে উপদেশ দেন; পদ্মের অভাবে শাপ্লাফুল হলেও চলবে।

(১১) **অনিয়মিত ঋতুস্রাবে—** মেয়েদের প্রতিমাসে ঋতুস্রাবে যদি অনিয়ম ঘটে—পরে তা ক্ষতের আকার ধারণ করে, এক্ষেত্রে লাল পদ্ম বা লাল শুঁদি (যার প্রচলিত নাম রক্তকম্বল, বোটানিক্যাল নাম—(Nymphaea rubra) মূলের ক্বাথ চিনি মিশিয়ে স্রাব চলাকালীন কয়েকদিন খেলে এ রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তবে ৩।৪ মাসের মধ্যে মাত্র ঐ ক'টাদিনই খেতে হয়। এ সম্পর্কে অন্যান্য উপসর্গগুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তাহলে কখনো ব্যর্থ হয় না।

(১২) **চোখের ছানিতে** (Cataract)— প্রথমেই বলে রাখি, এমন কোন ফুল নেই যার মধু নেই; কিন্তু এমন কোন একক ফুলের মধু নেই, যার রোগ-উপশমের শক্তি আছে; কিন্তু এই পদ্মফুলের মধু—যার বিশিষ্ট নাম অরবিন্দ; এই নামটিই কিন্তু তার চরিত্রগুণের দর্পণ। চোখের মণির 'অর' (চক্রাকার যে বর্ত্ম অর্থাৎ পথ) এর কর্কশ বন্ধুর অবরোধকে সে বিন্দতি=শময়তি। এখানে আয়ুর্বেদের মূল বক্তব্য হ'ল—তিমির রোগ, পিত্ত-শ্লেষ্মাজনিত ব্যাধি—এই ফুলের মধু সেই পিত্ত-শ্লেষ্মাকে অপসারিত ক'রে। ছানি পড়াও তিমির রোগের অন্তর্গত। এটাও কিন্তু সেই সুশ্রুতের সমীক্ষার আর একটি দিক। তবে রোগের সুরুতে এ ব্যবস্থা না করতে পারলে ওটিকে সরানো দায়। এর সংগে আর একটা কথাও ভাবতে হয় যে, দোষ সঞ্চয় আর না হয়। এভিন্ন আরও কত ভৈষজ্যগুণের কথা এখনো হয়তো উদ্ঘাটিত হয়নি।

সেই বৈদিক যুগের একক ভৈষজ্য-বিধানের পরবর্তীকালে এলো বহু ভেষজের একত্র ব্যবহার—যাকে আমরা সংহিতার যুগ বলি, তারপর পরবর্তীকালে এসেছে পারদ গন্ধকাদি পার্থিবদ্রব্যের গুণগত ব্যবহার এবং মিশ্রণ ক'রেও ব্যবহার; এর দ্বারা আয়ুর্বেদের ভৈষজ্য চিন্তনের মৌলিক চিন্তাধারা পথভ্রষ্ট কিনা সেটা আজ চিন্তনীয়। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র পৃথিবীতে একক বনৌষধির সমীক্ষা আরম্ভ হয়েছে; তবে তাঁদের পরীক্ষাপদ্ধতি স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের আয়ুর্বেদীয় ভৈষজ্য নিরীক্ষাটির আজও জাগরণ হ'চ্ছে না।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz., nelumbine, nupharine. (b) Volatile oil (c) Tannin.

বুড়িগুয়াপান

আগাছা কথাটা লৌকিক, অপরপক্ষে অ-গচ্ছ অর্থাৎ যে যায় না; এরই পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যেটি খুবই প্রামাণ্য সূত্র থেকে সবাই নিয়ে থাকেন।

গৌতমবুদ্ধের অনুগত সম্প্রদায়ে চিকিৎসক ছিলেন জীবক; তিনি যখন তক্ষশিলায় অধ্যয়নার্থী, তখন তাঁর আচার্যদেব তাঁকে ব'লেছিলেন যে, এমন দ্রব্যের সন্ধান ক'রে নিয়ে এসো, যেটি ভেষজ নয়। তিনি বহুদিন ভ্রমণ ক'রে এসে ব'লেছিলেন, 'না ভৈষজ্য-মস্তি', অর্থাৎ অনৌষধিভূত কোন দ্রব্য নেই (চরক সূত্রস্থান ২৬ অধ্যায়ে); এ কথার উল্লেখ দেখতে পাই বৌদ্ধগ্রন্থের 'মিলিন্দপঞ্হ' এবং জীবক চরিতেও। আয়ুর্বেদের সংহিতা গ্রন্থ চরকে বোধ হয় এই কথারই সূত্রধ্বনি রয়েছে। এর দ্বারাই আমরা ধারণা ক'রতে পারি যে, তখনকার আয়ুর্বিদ্যার ভৈষজ্য শিক্ষার মান কি ছিল।

আয়ুর্বেদের সেই বৈদিক সংস্কৃতির যুগ থেকে আজও চ'লে আসছে আর একটি রীতি—মাদুলী পরা; তা হয়তো বা প্রাক্-আর্যদের সংস্কার থেকে নেওয়া; তা থেকে উত্তরযুগে কত নূতন জিনিসের সন্ধান মিলেছে—আধকপালে মাথাব্যথার জন্য মাথায় গাছের ফল বাঁধা, ন্যাবা (জন্ডিস্) হ'লে গলায় ওষধির মালা পরা, চোখে আঞ্জনি হ'লে (আঁচিল থেকে কথাটা এসেছে) সাতটি কুলপাতা চোখে ছোঁয়ানো; এ রকম অনেক টোট্‌কার প্রভাবে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা। ও সব ছাড়াও ভৈষজ্যগ্রন্থে দেখতে পাই চেতকী জাতীয় হরীতকী হাতে রাখলে ভেদ হয়; এবং এমন বিষও আছে—যেটা গরুর শিং-এ বাঁধলে দুধ লাল হয়। এমনি একটা কথার সূত্র ধ'রেই বুড়িগুয়াপানের যে রোগনাশক শক্তি আছে, তার সন্ধান মিলেছে।

একদিন কথা প্রসঙ্গে এক চারণ বৈদ্য বললেন—এমন গাছও আছে, যার ২ ফোঁটা রস ২।৩ দিন কানে দিলে আমাশয় (Dysentery) সেরে যায়। তখন মনে হ'লো যে

বৈজ্ঞানিকযুগে এ কথা বিশ্বাস করার কোন অবকাশ নেই, কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের আত্মপ্রত্যয় দেখে তাঁর এই সংবাদের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন ক'রে জানতে পারলাম, তিনি এক বৃদ্ধাকে এই বুড়িগুয়াপানের রসের ফোঁটা কানে দিতে দেখেছেন, এবং নিত্যই নূতন নূতন লোকও সেই বৃদ্ধাটির কাছে আসতো। তাঁর এ কথাটি আমার কাছে শুধু সংবাদ হ'য়েই রইলো না, আমাকে অনুসন্ধানের প্রেরণাও জোগালো।

চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী কোন উদ্ভিদ সম্পর্কে প্রাথমিক কর্তব্য হ'চ্ছে—নাম অনুযায়ী তার স্বরূপ নির্ণয় (Identification); আবার তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই গাছটি সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে ও লোকপ্রমুখাৎ অনুসন্ধান করা; তাতেই জানতে পারি —একে মূষাকর্ণী বলে। মূষা অর্থে ইন্দুর, আর কর্ণী অর্থে কান, তাকে চলতি কথায় কোন কোন অঞ্চলে ইন্দুরকানী বা মূষাকাণী বলা হ'য়ে থাকে। এ সম্বন্ধে বনৌষধির প্রাচীন গ্রন্থ রাজনিঘণ্টুতে আখুকর্ণী নামের উল্লেখ আছে, অবশ্য আখু অর্থেও ইন্দুর, সুতরাং শব্দার্থ দু'টি এক হ'লেও গ্রন্থে যে বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে উপরি উক্ত গাছটির কোন মিল না থাকাতে, আসলে এটা মূষাকর্ণী কিনা, সন্দেহের অবকাশ আছে। আবার কারও মতে এই মূষাকর্ণী (ইন্দুরকানী) একজাতীয় পানা (শেওলা), মজা পুকুরে বা ঝিলে জন্মে; একে ইন্দুরকানী পানাও বলে, যেটির

বোটানিক্যাল্ নাম স্যাল্‌ভিনিয়া কুকুলেটা (Salvinia cucullata Roxb.)

নাগার্জুনের যুগে পারদ শোধনের জন্য আখুকর্ণীর ব্যবহার রয়েছে; এভিন্ন চরক সূত্রস্থান ২৭/৭৬ আখুকর্ণিকা নামের উল্লেখ।

এই গাছটির সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার অন্যান্য নামগুলির অর্থ অনুশীলন ক'রলে উপরিউক্ত গাছ দুটিকে গ্রহণ করা যায় না, কারণ তাকে বলা হ'য়েছে ভূমিচরী, বহুপাদিকা, প্রত্যকশ্রেণী, বহুকর্ণী, ভূদরীভবা প্রভৃতি। আমি দেখেছি—ইভল্‌ভুলাস্ নাম্মুলেরিয়াস্ (Evolvulus nummularius Linn.) গাছটির সংগে আয়ুর্বেদোক্ত আখুকর্ণীর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, এটি Convolvulaceae ফ্যামিলীভুক্ত।

আলোচ্য বনৌষধিটি অ্যাকান্‌থেসি (Acanthaceae) ফ্যামিলীভুক্ত, বোটানিক্যাল্ নাম হেমিগ্রাফিস্ হির্‌টা (Hemigraphis hirta T. And.) বাংলা দেশের যত্রতত্র এই গাছ অযত্নে প্রচুর পরিমাণে হ'য়ে থাকে। এর বিশেষ কোন স্বাদ নেই। প্রামাণ্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের অধিকাংশ গ্রন্থে এই গাছটির নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না; এমন কি 'ওয়েলথ্ অফ্ ইণ্ডিয়া' (Wealth of India) বলে দিল্লী থেকে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে, তার মধ্যেও এই গাছটির কোন উল্লেখ নেই। এই গাছটি সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে সংবাদ নিয়ে জানতে পেরেছি যে, আমাশয় ও রক্তামাশয় (প্রবাহিকা) হ'লে এই গাছের রস বয়সানুপাতে এক বা দুই চা-চামচ ক'রে খাওয়ানো হয়। এই গাছ সম্পর্কে 'বনৌষধি দর্পণ' (কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত কৃত) ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে এই গাছটির রস-গুণ সম্পর্কে কোন কথার উল্লেখ নেই, তবে মুখের ও জিহ্বার ক্ষতে পানের সংগে এই গাছের পাতা চর্বণ ক'রলে উপকার হয় এবং পুরাতন কদর্য ক্ষতেও এই পাতা বেটে লাগালে ক্ষত শুদ্ধি হয়, এই কথা বলা আছে।

আমাতিসারে— এই গাছটির পুষ্পিতকালেই একে সংগ্রহ ক'রে শুকিয়ে সমগ্র অংশ চূর্ণ করে ৫।৬ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার ক'রলে সাদা ও রক্ত আমাশায় ভালই উপকার হয়। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে তেমন উপকার পাওয়া যায়নি, অবশ্য এসব ক্ষেত্রের অন্য কোন হেতুও থাকতে পারে। পূর্বোক্ত ঔষধ প্রয়োগে যে সব ক্ষেত্রে তেমন উপকার হয়নি, সে সব ক্ষেত্রের কারণগুলির অনুসন্ধান যেমন প্রয়োজন, তেমনি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কতটা ফলপ্রসূ তাও নির্ধারণ করা প্রয়োজন; তা না হ'লে রোগ-নিরাময়ের কোন পূর্ণাঙ্গ ঔষধরূপে ব্যবহার করা সম্ভব নয়; এবং বৈজ্ঞানিক জগতে এর কোনদিনই স্থান হবে না।

অযত্নে বা যত্নে বর্ধিত এই সব বনৌষধির পরিচয়ের ব্যবস্থা ও তার ঔষধার্থে প্রয়োগের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করাও প্রয়োজন। এর দ্বারা সমগ্র দেশই উপকৃত হবে।

অর্জুন

বৃক্ষ ও মানবের সহাবস্থান অনাদিকাল থেকে চ'লেছে ব'লেই না পণ্ডিত ভাষায় একটি প্রবাদ আছে,

'ফলেন ফলকারণং অনুমীয়তে',

অর্থাৎ ফল দেখে ফলের কারণ জানতে হয়। অর্জুনের এই নামকরণটিও সেই রকম লাগসই; এই বৃক্ষটির বৈদিক নাম 'ককুভ'; অথর্ববেদের ৫৬।৪।১১৮ সূক্তে এই গাছটির সন্ধান পাওয়া যায়।

ককুভ শুষ্মা ওষধীনাং গাবো গোষ্ঠাদি বেরতে।
ধনং সনিষ্যন্তী নামাত্মানং তব পুরুষঃ॥

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য হ'লো—

বৃক্ষরাট্ ককুভয়াসি, কস্য বাতস্য কুঃ ভূমিঃ ভাতি অস্মাৎ বাতভূমি-প্রকাশকঃ অৰ্জ্জুনঃ তব শরীরং প্রতিধনং দাতুং ইচ্ছন্তীনাং ওষধীনাং শুষ্মা বলানি সামর্থ্যানি উদীয়তে উদ্‌নাচ্ছন্তি, যথা গাবো গোষ্ঠাদিব অরণ্যদেশং প্রতি উদ্‌গচ্ছন্তি।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—হে বৃক্ষরাট! ককুভ (অর্জুন), বিস্তীর্ণশাখ তুমি; বায়ুর প্রকাশ তোমাতে সর্বদা হয়, তোমার শরীর সর্ব শরীরের শ্রেষ্ঠ ধন যে বল, তাকেই দান করে। যেমন গরু গোষ্ঠ থেকে বল সঞ্চয় ক'রে আবার অরণ্যে ফিরে যেতে পারে।

নামের তাৎপর্য—

ককো বাতঃ, তস্য ককস্য বাতস্য। কং ভূমিং ভাতি; অস্মাৎ বাতভূমি-
প্রকাশকঃ অর্জ্জুনঃ

এই নামটির দ্বারা সে যে বাতভূমিতে (হৃদ্‌যন্ত্রে) বলদান করে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে অর্জুন নামের তাৎপর্য হ'লো অর্জ+উনন্‌; এই অর্জ অর্থ বল; এই কথাটা বৈদিক শব্দাভিধানে আছে।

ভৈষজ্য সংহিতাকারের দৃষ্টিতে— কান টানলে মাথা আসার মত এই অর্জুনের ভৈষজ্যগুণকে চরকে ও সুশ্রুতে বিচার করা হ'য়েছে ব'লে মনে হয়। কারণ হৃদ্‌যন্ত্র-ঘটিত কোন রোগে প্রত্যক্ষতঃ এটা ব্যবহার করার ফল। সে চিন্তাধারা হ'লো বায়ু আবরকধর্মী, অর্থাৎ সে যেকোন দ্রব্যকে আড়াল ক'রে রাখে অথচ আবৃতধর্মিত্ব তার নেই, অর্থাৎ নিজে আড়াল হয় না; যেহেতু সে সঞ্চরণশীল।

কিন্তু চিন্তাধারা হ'লো আবৃত্ত ধর্ম থেকে ধাতুর (পিত্ত-শ্লেষ্মার) অবস্থাকে অন্য ভৈষজ্য ব্যবহারের দ্বারা স্বভাবে ফিরিয়ে আনা উচিত—এই ভেবেই অর্জুনের ক্রিয়া-

কারিত্বকে অন্যভাবে বিচার ক'রেছেন; কিন্তু আরও পরবর্তীকালে চক্রপাণি দত্ত (যাঁর পুস্তক চক্রদত্ত, (একাদশ খৃষ্টাব্দে) সোজাসুজি বক্ষের আবরক বায়ুকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য হৃদ্‌রোগে অর্জুনের ব্যবহার করেছেন। এটা কিন্তু সেই বেদোক্তিরই নির্দেশিত পথ।

বৃক্ষ পরিচিতি

বৃহৎ গাছ, ৫০।৬০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়, পাতাগুলির আকারটা একটু বড় হ'লেও মানুষের জিভের মত কিন্তু পাতার ধারগুলি খুব সরু দাঁত করাতের মত কিন্তু মাংসল নয়, শক্ত গাছটির বোটানিক্যাল্ নাম Terminalia arjuna. ফ্যামিলি Combretaceae। সমগ্র ভারতেই এ গাছ দেখা যায়, তবে কম-বেশী।

ব্যবহার্য অংশ— গাছ বা মূলের (ত্বক্) পাতা ও ফল।

প্রাচীন বৈদ্যের দৃষ্টিভঙ্গী—গুরু শিষ্যকে ব'লছেন, বাবা! অর্জুন গাছের পূবের দিকের ছালটা নিও; কারণ পূবের দিকের বায়ুর তরলত্ব বেশী, ওদিকের ছালটা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াকারিত্বেও অনুকূল। তখন ভেবেছি এটা কি বৈদ্যের সংস্কার? আজ উত্তরবয়সে সেই কথাটাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মন ভাবতে চায় যে, সকালের রৌদ্র ওদিককার ছালটায় রঞ্জনরশ্মি বেশী সমৃদ্ধ হয়, তাই তাঁদের এই ব্যবস্থা। আজ হয়তো সিনোনিম্ ব'দলে গেল সত্যি; কিন্তু তাঁদের দ্রব্যগুণ সমীক্ষার স্তরটা কতটা উচ্চ ছিল!

প্রয়োগ ক্ষেত্র

(১) যাঁদের বুক ধড়ফড় করে অথচ হাই ব্লাড্‌প্রেসার নেই, তাঁদের পক্ষে অর্জুন ছাল কাঁচা হ'লে ১০।১২ গ্রাম অথবা শুষ্ক হ'লে ৫।৬ গ্রাম একটু থেঁতো ক'রে, আধ পোয়া দুধ আর আধ সের জল একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে, আন্দাজ আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে বিকেলের দিকে খেতে হয়। তবে গরম অবস্থায় ঐ সিদ্ধ দুধটা ছেঁকে রাখা ভাল। এর দ্বারা বুক ধড়ফড়ানি নিশ্চয়ই ক'মবে। তবে পেটে বায়ু না হয় সেদিকটাও লক্ষ্য রাখতে হয়।

(২) **লো ব্লাড্‌প্রেসারে**— উপরিউক্ত পদ্ধতিতে তৈরী ক'রে খেলে নিশ্চয়ই প্রেসার উঠবে।

(৩) **রক্তপিত্তে**— মাঝে মাঝে কারণ বা অকারণে রক্ত ওঠে বা পড়ে; সে ক্ষেত্রে ৪।৫ গ্রাম ছাল রাত্রিতে জলে ভিজিয়ে রেখে ওটা সকালে ছেঁকে নিয়ে জলটা খাওয়ার প্রাচীন ব্যবস্থা।

(৪) **শ্বেত বা রক্তপ্রদরে**— উপরিউক্ত মাত্রা মত ছাল ভিজানো জল আধ চামচ আন্দাজ কাঁচা হলুদের রস মিশিয়ে খেলে উপশম হয়।

(৫) **ক্ষয়কাসে**— অর্জুন ছালের গুঁড়ো, বাসক পাতার রসে ভিজিয়ে, সেটা শুকিয়ে (অন্ততঃ সাত বার) নিয়ে রাখতেন প্রাচীন বৈদ্যেরা। দমকা কাসি হ'তে থাকলে একটু ঘৃত ও মধু বা মিছরির গুঁড়ো মিশিয়ে চাটতে দিতেন।

(৬) **শুক্রমেহে** (Spermatorrhoea)— অর্জুন ছালের গুঁড়ো ৪।৫ গ্রাম ৪।৫ ঘণ্টা আধ পোয়া আন্দাজ গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর ছেঁকে ঐ জলে আন্দাজ ১ চামচ শ্বেতচন্দন ঘষা মিশিয়ে খেলে উপকার হয়, এটা সুশ্রুত সংহিতার কথা।

(৭) যাঁদের প্রস্রাবের সঙ্গে Puscell বেশী যায়, তাঁরা ৩।৪ গ্রাম শুকনো অর্জুনছাল আধ পোয়া আন্দাজ গরম জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে পরে ছেঁকে তার সঙ্গে একটু রান্না করা বার্লি মিশিয়ে খেলে ওটা চ'লে যাবে।

(৮) **রক্ত আমাশয়ে—** ৪।৫ গ্রাম অর্জুন ছালের ক্বাথে ছাগল দুধ মিশিয়ে খেলে ওটা সেরে যায়।

এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি, অর্জুন গাছের সব অংশই কষায় রস (Astringent); এর জন্যই ওর ক্বাথে অনেকের কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। ওদিকটাও লক্ষ্য রাখা দরকার। তবে এটা দেখা যায় দুধে সিদ্ধ অর্জুন ছালের ব্যবহারে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না।

বাহ্য প্রয়োগ

(৯) **মচ্‌কে গেলে বা হাড়ে চিড় খেলে—** অর্জুন ছাল ও রসুন বেটে অল্প গরম ক'রে ওখানে লাগিয়ে বেঁধে রাখলে ওটা সেরে যায়; এটা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। তবে সেই সঙ্গে অর্জুন ছালের চূর্ণ ২।৩ গ্রাম মাত্রায় আধ চামচ ঘি ও সিকি কাপ আন্দাজ দুধ মিশিয়ে অথবা শুধু দুধ মিশিয়ে খেলে আরও ভাল হয়।

(১০) **মেচেতায়—** অর্জুন ছালের মিহি গুঁড়ো মধুর সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে ও দাগগুলি চলে যায়।

(১১) **পদ্মকাঁটায়—** অর্জুন ছাল টক ঘোলে ঘষে লাগাতে দিয়ে থাকেন প্রাচীন বৈদ্যরা।

(১২) **পুঁজস্রাবী ঘা (ক্ষত)—** অর্জুন ছালের ক্বাথে ধুয়ে, ঐ ছালেরই মিহি গুঁড়ো ঐ ঘায়ে ছড়িয়ে দিলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

(১৩) **ফোড়া—** অর্জুনের পাতা দিয়ে ঢাকা দিলে ওটা ফেটে যায়, তারপর ঐ পাতার রস দিলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

(১৪) **হাঁপানীতে** (Cardiac)—**অর্জুনের ফলের** শুষ্ক টুকরো ক'ল্‌কে ক'রে তামাকের মত ধোঁয়া টানলে হাঁপের টান ক'মে যায়; এটা ব'লেছেন আমার এক কবিরাজ বন্ধু।

(১৫) **হার্ণিয়া হ'লে—** ঐ ফল গ্রামাঞ্চলে কোমরে বেঁধে রাখে। এই রকম আরও অনেক টোট্‌কার ব্যবহার চলে আসছে।

অর্জুন গাছ নিয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণ বহু গবেষণা ক'রেছেন; কিন্তু আয়ুর্বেদ সংহিতার ফলশ্রুতিটি তাঁদের পদার্থ বিজ্ঞানে ও রসায়ন বিজ্ঞানে ধরা পড়েনি; কারণ দেহাভ্যন্তরে শারীর যন্ত্রের সক্রিয়তায় ভেষজ প্রয়োগের দ্বারা মুহুর্মুহু যে অবস্থান্তর ঘ'টতে পারে তেমন নিষ্ঠা নিয়ে বোধ হয় অগ্রসর হননি, তা ছাড়া দ্রব্যের মধ্যে প্রভাব নামক একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে, আভ্যন্তরিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে তার ক্রিয়াকারিত্ব; কিন্তু রোগোপশমেই প্রত্যক্ষ করা যায়, এটা পুনঃপুনঃ অভিনিবেশের সঙ্গে অভ্যাসের ফলে অত্যন্ত প্রকট হয়, তাই এসব ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বসূরিদের সিদ্ধান্তে এটা দ্রব্যের প্রভাব ব'লেই স্বীকৃত।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Crystalline compounds viz., arjunine, arjunetin. (b) Lactonic constituents. (c) Essential oil. (d) Tannin. (e) Reducing sugar. (f) Colouring matter.

রক্তচন্দন

যে সদন সেই ভবন আর যে নাশন সেই সাদন; এখানে শুধু একটি আকার (আ) জুড়ে দিলেই বিপত্তি ঘটে। কিন্তু অবসাদনের অর্থ হয় পরিষ্কার, এমনিভাবে শব্দ-সংকোচন, শব্দ-প্রসারণ করার মধ্যে আছে বর্ণবিন্যাসে ভাবান্তর সৃষ্টি, তাই প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি, ভারতীয় সংস্কৃতিতে বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে শব্দ যোজনাই তার অপূর্ব রূপসৃষ্টি। এর দ্বারা বাস্তব জগতের উদ্ভূত অনুভূত যে কোন মানসচিন্তার ও দ্রব্যের স্বরূপ প্রকাশ করার ধী-শক্তি এরই মধ্যে নিহিত করার রীতি। যেমন—আহার, প্রহার, বিহার, সংহার শব্দের দ্বারা বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করা হয়—এক একটি উপসর্গের (প্র—পরা প্রভৃতি) মাধ্যমে, তেমনি শব্দ-যোজনার আর একটি ভাষা 'প্রসাদন'। প্রসিদ্ধ দ্রব্য রক্তচন্দন—এটি শোণিতের প্রসাদন করে অর্থাৎ প্রসন্নতা আনে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক।

প্রয়োগের ক্ষেত্রে রক্তচন্দনের কার্যকারিতাই তার প্রসাদন, এখানে অবসাদন অর্থে প্রসার বা পরিষ্কার বা প্রসন্নতা আনা; রক্তচন্দনের ক্ষেত্রে এই বিশেষণটির প্রয়োগের গূঢ় তাৎপর্যই হ'লো—রক্তের দোষকে নিরসন ক'রে প্রসারিত করে।

আর্য-চিকিৎসাশাস্ত্রের চিন্তাধারা—

'যনুক্তি প্রাণিনাং প্রাণঃ শোণিতং হ্যনু বর্ত্ততে'

(চরক—চিকিৎসাস্থান)

অর্থাৎ প্রাণ হ'লো রক্তের অনুগামী, সেই রক্ত বিশুদ্ধ থাকলেই দেহের বল, বর্ণ ও স্বস্থতা বজায় থাকে। একেই বলে শোণিতের প্রসাদন। এই কার্যের সহায়কের অন্যতম বনৌষধি এই রক্তচন্দন। এটি বৈদিক ভেষজ হ'য়েও তবে পাশ্চাত্য (পাশ্চাতে আগত,

তাই পাশ্চাত্য) বলা যায়—এটি ঋক্, যজু ও সামে সন্ধান পাওয়া যায়নি। বেদত্রয়ের ঢের পরে অথর্ববেদের বৈদ্যক কল্পে এবং অন্যান্য কল্পেও এটির সন্ধান আছে, সেখানে বলা হয়েছে—

'কুসীদং যো নিষদনং পর্ণে বসতিসংকৃতা।
যোনিং ইং কিলাসং অথবক্ত—সনকথ জ্বলনম্॥

(বৈদ্যককল্প ১৩।৩৯।১৩০ সূক্ত)
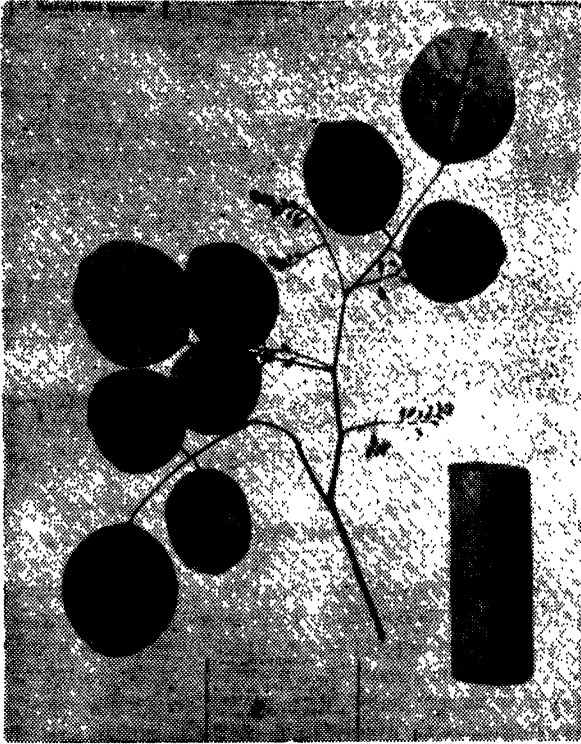
মহীধর ভাষ্যে বলা হয়েছে—

'কুসীদং=রক্তচন্দনং। বো যুষ্মাকং নিষদনং=স্থানং, যোনিং, কিলাসং =কুষ্ঠং, পর্ণে=পলাশে বসতিষ্কৃতা সনবথ জ্বলনং চ ইং=দাহাগ্নিং প্রশময়সি।'

এই ভাষ্যটির অর্থ হলো—যোনির ক্ষত ও কুষ্ঠ, গাত্রকুষ্ঠ এবং দাহের বসতিস্থলে

(চর্মে) রক্তচন্দন বসতি করুক। তার পত্রেও সর্বদা অগ্নির বাস রয়েছে অর্থাৎ তার পাতাগুলিও ঐসব স্থানের দাহ প্রশমন করে।

অথর্ববেদের এই ইঙ্গিতটুকু সম্বল ক'রে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রোগ-প্রশমনে, অলংকরণে ও দেহরঞ্জনে তাকে কাজে লাগিয়েছেন মনীষীগণ। চরক-সুশ্রুতাদিতে বৈদিক সূক্ত থেকে তাঁরা ইঙ্গিত পেয়েছিলেন তার নামকরণের মধ্যেই। বলা হয়েছে—কুসীদং অর্থাৎ কুৎসিত স্থানেতে তার কর্মক্ষেত্র এবং সে রোগ ক্ষেত্রটি কোথায় তারও একটা ইঙ্গিত বৈদিক সূক্তে আছে। অবশ্য এ সম্পর্কে আরও অনুশীলন ক'রে তাঁরা প্রয়োগ করেছেন—রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, কামজ উন্মাদ, কুষ্ঠ, বিসর্প ও বিভিন্ন রোগজ দাহের ক্ষেত্রে। এ ভিন্ন দেখা যায় যে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ রক্তচন্দনের তিলকের দ্বারা বশীকরণের কাজ করতেন। আর সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রেমিকার প্রথম প্রণয়ের চিঠি লেখার রীতি বর্ণনা করা আছে, সেটির অক্ষর পদ্মফুলের পাপ্‌ড়িতে রক্তচন্দনে লেখা হতো। বাল্মীকির রামায়ণে উল্লেখ আছে—"গ্রীষ্মকালে শ্রীরামচন্দ্রের দেহে রক্তচন্দন মাখানো হ'তো, দেহের দাহকে প্রশমন করার জন্যে"। এই দাহ প্রশমনের শীর্ষ দ্রব্য হিসাবেই কি সাধকগণ সূর্যার্ঘ্য দেওয়ার সময় রক্তচন্দনকে আবশ্যিক উপচার রূপে নির্ধারণ ক'রেছিলেন?

কালে কালে

নানা মুনির নানা মত—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি। অথর্ববেদে পাওয়া গেল রক্তচন্দন, আর প্রাক্‌-আর্য সংস্কৃতির অথবা দ্রাবিড় সভ্যতার কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে শ্বেতচন্দন। কত শত বৎসর পার হ'য়ে আসার পর ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকে এসে দেখা যাচ্ছে কেমন এক জগা-খিচুড়ী পাকানোর কাল। ভাবপ্রকাশকার ব'ললেন—শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, কালীয়ক (পীতচন্দন) এবং কুচন্দন (পত্তঙ্গ বা পত্রাঙ্গ); আর তার আগে পঞ্চদশ শতকের রাজনিঘণ্টু নামীয় সংগ্রহ গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে ছয় প্রকার চন্দনের নাম; কিন্তু পরম্পরায় পরিচিতির অভাবে আজ সব কয়টির পরিচিতি সম্ভব নয়।

কি পাওয়া যাচ্ছে—

১। রক্তচন্দন (Pterocarpus santalinus Linn.f.) ফ্যামিলি Leguminosae.

২। শ্বেতচন্দন (Santalum album Linn). ফ্যামিলি Santalaceae.

৩। কুচন্দন—এদেশে একে রক্তকম্বল বলে, এর নাম Adenanthera pavonina Linn. ফ্যামিলি Leguminosae. আলোচ্য রক্তচন্দনের গাছ ২৫।৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। কাঠের সারাংশই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। এই গাছ সাধারণতঃ পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্যের অঞ্চল বিশেষে। এতদঞ্চলে শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনেও একটি আছে।

আসল-নকল— বাজারে নকল রক্তচন্দনের কাঠ আমার নজরে পড়েছে, এটি অন্য গাছের সারাংশ, তবে সবই নকল একথা বলছি না। সম্ভব হলে সরকার পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কিনলে ও ভয়টা থাকে না। তা না হলে কোন বিশ্বস্ত দোকান থেকে সংগ্রহ করবেন।

শোণিতের প্রকৃতি কোন্‌ পথে—

প্রথমেই বলি—শোণিতেই প্রাণ, যদিও সর্বশরীরব্যাপী এর অবস্থানক্ষেত্র,তাহলেও

এর বহির্গমন তখনই হয়, যখন শারীরক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এই নির্গমনের পথ প্রধানতঃ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, লোমকূপ, মল ও মূত্রের দ্বার। যদিও পিত্ত-প্রাধান্যেই এই বিকৃতি ঘটে, তাহলেও ত্বক্ বিদীর্ণ হয়েই (চামড়া ফেটে) রক্ত আসতে পারে। এর মূল সূত্র হচ্ছে—ক্ষয়ধর্মী হলেই দাহ থাকে, এরই প্রতিষেধক এই রক্তচন্দন।

সক্রিয় ভূমিকায়—

(১) **প্রবল জ্বরের দাহে:—** অকৃত্রিম রক্তচন্দনের গুঁড়ো বা চেলি ১০।১২ গ্রাম এক পোয়া আন্দাজ গরম জলে ৩।৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে সেই জল অল্প মাত্রায় সমস্ত দিন খেলে দাহ ভাল হয়; গুঁড়োর অভাবে রক্তচন্দন ঘষে গরম জলে গুলে নিলেও চলে।

(২) **রক্ত প্রস্রাবের জ্বালায়:—** উপরিউক্ত পদ্ধতিতে রক্তচন্দনের জল তৈরী ক'রে ২।৩ বার খেলে জ্বালা কমে যায় ও রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

(৩) **রক্তপিত্তে:—** যেখানে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে, তার সঙ্গে শরীরের জ্বালাও আছে—এ ক্ষেত্রেও ঐ পদ্ধতিতে জল তৈরী ক'রে খাওয়ালে গায়ের জ্বালা ও রক্তবমন নিশ্চিত প্রশমিত হবে। বৃদ্ধ বৈদ্যেরা এরই সঙ্গে ৪।৫ গ্রাম পাতা সমেত শালপানি (Desmodium gangeticum) গাছ থেঁতো ক'রে ভিজিয়ে খেতে বলেন।

(৪) **অনিয়মিত রক্তস্রাবে:—** যাঁদের ঋতুধর্ম অনিয়মিত হয়—সে ক্ষেত্রে এই রক্তচন্দন উপরিউক্ত মাত্রায় প্রস্তুত ক'রে কিছুদিন খেলে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

(৫) **নাক-কানের রক্তস্রাবে:—** শরীরের এই দু'টি দ্বার দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকলে রক্তচন্দন সিদ্ধ বা ভিজানো জল খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

(৬) **চাঁদপোকা লাগায়:—** এটা সাধারণতঃ হাতের তালুতে হয়। এটাকে ক্ষুদ্র-কুষ্ঠের মধ্যে ধরা হয়ে থাকে—এ ক্ষেত্রেও রক্তচন্দনের কাঠ সিদ্ধ ক'রে সেই জল খেতে হয় এবং তার সঙ্গে রক্তচন্দন ঘষা হাতের তালুতে লাগাতে হয়।

(৭) **কর্ণমূলের শোথে** (Mumps):— এ রোগে আক্রান্ত হলে রক্তচন্দন ঘন ক'রে ঘষে কর্ণমূলে লাগাতে হয়, এর দ্বারা ব্যথা, ফুলো ও জ্বালা তিনটিই কমে যায়।

(৮) ঘামাচি শুকিয়ে চামড়া উঠে যাওয়ার মত সর্বাঙ্গে এক প্রকার রোগ হয়। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে একে 'নুনছাল ওঠা' রোগ বলে। এ ক্ষেত্রে রক্তচন্দন ঘষে গায়ে লাগালে ওটা সেরে যায়।

(৯) **দাদে** (Ringworm):— এ রোগের প্রথমাবস্থায় রক্তচন্দন ঘষে লাগালে প্রায় ক্ষেত্রেই সেরে যায়।

(১০) **বাতরক্তে:—** যেসব ক্ষেত্রে কোন আঘাত না লেগে গায়ে লাল দাগ হয়, অনেকের আবার এর সঙ্গে ওগুলিতে একটু ফুলো ও চুলকানি থাকে, সেখানে এই কাঠ ঘষে লাগালে এটা উপশম হয়।

(১১) **দাঁতের মাড়ির রক্ত পড়ায়:—** এই কাঠসিদ্ধ জল দিয়ে কুলকুচো করলে বন্ধ হয়। এমন-কি ঘুমুলে যাঁদের মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে, এর দ্বারা তাঁরাও নিষ্কৃতি পাবেন।

(১২) **মাথার যন্ত্রণায়:—** এই যন্ত্রণা যদি কোন বিশিষ্ট কারণে না হয়, তাহলে এই কাঠকে ঘষে কপালে লাগালে কমে যায়।

(১৩) **স্তনের ফোড়ায়** (একে আমরা ঠুনকোও বলি)ঃ— এ ক্ষেত্রে এই কাঠ ঘষা (ঘন ক'রে) দিনে-রাতে ৩।৪ বার লাগাতে হয়।

(১৪) **বিষ ফোড়ায়ঃ—** ঘষা রক্তচন্দন ও গোলমরিচ ঘষে ফোড়ায় লাগালে এক-দিনেই বিষুনি কেটে যায়।

(১৫) **দূষিত ঘায়ে** (ক্ষতে)ঃ— রক্তচন্দনের ক্বাথ দিয়ে ধুলে ক্ষতের দোষ কেটে যায়।

এ ভিন্ন কোন্ দোষের জন্য রক্ত সম্পর্কে কোন্ রোগের সৃষ্টি হয়েছে, বিচার করতে পারলে এর দ্বারা বহু রোগেরই উপশম হতে পারে।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Glycosides. (b) Colouring matter. (c) marsupium.

জল-জমানী (ছিলি হিণ্ড)

গ্রামীণ জীবনের শৈশবে খেলাপাতির একটা স্বতন্ত্র ঘর-সংসার পাতা হ'তো। সে ঘরে বন-ভোজনের উৎসব পর্বও হ'তো; আবার পুতুলের বিয়ের নিমন্ত্রণ এবং তার আয়োজনও হ'তো সেই ঘরে, সঙ্গে থাকতো ভূরিভোজন।

এই ভোজনের প্রধান উপাদান ও উপকরণ থাকতো খোলাম-কুচি ও চিতে পাতার লুচি, আর তরকারীর খোসার ব্যঞ্জন এবং দই; সেই দই বস্তুটি প্রস্তুত করা হ'তো 'দই-এ খই-এ' পাতার রসে অল্প জল মিশিয়ে: খাওয়ার সময় মুখে টক্ টক্ শব্দ ক'রে দই আস্বাদনের তৃপ্তির ধ্বনিও তোলা হ'তো।

এ স্মৃতি অনেকেরই মন থেকে আজও হয়তো স'রে যায়নি; এখন দেখছি, নাঃ, সে দই-এ খই-এ পাতার প্রয়োজন সে বয়সেই ফুরিয়ে যায়নি; তবে তার ধারা ব'দলেছে; ঠিক যেমন বাল্যের কর, খল, ঘট-এর অভ্যাস, সেই অভ্যাস পরে হয় সেইসব শব্দের ব্যাকরণের পদচ্ছেদ চিন্তা, আর তার অর্থবোধের বিশেষ প্রয়াসে।

তাই ব'লছিলাম, বাল্যের সেই খেলাঘরের দই-পাতা এখন ভৈষজ্যবিজ্ঞানের রস-বিচারে দাঁড়িয়েছে। আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু সেই দই-জমানো লতাটি।
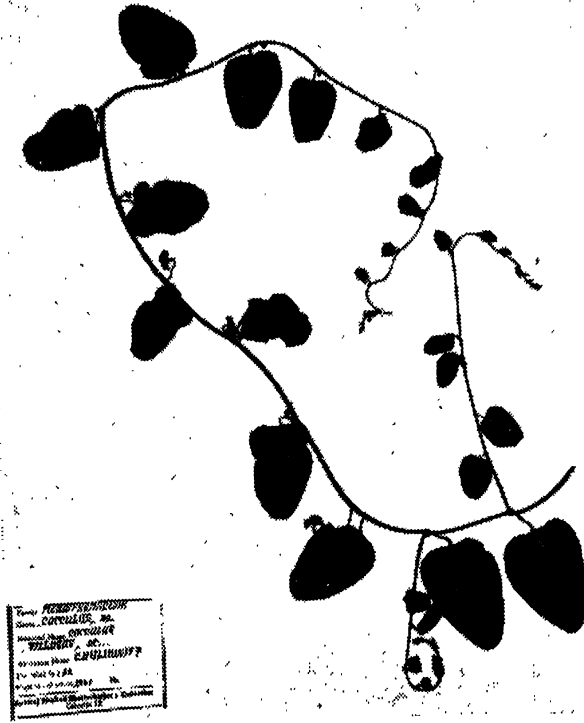
বহু প্রাচীনকালেই ছিল এই ভারতে বনৌষধির সার্থক (অর্থযুক্ত) নামকরণ করার রীতি। ওতেই থাকতো দ্রব্য পরিচিতির অন্যতম দিগ্‌দর্শন; কিন্তু আলোচ্য বনৌষধি দ্রব্যটির সন্ধান যদিও তেমনভাবে বৈদিক সংস্কৃতিতে সার্থকনামা ক'রে নমুনা পাওয়া যায়নি এবং সংহিতার যুগেও দেখছি সে অনুপস্থিত; তাই কতক অনুমানের ভরসায় বৈদিক ভৈষজ্যনামের মধ্যে সেটি হয়তো লুকিয়ে থাকলেও থাকতে পারে, যা আজও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, কারণ বৈদিক শব্দাভিধানকার যাস্ক ব'লেছেন—শব্দশক্তি ৩ প্রকার—(১) প্রত্যক্ষ, (২) পরোক্ষ, (৩) আজীবক, অর্থাৎ আজীবক হ'লে আমরা যেটাকে বলি প্রমুখাৎ (মুখে মুখে)। এই লতাটির নামই বা তেমনি সেই আজীবক

পর্যায়েই থাকতে পারে তার শব্দনাম; যেহেতু এই লতাগাছটির বৈদিক সংহিতা রচনার সময় তার কোন মৌলিক শব্দ বা সমার্থক শব্দেরও সমাবেশ করা হ'য়েছিলো কিনা দেখা যায় না।

ওষধির পঙ্‌ক্তি-ভুক্তি করণঃ— ষোড়শ শতকের আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে দেখা যায়, তৎকালের পরিচয়ে তার দেশীয় নাম 'ছিলিহিণ্ট'। এইটিই এখন সর্বভারতীয় বৈদ্যক সমাজের পরিচিত নাম। বাংলায় ছিলিহিণ্টের চলতি নাম দই-এ থই-এ বা হয়ের। কোন কোন অঞ্চলে দদৈয়া পাতা (মেদিনীপুর) বলে। এটি হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে 'বসন বেল', ছিরেটা, পাতালা গরুড়ী, ফরিদ বুটি, জল-জমানী ইত্যাদি নামে পরিচিত; এভিন্ন প্রদেশান্তরে তার আরও নাম আছে; তবে বোটানিক্যাল নাম Cocculus hirsutus (Linn.) Diels. এবং Menispermaceae ফ্যামিলীভুক্ত। সমগ্র ভারতবর্ষে এর ২০টি প্রজাতি আছে; এভিন্ন সিংহল, পেগু, দক্ষিণ চীন ও আফ্রিকার উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে এই জংলা লতাগাছটির সন্ধান মেলে। এগুলি প্রধানতঃ জন্মে উষ্ণপ্রধান অথবা নাতি-শীতোষ্ণ অঞ্চলে। ভারতের গ্রামে গেলে একে চিনতে কষ্ট হয় না, ঠাকুমা থেকে নাতনী পর্যন্ত সকলেই এর সঙ্গে পরিচিত। আর আপনিও পরীক্ষা ক'রে চিনতে পারবেন; এর ৩।৪টি পাতা অল্প জলে রগড়ালে কয়েক মিনিটের মধ্যেই জলটি জমে দই-এর আকার নেয়।

গ্রন্থোক্ত পরিচিতি ও প্রকৃতি পরিচয়

আয়ুর্বেদিক গ্রন্থের (ভাবপ্রকাশ) শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

ছিলিহিণ্টঃ মহামূলঃ পাতালগরুড়াহ্বয়ঃ।
ছিলিহিণ্টঃ পরং বৃষ্যঃ দাহঘ্নঃ পবনাপহঃ॥

এই শ্লোকটির দুটি দিক আছে—একটি হচ্ছে তার নাম আর অন্যটি হ'চ্ছে তার ভৈষজ্য শক্তি। নামগুলিতে রয়েছে মহামূল ও পাতালগরুড় দুটি সংজ্ঞা। এটি প্রধানভাবে বৃষ্যগুণ সম্পন্ন (Rejuvenative) এবং সে কফ ও বায়ুকে প্রশমিত করে।

রোগ প্রতিকারে

(১) এর প্রধান কাজ urinary system-এর উপর—প্রস্রাবের সময়, যেকোন কারণেই হোক, যদি জ্বালা ও জ্বালাবোধ হয়, সেক্ষেত্রে ৩।৪ গ্রাম কাঁচা পাতাকে থেঁতো ক'রে আন্দাজ আধ পোয়া জলে সেটাকে চট্‌কে ছেঁকে অল্প চিনি দিয়ে সকালে বা বিকালে খেলে জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না; এটা গনোরিয়াকেও উপশমিত করে। নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা চলে।

(২) প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে কিছু ক্ষরিত হতে থাকলে (লালামেহ বা শুক্রমেহ রোগে—spermatorrhoea) এর পাতা উপরিউক্ত নিয়মে সরবৎ ক'রে ব্যবহার করলে অপূর্ব কাজ পাওয়া যায়। তবে ব্যবহারবিধি সহজ করতে গেলে এটাকে শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে ৬ বা ৮ গ্রেণ (৩।৪ রতি) মাত্রায় সকালে বা বৈকালে সুবিধে মত সময়ে একবার দুধ বা জল দিয়ে খেতে হয়; এটাতে দাস্তও ভাল পরিষ্কার হয়।

(৩) **স্বপ্নদোষেঃ—** এই পাতার সরবৎ বা গুঁড়োর সঙ্গে ৪।৫ গ্রেণ কাবাবচিনির

গ‍ুঁড়ো বা ২।১ দানা কপ‍্‍র মিশিয়ে দ‍ুধের সঙ্গে খেলে এটার হাত থেকে একেবারে পরিত্রাণ পাওয়া না গেলেও সীমিত থাকে। এটা ব‍ৃদ্ধ বৈদ্যের অভিজ্ঞতা।

(৪) **শ‍ুক্র তারল্যে এবং ক্ষীণতায়ঃ—** প‍ূর্বোক্ত নিয়মে একট‍ু বেশীদিন খেতে হয়।

(৫) **রক্ত দ‍ুষ্টিতেঃ—** সালসার (Sarsaparilla) ন্যায় কাজ করে। এই গাছের ম‍ূল এবং অন্যান্য রক্ত-পরিষ্কারক ওষধির সঙ্গে গ্রহণ ক'রে থাকেন অন্যান্য প্রদেশের চিকিৎসকগণ। এ-ভিন্ন প‍ুরাতন বাত রোগের ক্ষেত্রেও এই ম‍ূলের উপযোগিতা আছে।

(৬) **শ‍ুষ্ক একজিমায়** (Dry Eczema) **বাহ্য প্রয়োগ** (External uses):— যে একজিমায় রস গড়ায় না, অথচ চুলকায়, সেক্ষেত্রে এটাকে জলে রগড়ে ঘন দই-এর মত ক'রে লাগিয়ে থাকেন কোন কোন প্রদেশের সাধারণ লোক।

(৭) **চোখের পার্শ্ব ক্ষতেঃ—** এই পাতার দই-এর ফোঁটা দিলে আরাম হয়।

(৮) **চুলকণায়ঃ—** এটা শিশ‍ুদের হলে এই পাতার দই গায়ে লাগালে চুলকণা কমে যায়, তবে দ‍ুপ‍ুরের দিকে (স্নানের প‍ূর্বে) লাগানো ভাল, নইলে দ‍ুর্বল শরীরে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

(৯) **বিষ-ফোড়ায়ঃ—** জ্বালা বা প্রদাহে এই পাতা বেটে ফোড়ার উপর প্রলেপ দিলে জ্বালা ও প্রদাহ দ‍ুয়েরই উপশম হয়; আবার কোন কোন অঞ্চলে আগ‍ুনে পোড়ায় এটার দই লাগিয়ে থাকেন সাময়িক জ্বালা নিব‍ৃত্তির জন্য, কারণ ও ক্ষেত্রে শৈত্য প্রয়োগ যেমনি নিষিদ্ধ তেমনি উষ্ণবীর্য, শীতবিপাক স্নেহ ভিন্ন অন্য কিছ‍ু প্রয়োগও ঠিক নয়।

(১০) **জিহ্বা ক্ষতেঃ—** এই গাছের ম‍ূলটা ঘষে অথবা ম‍ূল বেটে ঘিয়ের সঙ্গে পাক ক'রে জিভে লাগালে ক্ষত সেরে যায়। এটা ব্যবহার করতেন কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব‍ৃদ্ধ বৈদ্যগণ। অবশ্য এইসব লৌকিক ব্যবহারের কয়েকটির সংগ্রহকার ১৯ শতকে ভারতে আগত পাশ্চাত্য গবেষকব‍ৃন্দ।

(১১) **নব্য বৈজ্ঞানিকের সমীক্ষাঃ—** বিংশ শতকে এই লতাগাছটির ভৈষজ্যগ‍ুণ সম্পর্কে তাঁরা লিখলেন— Sedative, Hypotensive, Bradycardiac cardiotonic and Spasmolytic. এই ভেষজটিতে হয়তো এরকম বহ‍ু উপযোগিতা এখনো আমাদের অজানা র'য়ে গিয়েছে; কারণ কোন শব্দের অলক্ষ্য স্পর্শে ব‍ৃক্ষের পাতার ন‍ৃত্য এবং পাতার রস বহির্বায়‍ুর সংস্পর্শে এলে ঘন হ'য়ে যাওয়ার মৌলিক কারণ কি (যদিও প্রত্যক্ষ)—এসব তথ্যের পাঠ অদ্যাবধি আমরা আমাদের আয়‍ুর্বেদের সংগ্রহ গ্রন্থে এমন কি হাতের লেখা কোনও ঘরোয়া প‍ুঁথিপত্রের আলোচনার স‍ূত্রে পাই শিশ‍ুদের খেলাঘরের একটি উপাদান নিয়েই। ভাবতেই পারি না প্রকৃতির খেলাঘরে এই রকম শত সহস্র উপাদান পড়ে রয়েছে—যা আজও আমাদের কাছে সম্প‍ূর্ণ উপেক্ষিত এবং অনাদ‍ৃত। তাদের দিকে দ‍ৃষ্টি দিয়েই তো একদিন এই ভারতের ঋষিগণ জনকল্যাণে তাদিকে চিহ্নিত করেছেন এবং ব্যবহার করার রীতিও জানিয়েছেন।

এ দেশের অধিকাংশ মান‍ুষ অল্পবিত্ত সমাজের, তাঁরা অধিক ব্যয়ে চিকিৎসা করাতে অসমর্থ, কিন্তু ভারতের প্রতিটি বন সম্পদকে যদি চিকিৎসার উপযোগী ক'রে নেওয়া যায়, তাতে সব লতাপাতার মধ্যেই যে বিশেষ ভৈষজ্যশক্তি নিহিত রয়েছে তেমন পরিচয়ের সঙ্গে আমাদের শরীর ও মনের অনেক ব্যাধিরই স‍ুষ্ঠ‍ু চিকিৎসা করা যাবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের স্বীকৃতিটা প‍ূর্বে না রেখে ওকে পরবর্তীকালের সমর্থক ব'লেই গণ্য করা হোক না—সেই রীতিই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির প‍ুনর‍ুজ্জীবন।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz., coclaurine, trilobine, isotrilobine, menisarine, tetraadrine. (b) Quaternery base viz. cocsarnine, 10-ethoxy-1, 2, 9-trimethoxyaporphine. (c) Alkaloid glycosides. (d) Sterols.

মদয়ন্তিকা

প্রসাধন ও লাবণ্য এ দুটি শব্দ এক কথায় ব'লতে গেলে ঠিক যেন দেহ আর ক্ষুধা; একটি থাকলেই অপরটি থাকবে; তবুও প্রশ্ন ওঠে—মানুষের লাবণ্য তো ও ক্ষেত্রে সহজাত হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্তু তবুও যে দেহে সেটির আকর্ষক রূপ দেখা দেয় না, সে ক্ষেত্রে তাকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন তো আছে; এ ক্ষেত্রে তার সম্পূরকই বা কি, সেই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ এসেছে প্রসাধন।

সর্বকালে সবার আগে এ প্রয়োজন অনুভব করেন মায়েরা, তাই শ্রেষ্ঠ সুন্দরীও তার প্রকৃতিদত্ত লাবণ্যকে ধ'রে রাখতে কিংবা তাকে আরও নিখুঁত ক'রে তুলতে হাত বাড়িয়েছেন প্রসাধনের দিকে; তবে যুগে যুগে তার রকমফের হ'য়েছে—এসেছে পরিবর্তিত রুচি ও বৈচিত্র্য; এখনও সেই সুপ্রাচীন যুগের বাস্তব সাক্ষী হ'য়ে রয়েছে আলোচ্য এই বনজ উদ্ভিদটি।

প্রমাণ কোথায়? শুক্ল যজুর্বেদের ১২।৬৫ সূক্তের মহীধর যে ভাষ্য ক'রেছেন—তার অনুবাদ হ'লো—ওগো মেন্ধে (মদয়ন্তিকা), তুমি আমার শরীরের দুটি বাহু, মণিবন্ধ ও অঙ্গুলিকে সাজিয়ে দাও; আমার প্রিয়তম আলিঙ্গন ক'রে সুখী হবে;

তোমার পাতাগুলির রস আমার গোপন অঙ্গকে ক্লেদমুক্ত ও দৃঢ় ক'রবে।

মূল সূক্তটি হ'লো—

> "মেন্ধে ত্বা জ্যোতিষ্মতী মদয়ন্তিকা বাহু শেলেষোসি কল্পাভ্যাং ভগং অভিসংবিশতু ইন্দ্রইব অঙ্গযোনিং শারদাবৃতু ক্লিপ্ত ভগা দৃষইব মেঢ্রম্॥

পরবর্তী অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৩য় মণ্ডলের ২২ সূক্ত ও ভিষক্‌কল্পের ৪র্থ মণ্ডলের ৩১৭ সূক্তে সেই একই কথার প্রতিধ্বনি।

সংহিতার কালে

এই বৈদিক তথ্যকে উপজীব্য ক'রে তার শব্দবিন্যাস ও ভেষজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারকে মানবকল্যাণে কাজে লাগানো হ'য়েছে।

নামকরণের তাৎপর্য— মদ্ ধাতুর অর্থ গর্ব ও হর্ষ। এ দুটিকে দান ক'রতে পারে ব'লেই এর রূঢ়ী নাম মদয়ন্তিকা। এর ফুলের মৃদু গন্ধও মত্ততা আনে।

নামের হেরফের— মেন্ধ্ থেকে মেন্ধিকা, মদয়ন্তিকা, মেহেদি, মেদি; এইভাবে উচ্চারণদোষে ভ্রষ্ট শব্দের জন্যই এটা এসেছে। এ ভিন্ন তার আর একটি নাম গিরি-মল্লিকা বা বনমল্লিকা। সুশ্রুত সংহিতায় তাকে বলা হ'য়েছে 'নখররঞ্জিকা'—তারপর বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তার নামের পার্থক্য তো আছেই। এটির বোটানিক্যাল্ নাম Lawsonia inermis Linn. ফ্যামিলি Lythraceae. সর্বজন পরিচিত এই গাছটিকে সাধারণতঃ বেড়ার ধারে লাগানো হয়। ঔষধার্থে ব্যবহার করা হয় তার ফল, ফুল, পাতা ও মূল।

গুণপনা

জণ্ডিস্ বা কামলা রোগে—আঙ্গুলের মত মোটা মেদি গাছের মূল (কাঁচ হ'লে ভাল হয়) অর্ধকুট্টিত (আধকুটা) আতপচাল-ধোয়া জল দিয়ে ঘ'ষে (চন্দন পাটায় ঘ'ষলে ভাল হয়) ২ চা-চামচ আন্দাজ নিয়ে ৮।১০ চামচ ওই চাল-ধোয়া জলে মিশিয়ে সকালে ও বৈকালে দুইবার খেতে হয়। এইভাবে ৪।৫ দিন খেলে আরোগ্য হয়। এই টোট্‌কা ঔষধটি খাওয়ার কালে ডাবের জল বা আখের রস (ইক্ষুরস) খেলে ভাল কাজ হয়। এটি উড়িষ্যার একটি সিদ্ধফল টোট্‌কা ঔষধ। এটি কিন্তু পূর্ণবয়স্কের মাত্রা দেওয়া হ'লো।

(১) **শুক্রমেহ রোগে—** মেদি পাতার রস এক চামচ দিনে দুইবার জল বা দুধ এবং তার সঙ্গে একটু চিনি মিশিয়ে খেলে ১ সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

(২) **শ্বেতপ্রদরে—** উপরিউক্ত নিয়মে ব্যবহার ক'রলেও উপশম হয়। এর দ্বারা যদি কোষ্ঠকাঠিন্য আসে তবে কোষ্ঠ পরিষ্কারক—যেমন ঈসবগুলের ভূষি খাওয়া ভাল।

(৩) **নখরঞ্জিকায়—** এই গাছের পাতার রস নখে লাগালে চোখ ও চুল ভাল থাকে। এ কথাটা আবহমান কাল প্রচলিত। দ্বিতীয় কথা—এটা তো সেই আমলের 'নেল পালিশ।'

(৪) **হিমোগ্লোবিন্—** শরীরে রক্তকণিকা ক'মে গিয়েছে না ঠিকই আছে, এটা বিচার করেন মেদি পাতার রস হাতের তালুতে লাগিয়ে; হিমোগ্লোবিন্ যদি ভালই থাকে তা হ'লে রঙটা লাল্‌চে আভা দিকে থাকে; নইলে নয়। এটি এখনও রাজস্থানের প্রাচীনপন্থী বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত।

(৫) **কাঁধের ব্যথায়—** মেদি পাতার রস ও সরষের তেল মিশিয়ে ঘাড়ে মালিশ ক'রলে ব্যথা ক'মে যায়। এমনকি গরুর ঘাড়ে ব্যথা হ'লে এই গাছের পাতা বেটে গরম ক'রে লাগিয়ে থাকেন দেশগাঁয়ের লোক। অনেকে এর সঙ্গে একটু গোবর মিশিয়ে দিয়ে থাকেন।

(৬) **নখকুনি ও হাত-পায়ের হাজায়—** এই পাতার ক্বাথ একটু ঘন ক'রে দিনে দু'বার লাগাতে হয়। অনেকে এর সঙ্গে একটু টাট্‌কা গোবর মিশিয়ে ব্যবহার করেন।

(৭) **চুল উঠে যাওয়া ও পাকায়**— হরীতকী ১টি ও মেদিপাতা ১ তোলা মত একটু থে'তো করে আধ পোয়া জলে সিদ্ধ ক'রে আধ ছটাক মত থাকতে নামিয়ে ছে'কে নিয়ে ঠাণ্ডা হ'লে সপ্তাহে ২ দিন মাথায় লাগাতে দিয়ে থাকেন ইউনানি চিকিৎসক সম্প্রদায়। আমি মনে করি এর সংগে কেশুর্তের পাতা (যার চলতি নাম কেশুত্) (Eclipta alba) ২।১ তোলা ক্বাথ করার সময় ওর সংগে দিলে আরও ভাল হয়।

(৮) **শ্বেতপ্রদরে** (Leucorrhoea) দুই তোলার মত (২৫ গ্রাম) মেদিপাতা সিদ্ধ ক'রে সেই জলে উত্তরবস্তি দিলে (ডুস্ দেওয়া) সাদাস্রাব ও অভ্যন্তরের চুলকানি (ltching) প্রশমিত হয়। তার সংগে অনেকে ঐ পাতার রস দিয়ে তৈরী তেলে গজ বা তুলো ভিজিয়ে **পিচু ধারণ** (Plugging procedure) ক'রতে দিয়ে থাকেন; এর দ্বারা (এই পদ্ধতিতে ব্যবহারে) স্রাব বন্ধ হয় এবং অভ্যন্তরভাগের রোগও আরোগ্য হয়; অধিকন্তু যোনির শিথিলতাও অপেক্ষাকৃত কমে যায়।

(৯) **স্থানভ্রষ্ট জরায়ু** (Displacement of the uterus)—উপরিউক্ত পদ্ধতিতে প্রয়োগ ক'রলে ওটির অসুবিধাও ক'মে যায়।

(১০) **হাত-পায়ের জ্বালায়**— টাট্‌কা পাতার রস হাতে-পায়ে লাগালে জ্বালা ক'মে যায়; এর সংগে পিত্তবিকৃতিও যাতে দূর হয় সেইমত ঔষধও ব্যবহার করা উচিত।

(১১) **বসন্ত রোগে**— পায়ের তলায় পাতা বাটার প্রলেপ দিলে চোখে গুটি বেরোয় না। দেশগাঁয়ের বসন্ত চিকিৎসকদের একটি প্রক্রিয়া।

(১২) **মরামাস ও খুষকি**— সে যেখানেই হোক না কেন, এই পাতার ক্বাথ লাগালে ক'মে যায়।

(১৩) **পায়োরিয়ায়**— পাতার ক্বাথে অল্প খয়ের মিশিয়ে দাঁতের গোড়ায় লাগাতে দিতেন বৃদ্ধ বৈদ্যরা; তবে দাঁতে দাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। সেটা অবশ্য কিছুদিন বাদে উঠে যায়।

(১৪) **মুখক্ষত ও গলক্ষতে**— পাতাসিদ্ধ জল মুখে খানিকক্ষণ রাখতে হয়, যাকে বলে কবল ধারণ করা; এর দ্বারা ওই দুটো সেরে যায়।

(১৫) **গাত্রদৌর্গন্ধ্যে**— গ্রীষ্মকালে যাঁদের ঘাম বেশী হ'য়ে গায়ে দুর্গন্ধ হয়— তাঁরা বেণামূল (Vetiveria zizanioides) ও মেদি পাতা সিদ্ধ জলে স্নান ক'রলে উপকার পাবেন।

(১৬) **নাড়ীব্রণে** (sinus)— মেদি পাতা ও নিসিন্দার (vitex nigundo) পাতা বেটে তিল তেলের সংগে পাক ক'রে ছে'কে নিয়ে, সেই তেল লাগালে অনেক ক্ষেত্রে সেরেও যায়। এসব বদ্যিবাড়ীর হাঁড়ির খবর।

(১৭) **কানের পুঁজে**— পাতার রস গরম ক'রে ২ ফোঁটা ক'রে কানে দিলে ৪।৫ দিনে পুঁজ পড়া বন্ধ হ'য়ে যায়; আবার অনেকে এই পাতার রস দিয়ে তৈরী তৈলও ব্যবহার ক'রতে দিয়ে থাকেন।

(১৮) **চোখ ওঠায়** (নেত্রাভিষ্যন্দে) অল্প কয়েকটা পাতা থে'তো ক'রে, গরমজলে ফেলে রেখে সেটা ছে'কে সেই জল চোখে ফোঁটা দিলে সেরে যায়। এমন কি যাঁদের চোখের কোণ থেকে পুঁজের মত প'ড়তে থাকে, এর দ্বারা সেটাও সেরে যাবে।

(১৯) **লোলচর্মে**— যাঁদের গায়ের বা মুখের চামড়া কু'চ্‌কে ঢিলে হ'য়ে বা ঝুলে গিয়েছে, তাঁরা এই পাতার রস দিয়ে তৈরী তৈল মাখলে (মুখের ক্ষেত্রে ঘৃতও মাখা যায়) অনেকটা স্বাভাবিক হবে।

(২০) **অনিদ্রায়**— মেদি ফুলের বালিশ ক'রে নবাব বাদশাদের ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা ক'রতেন ইউনানি চিকিৎসকগণ। এর ফুলে আছে লাইলাকের (আধুনিক এক-

প্রকার প্রসিদ্ধ গন্ধ) গন্ধ। এই মদয়ন্তিকার সার্থক নামটি উপলব্ধি ক'রে তাকে তাঁরা কাজে লাগিয়েছিলেন।

সর্বশেষে একটা কথা মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে—তাঁদের এই যে মদয়ন্তিকা নামকরণ এবং তার ফুলের গন্ধে নিদ্রা আনয়ন, এই কার্যকারণের অন্তরালে অবসাদগ্রস্ত করানোর ইঙ্গিত বহন করে নাকি? তাই প্রাচীনদের সমীক্ষালব্ধ জ্ঞানের ইঙ্গিতই এই নামকরণের পটভূমিকা।

চরকের বাস্তব সমীক্ষায় বলা যায়—গন্ধটি পার্থিব সত্ত্বায় সমৃদ্ধ—বায়ুবাহিত হ'য়ে গন্ধটি নাসারন্ধ্রের পথে মস্তিষ্কে উপস্থিত হয় এবং ইড়া পিঙ্গলাকে একত্রীভূত ক'রে সুষুম্নায় পোঁছে দেয়। তখনই হয় মন অন্তর্মুখী; সেটাই নিদ্রার পূর্বরূপ; আসে আস্তে আস্তে স্নায়ুতন্ত্রের অবসাদ, তারই বাস্তবরূপ তন্দ্রা।

আমাদের পূজোর্চনায় ধূপধুনো দেওয়ার রীতি; এই রীতিটির অন্তরালে সেই গন্ধ দ্বারা মনঃসন্নিবেশেরই আবেশসৃষ্টির উপকরণ দান।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Essential oil. (b) Glycoside. (c) Colouring matter viz. 2-hydroxyalphnaphthoquinone. (d) Other constituents viz. hennotannic acid and fatty alcohols.

অষ্টমূল

কোথায় মহারাষ্ট্র আর কোথায় উড়িষ্যা, কিন্তু হাঁপ, হাঁপ্‌পা, হাঁপ্‌কি এই কথাগুলি একটু এদিক-ওদিক পালটে সেই হাঁপানিকেই বোঝাতে বাংলার সঙ্গে একই সূত্রে যেন বয়ে চ'লেছে শব্দতরঙ্গে; অর্থাৎ হাঁপ কাস বোঝাতে একই ভাষায় সারা ভারতে ভাষান্তর ক'রতে হয় না। হয়তো এই রোগের কষ্টকে লঘু ক'রে দেখা যায় না। মানবদেহের ব্যাধির মধ্যে হাঁপানি এমন একটি রোগ, যেটা আকস্মিকভাবে প্রাণহারকও নয়, আবার হৃদ্‌রোগীর হাঁপ উঠলে প্রাণহারকও হয়, তবে এমনি সাধারণ অবস্থায় এটি বড়ই কষ্টদায়ক। একে দমন ক'রতে এ পর্যন্ত যত ঔষধ আবিষ্কৃত হ'য়েছে—সবগুলিই সাময়িক উপশমকারী ঔষধ বলা যেতে পারে; কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাময়ের সামর্থ্য কোন ঔষধের যে আছে, এ কথা কোন চিকিৎসকই স্বীকার করেন না।

ভারতেও স্মরণাতীত কাল থেকে বহু টোট্‌কা ঔষধের প্রচলন এবং এখনও আছে। টোট্‌কার দ্বারা সাময়িক রোগোপশম হ'য়ে বেশ কিছুদিন ভাল থাকতেও দেখা যায়। অবশ্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ পুনঃ পুনঃ হ'তে থাকে; কারণ রক্ত সঞ্চয়ের সামর্থ্য কম হয় সে বয়সে। অনেককে আবার উত্তরাধিকার সূত্রেও ঐ রোগে গ্রস্ত হ'তে দেখা যায়, তবে তার রূপ ও লক্ষণ বদলায়। যেমন দেখা যায়, কোন সন্তানের হাত ও পায়ের তলে অসম্ভব ঘাম হয়, সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে—এই লোকটির বংশে কারও হাঁপানি না হয় এক্‌জিমা আছে, কারণ মেদোবহ স্রোতের বাধাই রক্তদুষ্টি সৃষ্টি ক'রে এক্‌জিমা হয়—এটা বংশগত।

আবার শ্বাস ও কুষ্ঠ রোগের পক্ষে যেটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকে, সেটাও রক্তদুষ্টি থেকে আগত। এটি যে নিয়তই থাকবে, এমন কারণ নাও হ'তে পারে, যেহেতু মাতা-পিতার মত তাঁদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গেও সন্তানের জন্মকারণগুলি একীভূত হ'য়ে

সর্বদা নাও হ'তে পারে। এ সব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গিয়েছে—আলোচ্য বনৌষধিটির প্রয়োগের কোন উপযোগিতা নেই।

এখানে প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি—আয়ুর্বেদে কুষ্ঠ শব্দটির এক ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ দেখানো হ'য়েছে। দদ্রু (দাদ্) ও চুলকাণি এসব যেমন ক্ষুদ্রকুষ্ঠের মধ্যে, তেমনি এক্‌জিমাও সেই পর্যায়ে পড়ে, তাই রক্তদুষ্টির বাহ্যরূপই কুষ্ঠের অন্তর্গত।

আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে হিক্কা ও শ্বাস (হাঁপানি) প্রভৃতি রোগগুলির উৎপত্তির হেতুও একই। তবে এত বহুমুখী কারণে এই রোগাক্রমণের সম্ভাব্যতা থাকে, যা সাধারণ মানুষকে কোন না কোন দোষে দুষ্ট হ'তেই হয়।

মোটের উপর বিকৃত বায়ু ও শ্লেষ্মার ক্ষেত্রটি থাকবেই। তাছাড়া বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে সাধারণ কারণেও—যেমন ঋতু বিপর্যয়, দুর্বলাগ্নি ব্যক্তির শীতল জলে স্নান, পান, ভোজন, অবস্থান, নাসিকাপথে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, গুরুভার বহন, পথ পর্যটন প্রভৃতির দ্বারাও এ রোগ হ'তে পারে; কিন্তু এ ছাড়াও এই রোগ আর একটি কারণে আত্মপ্রকাশ করে; জন্মসূত্রে যাদের মধ্যে এই রক্তদুষ্টি বীজ শরীরে এসে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার ভিন্ন রোগের রূপেও রূপান্তরিত হ'য়ে হাঁপানি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুনরাক্রমণের হেতু কি, তা রোগী বুঝতে পারে না; সে ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্ত হ'চ্ছে—

'সর্ব্বত্র হি ক্রিয়াযোগো নিদান-পরিবর্জনম্'।

অর্থাৎ রোগের হেতু বর্জন ক'রলে বোঝা যায় রোগাক্রমণের হেতু কি এবং তা রোধের পথই বা কি। এ ক্ষেত্রে তারও মৌলিক কারণও থাকে সেই রক্তদুষ্টিতে। আবার অনেক-ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হেতু বর্জন ক'রেও রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না; কিন্তু আক্রান্ত হ'য়ে প'ড়লে তখন উপশমের পথটাই অগ্রে বিবেচ্য হ'য়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে বক্তব্য সেই নিয়ে। উপরিউক্ত বনৌষধিটি এমনি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলা যেতে পারে।

প্রথমেই ব'লে রাখি, বনৌষধিটি কিন্তু আমাদের বহু পরিচিত অনন্তমূল (Hemidesmus indicus) নয়। আয়ুর্বেদের যেসব প্রাচীন গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে 'অন্তমূল' নামীয় কোন ওষধির উল্লেখ দেখা যায় না; অবশ্য গ্রন্থোক্ত বহু উদ্ভিদের স্বরূপ-নির্ণয় (Identification) অদ্যাবধি করা এখনও সম্ভব হয়নি। আলোচ্য বনৌষধিটির বর্ণনা ও গুণ সম্পর্কে পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের সংগ্রহ গ্রন্থেই উল্লেখ দেখা যায়। এরকম বহু বনৌষধির লৌকিক ব্যবহার সংগ্রহ ক'রেই তাঁদের পদ্ধতিতে নামকরণের পর সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে। আমাদের দেশে এ কার্যে প্রধান-ভাবে ডঃ রক্সবর্গ (Dr. Roxbrough), জে. ডি. হুকার (J. D. Hooker), প্রেণ (Sir David Prain) প্রমুখ পাশ্চাত্য বহু মনীষীদের অবদান স্মরণীয়।

'অন্তমূল' নামটি কিভাবে হ'ল— এর উৎস সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় যে, এটি অপভ্রংশ শব্দ। যেমন "দেশলাই" শব্দটি দীপ শলাকার ভ্রষ্ট লগ্নে জন্মেছে; হিন্দী ভাষায় 'দীয়া-শলাই', তারপর সেটা 'দেশলাই'এ রূপান্তরিত হ'ল। সেইরকম মাদ্রাজের করমণ্ডল উপকূল এলাকায় এই গাছ 'অন্তমূল' নামে পরিচিত; অথাৎ অন্ত্রের (Intestine-এর) রোগ আমাশয়ে এই গাছের মূল ব্যবহৃত হতো। সেই নামটি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের সংগ্রহ-গ্রন্থে Unto mool নামে স্থান পেলো, তারপর হিন্দী ও বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে 'অন্তমূল' নামে পরিচিত হয়। হ'তে পারে এটি রোগমৌলিক ভাষা।

প্রাপ্তিস্থান ও পরিচিতি— এই লতাগাছটি অ্যাসক্লিপিয়াডেসি (Asclepia-daceae) ফ্যামিলিভুক্ত। সমগ্র পৃথিবীতে এর ৫০টি প্রজাতি (species) আছে। তার

মধ্যে ভারতবর্ষ ও তৎপার্শ্ববর্তী দেশে ২৩টি পাওয়া যায় (হুকার সাহেবের মতে)। তবে তাদের মধ্যে তিনটি প্রজাতিই বহুস্থানে দেখা যায়, অনন্তমূল তারই অন্যতম। এই গাছ ভারতের সর্বত্র অল্পবিস্তর আছে, বাংলায়ও অভাব নেই। এতদঞ্চলের গাছের পাতাগুলির আকৃতির বিভিন্নতা দেখা যায়, তবে আকারে অনেকটা মালতী ফুলের (Aganosma dichotoma) গাছের পাতার মত, আবার দেশ ভেদেও পাতাগুলির গঠনের তারতম্য হওয়াটা স্বাভাবিক। মাদ্রাজ অঞ্চলে যে গাছ জন্মে, তার পাতাগুলি পানের মত এবং বোঁটার দিক কাটা কাটা (Lobe)। (ছবিতে বড় পাতাটি লক্ষ্য করুন), আর নিচের পিঠ হয় রোমশ (tomentosh)। যদিও উভয় প্রদেশের পাতার আকৃতি-প্রকৃতিতে অসমতা বর্তমান, তথাপি বিশেষজ্ঞদের মতে গাছটির প্রজাতি একই। এটির
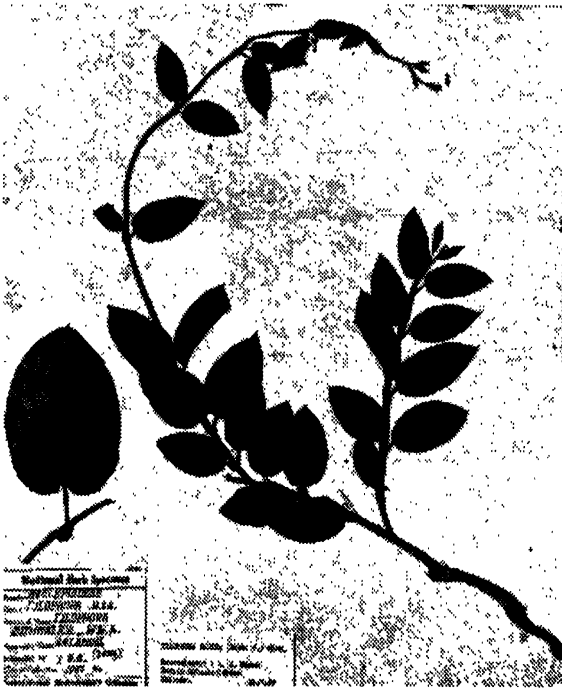
বর্তমান নাম Tylophora indica (Burm.f.) Merr. এই গাছটির নাম ছিল যথাক্রমে Tylophora asthmatica W & A ও Tylophora vomitoria. এই ওষধিটির মূল, পত্র ও লতাকে (stem) ঔষধার্থে ব্যবহার করা যায়। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের সংগ্রহ-গ্রন্থে এটাকে বলা হয়েছে—'ইণ্ডিয়ান ইপিকাকুহানা'। কারণ এমিটিনের সমধর্মী বস্তুও এই গাছের মূলে পাওয়া যায়। অবশ্য এই রসায়ন বিজ্ঞানটি আয়ুর্বেদের রস বিচারে আবিস্কৃত নয়।

হাঁপানির ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে

কাঁচাপাতা ছোট হলে একটা, আর বড় হলে আধ বা সিকি ভাগ নিয়ে প্রত্যহ সকালে খালিপেটে চিবিয়ে খেতে হয়; খাওয়ার আধ ঘণ্টার ভেতর অন্য কিছু খাওয়া উচিত নয়। এর ব্যবহারে দ্বিতীয় দিনেই উপকার বোঝা যায়, আর ৬।৭ দিনের মধ্যে বহুক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়। অন্য পদ্ধতিতেও নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে—পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে ২-৪ গ্রেণ মাত্রায় খেলেও একই ফল হয়। ক্ষেত্র-বিশেষে সকালে ও বিকালে ২ বার খেতে হয়। একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে, ব্রঙ্কিয়াল (Bronchial) হাঁপানিতেই এই পাতাটি বেশী উপকারী। তবে মাত্রা বেশী হলে বমনোদ্রেক বা বমন হতে পারে, অবশ্য সেজন্য শঙ্কার কোন কারণ নেই, এইজন্য যে, এর পাতার রস ২।৩ তোলা মাত্রায় নিয়ে কঙ্কন দেশে বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়। আর লতার গুঁড়োও রক্ত আমাশয়ে ওদেশে ব্যবহৃত হয়, একথা বলেছেন ডিমক (Dymock) । সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী কালে টাইলোফোরা অ্যাজমাটিকা বা ভোমিটোরিয়া তার গুণের নির্দেশকরূপে গাছটির নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। আলোচ্য লতাগাছটির বিভিন্ন অংশ দ্বারা কয়েকটি রোগের বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ প্রস্তুত করা সম্ভব হবে ব'লে মনে হয়।

বিহার প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলের গো-চিকিৎসকগণ গরুর হাঁপানি হ'লে এ গাছের লতার মালা ক'রে গরুর গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে থাকেন, এটা ওদেশের টোট্‌কা ঔষধ।

আগাছা ব'লে যেটিকে মনে করি, কালে দেখা যায় সেটি একটি মহৌষধি। এরকম ওষধি সম্ভার সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। এই জাতীয় বনৌষধিগুলি আমাদের এই গরীব দেশের আর্তের সেবায় নিয়োজিত হওয়া দরকার; তবে এ সম্পর্কে একটা মন্তব্য করা যায়—ভারতীয় বনৌষধির দ্রব্যগুণ বিচারের গ্রন্থমালায় এই অন্তমূলের রস, গুণ, বীর্য নিয়ে গবেষণা ক'রে প্রাচ্য রীতিতেই এর পরীক্ষালব্ধ ফলটুকু যাতে লিপিবদ্ধ করা যায়, সে বিষয়ে ভারতীয় বৈদ্যগণ যত্ন নিলে একটি মূল্যবান তথ্যের নবযোজনা করা যায়। জানি না সেদিনের কত দেরী!

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz., tylophorine, tylophorinine. (b) Essential oil. (c) Sterols. (d) Other basic constituents.

যমদূতিকা

"তাল, তেঁতুল, কুল—তিন করে বংশ নির্ম্মূল" খনার বচনের ধরণে এই প্রবাদটি আজও আছে; এবং আরও আছে একটি বিশেষ বয়সে অভিভাবকদের সাবধান বাণী, লবণ দিয়ে কাঁচা তেঁতুল খেতে দেখলেই তাঁরা সাবধান ক'রতেন, 'খাসনে, হাড়ের জ্বর টেনে বার ক'রবে'।

এরপর চিকিৎসকের জীবনে এসেছে দ্রব্যটির ভৈষজ্যগুণ সম্পর্কে একটি তথ্যের সন্ধান বা সংকেত, "প্রাণদা যমদূতিকা" অর্থাৎ যে যমের দূতী, সেই প্রাণরক্ষিণী; তাই কত প্রশ্ন জাগে—তেঁতুলকে ঘিরে কেন এত প্রবাদ?

এ ক্ষেত্রে বিচারে দেখা যায়, যদিও "বিচারে বিচারে বাড়ে অসারতা" সে ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণ্ পৃথক; কিন্তু দ্রব্যের বিচারে যে দ্রব্যের উৎকর্ষই প্রত্যক্ষ হয় এটা তো ঠিক।

বর্তমান সে সব তথ্য নিয়েই নিবন্ধে আলোচনা।

দেখা যায়—তাল, তেঁতুল ও কুল গাছের তলায় সাধারণতঃ কোন গাছই হ'তে চায় না; দ্বিতীয়তঃ, বৈদিক তথ্যের সমীক্ষায় বলা হ'য়েছে, তৃণবৃক্ষ তাল এবং তেঁতুল ও কুলবৃক্ষের পারিমাণ্ডলিক বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এই অর্থেই সেই বংশ-নির্ম্মূলের প্রবাদ।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে—যে ঋতুতে এটি জন্মে সেটি শরৎ; এ সময় কফপিত্তজ (পিত্ত-শ্লেষ্মা) জ্বরের জন্মই স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। তার উপর কাঁচা তেঁতুল ঐ কালধর্মী রোগগুলি কারণটির সহায়ক হয়; এই উদ্দেশ্যেই এই কথাই প্রচলিত। আর তৃতীয়টি হ'লো একটি প্রাচীন তথ্যের ইঙ্গিত—

> 'জীবনং জীবনং হন্তি প্রাণান্ হন্তি সমীরণঃ।
> কিমাশ্চর্য্যং ক্ষারভূমৌ প্রাণদা যমদূতিকা'॥

এই ইঙ্গিতটির মধ্যে দুটি জীবন শব্দের উল্লেখ, তবে অর্থ দুটি শ্লেষ ক'রেই প্রয়োগ করা হ'য়েছে।

প্রথমোক্তটির অর্থ জল আর দ্বিতীয়টির অর্থ প্রাণ, এই ক্ষারভূমির জল ও লবণাক্ত বায়ু প্রাণবায়ুকে বিনষ্ট করে।

আর এখানে যম শব্দেরও দুটি অর্থ, (১) সংযমশক্তি (প্রাণবায়ুকে যে সংযত করে সেই সংযমশক্তি)। (২) অম্লরস। সংযমের ক্ষেত্রে তার শক্তিক্রিয়া এবং বিশিষ্ট অম্লত্বের বীর্যক্রিয়া (ক্রিয়াকারিত্ব) আর দূতিকা হ'লো শক্তিধারিণী বা বাহক, তাই তেঁতুলের সার্থক নামকরণ "যমদূতিকা"।

এবার কেন সে প্রাণদা? এখানেও প্রাণ শব্দের দুটি অর্থ, (১) প্রাণবায়ু, (২) শারীর বল; তেঁতুল এই শারীর বল প্রদান ক'রে ব'লেই সে প্রাণদা। সেখানেই বিশেষ ইঙ্গিত আবহমণ্ডলের; কারণ দ্রব্যের ক্ষেত্র বিচারে আসতে গিয়েই আয়ুর্বেদ লবণ ও ক্ষারকে ভূমির একটি সমপর্যায়ের স্তরে ভুক্ত ক'রেছেন। লবণসমুদ্রবর্তী অঞ্চলকে ক্ষারভূমি বলা হয়; সেই ক্ষেত্রে লবণের বলহানিকর শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্যই অঞ্চল বিশেষে নিত্য তেঁতুলের ব্যবহার অপরিহার্য। তাই দক্ষিণীদের এটা নিত্য

আহার্যের অঙ্গ। ক্ষার এবং অম্লের যোগেই মধুর রস, আর মধুর রসই শারীর বল দেয়। খুবই বিস্ময়কর এ ধরণের রসায়নের আবিষ্কার; ক্ষারভূমিবাসীর পক্ষে যে জীবন-রক্ষিণী, তাই প্রাকৃতিক কারণেই সে যমদূতিকা; অতএব সে জীবনহন্তা হ'য়েই প্রাণ-রক্ষক। তাছাড়া এখানের বায়ুও এমন যে, ক্ষারাক্ত বায়ু অন্যত্র জীবনহানিকর হ'য়েও এখানে সে জীবনরক্ষক।

বৈদিক সমীক্ষা:—

> নক্তোষসা সমনসা দ্যূতং বিরূপে চিঞ্চে।
> ধাপয়েতে সমীচী রুক্মো অন্তর্বিভাতি দ্রবিণোদা॥
>
> অথর্ববেদ—বৈদ্যককল্প ৩।৪৫

এই সূক্তের মহীধর ভাষ্য করেছেন—

> 'চিঞ্চে ত্বং সমনসাং দ্যূতং নক্তোষসা, বিরূপে চ ধাপয়েতে, যথা দ্রবিণোদা দ্রবিণং ধনং দাতুর্মসি। অন্তঃ বিভাসি রুক্মো রোগদা যথা। সমীচী সম্যক অঞ্চনে সমন্বিতা ত্বং চিঞ্চা তিন্তিড়ী।'

হে চিঞ্চে, তুমি মনস্বীদিকেও দ্যূতক্রীড়ায় প্ররোচিত কর। রাত্রি ও উষাকাল পর্যন্ত প্রমত্ত রেখে কখনও ধনদান কর। আবার অন্তরে তোমার পাপ রোগের মত বিরূপও কর। রোগ অঞ্চন করারও সামর্থ্য তোমার আছে।

পরবর্তী সংহিতার যুগে তিন্তিড়ী সম্বন্ধে বেদের ঐ দুটি কথাকে উপকল্পনীয় অধ্যায়ে স্থান দিয়ে তার দোষগুণ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করা হয়েছে।

বৈদিক সমীক্ষার অন্তরালে:— ভারতে যে তিনটি প্রাচীন সংহিতা আছে, তাদের মধ্যে চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটই সর্বাগ্রে প্রামাণ্যের স্থান পায়—ঐ তিনটির মধ্যেই তেঁতুল তার বৈদিক আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রেখেছে। অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পে তেঁতুলকে 'চিঞ্চা' বলা হয়েছে (বর্তমানেও তাই বলা হয়); এই নামকরণটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই চিঞ্চা শব্দটির বিন্যাস করা হয়েছে—চিং অব্যক্ত শব্দং চিনোতি। ভোজনকালে চক্ চক্ টক্ টক্ শব্দ স্বভাবতঃই আসে বলেই কি এর নাম চিঞ্চা? বেদভাষ্যকার লিখলেন—

> 'সম্যক্ অঞ্চনে সমন্বিতা ত্বং চিঞ্চা'

এই অঞ্চন শব্দের অর্থ হলো—খুবলে খুবলে এবং চেঁছে চেঁছে ময়লা নিষ্কাশন করা। পরবর্তী আয়ুর্বেদ সংহিতার যুগে এই বৈদিক তথ্যটির সূত্র ধ'রেই তার দোষ-গুণ সম্পর্কে গবেষণা ক'রে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে; তাই ব'লে এটাকে নিয়ে আর গবেষণা করার কিছুই নেই, তা নয়। তার এই অঞ্চন শক্তিক্রিয়াই নূতন তথ্যের সন্ধানের সূত্র।

পরিচিতি:— ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই, বিশেষতঃ পূর্ব ভারতে এবং বর্মায় এ গাছ জন্মে; তবে কম-বেশী। মহীরুহও বলা চলে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে এর নাম ইম্‌লি; মনে হয় এটা সংস্কৃত অম্লিকা নামের অপভ্রষ্ট শব্দনাম।

সাধারণের চোখে তেঁতুল ৩ রকম—(১) টক বেশী শাঁস কম, (২) শাঁস বেশী টক কম, (৩) কাঁচায় লাল—এর রসও গোলাপী রঙের—একে পশ্চিমাঞ্চলে বলে 'লাল ইম্‌লি'; এদের বোটানিক্যাল্ নাম একই—Tamarindus indica Linn.

ব্যবহার্য অংশঃ— (১) পাতা, (২) গাছের ছাল (ত্বক্), (৩) কাঁচা ও পাকা ফলের শাঁস, (৪) পাকা ফলের খোসা, (৫) বীজের শাঁস ও বীজের খোসা।

পাতার কদর একালে ও সেকালেঃ— এই তেঁতুল পাতাকেই উপমার ক্ষেত্রে অমর ক'রে রেখে গিয়েছেন—সরস্বতীর বরপুত্র নদীয়ার বুনো রামনাথ তেঁতুল পাতার ঝোল খেয়ে। আজও ওড়িশার গ্রামাঞ্চলে গরীব লোকেরা কচিপাতা বেটে লংকা ও লবণ মিশিয়ে বড়ার মত ভেজে পান্তাভাত দিয়ে খেয়ে থাকে। এটা হয়তো বাহ্যতঃ চরম দারিদ্র্যের চিহ্ন মনে হতে পারে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক জগতে আজ সেটা নূতন তথ্যের সন্ধান দিচ্ছে। এ সম্পর্কেও গবেষণা হয়েছে, দেখা গিয়েছে—ছোট গাছের কচি পাতায় যথেষ্ট পরিমাণ 'এমিনো এসিড' (Amino acid) আছে। এভিন্ন সমাজ-কল্যাণে এর ফলে প্রস্তুত জৈব অম্লের উপযোগিতা প্রভূত—সেটা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা সকলেই জানেন; অবশ্য এ সম্পর্কে এখনও বিশেষ সমীক্ষা চলছে।

বিভিন্ন রোগ প্রতিকারে পাতার ব্যবহার

(১) **নব প্রতিশ্যায়েঃ—** (কাঁচা সর্দি, হাঁচি, নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়া) তেঁতুলের কাঁচা পাতাকে (৩।৪ গ্রাম) সিদ্ধ করে তার ঠাণ্ডা জল খেলে উপশম হয়।

(২) **রক্তস্রাবী অর্শরোগেঃ—** উপরিউক্ত মাত্রায় পাতা-সিদ্ধ জলের সরবৎ ক'রে খেলে কমে যায়। এছাড়া পুরানো তেঁতুল ভিজানো জল সেবনেও কাজ হয়।

(৩) **প্রস্রাবের জ্বালায়** (পিত্তবিকার জনিত)ঃ— এক চা-চামচ আন্দাজ পাতার রসের সরবৎ খেলে উপশম হয়।

(৪) **বসন্তেঃ—** ৩ গ্রাম তেঁতুল পাতার সমান হলুদ পাতা, তার অভাবে কাঁচা হলুদ একত্রে বেটে ছেঁকে নিয়ে সরবৎ ক'রে খাওয়ালে ঐ গুটিগুলি শীঘ্র পেকে যায়।

(৫) **আমাশায়** (পুরাতন)ঃ ৪।৫ গ্রাম পাতা সিদ্ধ ক'রে, চটকে, ছেঁকে সেই জলটিকে জিরে ফোড়নে সাঁতলে নিয়ে খেলে ২।৩ দিনের মধ্যে বহুদিনের পুরানো এবং পেটে সঞ্চিত আম (Mucus) বেরিয়ে যায়; অবশ্য নূতন আমাশার ক্ষেত্রেও টোট্‌কা চিকিৎসায় এটার ব্যবহার হয়ে থাকে।

(৬) **মচকানো ব্যথায়ঃ—** এই পাতা বেটে অল্প সোরা (যেটায় বাজি তৈরী হয়) মিশিয়ে সহ্যমত গরম ক'রে লাগালে ব্যথা ও ফুলা ১ দিনে দুইই কমে যায়।

(৭) **পুরাতন ক্ষতেঃ—** যে ক্ষত কিছুতেই ভাল হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে পাতাসিদ্ধ জলে ক্ষতস্থান ধুয়ে দিলে তাড়াতাড়ি আরোগ্য হয়।

(৮) **মুখের ক্ষতেঃ—** এর পাতা-সিদ্ধ জল মুখে খানিকক্ষণ রেখে ফেলে দিতে হয়। এইভাবে ৫।১০ মিনিট ক'রে ২।৩ দিন ব্যবহার করলে উপশম হয়; অনেক ক্ষেত্রে সেরেও যায়, তবে আভ্যন্তরিক কোন কারণে ক্ষত হলে সেখানে চিকিৎসার প্রয়োজন।

(৯) **বাতের ব্যথায়ঃ—** পায়ে বা হাঁটুতে ফুলা ও ব্যথার ক্ষেত্রে এই পাতা তালের তাড়িতে সিদ্ধ ক'রে একসঙ্গে বেটে নিয়ে অল্প গরম ক'রে প্রলেপ দিলে ব্যথা কমে যায়, অবশ্য ক্ষেত্র-বিশেষে। এ-ভিন্ন রোগ-প্রতিকারে বহু গ্রামীণ ঔষধ আমাদের এখনো অজানা রয়ে গিয়েছে। অবশ্য এই গাছের প্রতিটি অংশই বহু রোগ নিরাময় করে। এখানে কেবলমাত্র শারীরক্রিয়ার উপর তার বিশিষ্ট ক্রিয়াকারিত্ব শক্তি কি—সেইটা আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু।

বহু ভেষজের মধ্যে জৈব অম্ল কম-বেশী থাকলেও এই তেঁতুলের মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট শক্তি আছে—যেটিকে অঞ্জন শক্তি ও লেখনধর্মিত্ব বলেই আখ্যায়িত করা যায়

(এই হেতু শরীরে মেদ বৃদ্ধি হয় না)। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, একটু বয়স হলেই অনেকেরই রক্তে 'কোলেস্টেরল' বাড়তে থাকে এবং ধমনীগুলোর স্থিতিস্থাপকতা কমে যেতে থাকে, যাকে বলা হয় Arteriosclerosis; যার জন্য হাই ব্লাড-প্রেসার ও তৎ-পরবর্তী অবস্থা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যাঁরা নিত্য তেঁতুল সেবনে অভ্যস্ত—তাঁদের এটা হয় না কেন, আজ বৈজ্ঞানিকরাও সেটা চিন্তা করেছেন এবং ২।১ জন চিকিৎসকও একটু একটু পুরানো তেঁতুল সরবৎ ক'রে খাওয়ার ব্যবস্থাও দিচ্ছেন; অবশ্য সেটা কেবল বাস্তবকে লক্ষ্য ক'রে। আয়ুর্বেদের এই বস্তু-বিজ্ঞানের সহজ ব্যবহার রীতিটি উপলব্ধি করার মন আজও যদি আমাদের না হয়ে থাকে, তবে সেটা হবে আমাদের অতীতের বস্তু-বিজ্ঞানের প্রতি অজ্ঞতা-প্রকাশ।

এখন প্রসঙ্গত বলা হ'চ্ছে—প্রধানভাবে এই গাছের পাতা ছাড়াও এর অন্যান্য অংশের প্রচলিত ব্যবহার ও তার বিশিষ্ট শক্তি সম্পর্কে। এই গাছটির অন্যান্য অংশ কিভাবে সমাজ-কল্যাণের কাজে লাগানো হয়েছে, সেটাও আলোচ্য।

এটা অনেকের অজ্ঞাত নয় যে, আজও গ্রামবাংলার কোন কোন অঞ্চলে শারদোৎসবের বিজয়া দশমীর দিন দেবী প্রতিমার সম্মুখে পান্তা ভাত, কচু শাকের ঘণ্ট ও কাঁচা তেঁতুলের বা চালতার অম্বল রান্না ক'রে নিবেদন করা হয়; মনে করা খুবই সঙ্গত যে, এর মূলেও আছে সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থান ও জলবায়ুর গতি-প্রকৃতিকে লক্ষ্য করেই এই প্রচলন। প্রাচীনগণ লক্ষ্য করেছেন মানুষের দেহস্থিত স্বাভাবিক বায়ু, পিত্ত ও কফের যদি বিষম অবস্থান্তর (শরৎ ঋতুতে) ঘটে, তবে তার প্রতিষেধক হিসেবে সহজপ্রাপ্য তেঁতুলের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি। মাতৃতান্ত্রিক বঙ্গভূমিতে তাই দেবীকে নিবেদন ক'রে খাওয়ার বিধি অথবা নবান্ন গ্রহণের মত রীতি, হয়তো বা নিজে তৃপ্ত হই ব'লেই সর্বাগ্রে দেবতাকে নিবেদন করে আত্মতৃপ্তি। যাই হোক, এটা অবশ্য পরবর্তী-কালে সংস্কাররূপে পরিগণিত হয়েছে।

শীতপিত্তে (প্রচলিত নাম আমবাত):— শরীর চাকা চাকা হয়ে ফুলে ওঠে ও চুলকোয়, সেক্ষেত্রে তেঁতুলের শাঁস (কাঁচা হলে সিদ্ধ ক'রে) জল দিয়ে অল্প পাতলা ক'রে কোন তামার পাত্রে ৫।১০ মিনিট ঘষে নিয়ে তা শরীরে লাগালে ফুলো ও চুলকানি দুই-ই কমে যায়। এটা ওড়িশার গ্রামাঞ্চলে খুবই প্রচলিত; তবে এ রোগে দাস্ত-পরিষ্কার থাকা বিশেষ প্রয়োজন—তা না হলে রোগের মূলে আঘাত করা হয় না।

ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র

প্রচলিত বহুলক্ষেত্রে নবীনের কদর বেশী, বৃদ্ধ মানে বাতিল। ব্যতিক্রম কেবল পাঁচটিতে— ১। তেঁতুল, ২। কুল, ৩। ঘি (ঘৃত), ৪। চাকর, ৫। চাল। এইসব তত্ত্বকথা পূর্বসূরীদের দৃষ্টফলেরই বিদগ্ধ জ্ঞান বলতে হয়। তাই রোগ-প্রতিকারে পুরাতন তেঁতুলেরই ব্যবহার সর্বদা করা সমীচীন।

(১) পেটের বায়ু (ঊর্ধ্ব বা অধঃ) স্তম্ভিত হয়ে যাঁরা কষ্ট পান, তাঁরা অল্প (৩।৪ গ্রাম আন্দাজ) পুরানো তেঁতুল ১ কাপ জলে ভিজিয়ে রেখে চট্‌কে নিয়ে, ছেঁকে একটু চিনি বা লবণ মিশিয়ে অথবা শুধু ঐ জলটি রাত্রে শয়নের পূর্বে খেলে ঐ অসুবিধে অনেকেরই থাকে না।

(২) হাত-পা জ্বালার কষ্টে (শরৎ ও গ্রীষ্মকালে) তেঁতুল ভিজানো জল খেলে অনেকের কমে যায়। অবশ্য যাঁদের অম্লরোগ থাকে, তাঁদের ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার সমীচীন নয়।

(৩) কিড্‌নির দোষে হাত-পা বা মুখে একটু ফুলো ফুলো দেখায়, সেক্ষেত্রে একটু পুরানো তে'তুল ভিজানো জল খেলে উপশম হয়।

(৪) বুকে সর্দি বসে খুব কষ্ট হচ্ছে, এক্ষেত্রেও খেলে সর্দি উঠে যায়। তবে এর সংগে মাষকলাই ও পান সরিষার তৈলে ভেজে ঐ তৈল বুকে মালিশ করলে আরও সুবিধে হয়।

(৫) সিদ্ধির নেশা কাটাতে তে'তুলের সরবতের জুড়ি নেই। আমাশা হলে পুরানো তে'তুলের সরবৎ খাওয়া এটা সুপ্রাচীন টোট্‌কা হিসাবে চলে আসছে। তবে যাঁরা অম্লপিত্ত রোগগ্রস্ত, তাঁরা এটাকে সহ্যমত ব্যবহার করবেন।

(৬) লু লাগলে— কাঁচা তে'তুল আগুনে ঝলসে তার মজ্জা (মাড়ি) দিয়ে সরবৎ ক'রে খেলে এটাকে সামলে দেয়। যে সর্দিগর্মিতে হাত-পা অবশ হয়ে গেছে মনে হয়, সেক্ষেত্রে কাঁচা (পোড়া) তে'তুলের বা পুরানো তে'তুলের সরবৎ ব্যবহারে ঐ অসুবিধেটা চলে যায়। এতে লবণ দেওয়ার দরকার নেই।

বীজ-মাহাত্ম্য ঃ— বৈদিকযুগেও যে সেটা জানা ছিল না, তা নয়—তবে সেটা সংকেতে বলা আছে যে, এই বীজ 'রাত্রি থেকে ঊষাকাল পর্যন্ত প্রমোদিত করে রাখে।'

পরবর্তী সংহিতার কালে সেই সূক্তের অনুশীলনে তাঁরা জানতে পেরেছিলেন তে'তুল বীজের অন্তর্নিহিত শক্তির বল। এর আর একটি আশ্চর্য প্রাণধর্মিতা প্রত্যক্ষ— সেটি হ'ল যৌনশক্তিকে প্রাণবন্ত করা। প্রাক্‌-আর্যবংশীয়গণ আজও তে'তুলের বীজ বালিতে ভেজে খোসা ছাড়িয়ে মহুয়ার সংগে হালুয়া প্রস্তুত ক'রে খেয়ে থাকেন। টোট্‌কা বিধানে সিদ্ধহস্ত বৈদ্যরা বলেন—'এই কাঁই বিচি হ'ল যৌবনের মূল্যমান'; অবশ্য এই রেওয়াজটা কলকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ বৈদ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

শোনা কথা ঃ— তে'তুল বীজকে বার্লির মত রান্না ক'রে খাওয়াতে নাকি ডায়াবেটিস রোগ কমে গিয়েছে। এটা বৈজ্ঞানিকগণকে দেখতে অনুরোধ করি। তবে বীজের অঙ্কুর খাওয়ালে বহুমূত্রের উপশম হয়।

রূপরাগে ঃ— মাটির প্রতিমা রং করার জন্যে এই বীজ-সিদ্ধ ঘন জল বিশেষ উপযোগী। এ ভিন্ন দেশ-গাঁয়ে চপ, কাটলেট তৈরীতেও ডিম বা এরারুটের পরিবর্তে ব্যবহার হয়।

বীজের খোসা ঃ— অর্শের যন্ত্রণায় বীজের খোসা পুঁটলি ক'রে সে'ক দিলে উপশম হয়।

ফলের খোসা ঃ— তে'তুল ফলের শুকনো খোসা পুড়িয়ে তার ছাই (১-২ গ্রাম আন্দাজ) অম্লশূল ব্যথায় জলসহ অনেকে খেয়ে থাকেন, উপকারও হয়। টোট্‌কা বিধান এটা।

তে'তুল চটা (গাছের স্বভাব-মৃত ছাল) ঃ— এর পোড়া ছাই ৩ গ্রাম আন্দাজ জল-সহ খেলে বমন নিবারণ হয়।

তে'তুল এমনই একটি ভেষজ গাছ, যার সব অংশই কোন না কোন কাজে লাগে; এর কাঠ কাঁচা থাকলেও জ্বলে, শুধু তাই নয়—তৈল পেষাইয়ের ঘানি-গাছটি এই কাঠ ভিন্ন প্রস্তুত হয় না। কথায় বলে—'এই গাছটির সবই খায়, ছাইও না তার ফেলা যায়।'

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Tartaric acid. (b) Malic acid. (c) Polysaccharide. (d) Oxalic acid.

তাম্বুল

তাম্বুলবিলাস তখনই—যখন মুক্তোর চূণ আর কস্তুরী চুয়ার মশলা দিয়ে পান খেয়ে থাকেন নবাব বাদশারা এবং পান বিলাসিরা; আবার সমস্তদিন ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ ক'রে ২০।৩০টা পান যাঁদের খেতেই হয়—তাঁদের হয় সেটা নেশা, কিন্তু দু'বেলা খাওয়ার পর দু'টো পান খাওয়ার অভ্যাস—সেটা হলো স্বাস্থ্যসম্মত বিধি: তবে অসুস্থের জন্য নয়।

এই পানকে নিয়ে উপমাবহুল লোককথা পল্লীবাংলায় মুখে মুখে আজও ফেরে; যেমন—(১) ভালবাসার এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমনি চূণ; বেশী হ'লে পোড়ে গাল, কম হলে লাগে ঝাল। (২) ছাগলের মুখে প'ড়লো পান, পান বলে মোর গেল জান্! (৩) পান থেকে চূণ খসলেই বিপদ। (৪) পানের পিকে রেঙেছে নয়ান, বানরমুখে কি শোভে পান? (৫) পানের সজ্জা পানের ডাবর পান মশলার বাটি, কন্যারে পাঠালেম আমি করি পরিপাটি। অতএব এই পান তো আজকের নয়, সামাজিক মান্যতায় পানের সমাদর সবার আগে; কিন্তু এর আদিমান্যতা সেই বৈদিকযুগ থেকে চলে আসছে। এমনি সন্ধান নিতে গিয়ে দেখছি—ঋক্, যজু, সামবেদে এই লতাগাছটির নাম খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে খৃষ্টপূর্ব অন্ততঃ আড়াই/তিন হাজার বৎসরের অথর্ববেদেই এর সন্ধান পাওয়া যায়; সেখানে দেখা যায়, এটির বিভিন্নাংশ বিভিন্ন-গুণের আধার। এর বৈদিক নাম "সপ্তশিরা" (সব পানেই ৭টি প্রধান শিরা আছে), এই নামটির উল্লেখ আছে ৬৭ মণ্ডল ৫৩ সূক্তে।

"সপ্তশিরে পর্ণং প্রপত চোষেণ কিকিদীবিনা।
যক্ষ্মাং বিবাধধব বাতস্য ধ্রাজ্যা নশ্য নিহাকরা॥"

মহীধর ভাষ্য—

ত্বং সপ্তশিরা, তব পর্ণং কিকিদীবিনা=চোষেণ প্রপত। সপ্তশিরা নাগবল্লীতি। তব পর্ণং কিকিদীবিনা কফাবরুদ্ধ—কণ্ঠোথধ্বনেরনু—করণেন কিকিনা=কিকিদীবিঃ=শ্লেষ্মরোগঃ তেন=চোষেণ ব্যাকুলং কৃত্বা পিত্তরোগঃ বাতস্য ধ্রাজিঃ=বাতরোগঃ। তস্যাপিরুজঃ যক্ষ্মণঃ নিহাকা বেদনং। ত্বং নস্য সপ্তরোগান্ পর্ণতি ইতি পর্ণং বর্দ্ধয়তি চ।
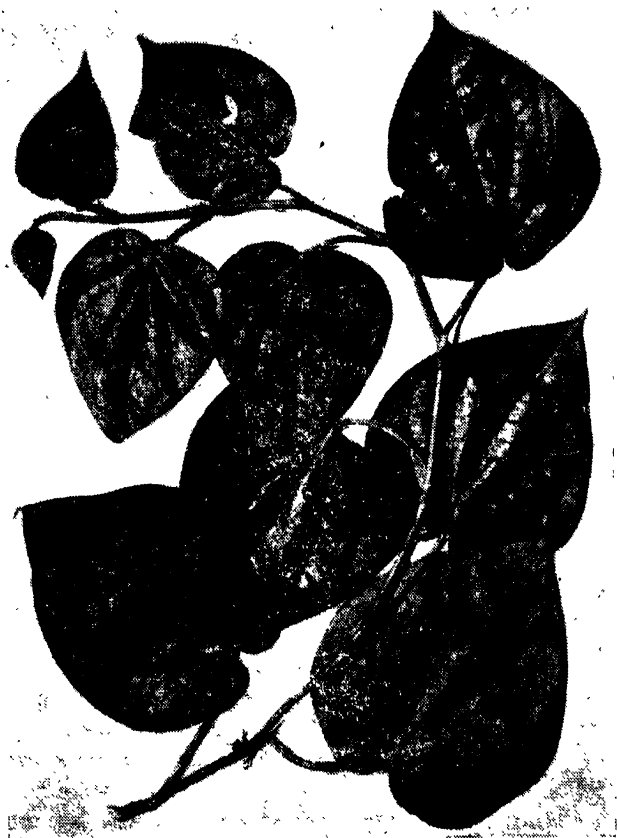
অনুবাদ— তুমি সপ্তশিরা। তুমি নাগবল্লী। কফরোগ জন্য কণ্ঠরোধ ও তজ্জন্য স্বরাবরোধ, জ্বর ও বাতরোগ দূর কর। তখন অতি কষ্টে কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে। তাতে ব্যাকুল কণ্ঠে নিঃশব্দের মত শোষ হয়, জ্বর ও বাতরোগ। তোমার পত্র সেইসব রোগ

দূর করে। তুমি যক্ষ্মা (জ্বর রোগেরও নাম যক্ষ্মা) দূর কর। তোমার ৭টি শিরা, সাতটি রোগকে হ্রাস-বৃদ্ধি করে। (একটি কথা এখানে ব'লে রাখি—এই কণ্ঠরোগ সম্পর্কে ভাষ্যকারের বর্ণনার সঙ্গে বর্তমান ডিপথিরিয়া রোগের লক্ষণের হুবহু মিল আছে।)

নাগবল্লীর বৈদিক সমীক্ষায় তার যতটুকু গুণপনা জানতে পারা যায়, তার পরবর্তী-কালে অনুশীলিত বনৌষধি-সম্বন্ধ সংহিতাগুলিকে রোগ-প্রতিকারার্থে তার বিশেষ কোন ব্যবহার দেখা যায় না; তবে চরকে কেবলমাত্র মাত্রাশিতীয় অধ্যায়ে এবং সুশ্রুতে আহারের পরবর্তী কৃত্যে পানের ব্যবহারের কথা বলা থাকলেও, মনে হয়, পরবর্তী চিকিৎসাজগতে সে যেন হারিয়ে গেছে, আর পানের আসর জমিয়েছে চেতনাহীন দ্রব্যের (নিরিন্দ্রিয়ম্ অচেতনম্) সাধক-সম্প্রদায়ের সাধিত রসগ্রন্থসমূহে; তাঁরা দেখেছেন—পারদ, গন্ধক প্রভৃতি প্রাণহীন দ্রব্যের ঔষধীর প্রাণ-সঞ্চারে পান একটি অপরিহার্য ওষধী। এই পানের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তাঁরা বহুরূপে দেখেছেন—সেটাও আজকের কথা নয়, খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতকের আরও আগের শতাব্দীরও পূর্বেকার কথা। এই সব সূত্রকে অবলম্বন ক'রে রসসাধক পূর্বাচার্যগণ যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, আমার বর্তমান আলোচ্য এই বল্লীটির উপর নিবন্ধ তার পটভূমিকাকে কেন্দ্র ক'রে।

জাতি ও গোষ্ঠী— সমগ্র ভারতে ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে বিভিন্ন স্বাদের ও গন্ধের বিভিন্ন প্রকার পান পাওয়া গেলেও, পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের মতে তারা সকলেই Piperaceae ফ্যামিলীভুক্ত, এর বোটানিক্যাল নাম Piper betle Linn.; কিন্তু আয়ুর্বেদ অনুবর্তীদের মতে বিভিন্ন প্রকার পানের গুণগত পার্থক্য অনেকদিন থেকেই রয়েছে।

এক নজরে পানের রসের দোষ-গুণ— (১) এটি বলকারকও যেমনি, বলহানিকরও তেমনি; অবশ্য ক্ষেত্র-বিশেষে। (২) নবপত্র (নূতন পাতা) শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে, পুরাতন পান শ্লেষ্মা দূর করে। (৩) পরিপাক শক্তি যেমন বৃদ্ধি করে, অপব্যবহারে তেমনি আবার অজীর্ণও সৃষ্টি করে। (৪) পাতার রস বিশেষ ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে বলাধানও করে, আবার শিরা (বোঁটা সমেত প্রধান শিরা) খেলে ইন্দ্রিয়ের বলহানিও করে। (৫) শরীরের চামড়ায় এর রস দাহ সৃষ্টি করে, আবার দগ্ধ চামড়ায় এর রস স্নিগ্ধতাও নিয়ে আসে। (৬) এর পাতার রস মুখের জড়তা ও অরুচি দূর করে, আবার এই পানের রস বাসি হলে ঠিক এইগুলিই বাড়িয়ে দেয়।

কোথায় কিভাবে কাজে লাগে— খাওয়ার পর একটি ক'রে পান খেলে মুখে যে লালা-নিঃসরণ হয়—তাই হয় হজমের সহায়ক, এই পর্যন্তই অনেকের জানা; কিন্তু আর একটি অন্তর্নিহিত শক্তি এর আছে—যেটি গ্রহণীনাড়ীর আকুঞ্চন-প্রসারণ শক্তি (peristoltic movement) বাড়িয়ে দেয়, আবার বেশী খেলেও এ কাজটি খুবই মন্দীভূত হয়। এটি নব্য বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা।

রোগ-প্রতিকারে

(১) পানের রোগ-নাশিনী শক্তি সম্পর্কে সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে—যেখানে শ্লেষ্মপ্রধান রোগ, সেখানেই তার প্রভাব বেশী; তাই রসতাত্ত্বিক আয়ুর্বেদজ্ঞগণ ঔষধের সহপানে পানের রস বেশী ব্যবহার করেন।

(২) দাঁতের মাড়ির দূষিত ক্ষতে পুঁজ জমতে থাকলে পানের রসের সঙ্গে অল্প জল মিশিয়ে কুলকুচি করলে ওখানে আর পুঁজ জমে না; ক্রমশঃ ক্ষত শুকিয়ে যায়।

(৩) পুরাতন দাদ বা চাপ্‌ড়া-চুলকানিতে পানের রস ঘষে দিলে কয়েক দিনেই ও অবস্থাটার অবসান হয়।

(৪) কানের পুঁজে এর রস গরম ক'রে ২।১ ফোঁটা কানে দেওয়ার বিধি গ্রামাঞ্চলে তো আছেই।

(৫) হাতে-পায়ে হাজায়— পানের রস অল্প গরম ক'রে রাত্রে লাগিয়ে রাখুন; উপশম হবে—তবে এটাও ঠিক যে, হেতুটা বর্জন না করলে সে তো আবার হবেই।

(৬) নখকুনির কষ্টে— পানের রস গরম ক'রে দিনে ৩।৪ বার নখের কোণে দিলে ব্যথা থেকে রেহাই হয়, তবে নখের ঐ বৃদ্ধিটুকু কাটতেই হয়।

(৭) ফোড়ায়— পানের পাতার সোজা পিঠে ঘি (পুরাতন হলে ভাল হয়) মাখিয়ে ফোড়ার উপর বসিয়ে দিলে ফোড়া পাকে ও ফাটে; আবার এইভাবে পানের উল্টোপিঠ ফোড়ায় বসালে ওটা পুঁজ টেনে বার ক'রে শুকিয়ে দেয়; (অবশ্য একটু গরম করে নিতে হয়)। এখানে আর একটা কথা বলে রাখি—পানের পাতায় পচন-নিবারক উদ্‌বায়ী তৈল আছে, যার জন্য ঐ ফোড়া বিসর্পিত হতে পারে না।

(৮) মাথায় উকুন হলে পানের পাতার রস মাথায় লাগিয়ে দেখুন—ওরা সবংশে চলে যাবে। (তবে ঝাল পান হলে ভাল হয়। এ পানের গঠন একটু মোটা হয়।)

(৯) গর্ভনিরোধ— পানের শিকড় বেটে খাওয়ালে ছেলেপুলে হয় না—একথা গ্রামাঞ্চলের মধ্যে কানাঘুষো শুনতাম, এখন দেখি বর্তমানের প্রামাণ্য গ্রন্থ Glossary of Indian Medicinal Plants-এ এ-কথা লেখা আছে। রোগ-প্রতিকারে এই পানের ব্যবহার আরও হয়তো অনেকের জানা আছে।

পান খাওয়া উচিত নয়— (১) রুক্ষ ও দুর্বল ব্যক্তির, (২) মূর্ছা রোগীর ও যার চোখ উঠেছে, (৩) রক্তপিত্তে, ক্ষয় ও যক্ষ্মা রোগীর, (৪) অতিরিক্ত নেশার পর।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, বর্তমানে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি নৈষ্কর্মাত্মক আত্মশ্লাঘার পরিচয় দেখা যায় যে, আমাদের আয়ুর্বেদে সব আছে, অতএব নূতন কিছু জানারও নেই, করারও নেই; হ্যাঁ, আছে সত্যি, কিন্তু আজ যে সেটা বাস্তবে হাতে-কলমে প্রমাণ করার সময় এসেছে।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Phenolic compounds viz. chavicol, hydroxychavicol. (b) Vitamin viz. ascorbic acid. (c) Enzymes. (d) Essential oil.

অগ্নিমন্থ

দাবাগ্নির বাস্তব অভিজ্ঞতা সকলের নেই, সেটা অনেকের কাছে অভিধানের শব্দও বলা যায়, কিন্তু পার্থিব বা ভেষজদ্রব্যকে মন্থন ক'রে যে আগুন জ্বালানো যায়, তার বাস্তবরূপ এখনও দেখা যায়। কারণ অদ্যাবধি মাদ্রাজের প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণরা মন্থন প্রণালীতে কাষ্ঠ ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নিসৃষ্টি ক'রতে পারেন। মন্থন প্রণালীটি তাঁদের বনৌষধির দুটি কাষ্ঠ দ্বারা; সুতরাং বিশেষ ধরণের একটি ভেষজের নাম যে অগ্নিমন্থ এটি অভ্রান্ত, অথবা অগ্নিমন্থ নামকরণের উৎসও এইখানেই। এ নাম কিন্তু ইদানীন্তন যুগের দেওয়া নয়, সেই বৈদিক যুগ থেকে এই নামেই এটির ব্যবহার চ'লে আসছে, সেখানে তার নাম দেওয়া হয়েছে "হবির্মন্থ"; এর আর একটি নাম 'অরণি'। এইজন্য বেদে অগ্নিমন্থ শব্দের বক্তব্যে হবির্মন্থ প্রয়োগ অর্থাৎ অগ্নিমন্থ কাঠটি আধার, আর তার আধেয় কাঠটি হয় শমী? তা ছাড়া এতে অরণি শব্দটিও যুক্ত করা যায়, সেটি তখন মাতৃসাদৃশ্যবাচক। আধার কাঠটির নাম অগ্নিমন্থ বা হবির্মন্থ। ওটিই অগ্নির যোনি, কিন্তু জনক নয়। অরণি শব্দটি সেখানে মন্থনক্রিয়া বাচক। মন্থনকালে দণ্ডটির নাম অরণি হয় না। আধার কাঠটির নামই তখন অরণি ('যাস্ক ১১।১৯।৩৪) সূক্ত ভাষ্য দ্রষ্টব্য—অথর্ববেদ'। আয়ুর্বেদিক সংহিতাগ্রন্থে এর আর একটি নাম গণিকারিকা, যাকে আমরা বাংলাদেশে চলতি কথায় গণিয়ারী বলে থাকি।

> 'হবির্মন্থ ওষধীষু সোমস্য শুষ্ম সুরেয়া সুতস্য রসস্তে জিন্ব যজমানং মদেন অশ্বিনৌ ইন্দ্রং অগ্নীয় জিন্ব।'

সূক্তটির মহীধর ভাষ্যে বলা হয়েছে—

> হবির্মন্থোসি, হবিষে মন্যতে অসৌ হবির্মন্থ হবিরিতি স্নেহরসঃ মজ্জাসু। পাবকারণিরসি অরণিকা পাবক এব ব্যতয়াৎ পাবকারণিঃ।

ত্বং ওষধেষু সোমস্য শুষ্ম যৎ বলং, যেন মদয়তি সুরয়া সহ সুতস্য
সোমস্য মদেন যজমানং অশ্বিনৌ ইন্দ্রং=অগ্নিং জিত্বা।

ভাষ্যটির অনুবাদ হ'ল—'তুমি হবির্মন্থ অর্থাৎ হবির জন্যই মন্থন। তুমি পাবকারণি, তুমি ওষধিদের মধ্যে সোমের বল বাড়িয়ে দাও। সেই বলের দ্বারা সুরা ও সোমের মদে যজমানের অগ্নিকে জয় করে। অশ্বিনীকুমারও তোমাকে প্রীত করেন।'
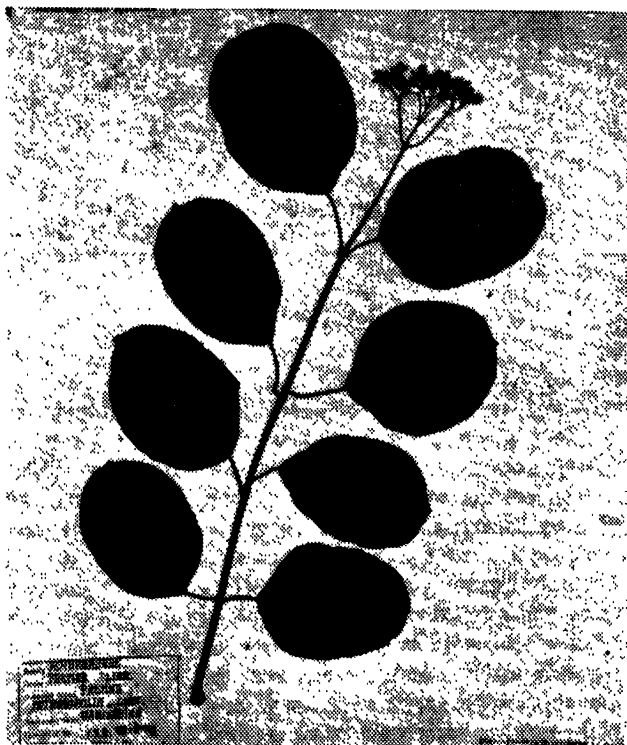
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু ইঙ্গিতই পাওয়া যায় বৈদিক তথ্যে। প্রথমতঃ হবির্মন্থ একটি নাম, কারণ হবি শব্দটি দু'টি অর্থ প্রকাশ করে— (১) ঘৃত (স্নেহ), (২) আমাদের শরীরের রস থেকে সৃষ্ট স্নেহ (মেদ ও মজ্জা ধাতু)। দ্বিতীয় হলো পাবকারণি—এই পাবক শব্দটি অগ্নির দ্যোতক আর অরণি শব্দটির বিন্যাসে দেখা যায়—ঋ গতৌ অনিচ্—ক। উনাদি প্রত্যয়ে সৃষ্ট। বৈদিক শব্দাভিধানকার যাস্ক লিখেছেন, অরণি দু'টি—একটি উত্তরারণি আর একটি অধরারণি। মন্থনে দু'টি কাঠ লাগবেই, যে কাঠটি আধার হবে অর্থাৎ যার উপর ঘর্ষণ করা হবে তার নাম অধরারণি, সেটাই কিন্তু অগ্নিযোনি, আর মন্থন কাজটির দণ্ডটি হবে অন্য কাঠ—সেখানে শমী কাঠের উল্লেখ। এই হবির্মন্থনের

আধার কাঠটিই যে অগ্নিগর্ভ—এইটাই ইঙ্গিত করা হলো।

সংহিতাকালের অনুশীলন— প্রকৃতির পার্থিব তেজ (অগ্নিক্রিয়া) সর্বত্রই বিদ্যমান, তবে কম-বেশী, এমন-কি জলের মধ্যেও; তা না থাকলে স্রোতের জল গরম হয় কি ক'রে! সেই রকম আমাদের শরীরে সৃষ্ট রস, রক্ত, মাংস ইত্যাদি সর্বপ্রকার ধাতুতেও অগ্নির ক্রিয়া ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান। বর্তমান বিজ্ঞানে বলা হয় 'মেটাবলিজম্।' এই অগ্নিবল কমে গেলেই আমাদের শরীর পোষণের মূল উপাদান যে রসাদি ধাতু সে হয় আমদোষে দুষ্ট অর্থাৎ অপক্ক দোষে দুষ্ট হলো, আবার বেড়ে গেলে অত্যগ্নিজনিত রোগ সৃষ্ট হয়, যাকে বলা যায় 'গোড়ায় গলদ হলো'। এর থেকে না আসে, এমন রোগ প্রায় নেই বললেই হয়।

পাশ্চাত্য মতে পরিচিতি— এটি Verbenaceae ফ্যামিলী ও Premna গণভুক্ত। ভারত ও তৎসন্নিহিত উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই গণের ৪০টি প্রজাতি (species) আছে। বৈদ্যক গ্রন্থে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভেদে দু'টি প্রজাতির ব্যবহার করেছেন। বৃহৎটির নাম Premna latifolia Roxb. ও ক্ষুদ্র প্রজাতিটির নাম Premna integrifolia Linn. বৃক্ষের আকারে স্থূলতা ও কৃশতা বর্তমান থাকাতে তাকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বলা হয়েছে। এই বৃক্ষটির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই সম্প্রদায়েরই স্বরূপ নির্ণয়ের ধারা একই বলা যেতে পারে, কারণ এই ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থের পাশ্চাত্য নাম পূর্বে ছিল Premna serratifolia, যেহেতু শৈশবাবস্থায় গাছের পাতাগুলির ধার করাতের মতো কাঁটা হয়; তারপর তার নামকরণ করা হলো Premna spinosa; এইহেতু গাছগুলি বড় হলে কাণ্ডের সরু ডালগুলি কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এই গাছটির নাম Premna integrifolia, এই অর্থে গাছ যখন পুষ্পিত হয়, তখন পাতাগুলির উপরের অংশ কাঁঠাল পাতার মত অখণ্ড হয়। আর প্রাচ্য মতে এই ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থের তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণের কথা বলা আছে— (১) 'তনুত্বচা'—তনু অর্থে কৃশ, ত্বচ (ত্বচা?) অর্থে ছাল। এই গাছের ছাল খুবই পাতলা হয়। (২) 'গন্ধপত্রা'—পাতায় এক বিশেষ ধরণের গন্ধ থাকে, যার জন্য, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে ডাল রান্নার সঙ্গে ঐ পাতা ব্যবহার করা হয়। (৩) গন্ধমূলা—এই গাছটির মূলের ছালে বেশ মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায় কিন্তু স্বাদে তিক্ত। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এই দুইটি প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য—পত্রে, ত্বকে, গন্ধে এবং আকারে।

প্রাপ্তিস্থান— সর্বত্র অল্প-বিস্তর পাওয়া গেলেও সাধারণতঃ নদীমাতৃক অঞ্চলে ও সমুদ্রোপকূলবর্তী দেশে বেশী পাওয়া যায়।

উপযোগিতা— আয়ুর্বেদে এই বৃক্ষটির বিভিন্ন অংশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে সেগুলিকে ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। রোগগুলির মধ্যে যেমন—অলসতা, শ্রম-বিমুখতা, দিবানিদ্রাপ্রিয়তা, ভোজন-বিলাসিতা ইত্যাদি। এগুলি রসধাতুর বিকারজাত। তাছাড়া শারীরিক অস্বাভাবিকতাও কারণ হতে পারে। এই রোগের হেতু সম্পর্কে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ মত-পার্থক্য না থাকলেও শারীর-ক্রিয়ার ক্রম-বিবর্তনের পরিণতিগত (physiological outlook) মতভেদ থাকবেই। তবে এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় হ'লো দ্রব্যগুণের প্রসঙ্গ নিয়ে।

বেদের সূক্তটির মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করার মত তিনটি বক্তব্য— (১) হবি শব্দটি স্নেহ এবং রস ধাতুর মজ্জাকে বোঝায়। (২) শরীরে ব্যত্যয় হয়ে অর্থাৎ বিপরীত হয়ে দেহকে অরণি ক'রে যে জন্মগ্রহণ করে। (৩) ওষধির বা ভেষজের মন্থনে অগ্নির জন্ম হয়। বলা হয়েছে—তুমি বলের দ্বারা সুরা ও সোমের মদে যজমানের অগ্নিকে জয় কর। অশ্বিনীকুমার ইন্দ্রকে প্রীণিত করে অর্থাৎ রসধাতুতেও অগ্নির অবস্থান হয়। কথাটা এই যে, রসে মন্থনক্রিয়ার বল কম থাকলে অগ্নির উদয় হয় না। তার

সরলার্থ হলো, প্রকৃতি এবং রোগ এক নয়। প্রকৃতির অন্যতম উপাদান রসধাতু। আর সেই রসধাতুতে অগ্নি অবস্থান করে। উভয়েই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জল বা রসকে মন্থন করলে অগ্নির উদয় হয়, আবার সেক্ষেত্রে অগ্নির উদ্‌গম প্রচণ্ড হ'লে রসধাতু শুকিয়ে যায়, যেমন বড়বাগ্নি। স্বভাব স্নেহ বা রস ধাতুকে মন্থন করলেই অগ্নির উদয় হয় দেহে। আবার অগ্নির মান্দ্য হলে বা মালিন্য এলে রসধাতুটি প্রবল হয়, তাতে শরীরে শোথ রোগের আবির্ভাব হয়। সে শোথ প্রায়শঃ রস-প্রধান। রস-প্রধান ধাতুর দেহে আরও রস-প্রধান দ্রব্যের সমাগম ঘটালে আরও অগ্নিমান্দ্য হয়।

এইজন্যই বেদের দ্বিতীয় সূক্ত হলো—শরীরের রসধাতু মন্থন করে বলেই এটির নাম হবির্মন্থ, অর্থাৎ শরীরে দোষ থাকলেই রোগ হয় না। তাহলে সর্বদাই রোগ হতো। রস ধাতুটিও দোষ, যেহেতু সে নিজেও দূষিত হয়। দোষ শব্দের ব্যাখ্যা দু'বার দু'রকমে হয়—

'দূষয়তি ইতি দোষঃ, দূষ্যতে ইতি দোষঃ',

অর্থাৎ যে দূষিত করে সেও দোষ এবং যে দূষিত হয় সেও দোষ। কিন্তু তার মন্থন বা বিকার হয় না সর্বদা। ব্যত্যয় হ'লেই হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি এবং রোগের মধ্যে এই হলো ভেদ। অপথ্য সেবনে প্রকৃতি কুপিত হয় না, কিন্তু দোষ কুপিত হয়। (পিত্ত-প্রকৃতির লোক কটু রস খেলে বেশ সহ্য হয়ে যায় কিন্তু পিত্তজন্য ব্যাধি হ'লে আর কটু খাওয়া চলে না। শ্লেষ্ম-প্রধান ধাতুতে দুধ বা আতা খেলে কিছু হয় না, কিন্তু শ্লেষ্মাবিকার হলে দুধ বা আতা খাওয়া চলে না।) এমনি বায়ু-প্রধান ধাতুতে শুষ্ক হরীতকী খেলে তেমন ক্ষতি হয় না, কিন্তু বায়ুবিকারে তা খেলে বহু রোগ হবেই। বৈদিক সূক্তের দ্বিতীয় ভাগের এই মন্তব্য। তৃতীয় ভাগ হলো ওষধির মন্থনে তোমার জন্ম।

ওষধি মন্থনে জন্ম এই অর্থ গ্রহণ ক'রে চরক-সংহিতায় ৪র্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—এটি 'শোথোপগ' অর্থাৎ অগ্নিবলের হ্রাস মানেই শোথ রোগ। শোথ শব্দটি সাধারণ পরিভাষা। এর মৌলিক অর্থ রস মন্থনের অভাবে যখন অগ্নিবল কমে যায়, তখনই শোথের আবির্ভাব। এইজন্যই শোথের সর্বপ্রথম চিকিৎসা অগ্নিবলবিধান। জ্বর রোগেও অগ্নিবল কমে যায়, সেখানেও দোষের বিকারে শোথের উদয় হয়। যেমন স্নেহধাতুর বিকারে তালু-মূলে শোথ হয়, সেখানেও অগ্নিমন্থের দ্বারা সেই শোথকে উপশমিত করা হয়। আবার রক্তে শোথ হলে বিসর্প হয়, সেখানেও অগ্নিমন্থনের দ্বারা চিকিৎসা করতে হয়। কাসি, তৃষ্ণা প্রভৃতিতেও শোথের উদয় হয়, সেখানেও অগ্নিমন্থের দ্বারা চিকিৎসাবিধি। ত্বকের শোথেও অগ্নিমন্থের প্রয়োজন হয়; যেহেতু বায়ুর স্বভাবই শৌষির সৃষ্টি করা। আবার বায়ুর কোপেও শোথের আবির্ভাব হয়, সেখানেও অগ্নিমন্থের প্রয়োজন অর্থাৎ অগ্নিবল বাড়ানই হলো শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। অগ্নিবলের বৃদ্ধি মানেই অগ্নিমন্থের ব্যবহার। হবির্মন্থ অর্থাৎ রসসৃষ্ট মেদ ধাতুকে মন্থন করে বলেই এর অপর নাম হবির্মন্থ। এমনি কাস, শোক, ভয়ের দ্বারা শোথের জন্ম হয়, সেখানেও অগ্নিবল কমে বলেই অগ্নিমন্থের প্রয়োগ করতে হয়। বিশেষ ক'রে রসজ অগ্নিমান্দ্য ও রসজ শোথেই অগ্নিমন্থের সমধিক প্রয়োগ অর্থাৎ সেখানে 'অত্যম্বুপানাদ্ বিষমাশনাৎ' ইত্যাদির ক্ষেত্র, সেইখানেই অগ্নিমন্থের যোগ্য প্রয়োগের স্থান। তাছাড়া যেখানে রসশেষে অন্ন-বিদ্বেষ এবং হৃদয়ের অশুদ্ধি বোধ, শরীরে গুরুতা বোধ, সেইখানেই অগ্নিমন্থের প্রয়োগ। সর্বাধিক লক্ষণীয় সেখানে অগ্নির সমতা স্থাপন করতে হয়। যেখানে বিষমাগ্নির উপশম করতে হয়, সেইখানেই অগ্নিমন্থ ভেষজের প্রয়োগস্থল।

এইজন্যই পরবর্তীকালের সংহিতার মধ্যে চরক সংহিতার সূত্রস্থানে এবং সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৩৯ অধ্যায়ে রস সম্পর্কিত শোথে অগ্নিমন্থের বিশেষ প্রয়োগ নিবন্ধ করা আছে।

বাগ্ভটের উত্তর তন্ত্রের ২০ অধ্যায়েও ওরই অনুসরণ। **এই অগ্নিমন্থের লোক-ব্যবহার:—** এর মূলের ছালই ভৈষজ্য শক্তি দেয় বেশী, তবে শুষ্ক পাতার চূর্ণেরও ব্যবহার আছে। এই ভেষজটিকে প্রখ্যাত ঋষিতুল্য বৈদ্য গঙ্গাধর রায় মহাশয় তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে ব্যবহার পদ্ধতি জানিয়ে গিয়েছেন।

ব্যবহার

১। **আমদোষে দমকা দাস্তে—** মাঝে মাঝে হতে থাকলে অগ্নিমন্থছাল চূর্ণ ২।৩ গ্রাম মাত্রায় জলসহ দু'বেলা ব্যবহার করলে, তাছাড়া মাঝে মাঝে দাস্তও হ'তে থাকলে দোষটি সেরে যায়।

২। **আঘাতজনিত ফুলোয়—** কোমলস্থানে আঘাত লেগে ফুলে গেলে এই গাছের পাতা বেটে লাগালে ফুলা সেরে যায়।

৩। **কিডনির দোষে—প্রস্রাবের অল্পতা, তজ্জন্য হাতে-পায়ে ফুলায়—** এর পাতার রস ৩।৪ চা-চামচ অল্প গরম ক'রে খেলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কিডনির শোথ নষ্ট হয়ে প্রস্রাব স্বাভাবিক হবে এবং হাত-পায়ের ফুলাও কমে যাবে।

৪। **জণ্ডিসে ও পাণ্ডু রোগে—** এর ছাল ও পাতার পাচন ব্যবহার করলে পাণ্ডু ও কামলা (ন্যাবা) সারে। এই গাছের পাতা ও ডাঁটা মিলিয়ে ১২—১৮ গ্রাম পর্যন্ত মাত্রায় ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে প্রত্যহ ২ বারে খেতে হবে।

৫। **ঋতুদোষে—** মেয়েদের ঋতুদোষে ক্রমে শরীরটা মোটা হয়ে গেলে এবং মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে উপরিউক্ত নিয়মে পাতা ও ডাঁটা সিদ্ধ ক'রে খেলে শরীরে সে তন্বী হয় এবং তার ঋতুদোষও নষ্ট হয়।

৬। **হৃদ্‌রোগে—** অস্বাভাবিক মেদজন্য বুক ধড়ফড় করে, সেক্ষেত্রে এই গাছের ছাল চূর্ণ ২।৩ গ্রাম মাত্রায় জলসহ খেতে হয়। এর দ্বারা ঐ মেদের জীর্ণতা এসে শরীরের বলাধান করে, তবে এই ঔষধটি খাওয়ার পর ঘরে পাতা দই একটু ঘোল ক'রে খেতে বলা হয়।

৭। **স্থূলতা দোষে মলরোধ ও আমদোষ হ'লে—** এক্ষেত্রে জানতে হয় এটি রস-দুষ্টি আমরোগ জনিত হয়েছে কিনা এবং তাতে বিষমাগ্নির জন্যই যে প্রচুর আহার ক'রতে চায় এটা জেনে নিতে হবে, সে রোগীর বিশেষ লক্ষণ মাঝে মাঝে কটুরসের (ঝাল) আহারে প্রবৃত্তি বেশী আসে; সেক্ষেত্রে অগ্নিমন্থের চূর্ণ গরম জলসহ দুপুরে ও রাত্রের আহারের পর ৩ গ্রাম মাত্রায় খেতে হয়।

৮। **দুর্ঘটনা জনিত ফুলোয় বা ফোড়ার ফুলোয়—** দেহের যেকোন জায়গা যেকোন দুর্ঘটনায় ফুলে গেলে এর ছাল বেটে প্রলেপ দিলে কমে যায়।

৯। **অগ্নিমান্দ্য রোগে—** প্রায়ই যাঁরা অগ্নিমান্দ্যে ভোগেন, তাঁরা নিত্য অগ্নি-মন্থের ছালের গুঁড়ো খাবেন ঠাণ্ডা জলসহ।

১০। **মলবেগ না আসায়—** পায়খানা করতে যাঁদের বেগ আসে না, তাঁরা এর পাতার চূর্ণ ১।২ গ্রাম মাত্রায় গরম জলসহ খেলে আধ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্য বেগ পাবেন। তাদের ও দোষ নষ্ট হয়।

চক্রদত্ত (১১দশ শতাব্দীর একটি আয়ুর্বেদীয় প্রাচীন গ্রন্থ) লিখেছেন গণিয়ারী মূলের ত্বকের ক্বাথে শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অতি স্থূল ব্যক্তিও কৃশ হয়। কথাটি যে অভ্রান্ত, তা আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেই আপনাদের নিকট নিবেদন করছি। এমন-কি শুধু গনিয়ারী ছাল চূর্ণ প্রয়োগেও উপকার হয়। তবে এই দু'টি দ্রব্যের সংযোগে ব্যবহারের ফল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কোলেস্টেরল (Cholesterol) বেড়ে গেলে এই গাছের ছাল চূর্ণ ১ই গ্রাম মাত্রায় গরম জলসহ খেলে ব্লাড কোলেস্টেরল কমে যায়।

সতর্কতা— বর্তমানে গণিয়ারী গাছের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হ'চ্ছে। আর চক্রদত্তের বিধানে যে শিলাজতুর ব্যবহার বিধি, সে ক্ষেত্রেও এটি বর্তমানে দুর্লভ হ'য়ে উঠেছে বলা যায়, কারণ বাজারে যেগুলি বিক্রি হয়, তার মধ্যে অধিকাংশই চিনি পুড়িয়ে তার সঙ্গে গোমূত্র মিশিয়ে তৈরী করা হ'চ্ছে; যেহেতু আসল শিলাজতু গোমূত্র গন্ধযুক্ত হয়, সেই কথাটার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য এটা মিশানো হয়; অথচ এই কৃত্রিমতা রোধের কোন ব্যবস্থাও করা সম্ভব হয়নি।

বর্তমান যুগে বহিরাগত সভ্যতার জন্যই কিনা জানি না, কারণ রুচিকর হ'লেই সেটা খাদ্য, এ ধারণাটার সঙ্গে বহিরাগত সভ্যতার একটা যোগ আছে। এমনি অবিচারে খাদ্য গ্রহণের ফলেই যে রোগগুলির বিপুল প্রসার, তাদের মধ্যে একটি হ'চ্ছে ইক্ষুমেহ ও বসা মেহ প্রভৃতি রোগ।

Urinary disease— এ রোগে এই গাছের বা মূলের ছালের ক্বাথ পান করার উপদেশ দিয়েছেন সুশ্রুত ও চক্রদত্ত।

সূত্র পেলেই অনুসন্ধানের প্রেরণা আসে, তাই রক্ত-সম্পৃক্ত শর্করা বৃদ্ধি রোগে (Blood Sugar) এই গাছের পাতা (যেটি সহজ প্রাপ্য) চূর্ণ দিনে ২ বার ১ গ্রাম মাত্রায় ব্যবহারে দেখা গেছে যে, এক মাসের মধ্যে রক্তে শর্করার ভাগ স্বাভাবিক হয়। অবশ্য এই রোগের বিধিনিষেধগুলিও এই সঙ্গে মেনে চলতে হয়। যদিও আমাদের পরীক্ষার ক্ষেত্র সীমিত, তথাপি এটির মধ্যে বিশেষ ভেষজগুণ বর্তমান আছে মনে করি। এখন এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচারের প্রয়োজন এসেছে—এটি পেশীসমূহের metabolism বৃদ্ধি করে অথবা Liver এবং Pancreas-এর বিশেষ কোন ক্রিয়াকে সক্রিয় ক'রে এই কার্যের সহায়ক হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, কোন কোন প্রদেশে Clerodendrum phlomidis Linn. f. নামীয় গাছটি অরণি নামে চিহ্নিত ক'রেছেন; এটিও Verbenaceae ফ্যামিলিভুক্ত, সেখানেও সমীক্ষার প্রয়োজন।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz. premnine, ganiarine. (b) Antibiotics viz. staphylo coccus aureus, bacillus subtilis, strepto coccus pyogenes (these substances are only active against grain positive organisms).

লবলী

যুধিষ্ঠির কখনো ব'লতেন না "দুর্যোধন", তিনি তাঁকে "সুযোধন" সম্বোধন ক'রতেন; অর্থাৎ কর্কশ অপ্রিয় ভাষায় শত্রুকেও আহ্বান ক'রতে নেই। তাই সারা ভারতে আজও একটি রোগকে বলা হয় "শীতলা"। এটির উদয়েও জ্বালা, অন্তেও যন্ত্রণা, তাছাড়া চিরদিনের জন্য দাগও রেখে যায়। তনুশ্রীকে বিশ্রী ক'রে নিজে স'রে পড়ে। আবার সুযোগ বুঝে আসে। তবে রসগত হ'য়ে যখন আসে তখনকার শীতলা বা বসন্ত নাম নেয় পানিবসন্ত বা জলবসন্ত। তারপর রক্তমাংসাদি অন্যান্য ধাতুগত হ'লে সে বসন্তকে Small pox বা আসল বসন্ত বলা হয়; উত্তরোত্তর পরিণাম-প্রাপ্ত রসরক্তাদি ধাতুকে দূষিত ক'রে যে বসন্তরোগটি উদ্ভূত হয়, সেইটিই মারাত্মক।

আজকের যুগোত্তরকালে এই রোগের জন্য উপযুক্ত সময়ে টীকা নিলে আর রসগত বা মাংসগত বসন্ত (Small pox) হয় না, এটা একরকম স্থিরীকৃত হ'য়েছে বলা যেতে পারে; তবে পানি বা জল বসন্তের হাত থেকে রেহাই যে হবে, এর কোন নিশ্চয়তা নেই তখন দেখতে হবে—অতীতে আয়ুর্বেদে এর কোন ভেষজ ছিল কিনা, অথবা আছে কিনা; এক্ষেত্রে ব্যবহারগত প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, আমাদের দেশে একটি অযত্নসম্ভূত বনৌষধি কণ্টকারীর নাম খুব উল্লেখযোগ্য (Solanum Xanthocarpum)। সেটি এই অবাধ্য রোগকে সংযত ক'রে রাখতে পারে। সাদা ও বেগুনে দু'রকম ফুলের গাছ দেখা গেলেও জাতিতে দু'টি একই। এদেশে বেগুনে ফুলের গাছই বেশী দেখা যায় ও ব্যবহারও করা হয়। অনেকের ধারণা আছে যে, এই গাছের মূল না হ'লে কাজ হয় না; কিন্তু তা ঠিক নয়; সমগ্র গাছেরই উপকারিতা আছে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে ব'লে রাখি, আমাদের দেশে বহুপ্রচলিত এই হাম রোগ; এটি একজাতীয় বসন্ত। এই হাম শব্দটি এসেছে ঘাম বা ঘর্ম থেকে, অর্থাৎ দেহে পিত্ত-

শ্লেষ্মার তাপজনিত স্বেদক্ষরণ বা ঘাম হয়, তা থেকেই হাম হয়। এটা আধুনিক বিজ্ঞানেও স্বীকৃত যে, ঘাম থেকেই ছড়িয়ে পড়ে; এই ঘাম খুব বিষাক্ত ও পাতলা, এটা হাওয়াতে ব'য়ে চলে তাই সে অন্যে সংক্রমিত হয়।

তা ছাড়া এই হাম সম্পর্কে আর একটি বিশেষ গাছের ব্যবহারও আমাদের দেশের পল্লীঅঞ্চলে আবহমান কাল থেকে প্রচলিত। পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) ও উত্তর-

বঙ্গে যাঁরা চিকিৎসা ক'রতেন, তাঁরা হাম হ'লে এই লবলী অর্থাৎ নোয়াড় গাছের (Phyllanthus distichus Muell-Arg. ফ্যামিলি Euphorbiaceae) পাতার রস খেতে দিতেন এবং ঐ গাছের পাতা সমেত একটি ডাল (শাখা) গায়ে বুলিয়ে আরোগ্য ক'রিয়ে দিতেন। এই গাছটির সংস্কৃত নাম "লবলী"।

লবলী? বা লবণী। লবণী নামটি যে অর্থ বহন করে, লবলী কিন্তু তা করে না; চরকে আছে লবণী (সূত্রস্থান ২৭ অঃ, ১১৭ শ্লোকে)।

ওর ফলটি টক এবং তা দিয়ে চাট্‌নী হয় এবং গুণে সে রূক্ষ, বায়ুকারক।

"অবদংশক্ষমং রূক্ষম্ বাতলং লবণী ফলম্"

আর সুশ্রুতে আছে লবলী (সূত্রস্থান ৪৬ অধ্যায়)

কষায়ং কফপিত্তঘ্নং কিঞ্চিৎ তিক্তং রুচিপ্রদম্।
হৃদ্যং সুগন্ধি বিষদং লবলী ফল মুচ্যতে॥

শব্দবিন্যাসে—

লবং ছেদনং ক্রিয়তে অস্মিন্, লবণী বৃক্ষে ফলে চ।

আর লবলী লবং লেশং লাতি লবলী (নোয়াড়)। শীতলা বা বসন্ত রোগটির সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এই যে—চরকে বসন্ত শব্দ দিয়ে কোন রোগের নাম নেই, তবে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অন্যান্য গ্রন্থে এর উৎপত্তি বা কারণ দেখে বলা যায় যে, এটি চরকোক্ত বিসর্প রোগেরই অন্তর্গত এবং তার জন্য পাচন, প্রলেপ হিসেবে বহু যোগের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। আর সুশ্রুতে এর মসূরিকা নাম (সুশ্রুত চিকিৎসাস্থান ২০। ১৯ শ্লোক)। ওখানে বলা হয়েছে—এই রোগটি পিত্তশ্লেষ্মা জন্য বিসর্প রোগ। এর চিকিৎসা কুষ্ঠ চিকিৎসার মত (কুষ্ঠ শব্দটি কুৎসিত অর্থে)।

মসূরিকায়াং কুষ্ঠঘ্ন—লেপনাদি ক্রিয়া হিতা,
পিত্ত শ্লেষ্ম বিসর্পোক্তা ক্রিয়া বা সংপ্রকাশ্যতে।

এটি সুশ্রুতের মতে ক্ষুদ্র রোগেরই অন্তর্গত, অর্থাৎ জটিল রোগ নয়।

বাগ্ভটের উত্তরতন্ত্রের ৩১ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে এটি ক্ষুদ্র রোগের অন্তর্গত এবং পিত্ত, কফ এবং কফ-বায়ুপ্রধান রোগ বলা হ'য়েছে। তবে নামটি—

মসূর মাত্রা স্তম্বর্ণাস্তৎ সংজ্ঞা পিটিকা ঘনাঃ।
ততঃ কষ্টতরা স্ফোটা বিস্ফোটাখ্যা মহারুজঃ॥

এর চিকিৎসার ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলা হয়নি।

পরবর্তীকালের রচিত গ্রন্থ "মাধব নিদান" নামক গ্রন্থের ৫৪ অধ্যায়ে মসূরিকা নিদানে বলা হ'য়েছে এবং বিস্তৃত ক'রেই তার রূপও দেখানো হ'য়েছে।

কিন্তু এইসব লক্ষণ তিনি যে কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তা বলেন নি, অর্থাৎ মাধব নিদানের দ্বিতীয় টীকাকার শ্রীকণ্ঠ দত্ত; তিনি মাধবের প্রত্যেকটি শ্লোকের আকর গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মসূরিকার বেলায় তা করেন নাই। অতএব চরক, সুশ্রুত ও বাগ্ভটের তুলনায় তা নবীন।

আবার ষোড়শ শতকের ভাবপ্রকাশকার এই মাধবের সংগৃহীত শ্লোকগুলিই অবিকল উদ্ধৃত করেছেন। তাদের মধ্যে ৩টি স্থানে নূতন যোজনাও করেছেন। প্রথমে বলেছেন—মাধবের আনুগত্যে অর্থাৎ অসাধ্য মসূরিকায়—

'নদেয়ং তস্য ভেষজং'

অর্থাৎ অসাধ্য মসূরিকায় কোন ঔষধ দেওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয় যোজনা সম্পূর্ণ নূতন—

'বহবো ভিষজো নাত্র ভেষজং যোজয়ন্তি হি।
কেচিৎ প্রযোজয়ন্ত্যেক মতং তেষাং অথ ব্রুবে॥'

অর্থাৎ অনেক চিকিৎসক এ ক্ষেত্রে কোন ওষুধই দেন না, আর যাঁরা দেন, তাঁদের মত ব'লছি।

তাঁরা বলেন—শীতল জলে নিমের বীজ এবং কাঁচা হলুদ বেটে খাওয়ালে, আর শীতলা বিকারই হবে না, তবে ঐ রোগটির চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় শীতল চিকিৎসাই ক'রতে হয় বলেই এর নাম শীতলা। এর সব অবস্থাতেই শীতল কষায় পান, শীতল প্রলেপের ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ আয়ুর্বেদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিটি রোগোৎপত্তির ক্ষেত্রে এবং রোগ উপশমনের ক্ষেত্রে এমনভাবে লক্ষ্যে লক্ষণসঙ্গতি রেখে বর্ণনা ক'রেছেন যা চিরন্তন রূপেই পরিগণিত হয়। অর্থাৎ রোগোৎপত্তির ক্ষেত্রে বায়ু, পিত্ত, কফের পরস্পরের একক প্রাধান্য বলে লক্ষিত হ'লেও অন্য দুটি দোষ সেখানে অলক্ষ্যে অনুগমন করে; যেহেতু পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টিটি পঞ্চীকরণ হয়েই অন্যে প্রবিষ্ট; অতএব বায়ু, পিত্ত, কফের মৌলিকভিত্তি আপ্য, পার্থিব ও আগ্নেয়, আর তার বিকার বা রোগের উৎপত্তিটিও সেই ত্রিবিধ ভূতের বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। সে ক্ষেত্রে যেখানেই আপ্য বা পার্থিব অথবা আগ্নেয় বিকার, নিশ্চয় সেখানে তার সমধর্মী ভেষজ বা ক্রিয়া কখনও তাকে উপশমিত করে না। সেইজন্য এই পিত্তপ্রধান শ্লেষ্মানুগত বিকার মসূরিকা বা বসন্ত রোগটি তার বিপরীতধর্মী আপ্য ধাতু দ্বারাই উপশমিত হয়। অতএব মসূরিকা বা বসন্তরোগে উষ্ণবীর্য এবং শৈত্য গুণপ্রধান ভেষজই তাকে শমিত করে।

এই বিচারে পরিষ্কার ধরা যায়—এই শীতলা বিদ্যাটির প্রচার হতে দীর্ঘদিন লেগেছে, কারণ ১১দশ শতকের চক্রদত্ত গ্রন্থে শীতলার নাম নেই, তবে মসূরিকার চিকিৎসা-বিধান আছে। সে চিকিৎসা বিসর্প-বিস্ফোট চিকিৎসার অন্তর্গত। এ ক্ষেত্রে চক্রদত্ত অমৃতাদি পাচনও খেতে বলেছেন; আর প্রতিষেধক ঔষধ হিসাবে একটা পূর্ণবয়স্ক লোকের পক্ষে ৩ গ্রাম (সিকি তোলা) কণ্টকারী ৯/১০টি গোলমরিচ একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে আন্দাজ আধ ছটাক থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে সকাল বেলা খেতে হয়, ছোটদের বয়সানুপাতে মাত্রা ঠিক করতে হয়; তবে বাড়িতে কেহ আক্রান্ত হলে প্রথম ৩ দিন প্রত্যহ খেতে হয়, তারপর ২।১ দিন অন্তর খেলেই চলে। হামের ক্ষেত্রে এই একই ব্যবস্থা। পল্লীতে হতে থাকলে প্রতিষেধক হিসাবে ২।৩ দিন অন্তর খেলে এ রোগের আর সংক্রমণ নাও হতে পারে। এ সম্পর্কে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সীমিত ক্ষেত্রেই করা সম্ভব হয়েছে।

ভারতের সুপ্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থে এ রোগের নিদান এবং চিকিৎসা কার্যে তার সহায়ক ভেষজ নিয়ে গবেষণা নিশ্চয়ই হয়েছিল। তাই অন্যান্য ভেষজের দ্বারা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের নির্মল আবহাওয়া স্থাপন করার মাধ্যমে একে তাঁরা চিকিৎসা করতেন। এর সঙ্গে অনেকে বিশেষভাবে ঘরোয়ানা ঔষধ হিসাবে আর একটি ঔষধের ব্যবহার করে থাকেন, যে ভেষজটির গুণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লবণী বা লবলীকে উপস্থাপিত করাটা এখানের মুখ্য। এ ভেষজটির আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন মনে করি। তারপর সাধারণের সহজে ব্যবহারোপযোগী ক'রে একে এ রোগের প্রতিষেধক ঔষধ হিসেবে প্রস্তুত করলে স্বল্প মূল্যেই একে জনকল্যাণে ব্যবহার করা চলে।

'অপনয়তি মসূরীং শীতপিত্তং জ্বরঞ্চ।'

তা ছাড়া আছে দশাঙ্গ প্রলেপ আর চতুঃসম প্রলেপেরও ব্যবস্থা সেখানে।

তারপর চক্রদত্ত মসূরিকা চিকিৎসা নামে একটি অধ্যায় রচনা ক'রেছেন। তাতে দেখা যায়— চরক, সুশ্রুত ও বাগ্ভটের বিসর্প যোগগুলিই উদ্ধৃত করেছেন। অতিরিক্ত ২টি প্রক্রিয়া যুক্ত করেছেন, একটি হোলো কজ্জলির ব্যবহার।

এই রোগের টোট্‌কা (তান্ত্রিকদের তন্ত্র, যন্ত্র ও মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম ত্রোটক। ত্রোটক পদ্ধতিতে বনৌষধির ব্যবহারই টোট্‌কা) ঔষধ সম্পর্কে পল্লীমঙ্গল চিকিৎসায় দেখা যায়—গোয়ার ভূতপূর্ব হেলথ্‌ অফিসার Anlonio Toagum লিখেছেন—সাধারণ বনকলার (যাকে রামকলা বলে) বীজ ৮। ৯টি গুঁড়ো ক'রে মধুর সংগে মিশিয়ে খেতে দেওয়ার প্রথা প্রাচীন বসন্তের প্রতিষেধক হিসাবে গোয়ায় প্রচলিত। আমাদের দেশে সেটি 'দয়াকলা' ব'লেই পরিচিত।

আর একটি টোট্‌কাও দেশ অঞ্চলে ব্যবহৃত হ'তো, অবশ্য সেটি মানুষের ক্ষেত্রে নয়। কোন গরুর বসন্ত হলে শিমুল তুলোর টাটকা বীজ ৫। ৬টি গুঁড়ো ক'রে আধ তোলা কাশীর চিনির সংগে মিশিয়ে গোয়ালের অন্য গরুগুলোকে খাওয়াতো, যাতে অন্য আর কোন গরু আক্রান্ত না হয়।

এখানে বক্তব্য, এইসব সাধারণ জিনিষগুলি পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি? প্রসঙ্গত আর একটি কথা আপনাদের কাছে নিবেদন ক'রে রাখি—বসন্তকালে আহার এবং ঔষধ হিসাবে কয়েকটি জিনিস ব্যবহার করা ভাল—যেমন সজিনার ডাঁটা, উচ্ছে, নিমপাতা, পলতা, হিঞ্চে, এ'চোড় প্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে একটা উল্লেখযোগ্য প্রথার পুনরুল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, সেটা হ'ল—বসন্ত রোগে গর্দভের সম্পর্ক ধ'রে। এত জীব থাকতে গাধাটিকে শীতলা মায়ের বাহন ব'লে কেন চিহ্নিত করা হ'ল? ঐ জীবটির অঙ্গে কি কোন বসন্ত প্রতিষেধক বস্তু নিহিত আছে? উত্তরে শীতলার পুরোহিতরা বললেন—এ সম্পর্কে একটি উৎস আমরা দেখতে পাই—বাড়িতে কারও বসন্ত হ'লে বাড়ির অন্যান্য সকলকে ১ চা-চামচ ক'রে গাধার দুধ খাওয়ানো হ'ত এবং ঐ দুধে চাল ভিজিয়ে শুকিয়ে রাখা হ'ত; কোন সময়ে দুধ পাওয়া না গেলে, ঐ চাল খেতে দেওয়া হ'ত। তাছাড়া কোন চিকিৎসক গাধার দুধ দিয়ে বসন্তের ক্ষত মুছে দেওয়ারও ব্যবস্থা দিতেন, আবার এও প্রবাদ আছে যে, গাধার নাকি বসন্ত হয় না। এটাও তো অনুধাবনযোগ্য।

কিন্তু গর্দভীর দুগ্ধ কি বসন্ত রোগে চলে? চরকের মতে এক খুর বিশিষ্ট প্রাণীর দুধ—ঘোড়া, গাধা প্রভৃতির দুধ উষ্ণ, অম্লরস, ঈষৎ লবণাক্ত, রুক্ষ এবং শাখাগত বায়ু-নাশক, তবে বলকর এবং স্থৈর্যকর। (চরক—সূত্রস্থান ২৭। ১৮৩ শ্লোক।)

শেষের দু'টি গুণ হয়তো সুস্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কিন্তু বসন্ত রোগটাই যখন পিত্ত-শ্লেষ্মা সমুদ্ভূত, তখন অম্ল, লবণ রস এবং রুক্ষগুণ দ্রব্যের ব্যবহার সেক্ষেত্রে চলে না। তাছাড়া গর্দভী পাঁচ প্রকার। প্রত্যেকের দুধের গুণও পৃথক এবং প্রত্যেকের মধ্যেই ঈষৎ অম্লতা ও লবণভাব আছে।

(অত্রি সংহিতা—৮ম অধ্যায়।)

আমি বিভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসক সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিকদের কাছে অনুরোধ করি—এইসকল গাছের গুণাগুণ পরীক্ষা ক'রে দেখুন যে, এ সকল ভেষজের এ রোগের প্রতিষেধক ক্ষমতা আছে কিনা। আমাদের দেশে এখনও বহু উদ্ভিদ, পার্থিব ও জান্তব পদার্থ আছে, সেগুলির উপযুক্ত গবেষণার ব্যবস্থা হলে বহু নতুন তথ্যের সন্ধান মিলবে। এসবের উৎস এখনও বহু লোকের কাছে আছে।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Tannin. (b) Saporin. (c) Gallic acid, oxalic acid, malic acid and other acids. (d) Unidentified substances. (e) Different amino acids.

দারুহরিদ্রা

(জণ্ডিসের চাবি)

আয়না, আরসি, আফ্‌শোষ, আফিম্‌, আবগারি, আড়াল, আব্‌রু, আওয়াজ, আম্‌-মোক্তার এবং আমলার মত বহু বৈদেশিক শব্দই কালপ্রভাবে আমাদের কথ্য ভাষায় এসে গিয়েছে, যেগুলি বাদ দিলে অনেক মনোভাবই অপ্রকাশ্য থেকে যায়। ওগুলি আজকাল আমাদের শ্রুতিকটু হয় না। কেদারা আনতে ব'ললে অভিধান খুঁজতে হয়; কিন্তু চেয়ার ব'ললে তা হয় না, দর্পণ ও আয়না এবং জলপাত্র ও গ্লাসের ক্ষেত্রেও তাই। বর্তমান যুগে সহজবোধ্য ব'লেই রোগের পশ্চিমী পারিভাষিক নামটাই শিরোনামায় প্রয়োগ ক'রলাম। এই রোগের অবস্থা বিশেষকে আয়ুর্বেদে বলা হয় পাণ্ডুরোগ, আর জণ্ডিসের আয়ুর্বেদিক নাম কামলা রোগ, যার প্রচলিত নাম "ন্যাবা"; এটি বিশিষ্ট লক্ষণান্বিত হ'লে তাকে বলা হয় 'হলীমক'। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই রোগের নামও কম নেই, তার মধ্যে জণ্ডিস্‌, হেপাটিক্‌ জণ্ডিস্‌ প্রধান। বর্তমানে একপ্রকার জণ্ডিস্‌ দেখা যাচ্ছে, সেগুলি নাকি ভাইরাস্‌ থেকে হ'চ্ছে। আমরা ভাবি ভাইরাস্‌ হ'লো একপ্রকার জড়াজড় বস্তু, বিশ্বজুড়েই তার অবস্থান, বহু ব্যাধিরই উদ্ভব হয় এ থেকে। বৈদিক পরিভাষায় এ হ'লো "যাতুধানম্‌"।

নামভাষ্য:— দারু সংস্কৃত শব্দ, এর অর্থ কাষ্ঠ বা কাঠ, যার জন্য আমরা জগন্নাথদেবকে বলি 'দারুব্রহ্ম', আর এখানে হরিদ্রা শব্দের সংগে তার যোগসূত্রটি রংয়ের ও গুণের সাদৃশ্যের জন্য, তাই তার নাম দেওয়া হ'য়েছে দারুহরিদ্রা; অর্থাৎ হরিদ্রা, তবে দারুময়। আর একটি কথা—প্রকৃতপক্ষে আমাদের ব্যবহারগত হলুদ রঙটির মৌলিক শব্দ যে হরিৎ এটাও নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না, কারণ হরিৎ শব্দটি কচি কলাপাতার রঙ এবং পান্নারও রং, কিন্তু স্মরণাতীতকাল থেকে হরিৎ মানেই হলুদ।

তা যাক্‌, এটি কিন্তু বৈদিক বনৌষধি, শুক্ল যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে এর নাম

'দর্বীহর', তার আর একটি নাম 'পর্জন্যহরী', একথা ব'লেছেন বেদ ভাষ্যকার মহীধর।

কুলজীনামা:— এই বিটপ্‌শ্রেণীর গাছগুলি ৩—৭/৮ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'লেও শাখাগুলি নিম্নাভিমুখী, পাতাগুলির কিনারা (ধার) দাঁতযুক্ত, শাখাগ্রে সরু সরু কাঁটা
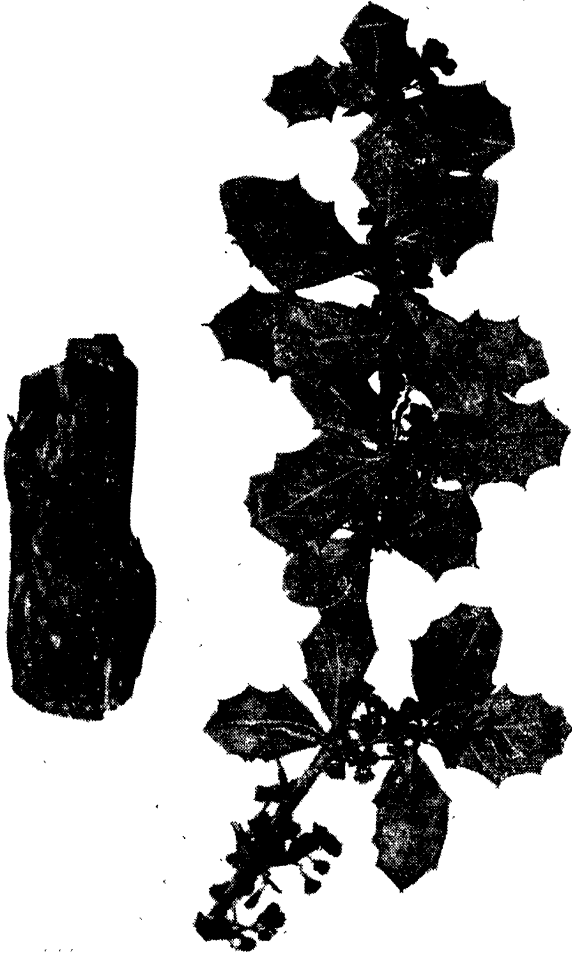
থাকে, কিন্তু সমতলে হয় না, এগুলি নীলগিরি ও হিমালয়ের বিভিন্নপ্রান্তে সাধারণতঃ ৩—১১ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে জন্মে। ফুল হয় বসন্তকালে আর ফল হয় গ্রীষ্ম-কালে। এই গাছের ছোট কিসমিসের মত শুষ্ক ও টক ফলগুলি ইউনানি চিকিৎসক

সম্প্রদায় ঔষধে ব্যবহার করেন, তাঁরা নাম দিয়েছেন 'জেরিস্ক'; আর গাছটিকে বলেন— দারহিল্‌দ, হিন্দীভাষী অঞ্চলে একে বলা হয় 'পীলী লকড়ি'। নব্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের বিচারে ৮।৯টি প্রজাতি (species) এদেশে পাওয়া গেলেও Berberis asiatica Roxb. Ex. Dc. এবং Berberis aristata Dc.— এই দু'টি প্রজাতির গাছই এখন পাওয়া যায়। এরা Berberidaceae ফ্যামিলীভুক্ত। ভেষজগুণে সবগুলি প্রায় একই, তবে কিছু ইতর-বিশেষ তো থাকবেই।

বর্তমান সংগ্রহ ব্যবস্থা:— সব প্রজাতির গাছের কাঠ হল্‌দে থাকাতে সংগ্রহে বাদ-বিচার করা হয় না, গাছের মূল পর্যন্ত তুলে নেওয়া হয়, কারণ তার মূলের ভেষজগুণ বেশী। এই গাছের ছাল বা ত্বক্‌ ও মূলাংশ কুচি ক'রে কেটে ৮ গুণ জলে সিদ্ধ ক'রে ছেঁকে তাকে ঘনসার (solid extract) তৈরী করা হয়, তার প্রাচীন নাম 'দার্বীরসাঞ্জন' আর চলতি নাম রসোত্‌। বর্তমানে প্রাপ্ত রসোত্‌ ভেজাল। আর দারু-হরিদ্রা ব'লে যেগুলি পাই, সে কাঠগুলির ছাল চে'ছে নেওয়া।

বৈদিক যুগের গবেষণা:— শুক্ল যজুর্বেদের বর্ণনায় বলা হয়েছে এটি বিদারণ ও লেখন গুণসম্পন্ন। লেখন অর্থে সম্মার্জন করা, যাকে বলা হয় আঁচড়ে বের ক'রে দেওয়া, এই হেতু পিত্তগ্রন্থিকে সে সম্মার্জিত করে, পিত্তবিকারের যে কোন ব্যাধিকে দূর করে ও বিষদোষ নষ্ট করে।

'শুক্ল যজুঃ—১৯।১৩ এবং অথর্বের—৭।১১।২২'

(১) যূপমাজগ্ধঃ দর্বীহরঃ শ্বেতছাগলঃ।
(২) পর্জন্যহরী পীতকঃ আরণ্যদৃষদি ক্ষপঃ।

মহীধর ভাষ্য—

শুক্লের=দর্বীহর;=দু উন+দর্বী স চ পীতকাষ্ঠঃ, তেন যূপেন জগ্ধঃ শ্বেতছাগলঃ বিষমাপুয়েত।

অথর্বের=সেই পর্জন্যহরী পীতকাষ্ঠ অরণ্যের অভ্যন্তরে পর্বতের বক্ষে থাকে, রাত্রির তপস্যা করে।

প্রথম ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়—তৎকালে হরিদ্রাবর্ণের শক্ত কাষ্ঠ দারুহরিদ্রার যূপকাষ্ঠে শ্বেতবর্ণের ছাগলকে হত্যা করলে মাংসের বিষদোষ দূর হয়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় জানা যায়—এই বৃক্ষটি অরণ্যের মধ্যে থেকে মেঘকে আহ্বান করে। সেইটিই তার রাত্রির তপস্যা।

বেদের সূত্র ধরেই সংহিতার যুগে এর ভৈষজ্য শক্তির অনুশীলন। চরক-সুশ্রুত-বাগ্‌ভট—সকলেই বিদগ্ধ পিত্তের প্রভাবে পিত্তজ গ্রন্থিগত রোগে এই দারুহরিদ্রাকে ব্যবহার করেছেন। সুশ্রুতে অপচী রোগে অর্থাৎ গণ্ডমালা রোগে এর ব্যবহারের উপদেশ।

এই রোগ দীর্ঘদিনস্থায়ী, অল্প চুলকানি হয়; পাকে, ফাটে, রস গড়ায়; চোয়াল, বাহুমূল ও গলায় ছোট ফুস্‌কুড়ি হয়ে সেও পাকে, ফাটে ও রস গড়ায়। এটি পিত্ত-শ্লেষ্মাপ্রধান রোগ এবং মেদ থেকে জন্ম নেয়। এক্ষেত্রে দারুহরিদ্রা-ঘষা কিংবা ক্বাথ ব্যবহার করলে ওগুলি তাড়াতাড়ি সেরে যায়।

সংহিতা যুগের গবেষণা:— চরকে বলা হ'য়েছে, এটি অর্শোঘ্ন, কণ্ডুঘ্ন (পিত্ত-বিকৃতিজনিত চুলকণা) ও লেখনীয়; এই 'ঘ্ন' অর্থে নাশ করা। সুশ্রুতে সর্পবিষের

ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার উপদেশ; এভিন্ন মেহরোগেও যেখানে খড়িগোলা জলের মত প্রস্রাব হ'চ্ছে, সেখানে এই কাষ্ঠসিদ্ধ ক্বাথ খেতে বলা হ'য়েছে। চক্ষুরোগেও ব্যবহারের উপদেশ। এক্ষেত্রে বাগ্‌ভটের (প্রাচীন আয়ুর্বেদিক সংগ্রহ গ্রন্থ) ইঙ্গিত আরও সুস্পষ্ট। বেশী-দিনের কথা নয়, গত ৩০ বৎসর পূর্বেও পারদর্শী পাশ্চাত্য চিকিৎসককে এই দারুহরিদ্রার কাঠ থে'তো ক'রে জলে ফুটিয়ে ছে'কে নিয়ে সাধারণ চক্ষুরোগে সর্বদা ব্যবহার করতে দেখেছি। এই কাঠসিদ্ধ জল দিয়ে তৈল পাক ক'রে কানের পুঁজে এবং যেকোন ক্ষত পূরণের জন্য ব্যবহারের উপদেশ আছে চরকে।

ব্রণ বা মেচেতায়ঃ— এই কাঠ ঘষে চন্দনের মত ক'রে লাগালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

মুখের ক্ষতেঃ— এই কাঠ ঘষা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে উপশম হয়।

রক্তপ্রদরেঃ— (মেনোরিজিয়া, Menorrhagia) এই গাছের ছালের ক্বাথ ব্যবহার করতে হয়।

শ্বেতপ্রদরেঃ— (লিউকোরিয়ায়, Leucorrhoea) এর ক্বাথ ব্যবহার, এমনকি কাঠ ঘষে চন্দনের মত ক'রে (১ চামচ) দুধ সহ খেলে উপকার হয়।

রক্তার্শেঃ— (Bleeding piles):— এই বনৌষধিটি ব্যবহারের কথা চরকে কয়েক বার বলা হয়েছে, তাছাড়া ওয়াট সাহেবের গ্রন্থেও দেখা যায় যে, ডাক্তার পানি (Dr. Panny) ৫—১০ গ্রেণ মাত্রায়, ঐ কাঠ থেকে তৈরী রসোত্ মাখনের সঙ্গে ব্যবহার ক'রতে (খাওয়ার জন্য) দিতেন এবং ঐ রসোতের জল তৈরী ক'রে অর্শের বলি ধুতে ব'লতেন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য—বর্তমান সময়ে ভাল রসোত্ যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন ঐ কাঠ যথানিয়মে সিদ্ধ ক'রে সেই জল ব্যবহারে ক্ষতি কি?

ব্রণ রোপণে (ঘা পুরাবার জন্য) দারুহরিদ্রার সিদ্ধ ক্বাথ তৈলের সঙ্গে পাক ক'রে সেই তৈল ক্ষতে ব্যবহার করলে ক্ষতটি তাড়াতাড়ি পুরে যাবে। এক্ষেত্রে যতখানি তৈল (তিলের) নিতে হবে, তার দ্বিগুণ দারুহরিদ্রা নিয়ে ক্বাথ করতে হবে। এ পদ্ধতি আয়ুর্বেদীয় তৈল পাকের।

পিষ্টক মেহেঃ— যাদের প্রস্রাব চট্‌চটে রকমের হয়, তাঁরা এই দারুহরিদ্রা আর হরিদ্রা সমপরিমাণ নিয়ে (৬ গ্রাম পরিমাণে) ক্বাথ ক'রে প্রত্যহ সকালে কাঁচা দুধ মিশিয়ে খাবেন। (এটা সুশ্রুতের যোগ।)

কোষবৃদ্ধিতে (Hydrocele)— মেদস্বী দেহ, শরীরে কফের প্রাধান্য যেখানে, সেক্ষেত্রে দারুহরিদ্রার কাষ্ঠ ১২ গ্রাম নিয়ে থে'তো ক'রে গোমূত্র দিয়ে বেটে সেটা ছে'কে খেতে হবে। অথবা জল ও গোমূত্র সহ সিদ্ধ ক'রে ছে'কে খেতে হবে। গোমূত্র ২।৩ চামচ—জল ১ পোয়া। (এটা বাগ্‌ভটের।)

নেত্ররোগেঃ— গরম জলে দারুহরিদ্রা (৩ গ্রাম) থে'তো ক'রে ভিজিয়ে রাখতে হবে। ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর খেতে দিলে চোখ লাল, ব্যথা, ফুলা, জলঝরা, পিঁচুটি পড়া ইত্যাদি নিবৃত্তি পায়। (এটাও বাগ্‌ভটের।)

এবার শিরোনামার বক্তব্যটি আপনাদের জানাই—ন্যাবা হলে এদেশে অনেক টোট্‌কাও ব্যবহার হয়, যেমন—কোন জিনিষ হাতের তালুতে ঘষা, কোন ওষধির মালা পরা ইত্যাদি—এর উপকারিতাও অনেকে নাকি প্রত্যক্ষও ক'রে থাকেন; কিন্তু পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এ পদ্ধতির গুরুত্ব নেই। এখানে বিশেষ বক্তব্য প্রত্যক্ষ দ্রব্য-গুণের। উল্লিখিত দারুহরিদ্রার গাছে বার্‌বেরিন (Berberine) এবং অক্সিএকান্‌থিন্

(Oxyacanthine) ব'লে দ্ুটি দ্রব্য আছে, এ দ্ুটি কিন্তু মূলেই বেশী পাওয়া যায়। এর মূল চন্দনের মত ঘষে ১—২ চামচ মাত্রায় একটু মধু মিশিয়ে ৬।৭ দিন খাওয়ালে জণ্ডিসে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়, এটি পরীক্ষিত। এ ভিন্ন আরও বহুপ্রকার রোগে এটির উপযোগিতা বর্তমান; কিন্তু দুঃখ হয় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আবর্তে প'ড়ে সেটা কাগজেই র'য়ে গেল, বাস্তবে রূপায়িত আর হ'ল না।

পূর্বে উল্লেখ ক'রেছি, এই গাছটির একটি বৈদিক নাম 'পর্জন্যহরী', পর্জন্য অর্থে মেঘ অর্থাৎ মেঘকে সে হরণ করে; এ নিয়ে আরও গবেষণা করা যায়, কারণ মেঘের আকর্ষক বায়ু না হ'য়ে বৃক্ষ? এই গাছটির জন্মস্থান ৩—১১ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়িয়া অঞ্চলে, বিশেষতঃ হিমালয়ে। এই গাছের সে। শক্তির বিশেষত্বের বিচার বিজ্ঞানীদের পক্ষে কি অবাস্তব? হিমালয়ের দারুহরিদ্রা বৃক্ষবহুল অঞ্চলে কুয়াশার (Fog) অপ্রতুলতা আমি দিনের পর দিন ধ'রে লক্ষ্য করে এসেছি, কিন্তু এটা স্বীকার করছি যে, তখন এই কারণটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারিনি—আলোচনা প্রসঙ্গে একথা জানালেন আমার অগ্রজ *কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য মহাশয়। জানি না সে সমীক্ষা কোনোদিন হয়েছে বা হবে কিনা—তথাপি ঊষাকীর্তনের মতই মাঙ্গল্যকীর্তন গেয়ে যাই—যদি কারও মনে কৌতূহল জাগে।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz., berberine, oxyacanthine. (b) Sterols viz., betasitosterol, gamasitosterol. (c) Unidentified gummy containing nitrogen.

সহদেবী

আজ হয়তো এ কথাটা বিতর্কিত হতে পারে, তবে সোমরস যে নেশার জিনিস এবং সে যুগের মদের নাম, সে কথা এখন প্রায় স্বীকৃতিই পেয়েছে। শিরোনামের উৎস এবং কার্যকারণের সম্পর্কটা নিতান্তই আকস্মিক পাওয়া—আজ থেকে ২৫ বৎসর পূর্বে আমার বৈদ্যক জীবনে একবার ঔৎসুক্য জেগেছিলো, আদিবাসীরা যে হাঁড়িয়া প্রস্তুত করে তার বীজাধার কি? সেই সময়ে উপরিউক্ত গাছটি যে ঐ বীজের অন্যতম উপকরণ সেটা আমার নজরে এসেছিলো; এবং এটা যে বাস্তবে সত্যি সেটাও আমার পরীক্ষা করা। এ ভিন্ন নেপালের পাহাড়িয়াদের মধ্যে এটিও ঐ কাজে ব্যবহার করা হয়; তাই বলে এটা নয় যে, তার এই গুণ ভিন্ন আর কোন উপকারিতা নেই ও আর্যদের গোচরীভূত হয়নি। তার প্রমাণ অথর্ববেদ ২১।৩৭।৭৪ সূক্ত। সেখানে বলা হয়েছে—

> যা অগ্নিং বিদধাসি কামান্ লোকায় যুঙ্খ সহদেবা।
> সঞ্চিন্বন্তি ধিষ্ণ্যা রোচনে উচিষে, অপ্‌স্বা যজস্ব॥

মহীধর ভাষ্য করলেন—

> সহদেবা=দেহেন যুক্তা দিব্যতি=ইতি সা, সৈব মৃগাদনী যা বর্ষ-পুষ্পা 'দণ্ডোৎপলা' ইতি লোকে। তাং যমজাং আবেষ্ট্য ত্বয়ি অগ্নিঃ রাজতে অতঃ কামান্ লোকায় যুঙ্খ। ধিষ্ণ্যা চ রোচনে উচিষে, অপ্‌স্বা=মধুর রসান্ অনুযোজ। সঞ্চিন্বন্ অপি ভূরি রোগনাশিনী।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—তুমি তো সহদেবা (দেহে যুক্ত হ'য়েই যে তার ক্রিয়া

প্রকাশ করে) তুমি মৃগাদনী অর্থাৎ ব্যাঘ্র যেমন মৃগকে ভক্ষণ করেই আনন্দ লাভ করে তুমিও তৎসম। বর্ষপুষ্পই এর জীবন অর্থাৎ সমগ্র জীবনকাল ধরেই যে পুষ্পধারণ করে। দণ্ডোৎপল বলে তোমার লোকখ্যাতি। এটি যমজ স্বরূপ, এর দেহে অগ্নি বিধৃত হয়। মানবের সুখও এতে বিধৃত থাকে। রসে মধুর হয় এবং বহু রোগ দূর করে।

এ ভিন্ন ঐ কল্পের ১৫।৫।৩৯ সূক্তে উল্লেখ রয়েছে—

সহদেবী বিশ্বং সারিবাসু সোমং রাজানং অস্মভ্যং মধুমতী ভবন্তু।

উপরি উক্ত সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> সহাদিব্যাতি দিব্ অচ্, পীত দণ্ডোৎপলা সারিবাসু=বিষবায়ুষু সারিবা বিষভেদে, তজ্জ বায়ুষু মধুমতী ভব, অস্মভ্যং রাজানং সোমং বিশ্বমিতি।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—যে লতা পীতদণ্ডোৎপলা হ'য়ে প্রকাশ পায়, সেই বিষ-বায়ুকে দূর ক'রে মধুমতী ও আয়ুবর্ধক হয়। তাই সোমের এবং আমাদের জন্য আয়ুষ্কর।

এই সব ওষধির গুণের বিচার উপমাপ্রধান হ'লেও তার শক্তির পরিচয়ের ব্যাপকতা অতি বিস্ময়কর। বলেছেন এগুলি ঘৃত ও পরমান্নের তুল্য আয়ুষ্কর ভেষজ প্রতিনিধি।

পরিচিতির ক্ষেত্রে সায়ণ ভাষ্য ক'রলেন—

সহদেবী দণ্ডোৎপলা পীতপুষ্পাশ্চ।

প্রসঙ্গত ব'লে রাখি—নিম্নোক্ত সূক্তে বলা হ'য়েছে এটি আয়ুষ্কর। আমরা সাধারণে আয়ু ব'লতে বুঝি এটা জীবনীয়, প্রাণবায়ুকেন্দ্রিক, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আয়ু শব্দার্থের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক; সেটা হ'চ্ছে শরীরের যে কোন অঙ্গের অসুস্থতাই সেই অঙ্গের আয়ুহানি করে, একেই চরক সংহিতায় বলা হয়েছে খণ্ডায়ু বা অহিতায়ু; অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন না হয়েও যে অকর্মণ্য, অনেক ক্ষেত্রে সেই অকর্মণ্য অঙ্গটি আরও অঙ্গের অহিত ক'রতে পারে; অতএব তার প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক শক্তিই হ'চ্ছে আয়ুষ্কর। এই উক্তিটি তারই প্রতিধ্বনি; এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই এই শাস্ত্রটির নামকরণ করা হ'য়েছে আয়ুর্বেদ।

আমি আমার মূল বক্তব্যে ফিরে যাই।

প্রথমোক্ত সূক্ত থেকে আমরা কি পেলাম—

১। সহদেবা নামের দ্বারা দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তির আভাস;
২। পুষ্পিতকালের দ্বারা তার বৈশিষ্ট্যের পরিচিতি;
৩। তার অন্তর্নিহিত দ্রব্যশক্তি;
৪। যমজ শব্দের দ্বারা কি ইঙ্গিত বহন করে?

উত্তর পর্বে

চরক সংহিতার বিমান স্থানের অষ্টম অধ্যায়ে, সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়ে এবং চক্রদত্তের শূল চিকিৎসায় এর ব্যবহারগত ফলের কথা বলা হয়েছে।

গাছে মানুষে বয়োধর্মের অভিন্নতা

আমাদের যেমন তিন কাল (বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য) গাছেরও তেমনি; তবে যে গাছগুলি এক বছরে ফুল, ফল হ'য়ে সাধারণতঃ ম'রে যায় (বর্ষজীবী) তাদের ক্ষেত্রেই এই মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে; সেখানে বলা হয়েছে, বাল্যকালে থাকে শ্লেষ্মার (যেহেতু দেহের সর্বধাতুই অপুষ্ট), যৌবনে পিত্তের ও বৃদ্ধবয়সে বায়ুর স্বভাবপ্রবণতা। যে বয়সের যা, সেটার ব্যতিক্রম যেখানে এসেছে সেইটাই তার রোগসৃষ্টির হেতু। বয়সের স্বভাবধর্মিতায় যখন একটি ধাতুপ্রকৃতিকে ঠেলে দিয়ে আর একটি প্রকৃতি অধিকার করে, তখন পূর্বটির অসম বণ্টন চ'লতে থাকে; যাকে বলা যেতে পারে যথাক্রমে বয়ঃস্বভাবজাত পূর্ব ক্রিয়াটির বিকৃতি। এটাও অনেক ক্ষেত্রে রোগের কারণ হয়; তারই জন্যে আহার-বিহারের বিধিনিষেধ ও ভেষজ প্রয়োগ। এই বর্ষজীবী গাছের বেলায়ও তেমনি—পুষ্পিত হওয়ার পূর্বে গাছের অন্তর্নিহিত শক্তিতে থাকে কফপ্রবণতা, যখন সে পুষ্পিত হয়, তখন সে হয় অগ্নিগুণের অধিকারী আর গাছটা বুড়ো হ'লে আসে বায়ুর স্বভাবধর্মিতা। এখানে একটা কথা বলে রাখি—এই গাছটিকে সুপ্রাচীনগণ দেহের ও বয়সের তারতম্যের মত গাছটির মূল, মধ্যভাগ ও অগ্রভাগেরও রস বিচার করেছেন। অর্থাৎ মূলে শ্লেষ্মস্বভাব, মধ্যভাগে পিত্তের গুণ এবং অগ্রভাগে বায়ুর গুণ বিদ্যমান। তবে রোগের ক্ষেত্রে এই গাছ তার গুণ প্রকাশ করে (রোগপ্রকৃতি হিসেবে) হেতুবিপরীতভাবে অথবা ব্যাধিবিপরীতভাবে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বা সমতারক্ষার

পরিপূরক হিসেবে। সে বিচারটা আরও গোলমেলে। যা হোক, এই তিন কালের বিচার সেই চরক যুগেই হ'য়েছিল। আজ পাশ্চাত্য ভেষজ-বিজ্ঞানীদের সমীক্ষায় সেটা ধরা পড়েছে। তাঁরা এই তিন কাল বা বয়সের গাছকে নিয়েই অনুশীলন ক'রে তবে তাঁদের বক্তব্য পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের কাছে তুলে ধরেন।

পরিচিতি— গুল্মজাতীয় অতি সাধারণ গাছ। বাংলা ভিন্ন সমগ্র ভারতের আয়ুর্বেদ-সেবিগণ এই ওষধিটি প্রামাণ্য সুশ্রুত ভাষ্যকার ডল্বনাচার্যের মতবাদের সমর্থক, তাই তাঁরা ব্যবহার করেন এই গাছটিকে। এটি দেখতে অনেকটা বেড়েলা (sida cordifolia) গাছের মত, তবে কাণ্ড নরম ও সরলই বলা যেতে পারে, শাখাপ্রশাখা অল্পই হয়, পাতার দু'পিঠ অল্প রোমশ ও বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। এর ধারগুলি অধিকাংশেরই সমান, গাছের নিচের পাতা থেকে উপরের পাতা অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। ফুলগুলি কুকশিমা (Blumia lacera), যার চলতি নাম "বনমূলা" গাছের ফুলের মত গুচ্ছাকারে হয় এবং রং হালকা বেগুনে রং-এর। এই সহদেবী গাছে ফুল প্রায় সারা বৎসরই দেখা যায়; এমনকি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে একই ধরণের উচ্চতার মধ্যে জন্মে।

বীজ থেকে নূতন গাছ হয়, তবে পুরাতন গাছ কিছু কিছু থেকেও যায়। এ গাছ চিনে নিতে ভুল হয় না, কারণ এই গাছের মূলে একটি চমৎকার গোলাপ ও চন্দনের মিশ্র গন্ধের রেশ পাওয়া যায়। মূলটি শুকিয়ে গেলে গন্ধটি আরও সুমধুর হয়। গাছটি ২।৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু দেখা যায়, সারা ভারতেই (তবে মরু্জ নয়) এই গাছ ছড়িয়ে আছে। হিমালয়ের ৬।৭ হাজার ফুট উঁচুতেও এ গাছ দেখা যায়। আর দুই বাংলার পতিত জমিতেও এর অভাব নেই। একে চলতি নামে ছোট কুক্‌শিমে বলে। হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে একে বলে "সাদেয়ী"; এই নামটি সহদেবীর অপভ্রংশ শব্দনাম। এই গাছটি উত্তর বঙ্গে পরিচিত ডানকুনী নামে, তাঁদের মতে এটা শঙ্খপুষ্পী, এর বোটানি-ক্যাল্ নাম Vernonia cinerea Less. ফ্যামিলি Compositae. সাধারণতঃ এই ফ্যামিলির বীজের একটা বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে বীজের পিছনের দিকে ১ গুচ্ছ তুলোর আঁসের মত লোম থাকে। বীজ পাকলে বাতাসে ঐ বীজগুলিকে অন্যত্র উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং এইভাবে বংশবিস্তার করে।

বেদোত্তর যুগে দ্রব্যগুণানুসন্ধানে

চরক সংহিতার প্রতিবেদন—এটি বল ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকর ওষধি। সুশ্রুতে বলা হ'য়েছে এটা বায়ু ও পিত্তজনিত ব্যাধি দূর করে; চক্রদত্ত মন্তব্য ক'রলেন—এটা শূল চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাবে দ্রব্যান্তরের সহিত; এ ভিন্ন জ্বরে এর মূল মাথায় বাঁধার কথা; তারপর দ্রব্যগুণের প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ রাজনিঘণ্টুতে লেখা আছে—এটি হৃদ্‌রোগ, বাত, অর্শ, শোথ ও বিষমজ্বর নাশ করে আর বৃদ্ধি করে শুক্র ও বল। এর ঘর্মকারক শক্তিও আছে, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে (Stangury) এবং মূত্রকোষের আক্ষেপেও ব্যবহার করা হয়, একথা লিখেছেন পাশ্চাত্য মনীষী ক্যাম্পবেল্ মহোদয়।

লোকায়তিক ব্যবহার

বিশেষ সমীক্ষা—এই বনৌষধিটি দুটি খল রোগকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরোগ্য করে। একটি অর্শ (Piles) আর একটি ফাইলেরিয়া (শ্লীপদ), তবে এটা যে অর্শরোগের

ক্ষেত্রেও মহোপকারী সে কথা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কিন্তু তার ব্যবহার-বিধি আমাদের অনেকেরই অজানা।

ব্যবহার-বিধি— মূল সমেত কাঁচা গাছ ১৭।১৮ গ্রাম নিয়ে ৩।৪টি গোল মরিচের সঙ্গে জল দিয়ে বেটে এক পোয়া (সিকি লিটার) আন্দাজ কাঁচা দুধে গুলে, কাপড়ে ছে'কে নিয়ে, সকালে খালি পেটে ২১ দিন খেতে হবে।

আহারে বাছ-বিচারে— এই ২১ দিন মাছ, মাংস, ডিম, মুগের ডাল, তে'তুল, লঙ্কা ও তেল খাওয়া নিষেধ।

খাওয়া চ'লবে—দই, দুধ, অল্প ঘিয়ে রান্না সব রকম তরকারী, টোমাটো, ঝাল হিসেবে গোল মরিচ, তবে সেটা নামমাত্র।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদে অর্শরোগ— এই রোগনির্ণয়ের সূত্রে মত-পার্থক্য বর্তমান। পাশ্চাত্য মতে এ রোগ Systemic vein এবং Portal vein- এর রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহের বাধাই (obstruction) এই রোগের কারণ হয়; অবশ্য এই বাধা সৃষ্টি বহুবিধ কারণে হ'তে পারে, তবে প্রধানভাবে যকৃৎ (লিভার) দোষই মুখ্য কারণ বলে তাঁরা মনে করেন। প্রাচ্য চিন্তাধারা হ'চ্ছে—এই রোগ বায়ু, পিত্ত ও কফের একক বা সংযোজক বিকৃতিতে রস, রক্ত, মাংস ও মেদকে দূষিত ক'রে আত্মপ্রকাশ করে। তবে শারীরক্রিয়ার বাস্তবতা বিশ্লেষণ ক'রলে মনে হয়, দুই মতবাদের কেন্দ্রবিন্দু একই। আর উত্তরাধিকারী সূত্রেও যে অর্শরোগ হয় সেটা নব্য ও প্রাচীনে একমত।

সাবধানতা

(১) অর্শজনিত অধিক রক্তস্রাব হ'তে থাকলে সেটা হঠাৎ বন্ধ করা অসমীচীন, তদ্দ্বারা আসতে পারে অন্য নানা প্রকার উপসর্গ। তাই আয়ুর্বেদের চিকিৎসা পদ্ধতি একটু পৃথক।

তদ্ভিন্ন এই রোগের আনুষঙ্গিক উপসর্গও অনেক সময় থাকে; সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন-বোধে এগুলিকে নিরসনের প্রয়োজন হয়।

(২) **আর একটি বিশেষ প্রয়োগ ক্ষেত্র ফাইলেরিয়া বা শ্লীপদ রোগে—** কেবল এই রোগ কেন, বহুরোগ সম্পর্কেই দুটি চিকিৎসাশাস্ত্রের রোগ-বিজ্ঞানের চিন্তাধারা বিপরীতমুখী। এক সম্প্রদায় ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রাধান্যে বিশ্বাসী, আর এক সম্পদায় জীবাণু-তত্ত্বে বিশ্বাসী; সে ক্ষেত্রে চিকিৎসার ধারা পৃথক হওয়া খুব স্বাভাবিক। একজন ব'লছেন ক্ষেত্রটিকে এমনভাবে অনুপযোগী করো, যেখানে জীবাণুর সৃষ্টিই না হয়। আর একজনের মতে, যেখানে জীবাণুর প্রাধান্য স্বীকৃত সেখানে তারই বিনাশ করা মুখ্য চিকিৎসা; সুতরাং নীতিগত পার্থক্য থাকবেই। আমার বক্তব্য হ'লো লেজের আগুন নিভানো দরকার; এই ওষধিটি সেই কাজের উপযোগী কিনা সেটাই বিচার্য।

কি ভাবে প্রয়োগ ক'রতে হবে— সমগ্র গাছ (মূল সমেত) ১২।১৩ গ্রাম, ৫টি গোল মরিচ ও ৫টি বড় এলাচ একসঙ্গে জল দিয়ে শিলে পিষে নিয়ে পাতলা কাপড়ে ছে'কে ঐ জলীয়াংশ ঈষদুষ্ণ ক'রে সকালে একবার খেতে হবে। এইভাবে ২১ দিন খেলে রোগের উপশম হয়। এই সময়টায় ক্ষীর ও দই খাওয়া নিষেধ। এটি ভাগলপুর অঞ্চলের বৈদ্যসম্প্রদায় ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন।

(৩) ক্রমশ শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে (বৃদ্ধ বয়সে) সে ক্ষেত্রে ১০।১২ গ্রাম (শুষ্ক

হ'লে ৫ গ্রাম) গাছে-মূলে নিয়ে জল আধ সের ও দুধ আধপোয়া একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে দুগ্ধাবশেষ অর্থাৎ আন্দাজ আধপোয়া থাকতে নামিয়ে, ছে'কে ঐ দুধটি খেতে হবে। এটি ব্যবহারকালে অন্ততঃ আধ সের আন্দাজ দুধ প্রত্যহ খেতে পারলে ভাল হয়।

(৪) বয়সের স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতিজনিত দুর্বলতায়, অল্প পরিশ্রমে কাতর, সে ক্ষেত্রে এই গাছের পঞ্চাঙ্গ (মূল সমেত সমগ্র গাছ) কাঁচা ১০ গ্রাম আর শুষ্ক হ'লে ৫ গ্রাম নিয়ে একপোয়া জলে সিদ্ধ ক'রে অবশিষ্ট এক ছটাক আন্দাজ থাকতে নামিয়ে ছে'কে একটু ঘিয়ে সাঁতলে প্রত্যহ খেতে হয়, এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যায়।

(৫) সহদেবীর সমগ্র গাছ ছে'চে রস ক'রে ৪ চামচ আন্দাজ একটু গরম ক'রে অথবা আন্দাজ আধ পোয়া (১০০ মিলি লিটার) গরম দুধে মিশিয়ে, তার সঙ্গে একটু চিনি বা মিছরি দিয়ে খেলে, মাথাঘোরা ও ভুল হ'য়ে যাওয়া অবশ্যই কমে যায়; তবে প্রথম দুই দিন অর্ধেক মাত্রায় আরম্ভ করাই ভাল।

(৬) যাদের কোষ্ঠে সর্বদা ক্রিমি জন্মে, যার জন্যে বমি বমি ভাব, থুথু ওঠা, চোখে কালি পড়া—এসব পুরানো আমাশয়ের লক্ষণ, এসব ক্ষেত্রে সহদেবীর রস সকালে ১।২ চামচ একটু গরম ক'রে খেতে হয়, অবশ্য পাটনা অঞ্চলে ক্রিমির উপদ্রব কমানোর জন্য এই গাছের বীজ ব্যবহার ক'রে থাকেন। এক্ষেত্রে এই গাছটির বীজ ব্যবহারের একটা যুক্তি আছে—এইহেতু যে এটি vernonia গণের গাছ। আমাদের সোমরাজীও সেই vernonia গণের।

(৭) **অনিয়মিত মাসিকে—** ৩।৪ মাস অন্তর হ'চ্ছে, তলপেট ও নিতম্ব ভেরে যাচ্ছে, তাঁরা এই গাছের রস ২ চামচ একটু গরম ক'রে প্রত্যহ কিছুদিন একবার ক'রে খেলে ঐ দোষটা চ'লে যাবে।

(৮) **বিষমাগ্নিতে—** যখন-তখন ক্ষিধে লাগে আবার না খেলেও অস্বস্তি, আর খেয়েও কোন লাভ হ'চ্ছে না, অর্থাৎ বায়ুপ্রধান অগ্নিমান্দ্য—এই রকম ক্ষেত্রে এই গাছের রস ২ চামচ একটু গরম ক'রে খেতে হয়।

(৯) **পেট ব্যথায়—** (বায়ুর জন্য) আমাশার জন্য নয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ২ চামচ রস গরম জলে মিশিয়ে খেলে উপশম হয়।

(১০) **খিল ধরায়—** শুধু হাঁটু দুটোতেই ধরে, ব্যথাও হয়; সেক্ষেত্রে এই সহদেবীর পাতার রস ২ চামচ জল মিশিয়ে খেতে হয়। আর বেটে অল্প গরম ক'রে ওখানে লাগাতে হয়।

(১১) **আধি রোগে** (মেলান্‌কোলিয়ায়)— যে উন্মাদ বিদ্রোহ করে না, বসে মনে মনে বকে, এসব ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন বৈদ্যগণ সর্পগন্ধার মূলের (Rauwolfia Serpentina) চূর্ণ খেতে দিতেন, কারণ তাঁদের মতে এটি নাকি শঙ্খপুষ্পী; ও অঞ্চলে এই গাছ ডানকুনী নামে পরিচিত; কিন্তু এ সব অঞ্চলে Canscora decussata গাছকেই ডানকুনী বলা হয়।

এই সব লৌকিক ব্যবহারকে কেন্দ্র ক'রে বনৌষধির গবেষণা ক'রলে দ্রব্যের অন্তর্নিহিত বস্তুসত্ত্বার সন্ধান পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

পরিশেষে আমার বক্তব্য হ'চ্ছে, গত ১২শ খৃষ্টাব্দ থেকে আমাদের সম্প্রদায় যাযাবর হ'য়ে গিয়েছে, আজ তার বাহ্য জৌলুস না থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু সেই পূর্বপুরুষের জীর্ণ উই-এ খাওয়া কোষ্ঠিটা এখনও কিন্তু বগলে আছে। আজ আমাদের এসেছে inferiority complex । সেটুকু এ সম্প্রদায় কি আর কাটিয়ে উঠতে পারবে না?

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Acid viz. threo 12, 13-dihydroxyoleic acid. (b) Terpenoids viz. betaamyrin, betaamyrin acetate, lupeol, lupeol acetate, betaamyrin benzoate. (c) Sterols viz. alpha sitosterol, beta sitosterol, stigmasterol. (d) Carbohydrates.

বর্ব্বুর

শুষে নিয়ে নিজেই ভোগ ক'রবো—এ প্রকৃতির মানুষও যেমন আছে, আবার শোষণ ক'রলেও অপরের কল্যাণও কিছু করে এরও অভাব নেই; বৃক্ষজগতের মধ্যেও এই প্রকৃতির বৈচিত্র্যও বর্তমান। আলোচ্য বর্বুর বৃক্ষটি কিন্তু এই শেষোক্ত পর্যায়ে পড়ে।

তাছাড়া সুপ্রাচীন যুগে সোমরস পান করারও রেওয়াজ ছিল, হয়তো বা সেই সোমরসের স্বভাবধর্ম মদকারী (মত্ততাকারী), তবে সে দ্রব্যটি যে জীবনীয় সেটার সম্পর্কে সন্দেহ নেই। বর্তমানের মদ নাম শব্দটির উৎপত্তি সেই থেকেই নয় তো?

যে রসিকজন সোমরসে মত্ততা সৃষ্টি করে এই অর্থমাত্র গ্রহণ করেন, তাঁরা ভিন্ন সাধারণের প্রশ্ন নিশ্চয়ই থাকবে যে—তা হ'লে কি মদ ভাল? তার উত্তরে বলা যায়—ক্ষেত্র, কাল ও প্রকৃতি বিচার ক'রে মাত্রামত সাপের বিষও তো জীবন রক্ষার কাজে ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে, সেই রকম এটিও শরীরের স্রোতপ্রবাহকে সিঞ্চন ক'রে জীবনকে সঞ্জীবিত করে, এটাও অন্যতম সত্য; যাকে বলা যায়—

প্রকৃতির ভূস্তরে উদ্ভিদগুলির বেঁচে থাকার মধ্যেও তাদের দেহকোষ সেইভাবে

নিশ্চয়ই গঠিত হয়। কারণ রসায়নটাই যখন দীর্ঘ জীবনের মৌল উপাদান।

এ সব তথ্যের উৎস কোথায়?

> পৃথিব্যাঃ সৃজাম্যদ্ভিঃ ওষধীভিঃ পয়সা প্রসবে যন্তুর্যন্ত্রেণাগ্নেঃ ঋতুভিঃ কল্পয়তি।
>
> অথর্ববেদ—বৈদ্যককল্প ২২।৫।৭০ সূক্ত

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য করেছেন—

> পৃথিব্যাঃ অদ্ভিঃ সৃজামি প্রসবে যন্তুঃ যন্ত্রেণ অগ্নেঃ=জাঠরাগ্নেঃ ঋতুভিঃ ওষধীভিঃ বর্বূরপয়সা সৃজামি। বর্বূর ইতি বর্ব+উরচ্ বর্বশ্চ স্তব্ধতায়াং বৃক্ষ ভেদে ইতি যাস্কঃ। তস্য পয়সা পৃথিব্যাঃ রসমিব অগ্নেঃ রসং শোষয়তি ইতি সৃজামি।

উপরিউক্ত ভাষ্যটির অর্থ হ'চ্ছে—এই বর্বূর পৃথিবীর রস শোষণ ক'রেই জন্মগ্রহণ করিতেছে। অর্থাৎ মরুস্থলেও সে জন্মগ্রহণ করে। একে জলসেচন ক'রতে হয় না।

এর রস পৃথিবীর মত জঠরাগ্নিকেও শোষণ করে। অত্যাগ্নি তাপ ও বহুঋতুর আবির্ভাবেও স্তব্ধতা প্রাপ্ত হয়ে রস দান ক'রে, তাই সৃজন করিতেছি।

আমাদের সর্বজন পরিচিত বাবলা গাছেরই সুপ্রাচীন নাম 'বর্বুর', অর্থাৎ সর্বত্র সে যেন স্তব্ধ বা অজ্ঞের মত থাকে; বৈদিক সূক্ত ভাষ্যে বর্বুর শব্দের অর্থ তাই করা হ'য়েছে; সঙ্গে সঙ্গে এও বলা হ'য়েছে—যদিও এটি বর্বুর, কিন্তু বিনা সেচনেই এই বৃক্ষটি জীবনায়ু লাভ করে। বহু ঋতুর আসা-যাওয়ার মধ্যেও সে আত্মরক্ষণ করে, এমনকি মরুভূমিতেও সে সেচনের জন্য অপেক্ষা না রেখে জীবিত থাকে। এর নিজ দুগ্ধই তার জীবনকে সিঞ্চিত করে; কারণ, এর শরীরস্থ রসই তো ঘনীভূত হ'য়ে নির্গত হয়, যেটা আমরা গঁদের আকারে দেখতে পাই। এর এই অন্তর্নিহিত সঞ্জীবন রসই বিভিন্ন ঋতুকালজ (শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি) বিপর্যয়ের মধ্যেও জীবনকে রক্ষা করে, এমনকি মরুপ্রান্তরেও।

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, 'বর্বরাণাং ধনক্ষয়ঃ' অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তির ধন কেবল ক্ষয় করার জন্য। মধ্যযুগীয় সামাজিকগণ অজ্ঞব্যক্তি বলেই তাঁদিকে নির্বাচন ক'রেছেন, কিন্তু যাঁরা কৃপণ তাঁরা না খেয়ে না দেয়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে ধনই সঞ্চয় ক'রে যান, আর বুদ্ধিমান তস্কর সেটাকে কাজে লাগিয়ে থাকে। এই বাবলা গাছের জীবনীশক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও হয়তো বা উপমাটা সেই ধরণের বৈদিক ইঙ্গিত।

সংহিতা যুগের অনুশীলন

বৈদিক সূক্তটির অন্তর্নিহিত শক্তির তাৎপর্য অনুশীলন ক'রে আয়ুর্বেদের সুপ্রাচীন সংহিতাগুলিতে সন্নিবেশিত হয়েছে; সেখানে শরীর পোষণের প্রাথমিক উপাদান যে রস ধাতু, সেটার ক্ষয়, এমন কি জীবনীয় যে শুক্রধাতু তার যেখানে ক্ষয় হয় সেখানে এবং অতিসারে(Diarrhoea), মূত্রাতিসারে(Diabetes insipidus)এবং ব্রণের প্রবল রসক্ষয় এবং পূঁজের উৎপত্তিদ্বারা দেহের ক্ষতপথে ক্ষয় প্রভৃতি—সেইসব ক্ষেত্রে এই বাবলার ঘনীভূত রস (গঁদ), পাতার ও ছালের (বৃক্ষ ত্বকের) ক্বাথ বাহ্য ও আন্তর ব্যাধিতে ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। এই ভেষজটি তিক্ত কষায় রসে পূর্ণ, যেহেতু এটি বায়বীয় শক্তিতে সমৃদ্ধ তাই সে গুণে লঘু, সূক্ষ্ম স্রোতোগামী। তাই এটি উপসর্পিত বা আগন্তুক ব্যাধিতেও ব্যবহার্য।

সংস্কারের দড়ির গুচ্ছ স্বরূপ এই পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি, সেযুগে ধর্মীয় আরব্য উপন্যাস বলা চলে, তবে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি সমাজব্যবস্থার শৃঙ্খলা রক্ষায়, কি স্বস্থবৃত্তের নীতি নির্ধারণের সরণী হিসেবেই তাকে সাজানো হয়েছে। এখানে সেইরকমই একটি পৌরাণিক উপাখ্যানের অবতারণা ক'রছি এই বাবলাকে কেন্দ্র ক'রে।

কোন এক সময়ে ছিল যজ্ঞে পশুবলির বিধি। সেই বলির মধ্যে গো-বলি, ছাগ-বলি সমপর্যায়েই ধরা হ'তো, তবে গো পশু পাওয়া গেলে সেই হ'তো সর্বোৎকৃষ্ট, তাই প্রায়ই ধনীর বাড়িতে যে সব যজ্ঞ হ'তো, তাতে ব্রাহ্মণগণ পরমানন্দে গোমাংস ভক্ষণ ক'রতেন; কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই তাদের অগ্নিমান্দ্য হ'তে লাগলো, এমনি যজ্ঞের মধ্যে 'পৃষধ্র' রাজার যজ্ঞটিই বেদে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হ'য়ে আছে।

সেখানে বলা হয়েছে—

'গবাং সংধ্রাণাং পৃক্ষং মাংসং যবাপহম্'

অর্থাৎ গোমাংসগুলি তাঁদের যব ভক্ষণেরও সামর্থ্য নষ্ট করে দেয়; সুরু হয় অতিসার পীড়া। (এই উপাখ্যানের সারাংশটি চরকের চিকিৎসাস্থানের দশম অধ্যায়ের প্রথমেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে)। তারপর ঋষিগণ যখন অতিসার পীড়ায় আক্রান্ত হ'য়েছিলেন, তাতেই তাঁরা উপলব্ধি ক'রলেন, অগ্নি উপহত হ'য়ে বায়ু মূত্র স্বেদকে পুরীষাশয়ে দ্রবীকৃত ক'রে অতিসার উৎপাদন ক'রেছে; অর্থাৎ বাতাতিসারের জন্ম হয়। পুরীষ (মল) জলের মত হয়, এবং শরীরও অবসন্ন হয়, মূত্র বন্ধ হয়ে যায়, এবং বায়ু কোষ্ঠে আবদ্ধ হ'য়ে শব্দ হয়, তারপর পেটে শূলের মত অসম্ভব যন্ত্রণা হ'তে থাকে; বায়ু তখন তির্যকভাবে উদরে পরিভ্রমণ করে। (এই লক্ষণযুক্ত রোগটি কিন্তু বর্তমানের কলেরা রোগের লক্ষণের সঙ্গে হুবহু মিল আছে)। সুশ্রুতেও এইভাবে বর্ণনা করা আছে।

এমনিভাবে অতিসার কখনও পিত্তবিকারের, কখনও বা শ্লেষ্মাবিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগটি দ্রুত প্রাণনাশকও হয়; আবার কালে তা অসাধ্য গ্রহণী রোগেও পরিণত হয়। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসককে আহার্য ও ঔষধের ব্যবহারের দুটি পথ ধরতে বলা হ'য়েছে; একদিকে তাকে যে সব ভেষজের মধ্যে দীপনশক্তি আছে, তাদের সাহায্যে তার অগ্নিবল উদ্দীপ্ত করা, আর সংগ্রাহী ভেষজের সাহায্যে শরীরের জলীয়াংশ বা মলাংশকে ধ'রে রাখা। এক্ষেত্রে বাবলাকে ব্যবহার করা হয় সংগ্রাহী ভেষজ হিসেবে, অগ্নির উদ্দীপ্তকারক হিসেবে নয়; তাই যেখানে সামান্য সংগ্রাহী ভেষজের প্রয়োজন, সেখানেই এই বাবলার ব্যবহার। এ সম্বন্ধে চরক ও সুশ্রুত একমত। অতএব কিবা আন্তর কিবা বাহ্য, যে ক্ষেত্রেই অতিসারণ ঘটে সেইখানেই বাবলার প্রয়োজন। এমনি কতকগুলি যোগের দ্বারা বাবলাকে সংগ্রহভেষজের আদর্শ ভেষজ হিসেবেই পেয়ে আসছি।

পরিচিতি

যদিও তার পিতৃভূমি ধন্বনদেশ (মরুদেশ) তবুও ভারতের মরুভূমি অঞ্চলে এর বাড়-বৃদ্ধি খুব; তবে বৃক্ষটি আনুপদেশ (জলাসন্ন দেশ) অথবা জাঙ্গল দেশ, প্রায় সব দেশের জলবায়ুর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে; সে শক্তি ও স্বভাবধর্ম সে পেয়েছে আপন প্রকৃতির কাছ থেকে।

মাঝারি গাছ ২৫।৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচুও দেখা যায়, তবে সাধারণতঃ ১৫।২০ ফুটই সর্বদা নজরে আসে। পাতা আকারে তেঁতুল পাতার মত বটে, তবে সাইজে সর্বদিকেই তার অর্ধেক। গাছে সোজা লম্বা লম্বা কাঁটা; গত যুদ্ধের সময় এই কাঁটা আলপিনের পরিবর্তে ব্যবহার হ'য়েছে; সুতরাং কাঁটার আকৃতিটি পরিস্ফুট। চারাগাছেই বেশী কাঁটা, পাছে গরু, ছাগল বা উটে তাকে মুড়িয়ে খেয়ে ফেলে, তাই এটা তার বেঁচে থাকার প্রকৃতিদত্ত হাতিয়ার। তবে এটা যে মরুদেশজ গাছ সেটা তার কাঁটার গঠন দেখেই বোঝা যায়। একটা সরু শিরে সমান্তরালভাবে ১০-১২ জোড়া সূক্ষ্ম লোমাবৃত পাতা থাকে, ফুল দেখতে গোল, আকারে মটর সদৃশ হ'লেও মনে হয় যেন রোম দিয়ে তৈরী। ফল ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা, আধ-ইঞ্চি চওড়া, চেপ্টা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সাদা রোমাবৃত, তাই দেখতে সাদাটে (শ্বেতাভ), ফলে ৮।১০টি বীজ থাকে, গাছের গুঁড়ি দীর্ঘদিনে মোটা হয়, এর কাঠ খুবই শক্ত, বাংলাদেশে লাঙ্গল ও গরুর গাড়ীর চাকা এই কাঠে তৈরী হয়।

পাশ্চাত্য ভেষজবিজ্ঞানীদের মতে এটির বোটানিক্যাল্ নাম Acacia arabica willd ফ্যামিলি Leguminoseae.

এই বাবলা নামের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আর একটি গাছ এদেশে হয়; তার প্রচলিত গ্রাম্য নাম 'গুয়ে বাব্লা'। গুয়ে এই বিশেষণ দেওয়াটার কারণ হ'লো এই গাছের ত্বকে (ছালে) পাওয়া যায় যেন বিষ্ঠার গন্ধ, কিন্তু ফুলে পাওয়া যায় বর্তমানের প্রসিদ্ধ Scent 'মাইমোসা'র (Mimosa) গন্ধ। এই গাছগুলি আকারে ছোট হয় এবং এর বাড়-বৃদ্ধিও কম; এটির বোটানিক্যাল্ নাম Acacia farnesiana willd. এটি Leguminoseae ফ্যামিলিভুক্ত। প্রাচীন বনৌষধি গ্রন্থকারের মতে, এটি বিট খদির নামীয় গাছ। এই Acacia গণের আরও বহু প্রজাতি আছে, তার মধ্যে আলোচ্য বর্বুর বা বাবলা গাছের বোটানিক্যাল্ নাম Acacia arabica willd. আমাদের খদির বা খয়ের গাছ, শমী বা শাঁই গাছ এই Acacia গণভুক্ত। এই বাবলা গাছের হিন্দি নাম ববুর, ববুল ও কীকর।

রোগ প্রতিকারে পত্রের ব্যবহার

(১) **পাতলা দাস্তে**— তার সঙ্গে আম সংযুক্ত আছে, সেক্ষেত্রে কচিপাতা ৩/৪ গ্রাম আধ পোয়া জল সিদ্ধ ক'রে এক ছটাক থাকতে নামিয়ে ছেঁকে, অল্প চিনি মিশিয়ে সেটা একবার বা দুইবারে খেতে হয়। এর দ্বারা ওটা সেরে যায়; তবে ঐ পাতা সিদ্ধ করার সময় কুড়চির ছাল ৩/৪ গ্রাম দিয়ে থাকেন অনেক বৈদ্য, অবশ্য এটা চক্রদত্তের ব্যবস্থা।

(২) ৫/৭ গ্রাম পাতা ৩ কাপ জলে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে সেই জলে ক্ষত ধুলে ওটা সেরে যায়, এমনকি ক্ষতে পচনক্রিয়া আসতে দেয় না; এ ভিন্ন পাতার মিহি গুঁড়ো ক্ষতের উপর ছড়িয়ে দিলে ওটা সেরে যায়।

হাজা হ'লে এই পাতার মিহি গুঁড়ো হাজার উপর ছড়িয়ে দিতে হয়।

(৩) **কর্ণমূল হ'লে**— ডাক্তারি মতে এটির নাম মাম্স্ (Mumps). সাধারণতঃ কানের গোড়া ফোলা, তার সঙ্গে জ্বর (অবশ্য এ জ্বর হয় দুই-একদিন বাদে) সেক্ষেত্রে পাতা ১০/১২ গ্রাম, ভাজা বালি ২০।২৫ গ্রাম, খয়ের (খদির) ২।৩ গ্রাম একসঙ্গে বেটে গরম ক'রে ২/৩ বার প্রলেপ দিতে হবে। দুই-একদিনের মধ্যে ফুলো ও ব্যথা দুইই ক'মে যাবে। তবে জ্বর হ'লে আভ্যন্তরিক ঔষধের প্রয়োজন থাকবেই। তাছাড়া মাম্স্ ভিন্ন সন্নিপাতজনিত গাল, গলা ফোলায় ২।৩ দিনেই আরোগ্য হয়।

প্রাচীন পদ্ধতিতে ঘনসার (Solid Extract) প্রস্তুত বিধি

বাবলা গাছের পঞ্চাঙ্গ (মূলের ছাল, গাছের ছাল, পাতা, ফুল ও ফল)—গাছের এই পাঁচটি অঙ্গ একসঙ্গে যতটা নেওয়া হবে তার ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করে চতুর্থাংশ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, তাকে মৃদু আঁচে (অগ্নিতে) পাক ক'রতে হবে। ঘন হ'য়ে গলিত পিচের মত হ'লে, যাকে বলা যায় Semi solid, গরম অবস্থায় তার সঙ্গে প্রতি কেজি গাছের ঘনসারের জন্য ৮ থেকে ১০ গ্রাম মত সোহাগার খৈ মিশিয়ে দিতে হবে। এটি দেওয়ার কারণ তার সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা। এটি প্রস্তুত ক'রে রাখলে বহুক্ষেত্রেই একে সহজে প্রয়োগ করা যাবে।

(৪) **দাঁতের মাঢ়ী ফুলোয়**— উপরিউক্ত ঘনসারে একটু জল মিশিয়ে তুলি ক'রে মাঢ়িতে লাগাতে হয়।

(৫) **মচ্‌কে গেলে—** ফ্‌লো ব্যথা দ্‌ইই আছে অথবা ফ্‌'লো আছে ব্যথা নেই, সেক্ষেত্রেও একট্‌ জল মিশিয়ে পাতলা ক'রে লাগালে ওটা সেরে যাবে।

(৬) **গল ক্ষতে—** ২/৩ গ্রাম ঘনসার নিয়ে আধ কাপ অল্প গরম জলে মিশিয়ে, সেই জলে কুল্লি (Gargle) ক'রলে ওটা সেরে যায়; আর যদি ম্‌খে বা গলায় ক্ষত থাকে সেটাও সেরে যায়। অথবা ১০।১২ গ্রাম বাবলা গাছের ছাল আধ সের জলে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, সেই জলে কুল্লি (Gargle) ক'রলে যে গলার ঘা কিছ্‌তেই সারছে না সেটা সেরে যাবে।

(৭) **প্রদর রোগে—** এটা স্ত্রীরোগ, ঋতুমতী হওয়ার পর সব বয়সেই হ'তে পারে, এক্ষেত্রে ২ গ্রাম আন্দাজ ঘনসার এক পোয়া আন্দাজ জলে গ্‌লে উত্তরবস্তি দিতে হয়— যাকে বলা যায় ডুস্‌ দেওয়া; এর দ্বারা সাদা স্রাবটা বন্ধ হ'য়ে যাবে।

(৮) **স্তনের ক্ষতে—** শিশ্‌দের ম্‌খের টানে অনেক সময় এটা হয়, সেক্ষেত্রে বাবলা গাছের শ্‌ধ্‌ ছাল আন্দাজ ৮।১০ গ্রাম একট্‌ থে'তো ক'রে নিয়ে সেটা সিদ্ধ ক'রে সেই জলে ধ্‌য়ে ফেললে ওটা সেরে যায়।

(৯) **প্রবল কাসি—** তার সংগে কফের যোগ, সেক্ষেত্রে বাবলার ফল চ্‌র্ণ ২ রতি (৪ গ্রেণ) মাত্রায় অল্প চিনি বা মিছরির গ্‌ড়ো মিশিয়ে দিনে রাতে মোট ৩ বার খেতে হয়, এর দ্বারা শ্লেষ্মাও উঠে যায়, কাসিও কমে।

(১০) **পিত্তের দাহে—** ২/৩ গ্রাম গ'দ (বাবলার আঠা) আধ পোয়া জলে রাত্রে ভিজিয়ে রাখতে হবে, সকালে একট্‌ চিনি মিশিয়ে সরবৎ ক'রে খেতে হবে।

(১১) **রক্তস্রাবে—** সে উর্ধ্ব বা অধো যে মার্গ থেকেই হোক না কেন, ৩/৪ গ্রাম গ'দের সরবৎ ক'রে খেতে হয়, এর দ্বারা দ্‌ই-একদিনেই তার উপশম হয়।

(১২) **ম্‌ত্র-কৃচ্ছ্‌তায়—** যৌবনের গণোরিয়া রোগের পরিণতিতে প্রৌঢ়কালে প্রস্রাবের সময় মাঝে মাঝে কষ্ট হ'চ্ছে, সেক্ষেত্রে ২ গ্রাম আন্দাজ গ'দের গ্‌ড়োর সরবৎ ক'রে, তার সংগে আমর্‌ল শাকের (Oxalis Corniculata) রস ২ চামচ অথবা ৩ গ্রাম আন্দাজ শ্‌ষ্ক শাক ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে সেই জলের সংগে গ'দের গ্‌ড়ো মিশিয়ে সরবৎ ক'রে খেলে এই অস্‌বিধেটা চলে যায়। এটা প্রাচীন বৈদ্যগণের একটি ম্‌ষ্টিযোগ। মেহ রোগে শ্‌ধ্‌ গ'দের গ্‌ড়ো ২/৩ গ্রাম সরবৎ ক'রে খেলেও উপকার হয়।

(১৩) **শ্‌ক্র প্‌ষ্টিতে—** ছোট ছোট ট্‌করো গ'দকে ঘিয়ে ভেজে, গ্‌ড়ো করে, তার সংগে চিনি মিশিয়ে লাড্ড্‌ তৈরী হয়; এটার ওজন আন্দাজ ১০।১২ গ্রাম হবে। এই লাড্ড্‌ একটি বা দ্‌টি খেয়ে এক কাপ দ্‌ধ খেয়ে থাকেন রাজস্থানীরা। তাঁরা উপকার নিশ্চয়ই পেয়ে থাকেন।

(১৪) **বত্তিশা—** এই বত্রিশ (৩২) সংখ্যাটির উচ্চারণের অপভ্রংশ হ'য়ে বত্তিশা হ'য়েছে; আসলে পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, বংশ লোচন, আখরোট্‌ প্রভৃতি ৩১টি দ্রব্যের সংগে ঘিয়ে ভাজা গ'দকে গ্‌ড়ো ক'রে সব জিনিস চিনির সংগে পাক ক'রে লাড্ড্‌ বানানো হয়। হরিয়ানা, পাঞ্জাব এইসব অঞ্চলে প্রস্‌তা নারীর ভগ্ন-স্বাস্থ্যের প্‌নর্‌দ্ধার ও স্‌স্থ রাখার জন্য এইটি খাওয়ানোর রীতি আবহমান কাল থেকে চ'লে আসছে।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Sucrose. (b) Tannin. (c) Enzyme. (d) Auxins.

প্রসারণী
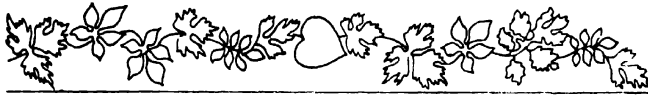
গ্রামাঞ্চলে কিশোর বয়সে কৌতুকের একটি প্রধান উপাদান ছিল এই গাঁদাল পাতা, এটা আরও বাস্তব রূপ নিতো, যদি এর পাতার রস সরষের খোলে (খইল) মিশিয়ে নিয়ে সেটাকে কাপড়ে লাগানো হ'তো; কারণ একেই তো তার লতাপাতায় বিষ্ঠার গন্ধ, তার ওপর খৈলের সংযোগ; হয়তো বা এই বিষ্ঠাগন্ধের জন্য সমাজে সে অভদ্রা, কিন্তু বৈদিক সমীক্ষায় সে ভদ্রা।

কেন তা ব'লছি—

> "যা ভদ্রাণি সরণী প্রতিমণ্ডতে প্রাসাবীদ্ ভদ্রং দ্বিপদে চতুষ্পদে নাকমখ্যৎ বরেণ্যা প্রয়াণে মুষসো বিরাজতে।
>
> অথর্ববেদ বৈদ্যককল্প ১১।১৪৮।৫৭

ভাষ্যকার মহীধর লিখেছেন—

> অস্যা ভদ্রায়া=লতায়াঃ। প্রতি মণ্ডতে ভদ্রং প্রাসাবীদ্। ইয়ং বরেণ্যা=শ্রেষ্ঠা। দ্বিপদে চতুষ্পদে=মনুষ্যপশ্বাদিভ্যো ভদ্রং=কল্যাণং প্রাসাবীদ্=প্রেরয়তি। উষসো সবিতুঃ পুরোগামিনী ইয়ং সরণী সতী যা নাকং=স্বর্গং সুখং ব্যখ্যৎ প্রকাশয়তি। ভদি মঙ্গলং রক্ সা ভদ্রা। সৃ+অনি=পথি।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'চ্ছে—এইটি ভদ্রা লতা। এটি সরণী। এটি বরেণ্যা। মনুষ্য ও পশ্বাদির জন্য কল্যাণ প্রেরণা করে। সূর্য যেমন সর্বাগ্রগণ্য হ'য়ে সকলের মঙ্গল বিধান করেন, এই সরণীও গতিশালিনী হ'য়ে স্বর্গসুখ প্রকাশকর।

যবনিকার অন্তরালে

এই সরণী বা গাঁদাল যে মনুষ্যের এমনকি গবাদি পশুরও কল্যাণকারী, তারই প্রতীক বৈদিক নাম 'ভদ্রা', এটি কল্যাণবাচী শব্দ। আর সরণী শব্দ সৃ+অনি=সরণী। এই নামটি তার গুণের পরিচায়ক। পরবর্তী সংহিতার যুগে চরক সুশ্রুতে এই ভেষজটির ভৈষজ্যশক্তির বিচার প্রচুর। এটি যে কিসের এবং কোথায় তার গতিশালিতা

তা নির্ণয় করা হ'য়েছে। শব্দার্থের পরিণত অর্থে বোঝা যায়—এটি সংকুচিত পথকে প্রসারিত ও তার অবরোধ নিবারণ করে। যার ফলে বায়ুর স্বচ্ছন্দচারী স্বভাবে বাধা এলে তাকে সরল করে।

তাই সংহিতার যুগে সেই সরণী ভেষজটির নাম দেওয়া হ'য়েছে প্রসারণী। এ শুধু প্রসারিতই করে না, স্থিতিস্থাপকতাও বজায় রাখে; যেহেতু এটি ভৌম ও বায়ব্য গুণসম্পন্ন ভেষজ।

পরিচিতি

এই প্রসারণী, যার প্রচলিত নাম গাঁদাল বা গন্ধ ভাদুলে, এটি ভারতের সর্বত্র (অবশ্য কম-বেশী) পাওয়া যায়; লতানে গাছ, সচরাচর অপর গাছ অথবা বাগানের বেড়ায় দেখা যায়, তবে জনপদে যত্র তত্র যে হ'য়ে আছে এটাও নয়; তবে সাধারণভাবে এটি লাগানো হ'য়ে থাকে। এ ভিন্ন মধ্য ও পূর্ব হিমালয়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যেও দেখা যায়, এর লতাপাতায় উৎকট বিষ্ঠার গন্ধ; সেইজন্য এর একটি নাম 'পূতিগন্ধা'। বর্ষাকালেই তার বাড়-বাড়ন্ত। শরতে ফুল এবং শেষে ফল হয়। এইজন্যই আয়ুর্বেদের ভৈষজ্য সংগ্রহের নির্দেশে এই শরতেই তার সংগ্রহ কাল। এটির বোটানিক্যাল্ নাম Paederia foetida Linn. ফ্যামিলি Rubiaceae.

এদেশে এর আর একটি প্রজাতি পাওয়া যায়; তার প্রচলিত নাম ভুঁই গাঁদাল বা ছোট গাঁদাল, এর পাতাগুলি আকারে একটু ছোট ও অল্প রোমশ এবং তার লতাটাও একটু শীর্ণ, তার লতায় পাতায় দুর্গন্ধ একটু কম, তার বোটানিক্যাল্ নাম Paederia tomentosa Blume. এভিন্ন কেরলে Merremia tridentata, Hallier. ফ্যামিলি Convolvulaceae. রাজস্থানে Leptadania sparitum এবং কোথাও কোথাও Convolvulus arvensis Linn. ফ্যামিলি Convolvulaceae. এই সব গাছ প্রসারণী ব'লে ব্যবহার হ'য়ে থাকে; কিন্তু অথর্ববেদোক্ত সরণীই হ'ল মূলতঃ প্রসারণী।

পূর্বাভাস

আকাশে কালো মেঘ যেমন বৃষ্টির পূর্বরূপ, রোগাক্রমণের তেমনি একটা পূর্বরূপ আছে। সেখানেও তার মূলীভূত কারণ থাকবে। এই যেমন আহার্যের স্বভাব পরিণতিতে শরীর পোষণকারী রস সৃষ্টি হওয়াটাই দৈহিক ক্রিয়ার স্বভাবধর্ম। ভাল পরিপাক না হ'লে তার সৃষ্ট রসটা হয় দূষণীয়। তা সে ভাল-মন্দ যাই হোক, এই রসই শরীরের শিরা, উপশিরা, স্নায়ু প্রভৃতি স্রোতের মাধ্যমে প্রবাহিত হ'চ্ছে; সেই রসে যদি গলদ থাকে তার দ্বারা রোগ সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া যে রসের পরিণতি আমাদের দেহ-স্রোতের মাধ্যমে শরীরকে পোষণ করে, সেই সব স্রোতে যদি আমদোষ অর্থাৎ অপক্ক রস বহমান থাকে, তা হ'লে আসে আমবাত, রসবাত, অর্শ, অতিসার, গ্রহণী, এমন কি পক্ষাঘাত পর্যন্ত; একে বাতব্যাধির অন্তর্গত বলা হয়। এক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের প্রাচীন মনীষীদের পরামর্শ হ'লো—আমদোষ কর্তৃক অবরুদ্ধ বায়ুকে মুক্ত অর্থাৎ আমদোষের পরিপাক ও শিরা-উপশিরা প্রসারিত করার জন্য বৈদিক সরণী বা সংহিতার প্রসারণীর আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ এবং প্রয়োজনবোধে বাহ্য প্রয়োগেও ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে চরকে একটি বিশেষ কথা বলা হ'য়েছে যে, দুগ্ধ বিনা কোন ক্ষেত্রেই গাঁদালের প্রয়োগ করা উচিত নয়।

রোগ প্রতিকারে

এই ভেষজটির উপকারিতা সাধারণের মনে গেঁথে রাখার জন্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে মিশ্রকল্প ক'রে কয়েকটি বিশিষ্ট মুষ্টিযোগ বলা হ'য়েছে ছড়ার মাধ্যমে।

"ভ্যাদাল বনে গাঁদাল ব'সে, হেঁকে বলে খাওনা ক'সে"।

ভাই-বোনেতে বেড়া দেবো
অতিসারের ঘর।
মোদের সঙ্গে বেলকে নেবো
আম-অতিসার ঝেঁটিয়ে দেবো
কিসের তোমার ডর?"

এই ভ্যাদাল হ'চ্ছে ভদ্রমুস্তক (cyperus rotundus). এর চলতি নাম মুথো। উপরিউক্ত দুটি মুষ্টিযোগে পেটের দোষ সারে; এবং এর সঙ্গে শেষোক্ত বেল (বিল্ব) যোগ ক'রলে আমাশা ভাল হয়, এমনকি ছোট ক্রিমিও ক'মে যায়।

২। **পক্ষাঘাতে—** পঙ্গু, কিন্তু সেই অঙ্গের স্পর্শশক্তি চ'লে যায়নি, এক্ষেত্রে এই প্রসারণী তাকে সঞ্জীবিত ক'রতে পারে; তবে যুগপৎ আভ্যন্তর ও বাহ্য প্রয়োগ ক'রে যেতে হয়।

৩। হাতে বা পায়ের শিরার সঙ্কোচন আরম্ভ হ'য়েছে, সেক্ষেত্রে গাঁদাল পাতা বেটে, তিল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে গায়ে মাখার উপদেশ দেওয়া আছে। এটা চরক আমলের ব্যবস্থা।

৪। **মূত্র-কৃচ্ছ্রতায়—** গ্রন্থিস্ফীতি নেই অথচ প্রস্রাব আটকায়, সেক্ষেত্রে গাঁদাল পাতার রসে (৩।৪ চা-চামচ) আধ পোয়া আন্দাজ কাঁচা দুধ মিশিয়ে কয়েকদিন খেলে এ দোষটা সারে।

৫। হর-গৌরী মিলনের মত গাঁদাল ও এরণ্ডতেল (Castor oil)। এই গাঁদালের রসে এরণ্ডতেল মিশিয়ে অতি প্রত্যূষে খেলে, আর তার সঙ্গে পথ্যাশী হ'লে বাতরোগ পালাবেই।

৬। **আমবাতে** (Rheumatic affections) —গাঁদালের রসের সঙ্গে এক কোয়া রসুন খেলে (এটা চিবিয়ে খেতে হবে) ২।৪ দিনের মধ্যেই আমবাতের যন্ত্রণার লাঘব হবে।

৭। **আমাশায়—** গাঁদাল পাতার রস ২-৪ চামচ একটু গরম ক'রে ৯।১০ ফোঁটা মধু মিশিয়ে খেলে থোকো থোকো আম পড়াটা কমে।

৮। **আমাজীর্ণে—** গাঁদাল পাতার ঝোল দুই-এক টুকরো কাঁচাকলা দিয়ে রান্না ক'রে খেলে ও দোষটা চ'লে যায়।

চোর তাড়িয়ে ডাকাত পোষার মত এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি—অনেকক্ষেত্রে দেখেছি গাঁদাল পাতা বাটা দিয়ে ঝোল খেলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য এসে যায়, সেখানে থানকুনী বা থুলকুড়ির (Centella asiatica) পাতার সঙ্গে ২।৩টি গাঁদাল পাতা মিশিয়ে ঝোল ক'রে খেলে ও অসুবিধেটা আর হয় না; অবশ্য সব ক্ষেত্রে এটা হয় না।

৯। **অর্শে—** যে অর্শে রক্ত পড়ে অথবা শুধু ফোলে, রক্ত পড়ে না, সেক্ষেত্রে গাঁদাল পাতার রস ২ চামচ ৩ গ্রাম আন্দাজ কাঁচা হলুদ বাটার সঙ্গে মিশিয়ে খেলে ২/১ দিনের মধ্যেই যন্ত্রণাটা ক'মে যায় এবং নিয়মিত অভ্যাস ক'রলে কয়েক মাসের মধ্যেই অর্শের বলি মিলিয়ে যায়। তবে প্রয়োজন হ'লে কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য পাকা পেয়ারা সিদ্ধ বা আপেল সিদ্ধের সঙ্গে ১ চামচ ইসবগুলের ভূষি মিশিয়ে খাওয়া ভাল। অবশ্য সেটা সম্ভব হলে; নইলে রাত্রে শয়নকালে শুধু ঐ ভূষি জল দিয়ে খেলেও চলে।

১০। যাঁদের মল প্রায় শুকনো হ'য়ে থাকে এবং পেটটা কাঁপে, তাঁরা যদি গাঁদাল পাতার রস সকালে সামান্য লবণের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করেন তবে অচিরেই ঐ দুটো দোষই কমে যাবে।

১১। **শুক্রদোষে**— তারল্য এসেছে এবং পরিমাণেও কম ক্ষরণ হয়; পরিণতিতে এলো 'অসমাপিক ক্রিয়া', সেক্ষেত্রে গাঁদাল পাতার রস ২ চামচ একটু ঘন গরম দুধের সঙ্গে খাওয়ার অভ্যাস ক'রতে উপদেশ দিতেন প্রাচীন বৈদ্যগোষ্ঠী, তবে প্রথমেই ২ চামচ না খেয়ে ১ চামচ থেকে আরম্ভ করাই ভাল।

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Essential oil (b) Alkaloids. (c) Straight chain fatty alcohol. (d) Sterols.

চণক

কোন ব্রাহ্মণ সন্তানের বৈদিক আভিজাত্য যতই থাক, সে যদি একখানা জীর্ণবাস পরে পথ সম্বল ক'রে থাকে, তাতে বিত্তবান সমাজে তার যতটুকু সমাদর, বর্তমান অভিজাত সমাজে ঠিক ততটুকু সমাদর এই চণকের। কারণ তার গুণ যতই থাক, সে তো বড়-লোকের ধারেকাছে আসতে পারবে না, আর তার হাতের স্পর্শও পাবে না; তাকে হয় অশ্বশালায়, না হয় বড়জোর খুব সাধারণ মানুষের কাছে আসতে হবে, নিজেদের বাঁচার জন্য তারাই তাকে আদর ক'রবে। তবে তার আভিজাত্য যে ছিল এবং এখনও আছে, তার নজীর তো আছে—

সা তৃট্ যা হৃদয়ং যমায়তি ধেনুরিব।
অর্বন্তঃ সুজাতসঃ সুরেয় শ্চণকং নিত্যাসো বাজিন ইষং আভর।
অথর্ববেদ বৈদ্যককল্প ৮২১/৩।২২

মহীধর—

চণকং উদ্দিশ্য=ত্বং তৃষাং অপহরসি, ধেনূরিব, হৃদয়ং যথা ধেনুঃ হৃদয়স্য তৃষাং অর্বন্ত=বাজিনঃ নিত্যাঃ=শাশ্বতাঃ=সর্বকালভাবিনঃ অশ্বাঃ, তথা সূরয়ঃ=সূজাতসঃ=শোভনং জাতং জন্ম যেষাং তে ইষং অন্নং চ আভর। চণঃ দানে কুণ্‌ ইতি যাস্কঃ, শমী ধান্যঃ ঋষিগোত্রশ্চ।

এ সম্বন্ধে মহীধরের উক্তি, চণককে উদ্দেশ্য করে—তুমি তৃষ্ণা অপহরণ কর, ধেনু যেমন হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করে, তুমি অশ্বগণের এবং যাদের শোভন জন্ম তাদের অন্নরূপেই পোষণ কর। তুমি চণক।

নামকরণের উৎস— চণ ধাতু কুন্‌ প্রত্যয়ের যোগে চণক, এটি শমীধান্যের একটি। যে নিজেকে দান করে সেই চণক। এটি প্রতীকধর্মী নাম করা হ'লো, অর্থাৎ এই ধরণের আত্মদানকারী ঋষির নাম যেমন চণক করা হ'লো এবং গোত্রও করা হ'লো এই নামে।

সহজিয়া লোকব্যাকরণে আর্দ্রক যেমন আদা হ'য়ে গেল, সেই রকম চণকও চানা

হ'লো। এই বাংলাদেশে তার নামের ওপর পালিভাষার প্রভাব প'ড়লো। ছিল তক্ষ্ (তক্+ষ) এই তক্ষের অর্থ ছাড়িয়ে দেওয়া; সেটি প্রাদেশিক পালি ভাষায় হ'লো ছোল্ল; সেইটাই আবার অপভ্রংশ হয়ে হ'লো ছাল। তাই সেই তক্ষ বা ছাড়ানো শব্দটি ছোল্ল বা ছাল, তা থেকে নামের জন্ম হ'লো ছোলা।

এই চণকই প্রাচীন-প্রধান বলে তাই হ'য়েছে ছোল্ল বা ছোলা, এটি শমীধান্য; যদিও সব শমীধান্যকেই ছোল্ল বলা অসংগত নয়, তবুও সুপ্রাচীনকালে গুণোৎকর্ষের জন্য এই চণকই ছোল্ল ওরফে ছোলা হয়ে আছে।

দ্বিতীয় পর্ব (সংহিতার যুগ)

বেদোক্ত শমী নামকরণের গূঢ়ার্থ নিয়ে পূর্বোক্ত আঢ়কী (অড়হরের) নিবন্ধে আলোচনা করা হ'য়েছে, তবুও এখানে বলে রাখি, শমীধান্য বিশেষণের ইঙ্গিতই হ'লো, 'যে তাপজনক এবং পুষ্টিকর খাদ্য'।

চরক সংহিতার সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে এই চণকের দোষগুণ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হ'য়েছে, সেখানে বলা আছে এটি লঘু ও শীতলগুণ বিশিষ্ট, রসে অল্প কষায়, সে তেজ ও বায়ুগুণে সমৃদ্ধ, কারণ তার জন্মলগ্ন হেমন্তকাল, আর তার জন্মের মৌল উপাদানে বায়ুর প্রাধান্য থাকায় তার স্বভাবটা একটু রুক্ষ। এটি সামগ্রিকভাবে পিত্তবিকার ও শ্লেষ্মাবিকারজনিত যে সব রোগ সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে এই চণকের কি ঔষধ হিসেবে আর কি পথ্য হিসেবে এর উপযোগিতা আছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—চণকের সম্পর্কে বৈদিক সূক্তির অন্তর রহস্য চরক সংহিতায় কোথায় কি ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে? এর উত্তরে দেখা যায়, বৈদিক সূক্তিতে আছে—'তুমি তৃষ্ণা দূর কর।'

সা তৃট্ যা হৃদয়ং যময়তি,

অতএব এই তৃট্ বা তৃষ্ণাটি সাধারণ তৃষ্ণা নয়, নিশ্চয়ই কোন ব্যাধি। তাই চরক সংহিতার সূত্রস্থানের ২৪ অধ্যায়টিতে তৃষ্ণা রোগ সম্পর্কে এবং ওই স্থানেই চণকের যূষের ব্যবহার।

তৃষ্ণা রোগের প্রাধান্য যে স্বতন্ত্র ধরণের, সেটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি ক'রেই চণকের ব্যবহার।

এই তৃষ্ণা রোগের বিজ্ঞানটি হ'লো ওটি রসবহ স্রোতকে বিকৃত করে ব'লে।

সে সময় এমন অন্নপানীয় দরকার, যার দ্বারা অগ্নি অন্তর্মুখী হ'য়ে আমাশয়স্থ অগ্নিকে যেন দীপ্ত ক'রে; যার দ্বারা এই দোষটা ও তার উপসর্গ দূরীভূত হয়।

পরিচিতি

বর্ষজীবী গাছ, ছোট ক্ষুপ জাতীয় ওষধি। বহু ক্ষুদ্র অথচ নরম শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট, পত্র পক্ষাকার ও সোজা ১/১½ ইঞ্চি লম্বা দাঁতযুক্ত, পুষ্পদণ্ড ½—¾ ইঞ্চি, শুঁটি ছোট ও বেঁটে, লম্বা ¾—১ ইঞ্চি, প্রত্যেক শুঁটিতে সাধারণতঃ একটি বীজ থাকে। কখনও কখনও দুটিও দেখা যায়, মার্চ মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

এটির বোটানিক্যাল্ নাম Cicer arietinum Linn. ফ্যামিলি Leguminosae.

রোগ প্রতিকারে

(১) **রক্তপিত্তে**— এর ভয়ঙ্কর রূপ দেখা দিলেও শুধু ছোলার (খোসা সহ সিদ্ধ) যূষ বার বার প্রয়োগ ক'রলে সেটা উপশমিত হয়। পরিমাণ হ'লো ছোলা ২৫ গ্রাম পূর্বদিন রাত্রে ভিজিয়ে রেখে পরদিন তাকে অন্তত ৩/৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রতে হবে; ওগুলি বেশ সিদ্ধ হয়ে ফেটে গেলে সেটা ছেঁকে, সেই জলটা সমস্তদিনে ৩/৪ বারে খেতে হবে।

(২) **দাহ রোগে**— ছোলা ভিজানো জল খাওয়া অভ্যেস ক'রলে সেটা সেরে যাবে।

(৩) **মেহ রোগে**— প্রস্রাব করার সময় জ্বালা করে; অথবা পুঁজের মত স্রাব হয়, এবং তার সঙ্গে জ্বালাও থাকে, তাঁরা নিত্য ছোলা ভিজানো জল খাবেন, অথবা ছোলা সিদ্ধ ক'রে তার যূষও খেতে পারেন। এর দ্বারা উপশম হবে, (অবশ্য শ্লেষ্মার বিকার থাকলে নয়)।

(৪) **গায়ের রং**— পেটের দোষে যাঁদের গায়ের রং নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাঁরা ছোলা ভিজানো জল অথবা ছোলা সিদ্ধ যূষ খেয়ে দেখুন।

(৫) **জ্বর হ'লে**— সিদ্ধ ছোলার ডালের উপরকার পাতলা জল বিশেষ উপকারী। যদি অগ্নিমান্দ্যের জন্য অতিসার (পেটের দোষ) না থাকে।

(৬) **কৃশতায়**— যাঁদের শরীর শিশুকাল থেকেই কৃশ, তাঁরা রোজ বাসি জলে ১০-১২ গ্রাম ছোলা ভিজিয়ে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা রেখে, ওটা ছেঁকে সেই জলটা সকালের দিকে খাবেন, এর দ্বারা কৃশতা ক'মে যাবে।

(৭) **বলহানি হ'তে থাকলে**— যাঁদের শরীরের বল আস্তে আস্তে ক'মে যাচ্ছে, তাঁরা ছোলার ছাতু অল্প অল্প ক'রে খাওয়ার অভ্যাস করুন।

(৮) **মাড়ী ফুলোয়**— যাঁদের দাঁতের গোড়া মাঝে মাঝে ফুলে যায়, তাঁরা ছোলা সিদ্ধ যূষ দিয়ে কুলকুচি ক'রে দেখবেন, ওটা কমে যাবে, তবে কারণটা যদি ঊর্ধ্ব শ্লেষ্মাজনিত হয় তা হ'লে তাঁর উচিত বাসক পাতার রস ৪।৫ চামচ একটু গরম ক'রে প্রত্যহ সকালে খাওয়া।

(৯) **শ্বাসে**— রোগের প্রথমাবস্থায় সকাল বা সন্ধ্যার দিকে একটু বুকে চাপ বোধ হ'তে থাকে, সেক্ষেত্রে খোসা সমেত ছোলা অন্ততঃ ১০ গ্রাম সিদ্ধ ক'রে সেই জল অতন্তঃ এক কাপ ক'রে খাওয়ার অভ্যাস করুন।

(১০) **ব্রণ ও মেচেতায়**— ছোলা ভিজিয়ে তাকে বেটে সেটা মুখে মেখে দেখুন, ওটা ক'মে যাবে।

(১১) **অজীর্ণ রোগে**— প্রায়ই চোঁয়া ঢেকুর ওঠে, দাস্ত ভাল পরিষ্কার হয় না, মাঝে মাঝে বুকও জ্বালা করে, তাঁরা ৪।৫ গ্রাম ছোলা শাক ভাল ক'রে বেটে, আধ গ্রাম আন্দাজ বিট লবণ মিশিয়ে খেতে দিয়ে থাকেন বিহার অঞ্চলের গ্রাম্য বৈদ্যরা।

(১২) **শূল ব্যথায়**— অজীর্ণ রোগের সঙ্গে যদি শূলে ব্যথাও থাকে, তা হ'লেও শাক বাটা ও বিট লবণ মিশিয়ে খেলেও কাজ হবে।

(১৩) **চণকাম্ল**— প্রাচীন বৈদ্যরা অতি প্রত্যূষে (ভোর বেলায়) ছোলা ক্ষেতে গিয়ে একখানা পাতলা কাপড়কে গাছের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতেন, শিশিরে ভিজে যাওয়া কাপড়খানা নিংড়ে তার জলটা সংগ্রহ ক'রতেন, তারপর তাকে জ্বাল দিয়ে একটি দ্রব্য তৈরী ক'রতেন, এটি খেতে অম্লাস্বাদ হয়—একেই বলা হয় 'চণকাম্ল'। অজীর্ণরোগে পাতলা দাস্ত হ'তে থাকলে দ্রব্যান্তরের সহিত মিশিয়ে ব্যবহার করার রেওয়াজ ছিল।

ভিটামিন সাবান— ছোলা বা মটর ডালের বেসন জলে গ‍ুলে সাবানের মত গায়ে মাথার রেওয়াজ ছিল; এর দ্বারা ত্বক্-লাবণ্য রক্ষে হয়, আর গায়ের ময়লাও কাটে; এখনও বহ‍ু প্রদেশে কোন কোন প্রাচীন বাসিন্দা যাঁরা, তাঁদের মধ্যে প্রচলিত।

সস্তায় কিস্তি— বয়স হ'য়েছে, সকালে দাস্ত অপরিষ্কারে অস্বস্তি, পেটে বায়‍ু, রাত্রে যেটাই খাওয়া যাক না কেন, কোনটাতেই এসব অস‍ুবিধে যায় না, সেক্ষেত্রে ছোলার বেসন গ‍ুলে ওম্‌লেটের মত তৈরী ক'রে রাত্রির ভোজন সমাপন করুন, তবে ম‍ুখরোচক ও গ‍ুণোৎকর্ষ করার জন্য দ‍ুটো যোয়ান ও পরিমাণ মত একট‍ু বিট লবণ মিশিয়ে ওটা তৈরী ক'রবেন; কিন্তু তরকারী বেশী খাবেন না।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Acids viz., oxalic acid, malic acid, acetic acid and other acids.
(b) Amino acids viz., arginine, tyrosine, lycine, cystine, tryptophane.
(c) Carotenoids. (d) Oil soluble vitamin viz., vitamins A, D and E.
(e) Other constituents viz., lecithin, phytin, saponin, biochanin A, biochanin B and biochanin C.

আঢ়কী

বাংলায় একটা কথা ম‍ুখে ম‍ুখে ফেরে 'ড‍ুড‍ু ও টামাক' (দ‍ুধ ও তামাক), যদিও কথাটা একটা নাটকের উদ্ধ‍ৃতি, সে পরিবেশটার মর্মকথা দ‍ুটো প‍ৃথক বয়সের পানীয় দ্রব্যের স‍ুবিধে ভোগ করার তুলনাম‍ূলক ডায়লগ্‌। আলোচ্য আঢ়কী বা অড়হর—আহার্য

হিসেবে তার যেমন উপযোগিতা, তেমনি ভেষজগুণেও তার কম নয়। সেইটাই প্রতিপন্ন ক'রতে সংহিতাকারগণ উল্টোপথে বিচার ক'রে আমাদের সামনে উপস্থিত ক'রেছেন; তা হ'লেও প্রারম্ভিক সূত্রটা প্রথমে বলি—

অভ্যাবর্ত্তন আঢ়কী ত্বা প্রজয়া ধনেন
সন্যা মেধয়া রথ্যা পোষেণ বর্চষা হৃদয়ং রেরিহৎ হীমিদ্ধো।

অথর্ববেদ ৫৩২।২।৩৯

মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

আঢ়কীমুপক্রম্য, আঢ়কী ইতি আঢ়কী ধান্যশমী, ত্বং প্রজয়া ধনেন আয়ুষা=জীবনেন সন্যা=ইষ্টলাভেন, মেধয়া=ধারণবত্যা পোষেণ =পুষ্ট্যা হৃদয়ং অপি রেরিহৎ=আক্রামসি, হি যস্মাৎ ইন্ধঃ=দীপ্তশ্চ অগ্নিঃ বর্চষা=পুত্রাদিকয়া অপি।

এই সূক্তটির অর্থ হ'লো—তুমি ধন, আয়ু বা জীবন এবং ইষ্টলাভের দ্বারা এবং পুষ্টির

দ্বারা আমাদের কাছে এসো, তুমি হৃদয়কে আক্রমণ কর, অগ্নিকে দীপ্ত কর, এবং পুত্রাদির দ্বারা দীপ্ত কর।

সংহিতার যুগে—

এই আদি সূক্তগুলির ইঙ্গিতকে উপজীব্য ক'রেই তো দ্রব্যটির আহার্য বা ভেষজগুণ কার কতটা তারই অনুশীলন। সেটা তো অনুশীলিত হ'য়েছে দ্রব্যের মৌল পদার্থকে সামনে রেখে। তাঁরাই ব'লেছেন—এই আঢ়কী একসঙ্গে আহার্য, পথ্য ও ভেষজ; এটা চরক সংহিতায় সন্নিবেশিত। সেটা চরকের সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে অড়হর বা আঢ়কীকে আহার্যের মধ্যে প্রথম উল্লেখ করা হ'য়েছে।

সেখানে বলা হ'য়েছে—

'আঢ়কী কফপিত্তঘ্নী বাতলা কফবাতনুৎ',

অর্থাৎ অড়হর কফপিত্ত নষ্ট করে এবং বায়ুকারক।

অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পে একে 'শমীধান্য' ব'লেই চিহ্নিত করা হ'য়েছে; বৈদিক অভিধানে ধান্য শব্দের অর্থ—'যে পোষণ করে', আর শমী শব্দের অর্থ যার মধ্যে অগ্নির ক্রিয়াকারিত্ব শক্তি বর্তমান। এই যেমন গরম জল, তার মধ্যে আগুন না থাকলেও আগুনের ক্রিয়াকারিত্ব বর্তমান; সেই রকমই।

মতবাদে দ্বন্দ্ব

সংহিতার মতে এটি পিত্তঘ্ন অর্থাৎ পিত্তনাশক, আবার বৈদিক সমীক্ষায় অড়হর যখন শমীধান্য বলে আখ্যায়িত ও বিশেষিত হ'লো, সেদিক থেকে তার প্রকৃতি অগ্নি-ধর্মী (বৈদিক অভিধানের মতে), দৈহিক অগ্নির বাহ্যরূপই তো দৈহিক পিত্ত, অথচ এই অড়হর পিত্তকারক না হ'য়ে পিত্তনাশক; তা হ'লে এই দ্রব্যটি কি আমাদের ধাতুগত অগ্নিকে বাড়িয়ে দেয়? যাকে বলা যায় মেটাবলিজম্ (Metabolism) বৃদ্ধি করা? সেইটাই কি এখানকার বক্তব্য বিষয়?

অপরপক্ষে বৈদিকসূক্তেও অড়হরকে পোষক, অগ্নিদীপ্তিকর, মেধাকর ব'লে উল্লেখ দেখা যায়। রোগ প্রতিকারে চরক সংহিতার চিকিৎসাস্থানের ১৫ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে অপস্মার রোগে ব্যবহার এবং যোনি রোগের চিকিৎসায় (৩০ অধ্যায় ১৫ শ্লোক) তার ব্যবহার; এ ভিন্ন পরবর্তী গ্রন্থে আরও বহুক্ষেত্রে তার যে উপযোগিতা আছে সেটি সমীক্ষিত হ'য়েছে।

পরিচিতি

গুল্মজাতীয় শাখাপ্রশাখাযুক্ত উদ্ভিদ, ৪ থেকে ৮।১০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়, গাছগুলিতে কাষ্ঠগর্ভ হলেও ডালগুলি নরম, সাধারণতঃ একটি বৃন্তের তিনটি শাখাবৃন্তে এক একটি ক'রে পাতা, লম্বা ২-৩ ইঞ্চি, চওড়া আধ ইঞ্চিরও বেশী, সবুজ পাতার উল্টোপিঠ অপেক্ষাকৃত সাদা, ফুল হলদে, ফল আকারে ছোট কড়াইশুঁটির মত, কিন্তু একটু চ্যাপ্টা হয়, প্রত্যেক শুঁটিতে ৩—৫টি বীজ থাকে।

এই অড়হর গাছ ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে জন্মে; কিন্তু উত্তর প্রদেশে ও বিহারে ব্যাপক চাষ হয়। জ্বলাই-আগস্ট মাসে ফ্বল ও শীতকালে অর্থাৎ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল হয়। হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে একে বলে অড়হর; আহার্য হিসেবে ডাল ব্যবহার হয়। অপেক্ষাকৃত লাল রংয়ের একটা ডাল (ডাইল) পাওয়া যায়, কোন কোন গ্রন্থে বলা হ'য়েছে, সেইটাই একট্ব বেশী প্র্ষ্টিকারক এবং বাতকারক দোষও নেই। এই গাছটির বোটানিক্যাল্ নাম Cajanus indicus spreng. ফ্যামিলি Leguminosae.

ঔষধার্থে ব্যবহার হয়—পাতা, ম্বল ও বীজ।

লোকায়তিক ব্যবহার

১। **কাসিতে** (পিত্তশ্লেষ্মাজনিত) অড়হর পাতার রস ৭/৮ চামচ একট্ব গরম ক'রে ১ চামচের মত মধ্ব মিশিয়ে খেলে কাসিটা ক'মে যায়।

২। **কামলা রোগে** (জণ্ডিসে) এই রোগের প্রথমাবস্থায় পাতার রস ৩।৪ চামচ, একট্ব গরম ক'রে খেতে হবে।

৩। **অর্শরোগে** পাতার রস ২ চামচ একট্ব গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে দ্বই-বার খেতে হবে, এর দ্বারা অর্শের যন্ত্রণা ক'মে যায়। তবে এর সঙ্গে অড়হর ডালের য্বষ একট্ব ঘি-এ সাঁতলে খাওয়া খ্বব ভাল, এটাতে দাস্ত পরিষ্কারও থাকবে।

৪। **দাহে** যাঁদের হাত-পায়ে জ্বালা বোধ হয়, তাঁরা এই পাতার রস হাতে মাখবেন, তার ঘণ্টাখানেক বাদে ধ্বয়ে ফেলবেন, তবে এর সঙ্গে পিত্তনাশক কিছ্ব খাওয়া উচিত।

৫। **মধ্বমেহ রোগে** (ডায়াবেটিসে) এই পাতার রস একট্ব গরম ক'রে খাবেন, তবে এর ম্বলের ছালের রস (একট্ব জল দিয়ে ক'রতে হয়) অথবা ম্বল ৮/১০ গ্রাম থে'তো ক'রে ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে খেলে বেশী উপকার হয়, খাঁটি মধ্ব হলে এক/আধ চামচ দেওয়াও চলে। এটি ব্যবহারের কালে আহার্যের সঙ্গে ডালের য্বষও খাওয়া উচিত।

৬। **রক্তপিত্তে** পাতার রস ২।৩ চামচ একট্ব গরম ক'রে ১৫।২০ ফোঁটা মধ্ব মিশিয়ে অথবা শ্বধ্ব রস গরম ক'রে দ্ব'বেলা খেতে হবে। এর সঙ্গে অড়হর ডালের য্বষ (সারাংশ বাদ) খেলে ভাল হয়। যদি পেটের অবস্থা ভাল না থাকে ডাল খাওয়া চ'লবে না।

৭। **অর্বচিতে** অর্বচি যতই প্বরানো হোক না কেন, এই ডালের য্বষ অল্প আদা মরিচ বাটা দিয়ে সাঁতলে তার সঙ্গে পরিমাণ মত লবণ মিশিয়ে বারে বারে একট্ব একট্ব ক'রে খেতে হবে। য্বষ এক/দেড় কাপ সমস্ত দিনে খেলেই চ'লবে। ৫০ গ্রাম আন্দাজ ডালের য্বষ ক'রতে হবে।

৮। **জিহ্বার ক্ষতে** কয়েকটি কচিপাতা (সম্ভব হ'লে) ভাল ক'রে ধ্বয়ে অল্প থে'তো ক'রে নিয়ে, সেটা আস্তে আস্তে চিবোতে হবে। এই সময় একট্ব জালা করে; তবে ২।৩ দিন এইভাবে ক'রতে পারলে ওটা সেরে যায়। আর একটা কথা, চিবিয়ে পাতার ছিবড়ে ফেলে দেওয়ার পর আর ম্বখ ধ্বতে নেই।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Two globulins viz., cajanin and concajanin. (b) Sterols viz., gamasitosterol, betasitosterol.

তর্বার্দক

এমন তথ্য অনেক আছে যেগুলিকে আমরা নূতন তথ্য উদ্ভাবন ক'রেছি ব'লে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকি; অনুসন্ধান ক'রলে দেখা যাবে সেই সব উদ্ভাবনের অন্তর্নিহিত সমীক্ষাই সেই বৈদিক যুগে সমীক্ষিত হ'য়েছে। সেই রকম একটা নজির সৃষ্টির উদাহরণ এই উল্লেখিত বস্তুটিকে কেন্দ্র ক'রে।

আর একটা কথা, সব যুগেই রাজতন্ত্রের ছাপ পাওয়া যায়, তবে তার রকমফের আছে। প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে শত্রুকে জব্দ করার জন্য একটা দ্রব্য ব্যবহার করা হ'তো, তার প্রমাণ আছে শুক্রনীতিসারে—

"গর্ভাস্থ পত্রং ত্রিপুটেভ্যো নীত্বা
আমিক্ষ গর্ভে গুড়-সারঘেণ।
অমিত্রভোজ্যে বিনিযোজয়েৎ চেৎ
মিত্রেন গুপ্তং চ পদার্দ-কৃত্যে॥"

এই শ্লোকটির অর্থ হ'চ্ছে—যদি রাজা মনে করেন অমুক ব্যক্তি আমার শত্রু, তা হ'লে সেই শত্রুর বন্ধুকে হাত ক'রে, তার হাত দিয়ে শত্রুর খাদ্যে ছানার সঙ্গে গুড় বা মধু দিয়ে তার সঙ্গে ত্রিপুট কলাই-এর গর্ভপত্র কিছুদিন খাওয়ালে নিশ্চয়ই সে পঙ্গু হ'য়ে যাবে। এই ত্রিপুট কলাই-এর প্রচলিত নাম তেউড়ি বা খেসারি। দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনবোধে সে যুগেও Slow poison করার রীতি ও পদ্ধতি তাঁরা অধিগত ক'রেছিলেন। এই গুপ্তির উৎস কিন্তু অথর্ববেদ ২।৭।৫।৪ সূক্তে পাওয়া যায়।

"অঙ্গান্যাত্মন্ ভিষজা তদাশ্বিনাত্মান মঙ্গৈঃ সমধাত্ তর্ব্বার্দগর্ভম্ ।
ইন্দ্রস্য রূপং শতমানমায়ুর্বলায় কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং গ্রহাভ্যাম্ ॥"

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

যজ্ঞপ্রস্তোতৃণাং; ভিষজা অশ্বিন ইতি=অশ্বিনৌ যুবাং পশ্যত আত্মন্ আত্মনি অঙ্গানি অবয়বান্ সমধাত্ তর্বার্দগর্ভ=তর্বার্দস্য গর্ভপত্রং তর্বেতি তর্বঃ=গতিঃ, অর্দঃ=পীড়নং গর্ভে=গর্ভপত্রে যস্য তৎ ত্রিপুটী বা কলায়ঃ, তৈ র্মাং ভক্তানাং স্তব্ধীকৃতানাম্ অঙ্গানাং। যুবাং অস্মাকং অবয়বানাং তানি সমধাত্ সমধাতাং সমযোজয়তাং। যথা ইন্দ্রস্য শতনাম্না প্রাণিনাং আয়ুর্বলায় গ্রহাভ্যাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রমিতি লভেমঃ পূজাং লভেমঃ সন্নিধিং গচ্ছামঃ।

এটি যজ্ঞপ্রস্তোতাদের প্রার্থনা সূক্ত—তাঁরা দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার যুগলের নিকট প্রার্থনা ক'রেছেন—ওহে অশ্বিনীকুমার যুগল! আমরা যজ্ঞকার্যে গমন ক'রতে পারছি

না; "তর্বার্দগর্ভ" ভক্ষণ ক'রেছি; (তর্ব=গতি তাকে যে পীড়িত করে, তার অপর নাম তুবরী বা ত্রিপুট কলায়) আমাদের পাদ সমূহের গতিতে পীড়া সৃষ্টি ক'রেছে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের আয়ু, দেহের বল, রূপ ও কর্ণের বল যোজনা ক'রে দাও, যেমন ক'রে শতনামা ইন্দ্রের ক'রেছো, আর সমস্ত প্রাণীর কাছে আমরা যাতে যেতে পারি ও তাদের পূজা লাভ ক'রতে পারি।

উপরিউক্ত অথর্ববেদিক সূক্ত ও তার ভাষ্যের দ্বারা বাস্তব সত্যকে রূপ দেওয়া হ'য়েছে কোন না কোন ঘটনার মাধ্যমে।

ঋষিদের অন্তর্দৃষ্টি

প্রতিটি প্রাণীর দেহের মধ্যে আত্মা ও মনের (ত্রিদণ্ডংধারি জীবিতং, ১ অধ্যায়, চরক) যেটি যোজক তাই আয়ু; এটিকে আবার হিতায়ু ও অহিতায়ু আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেখানে কোন বিচ্ছেদক দ্রব্য আত্মা, মন ও দেহকে পীড়িত করে সেইটাই অহিতায়ু, আর যখন সেটা স্বাভাবিক অবস্থায় চলে সেইটাই হিতায়ু।

আলোচ্য দ্রব্যটির সবটাই যে অহিতকর সেটা বক্তব্য নয়; তার গর্ভপত্রটিই কোন না কোন অঙ্গের ইন্দ্রিয়ের শক্তি বিচ্ছেদক।

এখানে সমষ্টিগত ভাবে দেহের আয়ুকে হনন করা হ'লো না বটে, কিন্তু তার অঙ্গের বা প্রত্যঙ্গের পঙ্গুত্ব ঘটালো; একেই আয়ুর্বেদের ভাষায় খণ্ডায়ু বলা চলে। এই সব ক্ষেত্রে রসপ্রধান আহার্য এবং বীর্যপ্রধান ভৈষজ্য শক্তিই স্বাভাবিকতা সৃষ্টি ক'রতে পারে। অথর্ববেদের সেই হুবহু বলিষ্ঠ ইঙ্গিতটি বর্তমানের বৈজ্ঞানিকগণকে নিশ্চয়ই আশ্চর্য ক'রবে।

আর একটা কথা—এক্ষেত্রে চরকের সমীক্ষাটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, সেখানে এই কলায়ের একটি নামকরণ ক'রা হ'য়েছে 'খণ্ডীক'; সেটা চরকের সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে লেখা হ'য়েছে।

এই নামকরণের তাৎপর্য হ'লো—যেহেতু সে আয়ুকে খণ্ডিত করে। এই নামটির সমর্থন একাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক চক্রপাণি দত্ত ক'রেছেন। সেখানে তিনি ব'লেছেন, 'খণ্ডকঃ ত্রিপুট কলায়ঃ', যার প্রচলিত লৌকিক নাম খেসারি।

এটি বিকৃত পিত্ত-শ্লেষ্মাকে স্বাভাবিক করে সত্যি, কিন্তু বায়ুবর্ধক হ'য়ে তারই পরিণতিতে ঘটায় দশটি ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটির পঙ্গুতা, কার্যতঃ দেখা যায় নিম্নাঙ্গের উপরেই এর প্রভাব সর্বাধিক।

এই দ্রব্যটির দোষগুণ বিচার হারীত সংহিতায় ও ভাবপ্রকাশে করা হ'য়েছে; তাঁদের বক্তব্যের সুর একই। তবে গর্ভপত্রের গরই (বিষ) যে নিম্নাঙ্গের স্নায়ুগুলিকে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত করায় এ তথ্য কেবল অথর্ববেদেই বলা হয়েছে।

এই গর শব্দের অর্থ 'যা কিছু বিচ্ছেদ ঘটায়', এখন দেখা যাচ্ছে যতগুলি অহিত আহার্য আছে তাদের মধ্যে ত্রিপুটি কলায় একটি।

এখন প্রশ্ন হ'লো—এই ত্রিপুটি কলাই-এর গুণগত বৈশিষ্ট্য যদি না থাকে তা হ'লে 'তৎসাম্যে সাম্য মায়াতি', অর্থাৎ সমান দোষ, সমান গুণই সমানের হ্রাসবৃদ্ধি করে। খেসারির ডালের নিশ্চয় ভৈষজ্যগুণও আছে, না থাকলে সে বায়ুরই বর্ধক হয় আর পিত্ত-শ্লেষ্মার উপকারক হয় কি করে? তাই বৈদ্যগণের অভিজ্ঞতালব্ধ বিশেষ জ্ঞানগুলি এখানে লেখা হ'লো।

লোকায়তিক ব্যবহার

প্রথমেই ব'লে রাখি এর গর্ভপত্রটিই খঞ্জতাকারক, এইটি থেকে সর্বদা সাবধান হওয়া দরকার; বাংলা, বিহার বিশেষতঃ উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে খেসারির বহু চাষ হয় এবং আহার্য ডাল হিসেবে বৎসরের পর বৎসর তাঁরা ব্যবহার ক'রে আসছেন কিন্তু তাঁরা এর দ্বারা কোন কুফল পাননি—সেটা কেন? তার কারণ হ'চ্ছে, তাঁরা এই ডালটিকে প্রথমে বালির সঙ্গে ভেজে নিয়ে যাঁতায় ভেঙ্গে খোসাটা ঝেড়ে বের ক'রে দিয়ে থাকেন; এর দ্বারা ঐ গর্ভপত্রের দোষ অংশটা বালির উত্তাপে নষ্ট হ'য়ে যায়। তারপর ব্যবহার করা হয় ব'লেই ঐ দোষমুক্ত হয়। আর বাজারে যেগুলি বিক্রি হয় সেগুলি ভাজা নয়, সুতরাং ঔষধার্থে ব্যবহার ক'রতে গেলে তাকে ভাল ক'রে ঝেড়ে, বেছে, ফুটন্ত গরমজলে ধুয়ে নিয়ে, শুকিয়ে রাখতে হবে। খেসারির ব্যবহার যেখানে বলা হ'চ্ছে সর্বক্ষেত্রেই এইভাবে সংস্কৃত ডালকে ব্যবহার ক'রতে হবে।

রোগ প্রতিকারে

১। **কার্শ্যরোগে (রিকেট)**— আধ তোলা বা এক তোলা শোধিত খেসারির ডাল আধ সের জলে সিদ্ধ ক'রে আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে, থিতিয়ে গেলে উপরকার জলীয়াংশ খেতে দিতে হবে; একদিন অন্তর কিছুদিন খাওয়ালে স্বাস্থ্য ভাল হবে।

২। **হাড়ের ও গাঁটের ব্যথায়**— ফুলো নেই অথচ গাঁটে ব্যথা, সেক্ষেত্রে ঐ শোধিত ডাল অল্প কুটে নিয়ে (অর্ধ কুট্টিত ক'রে) ডালের মাত্রার আট গুণ উৎকৃষ্ট মদে ভিজিয়ে রাখতে হবে, এক সপ্তাহ বাদে ছেঁকে নিয়ে, ঐ মদ ২ চামচ ক'রে আধ কাপ দুধের সঙ্গে কিছুদিন খেলে ঐ ব্যথা চ'লে যায়।

৩। **কোষ্ঠকাঠিন্যে**— যাঁদের এ অসুবিধেটা আছে তাঁরা খেসারির ডালের জলে অল্প লবণ দিয়ে কয়েক দিন রাত্রে খাওয়ার অভ্যাস করুন, পরের দিন দাস্ত পরিষ্কার হবে। এইজন্য দেশগাঁয়ে একটি প্রবাদ প্রচলিত—"স্বর্গে ছিলি খেসারি, তোকে মর্তে আনলে কে। তোর পায়ে পড়ি খেসারি, তুই কাছা খুলতে দে॥"

৪। **জানায় ভুলে**— যাঁরা মাঝে মাঝে ভুল হওয়ার জন্য অসুবিধেয় প'ড়ে যাচ্ছেন তাঁরা ১ কাপ গরম জলে ৩/৪ গ্রাম খেসারির ডাল ভিজিয়ে ঐ জলটা খাবেন। কিছুদিন খেলে এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৫। **বমনেচ্ছায়**— বিশেষভাবে শরৎ কাল আর বসন্ত কালে যাঁরা সর্বদা বমি বমি ভাব ভোগ করেন, অথবা বমিও করেন, তারা খেসারির ডাল ৩/৪ গ্রাম মাত্রায় গরমজলে ভিজিয়ে রেখে পরে ঠাণ্ডা হ'লে সেই জল সকালে অথবা বৈকালের দিকে খাবেন। এর দ্বারা ঐ বমনভাবটা চ'লে যাবে।

৬। **অরুচিতে**— অনেক কারণেই অরুচি হয়, এটা যদি পিত্তশ্লেষ্মার প্রাবল্যে হ'য়ে থাকে তা হ'লে ঐ ৩/৪ গ্রাম খেসারি গরমজলে ভিজিয়ে খেলে ঐ অরুচিটা সেরে যাবে, অনেক সময় এর সঙ্গে ক্রিমির উপদ্রবও দেখা যায়, এটাতে সেটাও চ'লে যায়।

৭। **মাঢ়ী হাজায়**— বর্ষাকালে অনেকের দাঁতের মাঢ়ী হেজে যায় বা হাজা ভাব হয়, এমন কি কিছুদিন বাদে তা থেকে রক্তও পড়ে; এক্ষেত্রে ৭/৮ গ্রাম খেসারির ডাল গরমজলে ভিজিয়ে রেখে, কয়েক ঘণ্টা পরে ঐ জলে কুলকুচি ক'রলে অথবা মুখে পুরে খানিকক্ষণ রেখে (যাকে বলে কবল ধারণ করা) ফেলে দিলে ওটার উপশম হয়।

৮। **হাজায়—** যাঁরা জল বেশী ঘাঁটেন তাঁদেরই বেশী হ'তে দেখা যায়, আর বর্ষাকালে দেশগাঁয়েও হয়; সেক্ষেত্রে খে'সারির ডাল বেটে গরম ক'রে লাগালে ক'মে যাবে এবং সেরেও যায়; তবে রোগের কারণটা যদি বন্ধ করা না যায় তা হ'লে আবার হবে।

৯। **গে'টে বাতে—** খে'সারির পাতা, যাকে খে'সারি বা তেউড়ি শাক বলে, বেটে গরম ক'রে গে'টে বাতে প্রলেপ দিলে বাতের ব্যথা কমে যায়।

১০। **নখকুনিতে—** খে'সারির কচি দানা বেটে গরম ক'রে প্রলেপ দিলে ওর যন্ত্রণা কমে যাবে। আরও ভাল কাজ হয় যদি ওর সঙ্গে একটু জনকপুরী খয়ের মিশিয়ে দেওয়া যায়।

চোল সহরং

গত ১৮২৯।৩০ খৃষ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশে ঝরা, খরা ও ঝড়ে ৩ বৎসর যাবৎ প্রধান খাদ্য যব, গম ও ধানের চাষ নষ্ট হ'য়ে যায়, আসে দুর্ভিক্ষ, সেখানকার সাধারণ মানুষকে ডাল কলাই সিদ্ধ ক'রে খেয়ে কোন রকমে বে'চে থাকতে হ'য়েছিলো, কিছুদিন বাদে দেখা গেল ঐ অঞ্চলের বহু লোকের নিম্নাঙ্গ বিকল হ'য়ে যাচ্ছে, চ'লতে পারছে না, বৃটিশ সরকারের টনক নড়লো; অনুসন্ধানও চ'ললো, শোনা গেল অধিকাংশ দিনই ঐ অঞ্চলের এই সব লোককে খে'সারির ডাল খেয়ে জীবন ধারণ ক'রতে হ'য়েছে; পরীক্ষা-নিরীক্ষায় স্থিরীকৃত হ'লো, খে'সারির ডালই এই বিকলাঙ্গ রোগের উৎস, যত লোক এ রোগে আক্রান্ত হ'য়েছিলো তার মধ্যে আবার বেশীর ভাগই পুরুষ। এই অদ্ভুত বাস্তব ঘটনাটি স্বল্পসংখ্যক মনীষীদের গ্রন্থে খে'সারির পঙ্গুতা সৃষ্টির ক্ষমতা আছে— এই নিশ্চয়াত্মক ইঙ্গিত থাকলেও স্মরণাতীত কাল থেকে জনসাধারণের স্মৃতিতে তা অবলুপ্ত ছিল, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকজনিত দুর্ভিক্ষের তাড়নায় খে'সারি ভোজনের কুফলটিকে ইংরাজ জাতি তাঁদের investigation -এর ফল বলে অজ্ঞ ভারতবাসীকে চমকিত ক'রলেন।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Starchy materials. (b) Salt of phytic acid. (c) Betaoxalylamino alanine. (d) Beta-N-oxalylalphabetadiaminopropionic acid. (e) Glucose.

দাড়িম্ব

ভারতে আর্য সমাগমের সময় বিভিন্ন শাখায় কারা কোন্ পথে এসেছিলেন, এবং কোন্ দিক থেকে নেমেছিলেন এ সবের নিদর্শন বেদের বহু সূক্তির মধ্যেই লুকিয়ে আছে, আবার কোন্ ধাতু, কোন্ ফল এবং কোন্ ধরণের পোষাক-আষাক তাঁরা ব্যবহার ক'রেছেন এবং পরে ইন্দ্রাদি দেবতার কাছে আবার চেয়েছেন, সেগুলির ইঙ্গিতও বেদের সূক্তির মধ্যে যথেষ্ট দেখা যায়। এই দাড়িম ফলের উল্লেখ দেখে মনে করা হয়, এ সব সূক্তি তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ, মিশর ও আফগানিস্থানের পথে যাঁরা ভারতে এসেছিলেন একে তাঁরা করক ব'লতেন। এ সম্পর্কে অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পে ৭৭২।১১।৯৭ সূক্তে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হ'য়েছে—

> ইচ্ছন্তি ত্বা সোম্যাসঃ সখায়ঃ সুন্বন্তি সোমং দধতি পয়াংসি।
> তিতিক্ষন্তে অভিশস্তিং জনানাং করকস্তদা কশ্চন হি প্রকেতঃ॥

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> করকং স্তৌতি, করকোহি দাড়িম্বঃ। করঃ=উপলঃ তম্বৎ, কৃ+বুন্। দাড়িম্বেতি দাড়ঃ=বিদীর্ণে, দড়্+ঘঞ্। ত্বৎতঃ সকাশাৎ প্রকেতঃ, প্রকৃষ্টৈঃ কেতঃ মেধা যত্র পয়াংসি রসাঃ সোমং দধতি রস-ধাতুং স্নিহ্যতি। সুন্বন্তি সখায়ঃ মনুষ্যানাং সখিত্বং কিম্ভূতাস্তে সৌম্যাসঃ=সোম সম্পাদিনঃ তিতিক্ষন্তে, জনানাং অভিশস্তিং বাক্ রোহন্তি চ সহন্তে চ॥

উপরিউক্ত এই ভাষ্যটির অনুবাদে উপলব্ধি হয় করকের স্তুতি সূক্তি এটি; করক অর্থাৎ দাড়িম্ব। কর শব্দের অর্থ উপল অর্থাৎ পাথরের টুকরো। আর দাড়িম্ব শব্দের অর্থ যা বিদীর্ণ হ'লে আত্মপ্রকাশ করে। তার নিকট থেকে মেধা সঞ্চিত করা যায়।

তার রস সোমধাতুকে স্নিগ্ধ করে। মনুষ্যগণের সখা হয়, কারণ মনুষ্যগণের বাক্ রোহণ করে, অর্থাৎ বাক্‌শক্তির বর্ধন করে, দেহের তিতিক্ষা বর্ধন করে। অর্থাৎ সহন

শক্তিকে বর্ধন করে।

এই বৈদিক সূক্তটির মহীধর ভাষ্যে পাওয়া গেল, এটি মেধাকারক এবং সোমধাতুকে স্নিগ্ধ করে; এবং বাক্ স্ফুরণের সহায়ক হয়। সহন শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। এ ভিন্ন অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৬৬৯।১১।২৯ সূক্তের এই দালিমকে পাওয়া যাচ্ছে; এখনও সেটা দালিম নামেই পরিচিত। এগুলি টক্‌টকে লাল, রসে ভরা দানা, বীজও বেশ দাঁতে লাগে। আর একটা নাম দেখি তার বেদানা, এর দানা থাকলেও নাম মাত্র, তাই কি এদের নাম বে-দানা অর্থাৎ দানাহীন? না কি বহুদানা কথাটা থেকে বিবর্তন হ'য়ে বেদানা হ'লো। যাক্, এই বেদানা শব্দটাই যখন ভারতীয় নয়, ফারসি; তখন ও নিয়ে আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন আমি বৈদিক দালিম নিয়েই আলোচনা করি।

বৈদিক দৃষ্টিকোণ তুলিতে

অভ্যাবর্ত্তস্ব দালিমঃ যজ্ঞেন পয়সা সহ।
যত্তে শুক্রং যৎপূতং বিশম্ভা হৃদয়ং ভরামসি॥
(অথর্ববেদ বৈদ্যককল্প—৬৬৯।১১।২৯)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য করেছেন—

দালিমঃ ইতি দল্ ভেদেন ঘঙ্, তেন নির্বৃত্তঃ রসঃ ই—মপ্। ত্বং দালিমোঽসি, ভেদনাৎ রস নির্বৃত্তোঽসি। এব পয়সা সহ অভ্যাবর্ত্তস্ব। যত্তে রসং শুক্রং=শুদ্ধং—দীপ্তিমৎ পূতং হৃদয়ং বিশম্ভা শ্লাঘ্যরূপং ভরামসি ভরামঃ সম্পাদয়ামঃ।

এর অনুবাদ হচ্ছে—দালিম বা দাড়িমকে নিয়ে এই বৈদিক সূক্ত। এর ভাষ্যে মহীধর বলেছেন—একে ভেদন করেই এর রস নিবর্তন করা হয়; তাই এর নাম দালিম। ড়-ল অভেদে দাড়িম ও দল্ থেকে ই মপ্ প্রত্যয়ের যোগে দালিম। দল শব্দের অর্থ ভেদ করা। সূক্তে ও ভাষ্যে বলা হয়েছে—তোমার রসকে আমরা অভ্যার্থনা করি, তোমার পবিত্র দীপ্তিমান রস খুবই শ্লাঘ্যকর, তাকে হৃদয়ে প্রবেশ করার কাজই আমরা সম্পাদন করবো।

পরবর্তীকালে ঘোষণা

ভারতের একটি সুখ্যাত আহার্য ও ভেষজ এই দালিম। চরকের বহুস্থানেই এর উল্লেখ। সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে মধুর রসযুক্ত ও অম্ল রসযুক্ত দাড়িমের গুণের বিবরণ; কোথাও এটি শ্রমহর, কোথাও হৃদ্য। আবার বিমানস্থানের ৮ম অধ্যায়ে অম্ল-স্কন্ধে ও মধুর স্কন্ধেও পঠিত হ'য়েছে। অর্শ, অতিসারে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি হৃদ্‌রোগেও; এক কথায় বলা যায়—উদর, হৃদয়, অর্শরোগ, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি মর্মস্থানগত রোগগুলিতেই দাড়িমের ব্যবহার। কারণ বেদ বলেছেন—এই দাড়িমকে হৃদয়ের জন্য অভ্যর্থনা করছি। প্রকৃতপক্ষে হৃদয় শব্দটি আয়ুর্বেদের একটি সংজ্ঞাবাচক শব্দ, কারণ চরকের অভিমত (সিদ্ধিস্থান ৯ম অধ্যায়) হোলো—আমাদের শরীরের স্কন্ধ ও শাখায় মোট ১০৭টি মর্মস্থান আছে। ঐসব মর্মের কোন একটির পীড়া হলে

শরীরের সর্বত্র পীড়া উপস্থিত হয়, কারণ মর্মস্থান মাত্রেই সুখ-দুঃখ অনুভব করার শক্তি নিহিত আছে। স্কন্ধের অর্থ মস্তক, গ্রীবা ও মধ্য শরীর এবং শাখার অর্থ হাত-পা। স্কন্ধাশ্রিত মর্মগুলির মধ্যে হৃদয়, বস্তি ও মস্তকই সর্বাপেক্ষা গুরুতর মর্মস্থান। অতএব হৃদয় আহত হলেই কাস, শ্বাস, বলক্ষয়, কণ্ঠশোষ, ক্লোমশোষ, মুখশোষ, অপস্মার, উন্মাদ, প্রলাপ, দৃষ্টি বিভ্রম, মোহ প্রভৃতি সব রোগই উপনীত হয়। ঠিক এমনি ভাবেই মস্তক ও বস্তি প্রধানতম মর্মস্থান। হৃদয়ই সর্বাপেক্ষা গুরু। তাই বৈদিক সূক্তে যে ডালিমকে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করানোর জন্য অভ্যর্থনা বা প্রশস্তি, সেটি যথার্থ এবং যথার্থ বলেই চরক থেকে আরম্ভ ক'রে সুপ্রাচীন সমস্ত আয়ুর্বেদিয় সংহিতায় এবং রসতান্ত্রিক সংহিতাগুলিতে আহার্য ও ভেষজের জন্য দাড়িমের প্রচুর যোগ, প্রচুর মুষ্টিযোগ এবং ভাবনা বিধায়ক ঔষধের আবিষ্কার হয়েছিল।

দাড়িমই একমাত্র ফল—যেটির রস মধুরপ্রধান এবং গৌণ অম্ল অথচ হৃদয়ের বা প্রধানতম মর্মের শ্রেষ্ঠতম হিতকর ফল। বস্তিগত রোগেও এর অমোঘ প্রভাব, তাই মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাতিসার, মূত্রাশ্মরীতে এর দ্বারা প্রচুর ঔষধের প্রচলন। আর একটি প্রধান মর্মস্থান মস্তক। সেখানেও এই দাড়িমের রসের ও দাড়িমের পত্রের ব্যবহার। সর্বপ্রকার রোগের অন্যতম স্বররোগেও এর ভৈষজ্য এবং আহার্য সম্পর্কে এতটুকু শক্তি হ্রাস পায়নি।

পরিচিতি

ভারতের সর্বত্রই ডালিমের গাছ সুপরিচিত। গাছগুলি ১০—১৫ ফিট উঁচু হয়। গাছের ছাল ধূসর বর্ণের ও কাণ্ডসার পীতবর্ণের হয়। পুষ্পভেদে একে ২ ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—একপ্রকার গাছে কেবলই পুং পুষ্প আর একপ্রকার গাছে স্ত্রী ও পুং পুষ্প হয়। চরক সংহিতায় দাড়িমকে ৩ ভাগে ভাগ করা আছে সূত্রস্থান ২৭ অধ্যায়ে—কষায়-মধুর দাড়িম, অম্ল দাড়িম ও মধুর দাড়িম। এই তিন প্রকারের মধ্যে মধুর রসের দাড়িমই শ্রেষ্ঠ। সুশ্রুতে অবশ্য চরকেরই দৃষ্টি। অন্যান্য নিঘণ্টুকার একে মধুর, মধুরাম্ল ও অম্ল ভেদে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন। দেশভেদে এর আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বাদের পরিবর্তন দেখা যায়। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে এটি আফ্রিকার গাছ। সেইটাই যদি প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়া যায় তা হ'লে অথর্ববেদে তার উল্লেখ থাকবে কেন? যদিও আফ্রিকা, কাবুল ও ইরানে বিশেষভাবে জন্মে। ভারতের সর্বত্রই কম-বেশী দেখা যায়। কাবুলের একপ্রকার দাড়িমই বাজারে বেদানা নামে বিখ্যাত। হিন্দীতে একে আনার বা আনারা মস্‌কট এবং ইংরাজীতে Pomgranate বলে। এটির বোটানিক্যাল্ নাম Punica Granatum Linn., এটি Punicaceae ফ্যামিলীভুক্ত।

নব্যদের দৃষ্টিতে

ডালিমের গাছের কাণ্ড ত্বক ও ফলের খোসায় 22-25% Tannin Acid, মূলের ত্বকে 20-25% Punico-Tannic Acid পাওয়া যায়। মূলে একপ্রকার ক্ষার (Pelletierine) পাওয়া যায়। এতে ২ প্রকার ক্ষারতত্ত্ব পাওয়া যায়। এছাড়া ফলে শর্করা ১৫ ভাগ, পেকটিন, মনাইড ইত্যাদি পাওয়া যায়।

গুণপনা

এই তিন প্রকার দাড়িমই সমগুণসম্পন্ন। তবে চরকের বিশ্লেষণে প্রথম ২ প্রকার বায়ুনাশক, একটু গ্রাহী, তবে দীপন, হৃদ্য, কফ-পিত্তের অবিরোধী, এমন-কি মধুরটি পিত্তনাশক তো বটেই। চরকীয় বিশ্লেষণের অনুশীলনে পরবর্তীকালে বাগ্‌ভট, চক্রদত্তাদি ও লোকায়তিক সিদ্ধযোগ ভারতে প্রচলিত হয়েছে।

মধুর দাড়িম— ত্রিদোষ বিকারের উপশামক, শুক্রবর্ধক, হৃদ্য, কণ্ঠ্য, মুখ ও বস্তিগত রোগ-নাশক, দাহ-জ্বর-পিপাসানাশক, তৃপ্তিকারক, অরুচিনাশক, মেধা ও বলকারক, ধারক, স্নিগ্ধ ও লঘু গুণান্বিত।

অম্লমধুর দাড়িম— রুচিকর, অম্লপিত্তবর্ধক, লঘু ও দীপন।

অম্ল দাড়িম— কফ ও বায়ুনাশক, পিত্তবর্ধক।

১। পাতা ও গাছের ছাল— সঙ্কোচক, অতিসার ও ক্রিমিনাশক।

২। ফলের রস— স্নিগ্ধ গুণ, জ্বর-অতিসার-অজীর্ণ-অরুচি নাশক, বলকারক ও যকৃতের ক্রিয়া শোধক। এতে Vitamin B ও C পাওয়া যায়।

৩। **ফলের ছাল—** আম ও রক্তাতিসার, অজীর্ণ নাশক।

৪। **ডালিমের ফুল—** রক্তস্রাবনাশক ও কফঘ্ন।

ব্যবহার্য অংশ— ফল, ফলের খোসা, মূলের ছাল, ফুল ও পাতা।

প্রয়োগ কৌশল

১। **অতিসারে—** (ক) নতুন বা পুরাতন অতিসারে ডালিমের খোসা চূর্ণ ১—৩ গ্রাম মাত্রায় মধু সহ সেবন। (খ) ডালিমের খোসা ২০।২৫ গ্রাম আধ সের জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপের মত থাকতে নামিয়ে ছে'কে খেলে অতিসার সেরে যায়। (গ) ডালিমের খোসা ও বেলশুঠের চূর্ণ সমভাগে মিশিয়ে ২।৩ গ্রাম মাত্রায় মধু সহ সেবনে চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

২। **অতিসার-রক্তাতিসার ও অজীর্ণে—** এ তিনটিতে যাঁরা প্রায়ই ভোগেন, তাঁরা ডালিমের খোসা চূর্ণ ১-৩ গ্রাম মাত্রায় বার্লির সঙ্গে বা ছাগলের দুধের সঙ্গে খাবেন, কয়েকদিনের মধ্যেই সেরে যাবেন।

৩। **রক্তাতিসারে—** (ক) ডালিমের খোসা চূর্ণ ও কুড়চির ছাল চূর্ণ সমভাগে মিশিয়ে ২।৩ গ্রাম মাত্রায় খেলে ভাল কাজ হয়। (চক্রদত্তের অভিমত।) (খ) ডালিমের কচিপাতা ছাগদুগ্ধের সঙ্গে ফুটিয়ে ছে'কে সেই দুধ পান করলে দুরারোগ্য রক্তাতিসার সারে। (গ) পাতার রস ১/২ চা-চামচ মাত্রায় মধুর সঙ্গে খেলেও কাজ হয়।

৪। **আমাশয়ে—**(ক) গাছের ছাল সিদ্ধ ক'রে খেলে আমাশয় সারে, এটি রক্তামাশয়েও কাজ দেয়। (খ) বার্লির সঙ্গে ডালিমের খোসা সিদ্ধ ক'রে খেলে বেলশুঠের মত কাজ দেয় আমাশয় রোগে। কাঁচা ছাল হলে ৫।৬ গ্রাম, শুষ্ক ছাল ৩।৪ গ্রাম হ'লেই চ'লবে।

৫। **আমাজীর্ণে—** ডালিমের রস (ফলের) ও পুরাতন আখের গুড় একসঙ্গে খেলে কাজ হয়। অথবা এই রসে একটু বিট লবণ মিশিয়ে খেলেও হবে।

৬। **রক্তপ্রদরে—** ডালিমের ফুল বেটে মধুসহ খেলে ওটার বেগ কয়েকদিনে কমে যায়, আরও কিছুদিন খেলে সেরে যায়।

৭। **চলিত গর্ভে—** যে মেয়েদের প্রায়ই গর্ভস্রাব হয়ে যায়, তাঁরা ডালিমের

পাতা বাটা, সাদা চন্দনঘষা ও মধু একত্র মিশিয়ে দধির সঙ্গে আলোড়নপূর্বক খেলে ও শঙ্কা করতেই হবে না। এটা বাগ্‌ভটের দৃঢ় অভিমত—হারীত সংহিতাতেও ঐ কথা বলা হয়েছে, তবে হারীত পঞ্চম মাসে খেতে বলেছেন।

৮। **কফ-পিত্তাধিক্যে—** বিশেষতঃ শিশুদের এটি হলে ডালিমের ফুল ছাগলের দুধে মেড়ে লেহবৎ ক'রে খেতে দিলে দোষটা দূর হয়।

৯। **রক্তপিত্তে—** ডালিমের ফুলের রস ১ চা-চামচ মাত্রায় কয়েকদিন খেলে রক্ত ওঠা বা পড়া বন্ধ হ'য়ে যায়।

১০। **নাসা থেকে রক্তস্রাবে—** ডালিমের ফুলের রস নাক দিয়ে টানলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়।

১১। **অরুচিতে—** অম্ল ডালিমের ফলের রস, বিট লবণ ও মধু একত্রে মিশিয়ে কুলকুচা ক'রে ফেলে দিলে অরুচি কমে যায়। এটি চক্রদত্তের অভিমত।

১২। **পুরাতন অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে—** এতে যাঁরা ভুগছেন, তাঁরা প্রত্যহ ঘোলের সঙ্গে খানিকটা টক বা মিষ্টি ডালিমের রস ও একটু বিট লবণ মিশিয়ে খেয়ে দেখুন, ম্যাজিকের মত উপকার পাবেন।

১৩। **উপদংশের ক্ষতে—** ডালিম গাছের ছাল চূর্ণ ছড়িয়ে দিলে ঘা শুকিয়ে যায়।

১৪। **ক্রিমিতে—** ডালিম মূলের ছালের চূর্ণ ১-৩ গ্রাম মাত্রায় (বয়সানুপাতে) চূণের জলসহ খেলে ক্রিমি দূর হবেই। ফিতা ক্রিমিতে(Tape worm) ভাল কাজ হয়।

১৫। **হৃদরোগে—** ডালিমের রস ২—৪ চা-চামচের সঙ্গে অল্প একটু ঘৃত-কুমারীর শাঁস মিশিয়ে খেলে বায়ুজন্য হৃদ্‌রোগের উপশম হয়।

১৬। **মূত্রকৃচ্ছ্রতায়—** ডালিমের রসের সঙ্গে গোক্ষুর চূর্ণ ২।১ গ্রাম মাত্রায় খেলে ২।৩ দিনেই ভাল ফল পাওয়া যায়।

১৭। **অনিদ্রায়—** যাঁরা অনিদ্রা বা অল্প নিদ্রায় ভোগেন, তাঁরা ডালিমের রসের সঙ্গে ঘৃতকুমারীর শাঁস মিশিয়ে খেয়ে দেখুন—২।৪ দিনে ও কষ্টটা দূর হয়ে যাবে।

১৮। **শ্বেতপ্রদরে—** যে সব মা-বোনের সাদা স্রাব হয়, তাঁরা ডালিমের ফুল ২।৩টি বেটে একটু সাদা চন্দন ঘষা মিশিয়ে সম্ভব হ'লে অল্প দুধ মিশিয়ে অথবা জল দিয়ে খেয়ে দেখুন, ৩।৪ দিন খেলে উপকার পাবেন।

১৯। **মেধা হ্রাসে—** অনেক সময় দেখা যায় শরীরও ভেরে যাচ্ছে, এদিকে বুদ্ধিটাও মোটা হ'চ্ছে—সেক্ষেত্রে ডালিমের রসের সঙ্গে এক বা দুই চামচ মধু মিশিয়ে প্রত্যহ একবার ক'রে খেয়ে দেখুন, শরীরটাও ঝ'রে যাবে, মেধাও বাড়বে।

২০। **যকৃৎ বৃদ্ধিতে—** শিশুদের লিভার বেড়ে গেলে ডালিম গাছের মূলের ছাল চূর্ণ করে ২ বা ৪ গ্রেণ অথবা আধ গ্রাম মাত্রায় ২/১ চামচ দুধ মিশিয়ে সকালের দিকে খেতে দিতে হয়, তার সঙ্গে ২/৫ ফোঁটা মধু হ'লে ভাল হয়। পথ্যের দিকে কড়াকড়ি না ক'রলে কোন কিছুতেই উপকার হবে না।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) alkaloids viz., pseudo-pelletierine, pellatierine, isopelletierine, methylpelletierine. (b) Vitamin P acitivity. (c) Mannitol and sorbitol.

শারিবা

রূপ, গুণ, নাম বস্তু-পরিচয়ের এক-একটি অবলম্বন, তা সে কল্পিত নামের দ্বারাই হোক আর শব্দার্থের দ্বারাই হোক। শব্দ সংকেতই যে দ্রব্য নির্ণয় করে তা সত্যই, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত সত্ত্বার পরিচয় যদি বোধগম্য না হয়, সেটা প্রাক্-আর্যযুগের আওতায় পড়ে যায়। এই অনন্তমূল নামটার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা জানি না, তবে তার শারিবা নামের যে আভিজাত্য আছে, সেটা নিঃসন্দেহ। এখন প্রশ্ন হ'লো—এই গাছটির নামের আদি অক্ষর কি হবে বা হওয়া উচিত।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুলো ব'লে একটা কথা আছে। সে কথাটার প্রসঙ্গ এলো—যখন দেখছি বৈদিকযুগে বস্তুবিচার ক'রে তার নামকরণের টেক্‌নিক্। আরো বৈচিত্র্য হ'লো নামের প্রথমাক্ষর কি হবে সে বিচারটাও শব্দবিজ্ঞানভিত্তিক। এই যেমন শারিবা—এই ভেষজটির আদি অক্ষর তালব্য 'শ' না হয়ে দন্ত্য 'স' তো হতে পারতো, তা না হয়ে তালব্য রাখার যুক্তি কি? তাঁদের বিচার হ'লো—তালব্য 'শ' ও দন্ত্য 'স' দুই উষ্ম বর্ণ হলেও প্রথমোক্তটির উচ্চারণ করতে হয় তালু থেকে, এই তালু হ'লো বাক্-প্রকাশের উৎসের স্থান—এটি বায়ুর আধার। আর দন্ত্য 'স' উচ্চারণ হয় দন্তমূলকে আশ্রয় ক'রে; এই দন্তমূল পিত্ত-শ্লেষ্মার আধার। এই শারিবার অন্তর্নিহিত শক্তি হলো বায়ুকেন্দ্রিক, এই তালব্য 'শ'-কে সামনে রেখে তার নামকরণ করা হয়েছে। এইটিই এই নামকরণের পদ্ধতি। এই নামকরণের পদ্ধতিটি আর্য-সংস্কৃতির জ্ঞানগর্ভের আর একটি সরণী। আর শিরোনামে সালসা কথাটি পর্তুগীজ শব্দ, এরই ইংরেজী হলো 'Sarsa', এটি দ্রব্যবাচক। এই সালসা বললেই আমরা বুঝি এটি রক্ত পরিষ্কারক বনৌষধি।

প্রারম্ভ সূত্র

অবিৎসি সোমাবতী মূর্জয়ন্তীম্
উদোজসাম অসন্ধাম শা শারিবাম্।
মজবন্ধো অযবোভিঃ সব্জরুষো
অরুণীভিঃ উর্জস্বতাম্ পিন্বমানম্॥

(অথর্ববেদ—১৬৫।৭১।৭৬)।

উপরিউক্ত সূক্তটির মহীধর ভাষ্য হলো—

অবিৎসি=সমন্তাৎ বেদ্মি। সোমাবতীং সোমযাগ যোগ্যাং, উর্জয়ন্তী =বল প্রাণায়। উর্জয়ন্তী উদজোসাং=উদগতং ওজো যস্যঃ সা। উদোজাঃ তৎ তেজঃ সম্পাদনীং। অসন্ধাং=অশেষেণ সন্ধান দক্ষাং। শারিবাং শারি=পাশঃ তং ব্যনক্তি ইতি=উম্মার্গগামিবৈশ্বানর শক্তিং তাং পাশয়তি শারিবা, তাং বেদ্মি অপিচ অব্দঃ=সূরঃ=বৈশ্বানরঃ অ-যবোভিঃ সজঃ যবাশ্চ অযবাশ্চ জোষণং জুট=প্রীতিঃ সহজষা বর্ততে। অরুণীভিঃ অরুণরসরশ্মিভিঃ চিত্রিতশ্চ প্রীতিযুক্তাং পিবমানাং উর্জস্বতীং বলস্য দধানাং অবিৎসি।

মহীধর ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—তোমাকে সর্বতোভাবে জানি। তুমি সোম যাগযোগ্যা। বল, তেজ ও ওজোদায়িনী। তুমি অশেষ প্রকারে সন্ধানদায়িনী। তুমি শারিবা অর্থাৎ উন্মার্গগামী অগ্নিকে রুদ্ধ কর (শারি অর্থে পাশ বা বন্ধন, তাকে যে প্রকাশ করে, সেই শারিবা)। তুমি যব ও অযবকে বৈশ্বানরের প্রীতিগামী কর। অর্থাৎ জঠরের বিষমাগ্নিকে সমাগ্নি কর। তোমার চিত্রিত পত্রের অরুণবর্ণের রসরশ্মির দ্বারা শরীরের বল বিধান কর।

পরবর্তীকালে

শারিবার প্রচলিত নাম অনন্তমূল। এই গুল্ম লতাটির মূল সরু হয়ে বহুদূরে যায়, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে শিকড়ের শেষ অংশটুকুর শেষ কোথায়—তার হদিস পাওয়া শক্ত হয়, হয়তো বা তারই জন্যে এই নামকরণ।

সংহিতাকারগণ এই শারিবাকে অন্য দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন; তাঁরা জীবনীশক্তি রক্ষার মূল উপাদান যে রক্ত—সেটি শুদ্ধ না থাকলে বল-বীর্য-তেজ এগুলি রক্ষা হয় না, সেই দৃষ্টিকোণ দিয়ে যে বিচার করেননি তা নয়, তবে সেটা গৌণপথে। কারণ সেটা হেতু-বিপরীত চিকিৎসার অন্তর্গত, ব্যাধি-বিপরীত চিকিৎসার ক্ষেত্রে নয়। এক্ষেত্রে ব্যাধিকে রুখে দিয়ে তারপর যে দোষে রোগোৎপত্তি হয়েছে, সেই দোষের কারণকে সে সরিয়ে দেয়, এইটাই অনন্তমূলের বৈশিষ্ট্য।

বৈদিক তথ্যে দেখা যায়—'তুমি যব ও অযবকে বৈশ্বানরের প্রীতিগামী কর'—এর দ্বারা সে দেহের মন্দাগ্নি ও বিষমাগ্নির মধ্যে একটির বৃদ্ধি ও অন্যটির সমতা করে, এইটাই প্রতীয়মান হয়। শেষে আর একটি কথার ইঙ্গিত আছে যে, 'তোমার চিত্রিত পত্রের অরুণবর্ণ রসরশ্মির দ্বারা শরীরের বলবিধান কর।' এই সমগ্র লতাগাছটিতে যে 'মিল্‌কি জুস' (সাদা আঠা বা ক্ষীর) আছে, সেটা নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা চালালে, আর একটা নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

এই অনন্তমূল বা শারিবা ভেষজটি রক্ত পরিষ্কারক—এ ধরণের সংস্কার কে সৃষ্টি করলে?

এটা কিন্তু পরম্পরায় এসে গিয়েছে এই হিসেবে যে, বিশুদ্ধ বায়ু দূষিত পিত্তের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে রক্তবহ শিরামার্গে বক্র হয়ে গমন করে—যার ফলে আসে বাতব্যাধি (বিশেষতঃ পক্ষাঘাত) বা হাতে-পায়ে অসাড়তা। সুতরাং এর শুরুতেই অনন্তমূলের ব্যবহার করলে ওটি আর সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হতে পারে না, ওখানেই সে রুদ্ধ হয়ে যায়, তারপর আস্তে আস্তে সংশোধিত হয়। এই রোগের যে এই-ই কারণ, সে কথা চরকের চিকিৎসাস্থানের ৯২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, চরকে একে ব্যবহার করা হয়েছে রক্তপিত্তে। এখানে দূষিত পিত্তই রক্তের রূপধারণ করেছে; সুতরাং এখানে শারিবা ব্যবহার করাটাই শ্রেয় বলে মনে করেছেন।

সুশ্রুতে একে শ্বাসরোগে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জানা উচিত যে, হাঁপালেই যে শ্বাসরোগ হয়েছে, এটাও যেমন ধরা উচিত নয়, সেইরকম সব বিকৃত পিত্তজনিত রোগে যে অনন্তমূল ব্যবহার করা যাবে তাও ঠিক নয়; সুশ্রুতে যে শ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রটি কিন্তু চরকের রক্তপিত্ত সম্পর্কের বহির্ভূত নয়, অর্থাৎ এই শ্বাসরোগে পিত্তবিকৃতির সম্পর্ক থাকবেই।

পরিচিতি

এই গুল্ম লতাটি ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই অল্পবিস্তর পাওয়া যায়; তবে প্রদেশ ভেদে পাতার আকারের ইতরবিশেষ হলেও তার মাঝখানের শিরা বরাবর যে সাদা দাগ আছে, সেটা সব ক্ষেত্রে থাকবেই। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় গাছের মূল; তবে মূল সরু কি মোটা নির্ভর করে গাছের বয়সের উপর। এই গাছের মূলে একটা বিশিষ্ট গন্ধ আছে। এটির বোটানিক্যাল্ নাম Hemidesmus Indicus R. Br., এটি Asclepiadaceac ফ্যামিলীভুক্ত। আর অপেক্ষাকৃত নবীন বনৌষধির গ্রন্থে শারিবা-দ্বয়ের উল্লেখ। তার জন্য এ দেশের বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ব্যবহার করেন শ্যামালতা নামে একটি বৃহৎ লতজাতীয় সমগ্র গাছ। তার বোটানিক্যাল্ নাম Ichnocarpus frutescens R. Br., এটি Apocynaceae ফ্যামিলীভুক্ত। তবে এইটিই যে নিঘণ্টুক্ত দ্বিতীয় শারিবা কিনা—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

লৌকিক ব্যবহারে

১। যৌবন থাকতেও যেন নেই, লাবণ্য কমে গিয়েছে, ভাল ক্ষুধা হয় না, এক্ষেত্রে অনন্তমূল চূর্ণ ১-২ গ্রাম মাত্রায় সিকি কাপ গরম দুধ ও একটু মিছরির গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে হয়। এর দ্বারা ওসব অসুবিধেগুলি চলে যায়।

২। **অর্শরোগে—** ৩ গ্রাম আন্দাজ অনন্তমূল জলে বেটে দুধের সঙ্গে জ্বাল দিয়ে সেই দুধ দই পেতে পরের দিন সকালে খেতে হবে। এর দ্বারা আহারের রুচি হবে ও ক্ষুধা বাড়বে, তার সঙ্গে অর্শেরও উপশম হবে।

৩। **হাত-পায়ের জ্বালায়—** শরৎকালে পিত্তবিকারে যাঁদের দেহ জ্বালা করে, তাঁরা ৩ গ্রাম আন্দাজ অনন্তমূল জলে বেটে চিনি দিয়ে সরবৎ ক'রে খাবেন, এ জ্বালা থাকবে না।

৪। **অরুচিতে—** যাঁদের বিকৃত পিত্ত শ্লেষ্মা চাপা আছে, এরই জন্যে হয় অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য, গা বমি বমি ভাব—এক্ষেত্রে অনন্তমূল থে'তো ক'রে গরম জলে ভিজিয়ে সকালে ছে'কে নিয়ে জলটা খাওয়া। এর দ্বারা ও দোষগুলি চলে যাবে।

৫। **একজিমা ও হাঁপানীতে—** দুটোই আছে, এক্ষেত্রে অনন্তমূল ৩ গ্রাম আন্দাজ জলে বেটে অল্প সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে সরবতের মত দু'বেলা খেতে হয়; অবশ্য বয়সানুপাতে অনন্তমূল কমাতে হয়। তবে সৈন্ধব লবণটা যেন আসল হয়।

৬। **খুস্‌খুসে কাসিতে—** অনন্তমূল চূর্ণ ১২ গ্রাম মাত্রায় সকালে ও সন্ধ্যায় দু'বার খেতে হয়। এটাতে উপশম হয়।

৭। **অনিয়মিত ঋতুস্রাবে—** এ ক্ষেত্রকে আয়ুর্বেদ বলেন—রক্তপ্রদর। এ রক্তে অনেক সময় দুর্গন্ধও থাকে। এক্ষেত্রে ৩ গ্রাম আন্দাজ অনন্তমূল বেটে সকালে ও বিকালে দুধ বা জল সহ খেতে হয়। এসব প্রাচীন বৈদ্যগণের অভিজ্ঞতার ফসল।

৮। **গাত্রদৌর্গন্ধে—** গায়ের যেখানে সেখানে ঘামে দুর্গন্ধ হয়। এই অনন্তমূল বেটে অল্প ঘি মিশিয়ে গায়ে মাখতে হয়। তার খানিকক্ষণ পরে স্নান করতে হয়। এটাতে ঐ দোষটি চলে যায়।

৯। **বাতরক্তে—** গায়ে যেন কি চ'রে বেড়াচ্ছে, তার সঙ্গে থাকে যে কোন অঙ্গের মাঝে মাঝে সঙ্কোচন; এক্ষেত্রে শুধু ঐ মূলের ক্বাথ বেশ কিছুদিন খেতে হয়। এর দ্বারা ঐ দোষটি চলে যায়।

১০। **আমাশয়ে—** অনন্তমূলের চূর্ণ মধু সহ খেলে প্রশমিত হয়।

১১। **স্তন্যহ্রাসে—** অনন্তমূলের কাথ সেবনে স্তনে দুগ্ধ বাড়ে।

১২। **উপদংশের ক্ষতে—** অনন্তমূলের কাথ দিয়ে ঘা ধুলে ঘা শুকিয়ে পুরে ওঠে।

১৩। **খোস পাচড়ায়—** অনন্তমূলের চূর্ণ ১-২ গ্রাম মাত্রায় অথবা তার কাথ সেবনে সুফল পাওয়া যায়। ঐ সঙ্গে অনন্তমূলের কাথ দিয়ে ধুলে সত্বর ফল পাওয়া যায়।

১৪। **জিহ্বার ক্ষতে—** ভেড়ার দুধে অনন্তমূল ঘষে লাগালে ওটা উপশমিত হয়। বিশেষতঃ শিশুদের জিহ্বার ক্ষতে বিশেষ উপকার হয়।

১৫। **পাথুরী রোগে—** গো দুগ্ধে অনন্তমূল বেটে খাওয়ালে এই রোগটির যন্ত্রণা অচিরেই লাঘব হয়।

এ ভিন্ন আরও কত লৌকিক ব্যবহার আমাদের অজানা থেকে গেল, তার ইয়ত্তা নেই।

অনন্তমূল যে রক্ত পরিষ্কারক, এ কথা পরম্পরায় চ'লে আসছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক-গণের মনে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, সে কিভাবে রক্ত পরিষ্কার ক'রছে? এ সম্পর্কে নবীনের মতবাদের সঙ্গে প্রাচীনদের মতবাদের পার্থক্য থাকবেই, কারণ দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী, তবে এটা দেখেছি যে, প্রাচীনেরা ব্লাডপ্রেসার রোগে এই অনন্তমূল ব্যবহার ক'রতেন, তাঁদের ধারণা এর দ্বারা রক্তের মলাংশকে দূরীভূত করে।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Essential oil. (b) 2-hydroxy-4-methoxy benzaldehyde. (c) Sterols. (d) Glycosides. (e)Other constituents viz., saponin, resin acid and tannins.

এরণ্ড

অনেক কথাই আমরা ব'লে থাকি, কিন্তু ব'লতে হয় তাই বলি; সেই রকমই একটি কথা বরেন্দ্র ভূমি; আসলে বরিন্দ্ শব্দটি আরবী, এর অর্থ উচ্চ ভূমি; বরিন্দ্ থেকে বরেন্দ্র। আমাদের উত্তরবঙ্গ উচ্চভূমি ব'লে তাকে বলা হ'তো বরেন্দ্র ভূমি। এখানকার অধিবাসীদের বলা হয় বারেন্দ্র, এই রকম রাঢ়ের ভূমিতে যাঁরা বাস ক'রতেন, তাঁদের সংজ্ঞা হ'লো 'রাঢ়ী'। গাছপালার মধ্যেও দেখা যায় এরণ্ডের প্রধান কলোনী হ'য়েছিলো রাঢ়ে (রাঢ় দেশে) তাই তার লোকায়তিক নাম হ'য়ে গেল 'রেড়ি'।

আবার গোদা বাংলায় আমরা যেমন বলি 'তেলাপোকা আবার পাখি'? সেই রকম পণ্ডিত সমাজের শ্লেষাত্মক উপমার বস্তু এই রেড়ি বা এরণ্ড। এ-সব কিন্তু হাফ্-আখড়াইয়ের পণ্ডিতি বুলেটিন্। একজন বললেন—রাখ তো, 'স্নুহী বৃক্ষো মহাতরুঃ'। অর্থাৎ মনসা গাছও (Euphorbia nerifolia) আবার মহীরুহ? তারই উপমার রূপান্তর ক'রে যাকে বলা যায় রং-এর উপর রসান চড়িয়ে আর একজন আসর জমালেন—

যস্মিন্ দেশে দ্রুমো নাস্তি এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।

অর্থাৎ যে দেশে গাছ নেই, সেখানে এরণ্ড গাছই বৃক্ষ।

এ তো গেল স্থূলে দৃষ্টিতে বিচারের রায়, কিন্তু বৈদিক যুগে এই ক্ষুপ জাতীয় গাছটির বস্তুসত্তার দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন সেই যুগের মনীষিগণ তাঁদের সমীক্ষায়—

মাতেব পুত্রং পৃথিবী পুরীষ্যং অগ্নিং স্বে যোনৌ অভৈরণ্ডঃ।
বিশ্বৈঃ দেবৈঃ ঋতুভিঃ সংবিদানঃ অন্যম্ অস্মদিচ্ছ
প্রজাপতির্বিমঞ্চতু॥
অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ১২।১২৭।২৯

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

এরণ্ড স্বং, মাতেব পুত্রং নিধায় দুগ্ধং সিঞ্চেৎ, পৃথিবী ভূরূপা ইব পুরীষ্যং অগ্নিং স্বে যোনৌ অভা ধৃতবান্ এরণ্ডঃ ইরয়তি বায়ুং মলং চ ইঃ প্রেরণে অণ্ডচ্। সর্বঋতুভিঃ সংবিদানাঃ একীকৃত্য পুরীষং এরণ্ডকৃত্য জানন্তঃ অন্যং অগ্নিং অস্মৎ প্রজাপতিঃ ত্বং বিমঞ্চতু।

অর্থাৎ তুমি এরণ্ড (বায়ু ও মলকে প্রেরণ করে যে তারই নাম এরণ্ড), মাতা যেমন পুত্রকে, পৃথিবী যেমন পুরীষ্যকে অর্থাৎ তার মলরূপ খাদ্যকে দান করে, তুমিও সর্ব-

ঋতুতেই আমাদিকে খাদ্যমল পরিত্যাগ করিয়ে নূতন খাদ্যগ্রাহক অগ্নিকে দান কর, তাই প্রজাপতি তোমাকে এরণ্ড অর্থাৎ বায়ুপ্রেরক ও মল পরিত্যাজক ক'রে আমাদিগকে দান করুন।

বেদের এই সূক্তিটি আয়ুর্বেদের দোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) সিদ্ধান্তের অন্যতম মৌলভিত্তি বায়ু। তার প্রাকৃত রূপ ও শারীর রূপের আকৃতি-প্রকৃতির চিহ্নিত ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টির রহস্য জ্ঞান হয়। অর্থাৎ যার ক্রিয়া আছে অথচ রূপ নেই সেই-ই তো বায়ু, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েও অতীন্দ্রিয়; এর প্রকৃতিটি যেমন শীতল তেমনি রূক্ষ, যেমন লঘু আর তেমনি গুরু, নেই তাতে পিচ্ছিলতা ও স্নেহ। আমরা দুটি রূপে তার ক্রিয়া-কলাপ উপলব্ধি করি। প্রথমটি হলো প্রাকৃত বায়ু, এটি স্বভাবে না থাকলে, কি জীব-জগৎ কি প্রাণীজগৎ, কেহই রক্ষে পেতো না; আবার তার বিকৃত রূপ যখন প্রকাশ করে, তখন হয় ঝড়-ঝঞ্ঝা; সেখানে তাপের আধিক্য বর্তমান থাকবেই; কিন্তু তখন বৃষ্টি হ'লে ওটি থেমে যায়। সেই রকম আমাদের দেহ-জগতের মধ্যে যেটি আছে, সেটি স্বাভাবিক থাকলে আমরা সুস্থ থাকি, আবার এটা বিকৃত হ'লেই শরীরের মধ্যেও ঝড়-ঝঞ্ঝা সৃষ্টি হয়; সেখানেও তাপের আধিক্য থাকে; তার ওপর তার স্বভাব প্রকৃতি রূক্ষ ও খর, তখন তাকে স্নেহ সিঞ্চন ক'রলেই ও শান্ত হয়। আমাদের যখন বায়ু-বিকার হয়, তখন আমাদের অভ্যন্তরস্থ ধাতুগত অগ্নি বিকারগ্রস্ত হবেই।

এক কথায় ব'লতে গেলে, যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ও শারীর যন্ত্রের ক্রিয়া নির্বাহিত হয় সেই শক্তির নামই বায়ু; এটি ভারতীয় সিদ্ধান্ত। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত হলো—স্নায়ু, শিরা ও ধমনীর দ্বারাই (যাকে বলা হয় Nervous System) আমাদের ইন্দ্রিয়ের ও শারীর ক্রিয়া নির্বাহ হ'য়ে থাকে; কিন্তু এ প্রশ্নও মনে আসতে পারে যে, এই সব ধমনী বা শিরার ক্রিয়াকারিত্ব কার দ্বারা পরিচালিত হ'চ্ছে?

সুতরাং বৈদ্যক-ঋষির সিদ্ধান্ত যে আরও গভীর ও সূক্ষ্মতর চিন্তাধারা—এইটাই ভাবার জন্যে মন এগিয়ে আসে, তাই তাঁরা ভেবেছিলেন শারীর বায়ুই একমাত্র কারণ রোগ ও নীরোগের।

তা হ'লে এখানে আর একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, বায়ু ভিন্ন ত্রিদোষের আর বাকী যে দুটি দোষ পিত্ত ও কফ, তাদের কি কোন কাজ নেই?

এখানে হেতু সিদ্ধান্ত হ'লো—

পিত্তং পঙ্গুঃ কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ।
বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র গচ্ছন্তি মেঘবৎ॥

অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ রসরক্তাদি সকলেই তো অচল (চলৎশক্তি হীন), তাকে সচল ক'রে রাখে বায়ু, যেমন মেঘকে টেনে নিয়ে যায়। তবে এটাও ঠিক যে বিকারগ্রস্ত পিত্ত বা কফ যদি তাকে ঢেকে ফেলতে পারে, অর্থাৎ আবৃতধর্মী হ'য়ে যায়, তবে তখনই হয় সান্নিপাতিক ক্ষেত্র অর্থাৎ সব দোষেরই প্রাধান্য। এ ক্ষেত্রে বায়ুর স্বভাবধর্মিতার বিকাশের জন্যই ওখানকার মলকে নিষ্কাশন করানোর প্রকৃষ্ট ভেষজ এই এরণ্ড, বিশেষভাবে তার বীজের স্নেহ। এই স্নেহ আবার ৪ প্রকারঃ ১। মূলজ ২। ত্বকজ ৩। জৈবজ ও ৪। বীজজ। তাদের মধ্যে জৈবজ ও ফলবীজ জাত স্নেহ বিকৃত বায়ুর পক্ষে বেশী হিতকর, এ সিদ্ধান্ত চরক সংহিতার এবং প্রধানতঃ সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায়ের। অতএব বিকৃত বায়ুর দ্বারা সৃষ্ট রোগের ক্ষেত্রে এই স্নেহ দ্রব্যটির ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রদ হয়; কারণ দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু যখন রূক্ষ ও খর হয়, তখন তাকে স্নেহ

সিঞ্চন ক'রলে ওটি শান্ত হয়, সেক্ষেত্রে যারা উপশমিত করে তাদেরই বলা হয় স্নিগ্ধ বা শীতবীর্য দ্রব্য। বৈদিক সূক্তে পাওয়া যাচ্ছে এরণ্ড স্নিগ্ধবীর্য ভেষজ, অবশ্য এ স্নেহটা বীজেই থাকে।

এ তো গেল দ্রব্যের দোষনাশক শক্তি বিচার। এইবার দোষের ক্ষেত্র বিচার :—

১৩টি স্রোতপথের সাহায্যে আমাদের দেহ ও জীবনকে ধারণ ক'রে রেখেছে, এটা চরকীয় চিন্তাধারা; এই সব স্রোতের কোনটায় বা চলে অন্ন, কোনটায় রক্ত, এমনকি প্রাণেরও স্রোতপথ পৃথক। কোন দুষ্ট কারণে যদি এই বায়ু ভারাক্রান্ত হ'য়ে প'ড়ে তার গতির সাবলীলতা বাধাপ্রাপ্ত বা রুদ্ধ হয়, তখনই সেখানে রোগ বাসা বাঁধে, বিশেষভাবে আমাশয়, পক্বাশয়, হৃদয়াশয়, রক্তাশয় ও সন্ধিস্থান প্রভৃতিতে; যে মলীভূত কারণে সেখানকার বায়ু অবরুদ্ধ হ'য়ে রোগাক্রান্ত ক'রে দেহকে পীড়িত ক'রছে এই এরণ্ড বীজ স্নেহ (যেটি আমাদের কাছে Castor oil ব'লে পরিচিত) আশয়গত দোষকে সরিয়ে দিয়ে বায়ুর সাবলীল গতিক্রিয়া পুনরায় স্বাভাবিক করে। ঠিক এমনিভাবে শিরাগত, স্নায়ুগত, রক্তগত, বস্তিগত বায়ুর ক্রিয়াকে সে স্বাভাবিক অবস্থায় এনে দেয়; তাই এই এরণ্ডবীজ স্নেহকে তুলনা করা হ'য়েছে মায়ের স্নেহের সঙ্গে; মা যেমন সন্তানের ভালোর জন্য তার প্রতি ক্রুদ্ধা হ'য়ে তাকে শাসন করেন, সেই রকমই।

পরিচিতি

ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, সাধারণতঃ ১০।১২ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়, শাখাপ্রশাখা খুবই অল্প; কান্ড ও পত্রদণ্ড নরম ও ফাঁপা, পাতাগুলি আকারে প্রায় গোল হ'লেও আঙ্গুল সমেত হাতের তালুর মত; ব্যাস প্রায় এক ফুট, পাতার কর্তিত অংশগুলির অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। এই কর্তিত অংশটি প্রায় ৫/৬ ইঞ্চি লম্বা। আবর্জনাপূর্ণ জায়গায় এর বাড়-বৃদ্ধি বেশী হয়। এক বৎসরেই গাছে ফুল ও ফল হয়; সাধারণতঃ কান্ডের অগ্রভাগে পুষ্পদণ্ডের চারিদিকে গোল হ'য়ে ছোট ছোট হলুদে ফুল হয়, পরে ত্রিকোষ-যুক্ত এবং আকারে দেশী কুলের মত ফল হ'লেও গায়ে কাঁকরোলের (Momardica cochinchinensis) মত নরম কাঁটা থাকে। এই ফল পাকার পর ফেটে বীজ প'ড়ে যায়, বীজের খোলায় (শক্ত বহিরাবরণে) থাকে সাদা সাদা ডোরা দাগ।

চরক সুশ্রুতের পরবর্তীকালের বনৌষধির গ্রন্থে আর একপ্রকার এরণ্ডের উল্লেখ দেখা যায়, তার কান্ড ও পাতার ডাঁটাগুলি একটু বেগুনে রং-এর; একে বলা হয় রক্ত এরণ্ড, দুটি গাছের আকৃতিতে কোন পার্থক্য নেই, তবে বৈদ্যকগ্রন্থের মতে শরীরের দোষ নিরসনের জন্য রক্ত এরণ্ড অপেক্ষা শ্বেত এরণ্ড বৃক্ষের উপযোগিতার কথাই উল্লেখিত হ'য়েছে। পাশ্চাত্য ভেষজ বিজ্ঞানীদের মতে এই রক্ত এরণ্ড পৃথক কোন প্রজাতি (Species) নয়; এই গাছটির বোটানিক্যাল্ নাম Ricinus communis Linn. ফ্যামিলি Euphorbiaceae.

রোগ প্রতিকারে (পত্রের ব্যবহার)

১। **নেত্রাভিষ্যন্দে (চোখ ওঠায়)**— পাতার রস একটু গরম ক'রে, ছেঁকে নিয়ে ঐ রস চোখে এক একবার ফোঁটা দিতে হয়।

২। **ঠুনকোয়**— যতদূর সম্ভব স্তনের দুধ গেলে ফেলে (অবশ্য সম্ভব হ'লে) এর পাতা আগুনে একটু সেঁকে নরম ক'রে ঐ পাতা চাপা দিয়ে বেঁধে রাখলে ফুলো ও

ব্যথা দুইই ক'মে যাবে। আর ৭/৮ গ্রাম পাতা এক পোয়া আন্দাজ জলে সিদ্ধ করে তিন ছটাক থাকতে নামিয়ে, ছে'কে ঐ জলটা খেতে হবে।

৩। **স্তন্যের স্বল্পতায়—** মায়ের পুষ্টির যে অভাব তা নয় অথচ বুকের দুধ কম, সেক্ষেত্রে কচিপাতা আন্দাজ ৫ গ্রাম, দুধ আধ পোয়া আর জল আধ সের একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে, এক পোয়া থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সেই দুধ খেলে স্তন্য বৃদ্ধি হবে। এমন কি একটি ক'রে রেড়ির পাতা গরুকে খাওয়ালে গরুরও দুধ বাড়ে। গরুর পালানে বাঁধলেও দুধ বাড়ে।

৪। **অম্লশূলে—** কচিপাতা ৪।৫ গ্রাম সিদ্ধ ক'রে ছে'কে সেই জল খেলে ব্যথা ক'মে যায়।

৫। **মাথা ভার ও যন্ত্রণায়—** ৫/৬ গ্রাম কচিপাতা সিদ্ধ জল ছে'কে খেলে ওটা ক'মে যায়।

৬। **রাতকানায়—** সন্ধ্যার পর চোখে দেখতে পান না, সেক্ষেত্রে ১০।১২ গ্রাম পাতা ঘিয়ে ভেজে মধ্যাহ্নে আহারের সময় শাক ভাজার সময় কয়েকদিন খেতে হয়।

৭। **জ্বরের দাহে—** গায়ের জ্বালা কিছুতেই ক'মছে না, সেক্ষেত্রে এর পাতা ধুয়ে, মুছে তার ওপর শুইয়ে দিতে হয়। এর দ্বারা গায়ের জ্বালা কিছু উপশম হবে।

৮। **কর্ণশূলে—** ঊর্ধ্বজত্রুগত দোষে কানে যন্ত্রণা, সাধারণতঃ রাত্রের দিকে বেশী হয় অথচ পু'জও পড়ে না; সেক্ষেত্রে এরণ্ডপত্র ও এক টুকরো আদা থে'তো ক'রে সরষের তেলে ভেজে, ছে'কে নিয়ে ঐ তেল কানে ফোঁটা দিতে হয়, এর দ্বারা ঐ যন্ত্রণার উপশম হবে।

৯। **স্বল্প রজেঃ—** রজরক্ত স্রাব ভাল না হওয়ায় তলপেটে যন্ত্রণা, এক্ষেত্রে রেড়ির পাতা অল্প গরম করে তলপেটে (নাভির নিচে) বসিয়ে রাখতে হয়; পাতা শুকিয়ে গেলে ফেলে দিতে হয়। এইভাবে আরও দুই/একদিন পাতা বসাতে হয়। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে। যাঁদের শ্বেতপ্রদর তাঁদেরও এটাতে কিছু সুবিধে হবে।

মূল বা মূলত্বক (মূলের ছাল)

১০। **প্রবাহিকায় (আমাশায়)—** পেটে গু'ঠলে মল আছে, বেরুচ্ছে না, কিন্তু মাঝে মাঝে আম ও রক্ত দুইই প'ড়ছে, তার সঙ্গে মলদ্বারে শুলুনি ব্যথা, এ ক্ষেত্রে কাঁচা এরণ্ড মূল ২৫ গ্রাম আন্দাজ, দুধ আধ পোয়া, জল আধ সের একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে ছে'কে সেই দুধটা খেলে ঐ অসুবিধেটা চ'লে যাবে। এ ব্যবস্থাটা চরক সম্প্রদায়ের।

১১। **প্রস্রাবের স্বল্পতায়—** কাঁচা মূল ১৫/২০ গ্রাম মাত্রায় ৩ কাপ জলে সিদ্ধ করে, এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সকালে অথবা বৈকালে একবার খেলে প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, এবং বারে বারে যেতে হয় না।

১২। **উদরের মেদে—** নাদাপেটা ভু'ড়ি, যত বাড়-বৃদ্ধি যেন ওখানেই, এ ক্ষেত্রে কচি এরণ্ড মূলের রস ৩/৪ চামচ এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেতে হয়, এটা কিছুদিন খেলে মেদটা ক'মে যাবে। তবে আরও উপকার পাওয়া যায় যদি ওর সঙ্গে ১ চামচ মধু (খাঁটি) মিশিয়ে খাওয়া যায়।

১৩। **রসগতবাতে—** এই রোগটিকেই আয়ুর্বেদে আমবাত বলা হ'য়েছে। এর লক্ষণ ফুলো আর সঙ্গে যন্ত্রণা; এ ক্ষেত্রে এর মূলের পাচনে উপশম হয়, তবে মূলের কাঠ শক্ত হ'য়ে গেলে মূলের ছাল অন্ততঃ ১০/১২ গ্রাম নিতে হয়।

১৪। **নিউরাল্‌জিয়ায়** (Neuralgia)— অনেক বৃদ্ধ বৈদ্য এটাকে নাড়ীশূল ব'লে থাকেন। এ ক্ষেত্রে এর মূলের ক্বাথ কিছুদিন ধ'রে খাওয়ালে ভাল কাজ হয়।

১৫। **খোস চুলকণায়**— মূলের ছাল বাটায় হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে গায়ে মাখতে বা লাগাতে হয়। এর দ্বারা ওটার উপশম হবে।

বীজের ব্যবহার

১৬। **সায়েটিকায় (গৃধ্রসী বাতে) ও কটি শূলে**— কোমর থেকে আরম্ভ ক'রে পায়ের শিরা বেয়ে যে যন্ত্রণা নামে, মনে হয় যেন কাঁটা বিঁধছে, সেক্ষেত্রে ৬।৭টি বীজের শাঁস বেটে দুধের সঙ্গে পায়েস করে খেতে হয়। কয়েকদিন ব্যবহারে কিছুটা উপশম হবে।

১৭। **কোষ্ঠবদ্ধতায়**— নানান কারণে যাঁদের কোষ্ঠকাঠিন্যের ধাত, মল গুঠ্‌লে হ'য়ে ২/১ দিন অন্তর হয়, তাঁরা নিত্য আহার্য ব্যঞ্জনের সহিত ৪/৫টি এরণ্ডবীজের শাঁস বেটে ঐ ব্যঞ্জন রান্নার সময় ওটা দিয়ে নিত্য ব্যবহার ক'রবেন, তবে কিছুদিন ধরে এটা ক'রতে হয়। এ সম্বন্ধে আর একটা কথা জানিয়ে রাখি—উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে বহু গরীব গৃহস্থবাড়ীতে গাছ করা আছে; তাঁরা প্রায় নিত্যই ডাঁসা ফলের বীজের শাঁস মশলার সঙ্গে বেটে দিয়ে থাকেন তরকারিতে। এটার উদ্দেশ্য রান্নার তেলের সাশ্রয় হয়, অধিকন্তু দ্রব্যগুণ তো আছেই। আর এই বীজ বাটা ব্যঞ্জন খেতেও নাকি খারাপ হয় না, কারণ তখন রেড়ির তেলের যে একটা গন্ধ আছে, সেটাও হয় না।

১৮। **ফোড়া পাকাতে**— রেড়ির বীজের শাঁস বেটে অল্প গরম ক'রে ফোড়ার ওপর বসিয়ে দিলে ওটা পেকে ফেটে যায়।

রেড়ির তৈল প্রস্তুতের প্রাচীন পদ্ধতি

রেড়ির বীজ মাটিতে ২ দিন রেখে (খড় চাপা দিয়ে, গোবর জল ছিটিয়ে) সেইগুলিকে রৌদ্রে সামান্য শুকিয়ে নিলেই অল্প আঘাতে খোসা ছাড়ান যায়। বেশ ক'রে ঝেড়ে নিয়ে খোলায় ভেজে, ঢেঁকিতে বা হামানদিস্তেয় কুটে জল দিয়ে ফাটালেই রেড়ির তেল ভেসে উঠবে, পরে ছেঁকে জলটাকে মেরে নিলেই পরিষ্কার রেড়ির তেল হয়। যাঁদের অবস্থা ভাল তাঁরা ঘানিতেই পিষে নিতেন; তবে প্রাথমিক কাজ ক'রতেই হবে। সুশ্রুতে বলা আছে যন্ত্রপেষিত তৈল অপেক্ষা সিদ্ধ তৈল স্নিগ্ধগুণ। পাকাশয় বা অন্ত্রে কোন উদ্বেগ হয় না। যন্ত্রপেষিত তৈল রুক্ষতা আনে।

তৈলের ব্যবহার

১৯। **পেট ফাঁপায়**— দাস্ত পরিষ্কার হয় না, আবার পেটও অল্প ফাঁপে, এ ক্ষেত্রে গরমজলের সঙ্গে আধ বা এক চামচ এরণ্ড তৈল খেতে দিতেন প্রাচীন বৈদ্যরা, তবে বয়স হিসেবে মাত্রা ঠিক ক'রে দিতেন।

২০। **ক্রিমির উপদ্রবে**— মলদ্বারে এসে প্রায় রোজই জ্বালাতন করে, অস্বস্তিকর অবস্থা—এ ক্ষেত্রে দুই একদিন অন্তর ৫/১০ ফোঁটা থেকে আরম্ভ ক'রে ১ চামচ পর্যন্ত (বয়সানুপাতে) একটু গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিতে হয়। এটাতে অনেকের কেঁচো ক্রিমিও বেরিয়ে যায়।

২১। **বৃদ্ধি রোগে (বাতজ)**— যাঁদের অণ্ডকোষের বহিরাবরণের চর্মাধারে জল

জমেনি অথচ আকারে বড় হ'য়ে আছে; সেক্ষেত্রে এই এরণ্ড তেল ১ চামচ ক'রে একটু গরম দুধে মিশিয়ে এক/ দেড় মাস খেতে হয়; সেটা খালিপেটে ভোরের দিকে খেলে ভাল হয়। এটা সুশ্রুত সংহিতার ব্যবস্থা।

২২। **পিত্তশূলে** (Biliary colic) পিত্তনিঃসারক স্রোতপথের আকস্মিক আক্ষেপ (spasm) মাঝে মাঝে হ'তে থাকে, এ ক্ষেত্রে যষ্টিমধু (Glycyrrhiza glabra) ৫/৬ গ্রাম থে'তো ক'রে এবং সিদ্ধ ক'রে এক ছটাক আন্দাজ থাকতে নামিয়ে, সেটাতে আন্দাজ ১ চামচ চিনি মিশিয়ে খেলে ওটা চ'লে যাবে। এটা রাত্রে শয়নকালে অথবা ভোরের দিকে খেতে হয়।

২৩। **মূত্র শূলে**— এরণ্ড তৈলের সঙ্গে ১ চামচ আদার রস অল্প গরমজলে মিশিয়ে খেলে এটা উপশম হয়, তবে এর গন্ধটা বিরক্তিকর, বর্তমান ক্ষেত্রে গন্ধবিহীন (Odourless Castor oil) এরণ্ড তৈলের ব্যবহার চ'লছে।

পায়ের শিরা কে'চোর মত জড়িয়ে যাচ্ছে ও মোটা হয়েছে, পেশীগুলিও শক্ত, মাঝে মাঝে টনটন করা, ব্যথা ও যন্ত্রণা উপসর্গ আছে—সেক্ষেত্রে প্রত্যহ অল্প গরম দুধের সঙ্গে এক বা আধ চামচ মাত্রায় খাওয়া। এটা কিন্তু বিরেচন হিসেবে ব্যবহার করা নয়, রক্তগত বায়ুকে নিবারণ করার জন্য। এর সঙ্গে পায়ে আস্তে আস্তে এই তৈলের মালিশ ব্যবস্থা।

২৪। **কেটে গেলে**— এরণ্ড তৈলে হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে কাটা জায়গায় চেপে বে'ধে দিলে রক্ত বন্ধ হ'য়ে যায় ও ব্যথা হয় না এবং তাড়াতাড়ি জুড়ে যায় এবং থে'তলে গেলেও এইভাবে লাগাতে হয়।

২৫ **অগ্নিদগ্ধে**— পোড়া জায়গাটা আস্তে আস্তে মুছে দিয়ে তৎক্ষণাৎ এই তৈল তুলো দিয়ে আস্তে আস্তে লাগাতে হয়। লাগানোর ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে পোড়ার জ্বালা কমে যায়। এ ক্ষেত্রে ক্ষত হ'লে একটু সাদা ধুনোর গুঁড়োর সঙ্গে মলম ক'রে লাগালে সেরে যায়।

২৬। **শিশুদের পেটকামড়ানিতে**— কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, পেটে অল্প অল্প বায়ু হয়েছে, সেক্ষেত্রে এই তৈল আর জল একসঙ্গে ফেটিয়ে নাভির চারিদিকে লাগিয়ে আস্তে আস্তে মালিশ করে দিতে হয়; এটাতে অল্প সময়ের মধ্যে কষ্টটা চলে যায়।

২৭। **সাদা দাগে**— গায়ের মাঝে মাঝে ফুট্ফুট্ দাগ। সেক্ষেত্রে এই তৈল প্রত্যহ বা এক দিন অন্তর গায়ে মাখতে হয় অথবা ঐ দাগগুলিতে লাগাতে হয়। এমন কি শ্বেতির (শ্বিত্র রোগ) ঠিক প্রথমাবস্থায় এই তৈল দিনে ২।৩ বার ক'রে লাগাতে হয়। তবে কমপক্ষে ২।৩ মাস না লাগালে এই ক্ষেত্রে ফল দেখা যায় না।

২৮। **আঁচিলের ঘা**— অনেকে আঁচিলে চুণ, সোডা লাগিয়ে তুলে দেন, সেখানে ক্ষতও হয়, সেই ক্ষতে এরণ্ড তৈল লাগালে সেরে যায়।

২৯। **বাতের ব্যথায়**— সৈন্ধব লবণের সঙ্গে গরম এরণ্ড তৈল মিশিয়ে ভাল ক'রে পিষে ওটা ব্যথার জায়গায় লাগাতে হয়, এটাতেও কিছু উপশম হবে।

৩০। চোখে বালি বা ময়লা প'ড়ে জল ঝ'রতে থাকলে পালকে ক'রে চোখে লাগিয়ে দিলে ওটা বন্ধ হয়।

ক্ষারের ব্যবহার

৩১। **মেদ বৃদ্ধিতে**— না খেয়েও মোটা হ'য়ে যাচ্ছে—এ ক্ষেত্রে এই এরণ্ড পত্রের ভস্ম আধ গ্রাম আর তার সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা হিং এক গ্রেণ (আধ রতি) এই দুটি একসঙ্গে

মিশিয়ে আধ কাপ আন্দাজ ভাতের মাড় (ফেন) মিশিয়ে খেতে হয়। এটা তৈরী করার নিয়ম—বেশ কিছুটা শুষ্ক এরণ্ড পত্র (রেড়ির পাতা) হাঁড়িতে মুখ বন্ধ ক'রে মাটি লেপে পোড়া দিয়ে যে সাদা-কালো মিশানো ছাই পাওয়া যাবে সেইটা নিলেই হবে।

৩২। **কাসে—** কোন ওষুধেই বিশেষ কাজ হচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে এই পাতার পোড়া মিহি ভস্ম ২/৩ রতি (৬ গ্রেণ) (এটা পূর্ণ মাত্রা) একটু পুরানো গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে চেটে খেতে হবে।

এ ভিন্ন দ্রব্যের রস, গুণ, বীর্য বিপাক ও প্রভাব বিচার ক'রে রোগ প্রতিকারে আরও বহুক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে একটি রোগের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অ-সমীচীন —সেটা হ'লো রক্তপিত্তে, কারণ এরণ্ডের পঞ্চাঙ্গ ফল মূল পত্রাদি—এর প্রতিটি অঙ্গ অগ্নিধর্মী, তাই ওর প্রয়োগ নিষেধ।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz., recinine and toxalbumin recin. (b) 45-50% fixed oil.

(গুলঞ্চ)

প্রবাদবাক্য হ'লেও ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত আমাদের আত্মরক্ষা-প্রয়াস যে সর্বদাই মানসিক স্বভাব বা প্রবৃত্তি, তাই হ'য়ে ওঠে প্রবাদ বাক্য—

'আত্মানং সততং রক্ষেৎ'।

অর্থাৎ নিজেকে সর্বদা রক্ষে করো; তারই লোককথা—'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'। অবশ্য এ কথাটা আমরা লাগনসই ক্ষেত্র পেলেই প্রায়ই এটা আওড়ে দিয়ে থাকি। এই গুড়ূচীর ক্ষেত্রে সে উপমাটা আজ কাজে লাগবে।

জীবজগতে এমন প্রাণী আছে (অবশ্য পুরুষ পক্ষে) তারা নিজেদের স্বগোত্র এমন কি নিজের সন্তানও তার আহার্য হয়, তবে কোন সময়েই গর্ভধারিণী তাকে ভক্ষণ করে না; বাগে পেলে জন্মদাতাই বাচ্চাকে খেয়ে ফেলে; এটা বিড়ালের ক্ষেত্রে। উদ্ভিদ জগতের [illegible]ড়ূচ। সেই রকম। আমরা চলতি কথায় একে গুলঞ্চ বলি।

Tinospora tomentosa Miers.

প্রসঙ্গের উৎস:— অথর্ববেদ বৈদ্যককল্প ১।১৬৪।৫ সূক্ত—

ইচ্ছন্তি ত্বা সোম্যাসঃ সখায়ঃ সুন্বন্তি সোমং দধতি পয়াংসি।
বৎসাদনী অভিশস্তিং জনানাং অমৃতং ত্বদা কশ্চন হি প্রকেতঃ॥

মহীধর ভাষ্য করেছেন—

> বৎসাদনী=বৎসাঃ অদ্যন্তে=ভুজ্যন্তে ইতি প্রিয়ত্বেন অদ্ ল্যুট ডীপ্। ত্বত্তঃ সকাশাৎ কশ্চনঃ আ-সমন্তাৎ যতো ভবতি সখায়ঃ ত্বাং ইচ্ছন্তি। কিম্ভূতাঃ সখায়ঃ সোম্যাসঃ সোমস্য সোম সম্পাদিনঃ ইচ্ছন্তি সোমং সুন্বন্তি পয়াংসি অমৃতং ইতি গুড়ূচী। গুড়ং আত্মরক্ষণং চীয়তে দোষদুষ্টানি যানি তেষু অমৃতং প্রকেতঃ সন্ধানকৃৎচ।

Tinospora cordifolia Miers.

এই সূক্তটির অনুবাদ হ'লো—বৎসাদনী, বৎস তোমার প্রিয় খাদ্য। তোমার কাছ থেকে যে কেউ সম্যক্‌রূপে সোমের প্রিয়তা আনয়ন করে। তোমার রস অমৃত। এটি তাই গুড়ূচী—যে আত্মরক্ষণ করে তাই গুড়ূচী। গুড় শব্দের অর্থ আত্মরক্ষণ। তোমাতে রক্ষিত রসই অমৃত। দোষদুষ্ট যা কিছু সবই তোমার কাছে এসে অমৃতের সন্ধান পায়।

এই বৈদিক সূক্ত থেকে নাম পাওয়া গেল বৎসাদনী, অর্থাৎ বৎসকে যে ভক্ষণ করে। এর এই বৈদিক নামটি কাব্যধর্মী কিন্তু সমীক্ষালব্ধ। এই উদ্ভিদটি মাংসল

লতা গাছ, অন্য গাছকে আশ্রয় ক'রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরিণত বয়সের (৩। ৪ বৎসরের) লতাগুলি থেকে সরু সুতোর মত এক প্রকার ঝুরি বেরোয় (Aerial roots)। এই গুলঞ্চ লতা কেটে ঘরে রাখলে প'চে যায় না, ঐ সুতোর মত বোয়াগুলির রস খেয়ে সে বে'চে থাকে, তখন ওগুলি শুকিয়ে যায়। এগুলিকে সম্পূর্ণ খাওয়া হ'লে তারপর নিজে সে শীর্ণ হ'তে থাকে। তার এই বৈশিষ্ট্যকে উপজীব্য ক'রেই এই বৎসাদনী নামকরণ, এটি এর স্বভাব পরিচয়ের সংজ্ঞা নাম। এর আর একটি বৈদিক নাম অমৃতা, এই নামটি তার গুণের পরিচায়ক। তারপর মহীধরের ভাষ্যে পাওয়া গেল সর্বজন পরিচিত তার গুড়ূচী নামটি। চরকের কালে এসে তার আরও কতকগুলি নাম পাওয়া যায়—মধুপর্ণী (চরক সূত্রস্থান ৪ অধ্যায়), ছিন্নরুহা, ছিন্নোদ্ভবা প্রভৃতি। এই মধুপর্ণী নামকরণের তাৎপর্য হ'লো—মধুকাল অর্থাৎ বসন্ত কালে এই উলঙ্গ লতাগুলি আবার নূতন পাতায় ভ'রে যায়, সেই জন্যেই তার এই নামকরণ। আর লতার টুকরো কেটে মাটিতে বসালেই গাছ হয়, সেই জন্যেই এর নাম ছিন্নরুহা ও ছিন্নোৎদ্ভবা।

আমাদের মনে এ প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, একটি ভেষজের এতগুলি নামকরণের যুক্তি কি? বেদের উক্তিই তার যুক্তি, অর্থাৎ বৈদিক সূক্তে বলা হ'য়েছে—

'সর্গাৎ ওষধীঃ বিবর্ত্তস্বঃ ওঘাৎ'।

অর্থাৎ প্রত্যেক ভেষজকে তার ওষধীরূপ জানতে শ্রেণী, জাতি, বর্গ ও গণের ভেদ আছে জেনেই ভৈষজ্য কার্যে তাকে কল্পনা ক'রবে; নইলে সেই বংশের স্বভাব বা বিশেষ ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। তাঁরা ব'লেছেন প্রত্যেকের জাতি ও গণ এবং বর্গের দ্বারা তাদের সাধর্ম্য বৈধর্ম্য জানা যায়। এই যে শ্রেণী জাতি বর্গ ও গণের ভেদ সেটি কিন্তু আধুনিক (পাশ্চাত্য) পদ্ধতিতে নয়, বৈদিক মতে; এই লতাগাছটি পর্বযোনি প্রভব, মূলজ প্রভব এবং স্কন্ধজ প্রভব। এই তিনটি ধর্ম যেখানেই থাকবে তারই এক নাম হবে সোমযোনি অর্থাৎ মদিরার জন্ম দিতে পারে। উদ্ভিদ এবং অমৃতজন্মা এটি। একে অন্তঃসারপ্রধান ভেষজ বলা হয়।

চরক সংহিতায় বিভিন্ন রোগ প্রশমনে বিভিন্ন নাম ব্যবহার করার একটা গূঢ় তাৎপর্য আছে, যেমন মধুপর্ণী নামের যেখানে উল্লেখ ক'রেছেন, সেখানে তার কার্যকারিতা সন্ধানীয় ও স্নেহ উপগ এই হিসেবে। স্নেহ উপগ শব্দের অর্থ হ'লো, স্নেহ সম্পন্ন করা, আবার স্তন্য শোধন, দাহ প্রশমন ও রসায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার গুড়ূচী নামোল্লেখ, আবার বয়ঃস্থাপক বলে যেখানে উল্লেখ, সেখানে তার নাম অমৃত। তাঁদের চিন্তাধারা হ'লো নাম শুধু নামই নয়, সেটা হবে সার্থক শব্দ।

পরিচিতি

এই বৃক্ষারোহী গাছ কখন কখন বেড়ার গায়েও দেখা যায়। দীর্ঘদিনের হ'লে খুবই মোটা হয়, এই লতাগুলি আঙ্গুলের মত মোটা হ'লে, সরু সুতোর মত শিকড় বেরিয়ে ঝুলতে থাকে (Aerial roots)। লতার গায়ের ছালগুলি কাগজের মত পাতলা, ভিতরটা যেন একগোছা সুতো দিয়ে পাকানো দড়ি, স্বাদে তিক্ত ও পিচ্ছিল। পাতা দেখতে অনেকটা পানের মত হ'লেও সাদৃশ্যে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, শীতকালে পাতা প'ড়ে বসন্তে আবার নূতন পাতা বেরোয়। ছোট ছোট হরিদ্রাভ সাদা ফুল; ফল হয় মটরের মত।

সাধারণতঃ দ্বটি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। একটির বোটানিক্যাল্ নাম Tinospora cordifolia Miers. এই গুলঞ্চকে সাধারণ লোকে বলে 'ঘোড়া গুলঞ্চ'। এটি স্বাদে স্বল্প তিক্ত। আর একটি প্রজাতি পাওয়া যায়, তার লতাগুলির গায়ে বুটি বুটি দানা হয়, একে বলা হয় 'পদ্ম গুলঞ্চ'। এই লতাগাছের পাতাগুলি একটু রোমশ এবং আকারে বড়। এই লতার রসে পিচ্ছিলতা অনেক বেশী এবং স্বাদে খুবই তিক্ত। এই প্রজাতির বোটানিক্যাল্ নাম Tinospora tomentosa Miers. এদের ফ্যামিলি Menispermaceae. ভারতের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। ঔষধার্থে ব্যবহার হয় পত্র ও সমগ্র লতা। এখানে আর একটা কথা বলা দরকার—আমাদের প্রাচীন বনৌষধির গ্রন্থ রাজনিঘণ্টুতে আর এক প্রকার গুড়ুচীর উল্লেখ দেখা যায়, তাকে বলা হ'য়েছে 'কন্দোৎভবা', যার অর্থ হ'ল কন্দ থেকে উৎপত্তি। তারই আরও নাম দেওয়া হয়েছে 'পিণ্ডামৃতা', 'কন্দরোহিণী', রসায়নী। এই নামের গুলঞ্চ কিন্তু আমাদের কাছে অপরিচিত হয়েই আছে; অবশ্য আমাদের পূর্বসূরী প্রাচীন বৈদ্যগণেরও ঐ একই প্রতিধ্বনি।

আর এক প্রকার গুলঞ্চ বর্তমানে আমরা দেখতে পাই; তার লতার গায়ে ঘন বুটি থাকে (পদ্মবীজের চাকায় যেমন থাকে সেইরকম)। এই লতাগাছের পাতাগুলি রোমশ নয়। এই লতাগাছটির বোটানিক্যাল্ নামTinospora malabarica (Lam) Miers. হিন্দিতে একে গিলোয় বা গুরুচ্ কিম্বা গুড়ুচ্ বলে।

প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে গুড়ুচীর ব্যবহার

প্রথমেই বলে রাখি পূর্বাচার্যগণ কতকগুলি ভেষজকে কাঁচা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন; এই গুড়ুচীও তার মধ্যে অন্যতম।

চরক সংহিতায় ব্যবহার

বিষম জ্বরে (চিকিৎসিত স্থান ১৫ অধ্যায়); **কামলায়** (জন্ডিস্) ২০ অধ্যায়; **পিত্তজ বমনে** ২৩ অধ্যায়ে; **বাতরক্তে** ২৯ অধ্যায়ে; **স্তন্য-শুদ্ধ্যর্থে** ৩০ অধ্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

সুশ্রুতে ব্যবহার

অর্শরোগে চিকিৎসিত স্থান ৬ অধ্যায়ে; **প্রবল পিত্তাধিক্যজনিত বাতরক্তে চিকিৎসিত** স্থান ৫ অধ্যায়ে; **বাত জ্বরে** উত্তরতন্ত্র ৩৯ অধ্যায়ে প্রধানভাবে ব্যবহৃত হ'য়েছে।

পরবর্তীকালে বাগ্ভটে (৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থ) ব্যবহার।

মেহ রোগে চক্রদত্ত সংগ্রহ (চক্রপাণি দত্ত কৃত ১১শ খৃষ্টাব্দ) ব্যবহার করেছেন। **শ্লীপদে** (ফাইলেরিয়ায়), **আমবাতে, কুষ্ঠে** ভাবপ্রকাশ (ষোড়শ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থ) এই গাছের পত্র। **কামলা রোগ ও জীর্ণ জ্বরেও** প্রয়োগের বিধান দিয়েছেন, তবে ভাবপ্রকাশকার চরকেরই ব্যবস্থাগুলিকে পুনরাবৃত্তি ক'রেছেন।

লোকায়তিক ব্যবহার

১। **পুরাতন বা জীর্ণ জ্বরে—** গুলঞ্চের পাতা শাকের মত কুচিয়ে ভেজে খেলে জ্বর ছেড়ে যায়। পাতা সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ৮/১০ গ্রামের মত গুলঞ্চের ডাঁটা

অল্প জল দিয়ে থে'তো ক'রে নিংড়ে ঐ রসকে ছে'কে, অল্প গরম ক'রে খেতে হয়, এটাতেও কাজ হয় অথবা থে'তো করা ঐ গুলঞ্চ এক কাপ জলে সিদ্ধ করে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে অল্প চিনি মিশিয়ে খেতে হয়। অথবা গুলঞ্চের রস বা ক্বাথ দিয়ে ঘি (ঘৃত) তৈরী ক'রে খেতে দিলেও জ্বর ছেড়ে যায়।

২। **অরুচিতে—** যাঁদের মুখে কিছু ভাল লাগে না, খেতে ইচ্ছে হয় না, তাঁরাও এই পাতা ভাজা খেয়ে দেখুন, অরুচি চলে যাবে।

৩। **বাতের যন্ত্রণায়—** প্রায়ই হাত-পা কন্‌কন্‌ করে, এই ক্ষেত্রে ১০ গ্রাম আন্দাজ গুলঞ্চ ছে'চে উপরিউক্ত নিয়মে ক্বাথ ক'রে অল্প একটু দুধ মিশিয়ে কয়েকদিন খেলে ওটা উপশম হবে। তবে যে সব কারণে (আহার-বিহারে) বাত বাড়ে সেগুলিকে বর্জন তো ক'রতেই হবে।

৪। **পচা ঘায়ে—** ১০/১৫ গ্রাম থে'তো গুলঞ্চের ক্বাথ ক'রে সেটা দিয়ে ক্ষত ধুলে ওর বিষুনি দোষটা কেটে যায়।

৫। **হৃৎ কম্পনে—** ৫/৭ গ্রাম গুলঞ্চকে ক্বাথ ক'রে খেলে ওটা ক'মে যাবে, তবে ২ গ্রেণ বা একরতি গোল মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে দিয়ে থাকেন প্রাচীন বৈদ্যগণ।

৬। **রক্তার্শে—** যাঁরা এ রোগে ভুগছেন, তাঁরা ৫/৭ গ্রাম গুলঞ্চকে ক্বাথ করে খেয়ে দেখুন, প্রশমিত হবে। তবে এই ক্বাথকে ভাগ ক'রে দু'বেলায় খেতে হবে।

৭। **দ্বিতীয় যোগ (অর্শের)—** একটা মাটির খুরিতে গুলঞ্চের রস মাখিয়ে, সেই পাত্রে দই পেতে সেই দই খেলে অর্শে উপকার হয়।

৮। **অগ্নিমান্দ্যে—** খাওয়ার প্রবৃত্তিও যেমন কম, আবার খেলেও হজম হ'তে চায় না, যাকে বলা হয় অগ্নিমান্দ্য রোগ (শ্লেষ্মপ্রধান অগ্নিমান্দ্য), এ ক্ষেত্রে গুলঞ্চ শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে প্রত্যহ ১ গ্রাম ক'রে জলসহ খেয়ে দেখুন। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ক্ষিধে বেড়ে যাবে।

৯। **স্বরভঙ্গে—** স্থূলকায়, তার সঙ্গে আবার কফের যোগ হ'লে অনেকের স্বরভঙ্গ হয়, সেখানে গুলঞ্চের ক্বাথে কাজ হয়।

১০। **কাসিতে—** যে কাসি হে'কে ডেকে আসে না, খুস্‌খুসে, সেখানে একটু গুলঞ্চের ক্বাথে মধু মিশিয়ে খেলে ও অসুবিধেটা ক'মে যাবে।

১১। **বাতরক্তে—** অনেক সময় গায়ে চাকা চাকা হয় এবং অনেকক্ষেত্রে শক্তও হয়, আবার ব্যথাও থাকে; এ ক্ষেত্রে গুলঞ্চের রস বা ক্বাথ দিয়ে তৈরী তেল মাখা, অভাবে গুলঞ্চের রস গায়ে মাখা ও গুলঞ্চের ক্বাথ খাওয়া, এর দ্বারা ঐ বাতরক্তজনিত অসুবিধে যেটা আসছে সেটা দূর হয়।

এটি পদ্মগুলঞ্চ হওয়া দরকার, তা না হ'লে আশানুরূপ উপকার হয় না। আর এর সঙ্গে যদি কোন গুগ্‌গুল ঘটিত ঔষধ খাওয়া যায় আরও ভাল হয়।

১২। **কামলা বা ন্যাবা রোগে—** ২ ইঞ্চি পরিমাণ গুলঞ্চ চাকা চাকা করে কেটে ১ কাপ জলে রাত্রে ভিজিয়ে রেখে সকালে সেই জলটায় একটু চিনি মিশিয়ে খাওয়া।

১৩। **বাতজ্বরে—** সর্দি কাসি কিছুই নেই, হঠাৎ হাই উঠে কে'পে জ্বর এলো, আবার খানিকক্ষণ বাদে ক'মে গেল, একে বলে বাতিকের জ্বর, এ ক্ষেত্রে ৮/১০ গ্রাম গুলঞ্চকে থে'তো ক'রে তার ক্বাথ ছে'কে ঠান্ডা হ'য়ে গেলে খেতে হয়।

১৪। **শূল ব্যথায়—** গুলঞ্চ চূর্ণ ১ গ্রাম, গোল মরিচের গুঁড়ো সিকি গ্রাম একসঙ্গে গরম জলে দিয়ে খেতে হয়।

১৫। **বসন্ত রোগে—** হাত-পা অসম্ভব জ্বালা করে; সেক্ষেত্রে গুলঞ্চ রস ক'রে

(অল্প জল দিয়ে থে'তো ক'রলেই রস বেরোয়) হাত-পায়ে লাগালেই ঐ জ্বালা কমে যায়।

১৬। **পেটের দোষে—** প্রায়ই ভুগে থাকেন, পেট জ্বালাও করে, সংগে সংগে ফ্যাকাসে ভাব আসছে, এ ক্ষেত্রে গুলঞ্চের কাথ কাজে আসে।

১৭। **অরুংষিকায়—** মাথায় ছোট ছোট ফুস্‌কুড়ি ও ব্যথাও আছে, আবার মুখে মাম্‌ড়িও পড়ে; এটি পিত্তশ্লেষ্মজ ব্যাধি। এ ক্ষেত্রে গুলঞ্চের রস দিয়ে তৈরী তেল মাথায় লাগালে ভাল কাজ হয়, তা না হ'লে ১ চামচ রস ৩/৪ চামচ জল মিশিয়ে একটু গরম ক'রে সেইটা প্রত্যহ একবার করে কয়েকদিন লাগানো আর গুলঞ্চের রস খাওয়া।

১৮। **সোরিয়াসিসে** (Psoriasis)— গায়ে চাকা চাকা হয়ে ওঠে, মাম্‌ড়ি পড়তে থাকে, আবার কোন কোন জায়গা থেকে রস গড়াতে থাকে, এ ক্ষেত্রে গুলঞ্চের কাথ খাওয়া, গুলঞ্চের রস দিয়ে তৈরী তেল মাথা, আর গুলঞ্চ রস ক'রে গায়ে মাথা। অদ্ভুত ফল পাবেন।

১৯। **পিত্ত-বমিতে—** পেটে কিছু থাকছে না, সে ক্ষেত্রে আধ কাপ জলে দেড় বা দুই ইঞ্চির মত গুলঞ্চ পাতলা চাকা চাকা ক'রে কেটে জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে, তারপর তা থেকে ছে'কে ২/১ চামচ ক'রে জল নিয়ে তার সংগে ২/১ চামচ দুধ মিশিয়ে খেতে হয়। অবশ্য এটা পিত্তশ্লেষ্মা জন্য বমনেই ভাল।

২০। **পিপাসায়—** ঐভাবে কাটা গুলঞ্চ ও মৌরী একসংগে ভিজিয়ে ঐ জল একটু একটু ক'রে খেতে দিলে পিপাসা চ'লে যায়।

২১। **মেদস্বিতায়—** যাঁরা না খেয়েও মোটা, খেলে তো আর কথাই নেই, তাঁরা ৮/১০ গ্রাম গুলঞ্চের কাথ ক'রে (১ কাপ আন্দাজ) তাতে ১ চামচ মধু মিশিয়ে খেয়ে দেখুন, তবে ২/৪ দিন খেয়েই হতাশ হ'লে চ'লবে না।

২২। **ক্রিমিতে—** গুলঞ্চের কাথ একটু একটু খেতে দিলে, বা খেলে ক্রিমির উপদ্রব কমে যায়।

গুলঞ্চের চিনি বা শ্বেতসার প্রস্তুত

পরিণত বয়সের মোটা মোটা গুলঞ্চকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে থে'তো ক'রে ৮ গুণ জল দিয়ে ভাল ক'রে ম'সুটে, যাকে বলা হয় চট্‌কে নিয়ে, একটা চুবড়িতে ঢেলে দিলে সিটেগুলি মোটামুটি ভাবে বেরিয়ে যাবে, তারপর ঐ জল থিতিয়ে গেলে উপরের ঐ জল আস্তে আস্তে ঢেলে ফেলতে হবে। নিচে যেটা থিতিয়ে ব'সে আছে সেইটাই রৌদ্রে শুকিয়ে ছে'কে নিলেই গুলঞ্চের শ্বেতসার পাওয়া যায়; একেই গুলঞ্চের চিনি বলে। বহু রোগের ক্ষেত্রে এই চিনি ব্যবহার করা হ'য়েছে।

২৩। **মস্তিষ্কের দুর্বলতায়—** গুলঞ্চের চিনি ৩ রতি থেকে এক আনা মাত্রায় একটু দুধের সংগে খেলে ঐ দুর্বলতাটা কেটে যায়।

২৪। **দুর্বলতায়—** দীর্ঘদিন থেকে চ'লছে। অস্থির কোন পোষণ নেই; সেক্ষেত্রে অল্প ঘিয়ের সংগে গুলঞ্চের চিনি ১ গ্রাম আন্দাজ মিশিয়ে চেটে খেলে আস্তে আস্তে ওটা চ'লে যাবে।

২৫। **প্রমেহ রোগে—** প্রমেহ কথাটার দ্বারা প্রস্রাব ঘটিত বহু রোগের ইঙ্গিত বহন করে, তার মধ্যে যে মেহে প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে লালার মত নির্গত হয় তাকে বলা হয় লালা মেহ। এই ক্ষেত্রে গুলঞ্চের চিনি ½ গ্রাম এবং তার সংগে কাবাবচিনি

২ গ্রাম মাত্রায় একত্রে দুধ সহ খেলে কয়েক দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত যে, নিম গাছের গুলঞ্চই বেশী তিক্ত হয়, এবং সেই গাছের গুণ গ্রহণ করে। এরা অপরাশ্রিতা লতা হ'লেও অপরের রস গ্রহণ করার উপযোগী পরিবেশই বা কোথায়? তারা তো মাটি থেকে রস গ্রহণ করে। তবে প্রজাতি ভেদে সে যে গাছই আশ্রয় করে থাকুক না কেন, স্বল্প বা তিক্ত হবেই। সাধারণ গুলঞ্চ, যাকে আমরা চলতি কথায় 'ঘোড়া গুলঞ্চ' বলি (Tinospora cordifolia) সে গুলঞ্চ নিমগাছের হ'লে সে তিক্ত হবে। আবার পদ্মগুলঞ্চ যদি আমড়া গাছেও হয়, তার তিক্ততার তীব্রতা যিনি আস্বাদ না ক'রেছেন তিনি বুঝবেন না।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Giloin. (b) Giloinin. (c) Glycoxides of myristic and palmitic acid. (d) Unidentified bitter principle. (e) A neutral substance. (f) Glycosides.

ভৃঙ্গরাজ

(শিরস্ত্রাণ মার্কব)

"শাককেও শাক, সঙ্গে মুলো" ব'লে একটা গেঁ'য়ো কথা আছে, এই 'মার্কব' কিন্তু সেই ধরণের বনৌষধি।

শিরোনামটায় শিরস্ত্রাণ যথা-অর্থে সার্থক হলো তার শারীর ক্রিয়ায়। সে শিরোরোগকে ত্রাণ তো করেই, অধিকন্তু সে দেহে সৃষ্টি করে সৌন্দর্যের প্রধান উপাদান। বিংশ

শতাব্দীর আমরা অনেকে ভাবি যে, সুদূর অতীতের ভারতে বোধ হয় রূপচর্চার কোন রেওয়াজ ছিল না; কিন্তু তা যে নয় সে ইংগিত বৈদিক তথ্যেই পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগের সমীক্ষা

শিরোগম্ভন্ সীদ মা ত্বা সূর্যোঽভি তাপসীন্ মার্কবঃ অচ্ছিন্ন-পত্রঃ অনুবীক্ষম্বানু অঙ্গারকঃ জন্তুন্ সুকৃতস্য লোকে।
(অথর্ববেদ—৮৪২।২১।২৩৩ সূক্ত)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

শিরোগম্ভন্ গম্ভানি=গভীরে স্থানে। ত্বং সীদ উপবিশ। মা ত্বা সূর্য্যো অভিতাপ্সীৎ=সূর্য্যো ন অভিতপ্যেৎ। ত্বং মার্কবশ্চ অঙ্গারকঃ ভৃঙ্গরজঃ। মার্কব ইতি মারয়তি ক্বিপ্। মারি কেশ-ক্লেশে কুয়তে কু অচ্। ভৃঙ্গরজ=ভৃগ্ রোলে অনু রঞ্জয়তি অসূন্ প্রাণান্ প্রকাশয়তি। ত্বং অঙ্গারকঃ চ পিশলায়া হি যম্বৎ (অথর্ববেদ ২৬৯।২২।৩)। অচ্ছিন্নপত্রঃ মূলতঃ সর্ব্বং অনুবীক্ষব, লোকে সুকৃতস্য সুখিনোঽপি ক্রিমীন্ অভিতাপ্সীৎ।

এই ভাষ্যটির অর্থ হলো—শিরোভাগের গভীর স্থানে তুমি বাস কর। সূর্য তোমাকে অভিতপ্ত করে না। তুমি মার্কব। অর্থাৎ শিরঃক্লেশ দূর কর। তুমি অঙ্গারক অর্থাৎ ভৃঙ্গরজ। ভৃগ্ অর্থে রোল (শব্দ)। তার দ্বারা প্রাণের প্রকাশ কর। পিশল্যার যেমন অকালপক্ক কেশকে অঙ্গার বর্ণ করেছ—তেমনি কর। তাই তোমার নাম অঙ্গারক। তোমার মূল থেকে সবই অঙ্গারক। যারা সর্বপ্রকারে সুখী হয়েও ক্রিমির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তুমি তাদিগে অভিতপ্ত কর।

উপরিউক্ত বৈদিক সূক্ত থেকে সংহিতাকারগণ কি তথ্য পেলেন?

১। শিরোভাগের গভীরস্থানে তুমি বাস কর—এই ইঙ্গিতে এটির প্রভাব—মেধা, বুদ্ধি, স্মৃতি ও প্রতিভার উপর যে আছে—সেইটি তাঁরা বিচার ক'রে প্রয়োগ করেছেন।

২। সূর্য তোমাকে অভিতপ্ত করে না—এই উক্তি থাকাতে তাঁরা বিচার করেছেন যে, এর দ্রব্যশক্তি শিরোগত উষ্মাকে প্রতিহত ক'রে থাকে। সংহিতাকারগণের চিন্তাধারা হলো—পিত্তের স্বভাব আগ্নেয়, কিন্তু বিকৃত হলেই রোগ সৃষ্টি করে; সে তখন অনুষঙ্গী হয় বায়ুর, তখনই আসে বায়ুরোগ; এই ভৃঙ্গরাজ ঐ বিকৃত পিত্তের উষ্মাকে শান্ত করে।

৩। তুমি মার্কব অর্থাৎ কেশের ক্লেশ দূর কর—এখানে কেশের ক্লেশ তার অকাল-পক্কতা ও পতন—এ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রয়োগ করেছেন কেশরঞ্জক হিসেবে ও কেশপতন নিবারণে; এই ভেষজটি বায়ু ও কফঘ্ন।

আমাদের অনেকের ধারণা আছে—কফ আর শ্লেষ্মা ধাতু বুঝি পরিভাষাগত এক—কিন্তু তা নয়, এই শ্লেষ্মধাতু আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি, এটি আমাদের দেহের ধারক ও পোষক বটে, কিন্তু যেটা বেরোয়—সেটা ঐ শ্লেষ্মধাতুর বিকৃত রূপ, যাকে আমরা কফ বলি (চরক সূত্রস্থান ১২ অধ্যায়)।

আমরা অনেক সময় দেখি—ভৃঙ্গরাজের রস অথবা তার রসে প্রস্তুত তৈল মাখলে সর্দি হয়, এ ক্ষেত্রে ঐ বিকৃত জিনিষটিই বেরিয়ে আসছে—সেটি বেরুলে তবেই না রোগ নিরাময় হবে। এক্ষেত্রে ঐ কাজের জন্য ভৃঙ্গরাজের জুড়ি নেই। এইটাই বৃদ্ধ বৈদ্যগণের অভিমত।

৪। তুমি অঙ্গারক—এর দ্বারা প্রমাণ করে—সে কেশরঞ্জক। এই নামটি তার গুণ-প্রকাশক। সংহিতাকারগণের সমীক্ষাটা এখানে বলে রাখি—এই অকালপক্কতা ও খালিত্য (টাক) কয়েকটি কারণে আসতে পারে। (ক) **প্রাকৃতিক**—এটির কারণ দেশজ, কোন কোন প্রদেশে চুল অল্প বয়সে পেকে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে টাকও পড়ে। (খ) **পৈত্রিক**—এখানে আয়ুর্বেদের চিন্তাধারা হচ্ছে—অস্থি ও কেশ পিতৃসূত্রে সন্তান পায়, সুতরাং পিতার ঐ জিনিষটি থাকলে সন্তানেও বর্তাতে পারে। (গ) **রোগজ**—পেটের রোগ, প্রমেহজনিত দোষ, অত্যধিক দুঃশ্চিন্তা ও কীটজ ব্যাধি ইন্দ্রলুপ্ত (Alopecia)প্রভৃতি কারণে চুল উঠে যায় ও টাক পড়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে অকালেও পাকে। এক্ষেত্রে সেই পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ুর বিকৃতির ফলে ওখানকার ত্বকের স্বভাব-ধর্মিতায় ক্ষয় আসাতে ত্বক্‌গত রোগ এই টাক উপস্থিত হয়। ত্বকেরই অপভ্রংশ শব্দ টাক।

৫। তুমি অঙ্গারক—এক্ষেত্রে ঐ অঙ্গারক নামটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

'উষ্ণোদহতি—চাঙ্গারঃ শীতশ্চেৎ মলিনীকরঃ'

এই অঙ্গার যদি উষ্ণ হয়, তখনই সে দহন করে। আর যদি শীতল গুণান্বিত হয়, তখন সে মলিন করে। এক্ষেত্রে এই ভৃঙ্গরাজ শীতগুণান্বিত এবং কেশকে কালো করে ব'লেই তার এই অঙ্গারক নামকরণ। এটি তার গুণ-প্রকাশিকা সংজ্ঞা নাম।

৬। ভৃঙ্গরজ (ভৃঙ্গরাজ)—এই নামটি স্বার্থ হয়ে দু'টি ইঙ্গিত বহন করছে। প্রথমটি হলো—ভৃঙ্গ (রোল) অর্থাৎ ধ্বনি, এর দ্বারা মস্তিষ্কের শব্দ ধরে রাখার শক্তিকে সে সংহত করতে পারে, সেই ইঙ্গিত এই নামের মধ্যে প্রকাশমান। আর দ্বিতীয়টি হলো—এটির প্রয়োগের ফলস্বরূপ ভ্রমর বর্ণসম কেশের তুলনা; এই সূক্তের শেষোক্ত বক্তব্য—এটি ক্রিমিনাশক; সেটি বাহ্য বা আভ্যন্তর কোথাকার ক্রিমি, সেইটাই বিচার্য।

পরিচিতি

বৈদিক সূক্তে পাওয়া যায়—ভৃঙ্গরজ বা ভৃঙ্গরাজের কথা, এটি পীতপুষ্প (হলদে ফুল); পরবর্তী কালে দেখা যায় আরও দুই প্রকারের উল্লেখ আছে, শ্বেত ও নীল পুষ্প। নিবন্ধোক্ত বনৌষধিটি বেদোক্ত পীতপুষ্প ভৃঙ্গরাজ সম্পর্কে এটি ভূমিপ্রসারিণী লতা। এই প্রজাতির আর এক প্রকার গাছ দেখা যায়, সে গাছের ডাঁটা একটু লালচে। এই সাদা ও লাল ডাঁটা ভৃঙ্গরাজ বারো মাসই প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়; তবে বাংলা, আসাম, মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু, নাড়ু অর্থে পল্লী), মালাবার প্রভৃতি অঞ্চলে এগুলি বেশী জন্মে। এর হিন্দী নাম পীলা ভাঙ্গরা; এইটির বোটানিক্যাল্ নাম Wedelia Calendulacea. ব্যবহার্য অংশ—মূল সমেত সমগ্র গাছ। দ্বিতীয় শ্বেতপুষ্প ভৃঙ্গরাজ বা ক্ষুদ্র ভৃঙ্গরাজ। কালমেঘের (Andrographis Paniculata) মত ছোট গুল্ম জাতীয় গাছ, স্থান ভেদে কখনও ভূলুণ্ঠিতও হয়—একে কেশরাজ বা কেশুর্তে বলে, এর চলতি নাম কেশুত্; হিন্দীতে একেও ভাঙ্গরা বলে। এর বোটানিক্যাল নাম Eclipta alba. আর নীলপুষ্প ভৃঙ্গরাজ যে কি—সেটি আজও আমাদের কাছে অজানা। ঔষধার্থে ব্যবহার হয় মূল সমেত সমগ্র গাছ। এটির ফ্যামিলি Compositae.

দ্রব্যশক্তির বিচার

এই ভেষজটি কটুতিক্ত ও গৌণত কষায় রসধর্মী; তারই ফলে স্বাভাবিকতায় এটি পিত্ত ও শ্লেষ্মবিকার কফের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে এবং তজ্জন্য এইসব বিকার-জনিত রোগের উপশম হয়।

রোগ প্রতিকারে

১। **শিরোরোগে—** সূর্যোদয়ের পর অনেকের মাথার যন্ত্রণা হয়, আবার কারও বা আধকপাল মাথাব্যথা হয়; সেক্ষেত্রে ভৃঙ্গরাজের নস্য নিলে বা মাথায় মাখলে এর উপশম হয়।

২। **কেশপতনে—** এই পাতার রস ক'রে দুপুর বেলার দিকে লাগাতে হয়। এই পাতার রস দিয়ে তৈল পাক ক'রে লাগালেও কেশপতন বন্ধ হয়।

৩। **মাথায় উকুন হলে—** এই পাতার রস মাথায় মাখলে উকুন মরে যায়।

৪। **পোড়ায় সাদা দাগে—** এক্ষেত্রে ভৃঙ্গরাজের রস থেকে ও কেশুর্তের রসে দুর্বা বেটে লাগালে কয়েকদিনের মধ্যে গায়ের স্বাভাবিক রং ফিরে আসে।

৫। **চোখ ওঠায়—** পুঁজ পড়তে থাকলে ২০/২৫ ফোঁটা ভৃঙ্গরাজের রস জলে মিশিয়ে ঐ জলে চোখ ধুলে পুঁজ পড়া বন্ধ হয়।

৬। **পায়োরিয়ায়—** ভৃঙ্গরাজের পাতা চূর্ণ ক'রে মাজনের মত ২/৪ মিনিট মেজে মুখ ধুয়ে ফেলতে হয়। এর দ্বারা ঐ দোষটি সেরে যায়।

৭। **অন্ত্রদৌর্বল্যে—** দাস্ত হতে চায় না—তাঁদের এটি বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। তবে এটি দীর্ঘদিন ব্যবহার না করাই ভাল।

৮। **পুরাতন আমাশায়—** অজীর্ণ মল, তার সঙ্গে আমও আছে, মলের রংও ভাল নয়; সেক্ষেত্রে এর পাতার রস ২৫/৩০ ফোঁটা প্রত্যহ আধ কাপ ছাগল দুধের সঙ্গে কয়েকদিন খেতে হয়।

৯। **শোথে—** সর্বশরীর অথবা হাত-পায়ে একটু ফুলো ফুলো ভাব, সেক্ষেত্রে ২৫/৩০ ফোঁটা এই পাতার রস দুধের সঙ্গে খেলে ও ভাবটা কেটে যায়।

১০। **রক্তে শ্বেতকণিকা বেড়ে গেলে—** এই পাতার রস উপরিউক্ত মাত্রায় দুধের সঙ্গে খেতে দিলে ওটি আবার স্বভাবে ফিরে আসে।

১১। **কেশপতনের বিশেষ ক্ষেত্র—** যেসব মা শ্বেতপ্রদরের শিকার হয়েছেন, তাঁদের মাথার চুল প্রায় ক্ষেত্রেই উঠে যেতে থাকে। তাঁরা ভৃঙ্গরাজের পাতা সিদ্ধ ক'রে সেই জলে দিনে ২ বার মাথা ধুয়ে ফেলবেন, এর দ্বারা ৩।৪ দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফল পাবেন।

১২। **ক্রিমির উপদ্রবে—** কুচো বা ঝুরো ক্রিমি সব বয়সের লোককেই ব্যতিব্যস্ত করে, সেক্ষেত্রে এই ভৃঙ্গরাজের পাতার রস ১ চা-চামচ (পূর্ণবয়স্কদের জন্য) সিকি কাপ জলে মিশিয়ে খেলে ওটির উপদ্রব কমে যায়।

১৩। **দাদে—** ভৃঙ্গরাজের রসের প্রলেপ দিলে বেশ কাজ হয়।

১৪। **স্নায়বিক দুর্বলতায়—** ভৃঙ্গরাজের রস ২৫।৩০ ফোঁটা প্রত্যহ সকালে মধু সহ খেলে স্নায়ুবল ফিরে আসে।

১৫। **পান্ডুরোগে—** কুলেখাড়ার পাতার রস না দিয়ে ভৃঙ্গরাজের পাতার রস খাওয়ালে আরও বেশী কাজ হয়।

১৬। **পুরাতন অম্ল ও অজীর্ণে—** যাঁরা এতে ভুগছেন, তাঁরা সকালে ও বিকালে ১ চা-চামচ মাত্রায় ভৃঙ্গরাজের পাতার রস খেয়ে দেখুন, এতে উপকার পাবেন।

১৭। **দাঁতের মাড়ির দুর্বলতায়—** ভৃঙ্গরাজের পাতার গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজলে মাড়ি শক্ত হয়। মাড়িতে ঘা থাকলে ঐ পাতার ক্বাথে কয়েকদিন মুখ ধুলে সেরে যায়।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz., ecliptine, nicotine. (b) Steroidals constituents. (c) Fatty acids.

শ্রীহস্তিনী

চোখে কি হাতি ঢুকেছে? গ্রাম বাংলায় এমনি একটি রহস্যজনক উপমা; এটা যে অবাস্তব সেটারই প্রতিধ্বনি; এ যেন মহারাজার কৃষ্ণপ্রাপ্তি!

তাই বলছিলাম—চোখেও হাতি ঢোকে, তবে তার রকমফের আছে।

এই হাতির সন্ধান পাওয়া যায়—অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৫০।৫৭।৬৭ সূক্তে; সেখানে তিনি নাগদন্তী নামে পরিচিতা, পরে সংহিতার যুগে এসে পরিচিতা হ'য়েছেন শ্রীহস্তিনী নামে। অথর্ববেদে উল্লেখ আছে—

> 'ত্বাং গন্ধর্ব্বা নাগদন্তীং অখন স্ত্বাং বৃহস্পতিঃ।
> দন্তিকা বিজহুঃ পাশকা বহ্বঙ্কুরা দন্তুরা পাপ্‌মানম্‌॥'

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

> গান্ধর্ব্বাঃ দেববিশেষাঃ ত্বাং নাগদন্তীং অখনঃ বৃহস্পতিশ্চ ত্বাং, দন্তিকাসি গজশুণ্ডাভ্যন্তর-প্রতীকাশা=শ্বেতপুষ্পিকা, হস্তি-শুণ্ডিকেতি লোকে, ত্বং দন্তুরা বহ্বঙ্কুরা অতঃ পাপ্‌মানং ব্যাধিং বিজহুঃ তে গুণবিশেষাঃ, অতস্তেচ পাশকা যে চ ব্যাধয়ঃ দেহ-পার্শ্বতঃ জায়ন্তে ইতি পাশকঃ।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—গন্ধর্বগণ বা দেববিশেষবৃন্দ তোমাকে খনন করেন। বৃহস্পতিও, তোমার আকৃতি গজদন্তের অভ্যন্তর যেমন শুভ্র তেমনি শ্বেতপুষ্পযুক্ত,

উপরিভাগ শুন্ডের মত, তোমার লোকনাম হস্তিশুন্ড। তোমার শুন্ডাকৃতি দণ্ডটি দন্তুর, বহু পাপজ ব্যাধি দূর করে। ব্যাধিগুলি দেহের উভয় পার্শ্বে জন্মগ্রহণ করে, সেগুলি দেহের পাশক। (পাশক=বন্ধন)

সংহিতার যুগের অনুশীলন

উপরিউক্ত ভাষ্যের অনুসরণে পাওয়া যাচ্ছে, প্রথম বক্তব্যে তার পরিচিতির বর্ণনা, তারপর তার তৎপরতা কি ধরণের এবং কোথাকার রোগে।

পরিচিতি

শ্রীহস্তিনী বা হস্তিশুন্ডি এই নাম দুটি ঐ গাছটির পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা নাম; হস্তীর শ্রী হ'চ্ছে তার শুঁড়; এই গাছের পুষ্পদন্ডটির গঠন অবিকল হাতির শুঁড়ের মত। এই নামকরণটি নিরর্থক নয় বলা যেতে পারে; আমরা চল্‌তি কথায় একে হাতি-শুঁড়ের গাছ বলি; এই গাছটির বিভিন্ন প্রাদেশিক নামও আছে, যেমন—মহারাষ্ট্রে বলা

হয় ভূরুণ্ডী, হিন্দীভাষী অঞ্চলে হাতাজুড়ি সারিয়ারি, তেলেগুতে নাগদন্তী, ওড়িয়া ভাষায় বলা হয় হাতিশুণ্ডা প্রভৃতি।

বর্ষজীবী ছোট গুল্ম, ভারতবর্ষের অযত্নসম্ভূত অতি সাধারণ গাছ, এক দেড় ফুট উঁচু হয়। এই গাছের কাণ্ডগুলি ফাঁপা ও নরম, বৈশিষ্ট্য তার পুষ্পদণ্ডে। এই গাছটির বোটানিক্যাল্ নাম Heliotropium indicum Linn. ফ্যামিলি Boraginaceae.

এই গাছটি দুটি ধারায় অনুশীলিত হ'য়েছে। একটি চরকীয় ধারায়, আর একটি সৌশ্রুতীয় ধারায়। চরক ধারায় দেখা যাচ্ছে পাণ্ডকর্মীয় চিকিৎসার অন্তর্গত শিরোবিরেচনের ক্ষেত্রে তার অনুশীলন। আর অপর ধারাটির অনুশীলন প্রত্যক্ষতঃ ব্যাধি বিমোচনের ক্ষেত্রে। চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে বৈদিক নাগদন্তী নামটিই গৃহীত হ'য়েছে আর সুশ্রুতে চিকিৎসাস্থানের ১৭ অধ্যায়ে আর সূত্রস্থানে গুণ পরিচয়েও এই নামটিকে গ্রহণ করা হ'য়েছে অর্কাদিগণে। চরকের সমীক্ষায় শিরো-বিরেচনের কষায় তিক্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী, যেহেতু ভেষজটি বায়বীয় প্রধান, তাই কফ-পিত্তবিকারজনিত রোগে সে কার্যকরী। তারপর সুশ্রুতের চিকিৎসাধারা প্রত্যক্ষতঃ ব্যাধিঘাতক হয় যে, যে ক্ষেত্রে যে যে দ্রব্য, তাদেরকে নিয়েই এক একটি গণের গঠন করা হ'য়েছে (সূত্রস্থান ৩৮ অঃ)। তাঁদের মতে নাগদন্তীর মূলের রস, পত্রের রস ক্রিমি ও কুষ্ঠপ্রশমক, বিশেষ ক'রে ব্রণশোধক। তাই বিসর্পরোগের চিকিৎসায় (চিঃ স্থান ১৭ অঃ) নাগদন্তীর মূলের ও পাতার রস ব্যবহার ক'রেছেন; কিন্তু লোকায়তিক ব্যবহারে দেখা যায়—সে নেত্রাভিষ্যন্দ, যাকে চল্‌তি কথায় বলা হয় 'চোখ ওঠা', রোগের একটি নিশ্চিত ফলপ্রদ ওষধি।

তাই ব'লছি—গোদের উপর বিষফোড়ার মত এই চক্ষুরোগ। অদ্ভুত তার অনুপ্রবেশ; রাত্রে শুয়ে আছেন, সকালে উঠে অনুভব ক'রতে লাগলেন যে, আপনার চোখ আর আপনার এক্তিয়ারে নেই, মনে হবে চোখে বালি প'ড়ে চোখ কর্‌কর্ ক'রছে আর চোখ-নাক দিয়ে খালি জল আসছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মতে এটা একটা অজ্ঞাত ভাইরাস্ ইন্‌ফেক্‌শন্ (Virus infection), এর অনুপ্রবেশ বন্ধ করা মুশকিল। তবে এটা সত্যি যে, সসাগরা পৃথিবী এখন বিজ্ঞানী মানুষের মুঠোর মধ্যে; সুতরাং নিত্য নূতনের অনুপ্রবেশ তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে এ জাতীয় রোগ তৎকালিক ভারতীয় চিকিৎসকদের জানা ছিল না তা নয়। তাঁরা ব'লেছেন, রোগটি যখন-তখন আসে আবার নিয়ম ক'রেও আসে, অর্থাৎ বৎসরের সব সময় আসার সুযোগ খোঁজে, একটু ফাঁক পেলেই আসে; সে ফাঁকটা হ'লো ঋতুর বিপর্যয় হ'লে পর। তার মানে গ্রীষ্মে যদি বসন্তের উদয় কিম্বা বসন্তে গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয়, এমনি বর্ষায় শরতের অথবা গ্রীষ্মের আগমন হয় তখনই এসে নয়নদ্বয়ে এই রোগের বসতি হয়, এই জন্য সুশ্রুতে পরিষ্কার বলা আছে—

"স্বেদাৎ রজো-ধূম নিষেবণাচ্চ ছর্দে বিঘাতাদ্ বমনাতি যোগাৎ।
তথা ঋতূণাং চ বিপর্য্যয়েণ বাষ্প গ্রহাৎ সূক্ষ্ম নিরীক্ষণাৎ চ।"

অর্থাৎ চোখের রোগের সংখ্যা ৭৬ প্রকার। তাদের কারণও পৃথক পৃথক, যেমন রৌদ্র লাগলে, ধোঁয়া লাগলে, খুব বমি হ'লে, নিদ্রা না হ'লে এবং ঋতুর বিপর্যয় হ'লে চোখের রোগের কারণ হয়। যেগুলি আগন্তুক মাত্র সে সব রোগের ভোগকাল ৫ থেকে ৬ দিন, আর হেতু হয় পিত্ত-শ্লেষ্মার বিপর্যয়। তা ছাড়া সংক্রামক হ'য়েও দেখা দেয়, কারণ কোন কোন ব্যাধি 'জড়াজড়' কারণেও জন্ম নেয়। যার আধুনিক

প্রচলিত নাম ভাইরাস্ (Virus), এদের বৈদিক নাম 'যাতুধানঃ'; বিশ্বের যে কোন সত্ত্বায় এরা অবস্থান করে এবং দুর্বল ক্ষেত্র পেলেই এরা সক্রিয় হ'য়ে আক্রমণ করে; তখন সে আর 'জড়' নয়, 'অজড়'। ঋষিবৃন্দ ব'লেছেন যে—একসঙ্গে শোওয়া, বসা, খাওয়া, একে অন্যের বস্ত্রাদি ব্যবহার করা বা নিশ্বাস গায়ে লাগা প্রভৃতি কারণে কতকগুলি রোগ সংক্রমিত হয়। এই নেত্রাভিষ্যন্দ রোগও তার মধ্যে একটি। অভিষ্যন্দি শব্দের অর্থ হ'লো—সর্বতোভাবে স্যন্দন করা, অর্থাৎ ঝরণা বওয়া অর্থাৎ ঝর্ ঝর্ ক'রে চোখ দিয়ে জল পড়া ও চোখ কর্ কর্ করা—এই জন্য এই রোগকে নেত্রাভিষ্যন্দ পর্যায়েও আনা হয়, যাকে আমরা চল্‌তি কথায় চোখ ওঠা বলে থাকি, যদিও চোখ ওঠার প্রকৃত কারণ এতে থাকে না। এ রোগে কি ক'রে তাকে ব্যবহার করা হয়—কাঁচা পাতা গরমজলে ধুয়ে নিয়ে, একটু থে'তো ক'রে বা হাতে র'গড়ে দুই-এক ফোঁটা রস সকালে বৈকালে দিনে দুইবার ক'রে চোখে দিতে হয়; তবে অসাধারণ কিছু হ'লে চক্ষু-চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ভারতীয় চিকিৎসাধারার অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ডাইমক্ সাহেব তাঁর "ফারমাকোগ্রাফিয়া অফ্ ইণ্ডিকা" নামক পুস্তকে এটি যে চক্ষুরোগের ক্ষেত্রে কাজ করে এটা লিখে গিয়েছেন। এভিন্ন আরও লোকায়তিক ব্যবহার আছে।

লোকায়তিক ব্যবহার

১। **ফুলোয়—** হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে হাতে পায়ের গাঁট ফুলে গেলে (এটা সাধারণতঃ কফের বিকারে হয়) এই হাতিশুঁড়ো পাতা বেটে অল্প গরম ক'রে ঐ সব ফুলোর জায়গায় লাগালে ওটা ক'মে যায়।

২। **আঘাতের ফুলোয়—** এই পাতা বেটে গরম ক'রে ঐ আঘাতের জায়গায় লাগালে ব্যথা ও ফুলো দুইই চ'লে যায়।

৩। **বাগীর ফুলোয়—** উরু ও তলপেটের সন্ধিস্থানে অর্থাৎ কুঁচকীতে যেটা হয় তার নামই বলা হয় বাগী, ডান বা বাম যে কোন দিকেই হ'তে পারে। সাধারণতঃ এটা যৌন সংসর্গের সময় অস্বাভাবিক অবস্থানের জন্য অথবা মেহ বা ঔপসর্গিক মেহ (গণোরিয়া) রোগগ্রস্ত লোকগুলি এই রোগে বেশী আক্রান্ত হ'তে দেখা যায়। এক্ষেত্রেও ঐ পাতা বেটে অল্প গরম ক'রে লাগালেও ক'মে যায়।

৪। **রিউমেটিকে—** এই বাতে ফুলো থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। এগুলি সাধারণতঃ অস্থির সন্ধিস্থানে (গাঁটে) বেশী হয়। এ ক্ষেত্রে এরণ্ড তৈলের (রেড়ির তেল) সঙ্গে এই পাতার রস বা পাতা বাটা দিয়ে পাক ক'রে, ছে'কে নিয়ে সেই তৈল গাঁটে লাগাতে হয়।

৫। **বিষাক্ত পোকার কামড়ে—** জ্বালা করে, কোন কোন ক্ষেত্রে ফুলেও যায়, সে সময় এই পাতার রস ক'রে লাগালে ওটা ক'মে যায়।

৬। **শ্লেষ্মা জ্বরে—** সর্দিতে বুক ভার, সেক্ষেত্রে এই পাতার রস ২ চামচ একটু গরম ক'রে ছে'কে নিয়ে খেতে দিতেন প্রাচীন বৈদ্যরা। এর দ্বারা সর্দিটা বমি হ'য়ে বেরিয়ে যায়; অবশ্য এটা আমার শোনা কথা।

৭। **টায়ফয়েড্ জ্বরে—** পিপাসা ও সঙ্গে মাথা চালাও প্রবল থাকে, এ ক্ষেত্রে ঐ পাতার রস গরম ক'রে, ছে'কে ঐ রস ১০ ফোঁটায় একটু জল মিশিয়ে খেতে দিতে হয়। আধ ঘণ্টা অন্তর দুই/তিন বার খাওয়ালে এই উপসর্গটা প্রশমিত হয়, তবে দুই-তিন বারের বেশী খাওয়ানো উচিত নয়।

৮। **ফেরিন্‌জাইটিসে—** অথবা লেরিন্‌জাইটিস্‌ হ'লে পাতার রস ২ চামচ আধ কাপ অল্প গরম জলে মিশিয়ে গারগেল্‌ (gargle) ক'রতে হয়। প্রত্যহ সকালে বৈকালে দুই বার ক'রতে পারলে ভাল। এমন কি গলার মধ্যে ক্ষত ভাব দেখা দিলে সেটাও সেরে যায়। তবে এসব ক্ষেত্রে এর সঙ্গে ২/৩ চামচ বাসক পাতার রস একটু গরম ক'রে প্রত্যহ একবার ক'রে খেতে পারলে কফের বিকারটা নষ্ট হয়।

৯। **এক্‌জিমায়—** এই পাতার রস লাগালে ক'মে যায়।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids. (b) Saponin. (c) Essential oil. (d) Fatty acids.

ধুস্তুর

অনেক লোকই ধুরন্ধর হয়, এমন কি পশু-পক্ষীর মধ্যেও তাদের কার্যের বিশেষ অভিব্যক্তিতে কতকটা আন্দাজ করা যায় যে, এরাও কম নয়। এই জড়াজড় বৃক্ষলতাদির মধ্যেও যে এই জাতীয় ধুরন্ধর গাছও আছে, সে সন্ধান পাওয়া গেল আমাদের বেদ সংহিতায়।

এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, নড়েচড়ে না, কথাও কয় না অথচ তাদের এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটা তাঁরা কি বুঝেছিলেন?

সঙ্গ না ক'রলে যেমন কারুর চরিত্র বোঝা যায় না, এটা সেই রকমই। এই নিবন্ধোক্ত গাছটির সঙ্গ ক'রেই উপলব্ধ অভিজ্ঞতায় তার নামকরণ করা হয়েছিল 'ধুস্তুর'—সে

অভিজ্ঞতাটা হ'লো, যেমন কাউকে নষ্ট ক'রতে গেলে তার মাথাটা আগেই খেতে হয়, সেই রকমই। এই গাছটির বীজ যদি খাওয়া যায়, তা হ'লে তড়িৎ গতিতে এর বিষ-প্রভাব মস্তিষ্কের জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ভারাক্রান্ত ক'রে উন্মাদের স্তরে নিয়ে যায়। তার ধুস্তুর নামকরণের সার্থকতা এইখানেই।
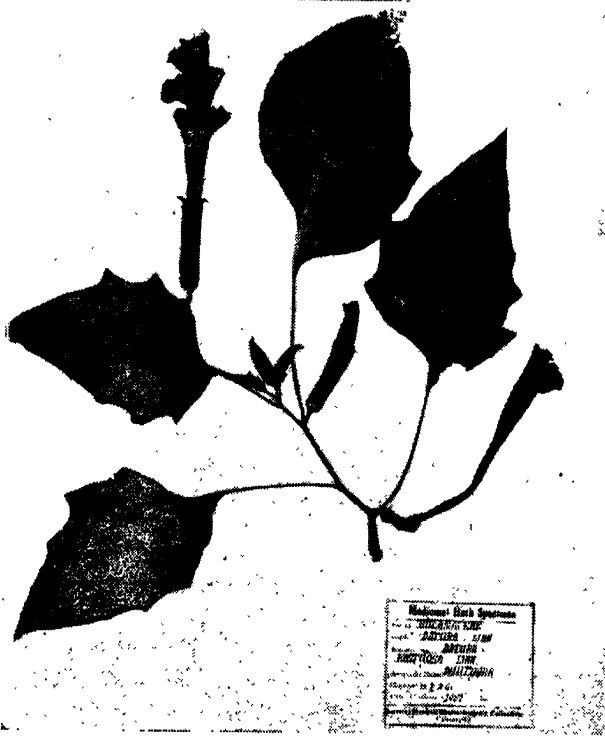
প্রাচীনদের নজির

কিং স্বিদ বনং বৃক্ষা আসন্ যতঃ পৃথিবী নিষ্ঠ তক্ষুঃ। মনীষিণঃ ধুস্তুরং।

ধুস্তুরং মহ্যান্ত্বন্যো অভিতঃ ভুবনানি ধারয়ন্তু।

—উপবর্হণ সংহিতা ১৩।২৮

ভাষ্যকার উবট্ এই সূক্তটির ব্যাখ্যা ক'রেছেন—

পুনরপি প্রশ্নঃ—স্বিদ্ ইতি বিতর্কে তম্বনং কিমাস=বভূব ইতি, বৃক্ষা এব বনং আসন্ কিং যত তানেব নিষ্ঠ তক্ষুঃ নিস্তষ্যা অলং কৃতবন্তঃ। ততঃ প্রশ্নে মনীষিণঃ ধুস্তুরং প্রাপ্য ন মহ্যন্তু। ভুবনানি ধারয়ন্তু তে, অন্যে মহ্যন্তি।

পুনরায় প্রশ্ন, তাই স্বিদ্ শব্দটি বিতর্ক অর্থ প্রকাশ করে। প্রশ্ন এই—সেই বন কিরূপ ছিল? বৃক্ষের সমষ্টিই তো বন। তা হ'লে সেই বনের প্রতিই তাঁরা অ-ত্যজনীয় হ'য়ে অলংকৃত করেছিলেন? অর্থাৎ ধুস্তুর কি তাঁদের নিষ্ঠার অলংকার হ'য়েছিল?

উত্তর— মনীষীবৃন্দ ধুতুরা পেয়ে কখনই মুহ্যমান হন না, ধুতুরার দ্বারাই তাঁরা বিশ্বকে ধারণ ক'রে থাকেন। অপরে কেবল মুহ্যমানই হয়।

এখানে মনীষীদের দৃষ্টি হ'লো ধুতুরায় অমৃতত্ব লাভ হয় এবং অজ্ঞদের পক্ষে তা শুধু নেশার জিনিস।

ধুতুরার বৃক্ষ, ফল, পাতা নিয়ে তান্ত্রিক, রসতান্ত্রিক ও বিষবৈদ্যদের গ্রন্থে যত অনুশীলন, সে তুলনায় আর্যধারার সংহিতাগ্রন্থের মধ্যে চরক, সুশ্রুত, বাগ্ভট্, কাশ্যপ সংহিতায় তেমন কিছুই নেই বললেই হয়।

সংহিতাযুগের অনুশীলন

চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে তিক্তক স্কন্ধে 'সুমনঃ' দ্রব্যটি চক্রপাণি দত্তের মতে ধুস্তুর অথবা ধুস্তুর। বৈদিক অভিধানে বলা হ'য়েছে=ধুর ঊর্ধ্বভার, তুর অর্থে গতি, কেবলমাত্র বানানের হেরফের, কিন্তু রাজনিঘণ্টু ও সারকৌমুদী ধুত্রার আর পর্যায় পরিভাষা গ্রহণ করেননি।

তারপর চরকের কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় ৭ম অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকে কনক শব্দটি ব্যবহৃত হ'য়েছে, ওখানে চক্রপাণি কনক অর্থে ধুস্তুরকে গ্রহণ ক'রেছেন। এখানে ধুতরা বীজ দিয়ে এবং অন্যান্য দ্রব্য সহ যে মধ্বাসব, সেটি পান ক'রলে কুষ্ঠ নিরাময়ের কথা বলা হয়েছে; তারপর কুষ্ঠরোগে যতগুলি প্রলেপের যোগ, তাদের মধ্যে দুটি যোগে কনক শব্দের দ্বারা ধুত্রার ব্যাখ্যা, ওখানে ধুত্রার মূলত্বক্ (মূলের ছাল) এবং বীজের প্রলেপের কথা বলা হ'য়েছে।

সুশ্রুতে এবং বাগ্ভটে উপবিষের মধ্যে কনক শব্দের উল্লেখ, কিন্তু রসতান্ত্রিকগণ এবং বিষবৈদ্যগণ ধুত্রার ব্যবহারের উল্লেখ প্রায়ই ক'রেছেন। সবক্ষেত্রে খাওয়ার ঔষধেই ধুত্রার বীজের উল্লেখ এবং তার শোধন পদ্ধতিটি দুগ্ধ সহ সিদ্ধ ক'রে তারপর তাকে শুকিয়ে নিয়ে ঔষধে ব্যবহার করার উপদেশ। হয়তো তান্ত্রিকদের এই ধারা অনুসরণ ক'রেই লোক-ব্যবহারিক বৈদ্যগণ ধুতুরাকে ঔষধে প্রয়োগ ক'রেছেন।

ধুতুরার ভেদ

বনৌষধির প্রাচীনগ্রন্থ রাজনিঘণ্টুতে লিখিত আছে—

'সিত, নীল, কৃষ্ণ, লোহিত, পীত প্রসবাশ্চ সন্তি ধুস্তুরাঃ।
সামান্য গুণোপেতাস্তেষু গুণাঢ্যস্তু কৃষ্ণকুসুমঃ স্যাৎ॥'

অর্থাৎ শ্বেত, নীল, কৃষ্ণ, লোহিত এবং পীত পুষ্পের ধুস্তুর দেখা যায়, ইহারা ক্রিয়াকারিত্বে সমান হ'লেও কৃষ্ণপুষ্প ধুস্তুরেরই ক্রিয়া অধিক। তিনি যখন এই ধুস্তুরের ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা ক'রেছেন তখন ধুস্তুর, কৃষ্ণ ধুস্তুর ও রাজ ধুস্তুর এই ৩ প্রকার ধুস্তুরের পর্যায় পৃথক পৃথক লিখেছেন; তবে কনক ও স্বর্ণ শব্দের উল্লেখ তাঁর পুষ্পের বর্ণকে উদ্দেশ ক'রে। অথবা ক্রিয়াকারিত্বে আধিক্য থাকাতে স্বর্ণের সঙ্গে

তুলনাবাচক হিসেবে এই নামকরণ করা হ'য়েছে, সেটাতেই সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। দ্বিতীয়তঃ এই কনক শব্দটি কৃষ্ণ ধুস্তুরেরই পর্যায়ে ধরা হ'য়েছে; তা হ'লে ক্রিয়া-ধিক্যই কি কনক শব্দের প্রতীক করা হ'লো? তবে প্রাচীন বৈদ্যগণ কৃষ্ণ ধুস্তুরকেই কনক ধুস্তুর হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন।

সর্বজন পরিচিত এই ধুতুরা অযত্নসম্ভূত গুল্ম; ভারতের প্রায় সকল স্থানেই দেখা যায়। এক একটা গাছ ৪/৫ বৎসরও বেঁচে থাকে। সাদা ফুলের গাছই যত্রতত্র দেখা যায়; বর্ষাকালে ঘণ্টার আকারে সাদা ফুল হয়, তাই তার এক নাম 'ঘণ্টাপুষ্প'। লাড়ুর মত গোল ফলের চারিদিকে ছোট ছোট কাঁটা আছে, তাই এই গাছের আর একটি পর্যায় শব্দনাম 'কণ্টফল'। গাছ, ফল, পাতা সবই সবুজ রং-এর; কোন পশুপক্ষী এর পাতা বা ফল খায় না, ফলের মধ্যে গুচ্ছাকারে বহু সাদা বীজ হয়, এর ফল পাকলে ফেটে যায়, তখন ঐ বীজের রং পাংশুটে (ছাই) রং-এর হয়।

দ্বিতীয়টি কৃষ্ণধুস্তুর, যাকে আমরা বর্তমানে কনক ধুতুরা বলি, তার পাতার শিরা, বোঁটা, গাছের ও ফুলের রং গাঢ় বেগুনে রং-এর বৃন্তে একটি ফুলও হয়, আবার একটি বৃন্তে অন্তঃপ্রবিষ্ট দুটি বা তিনটি ফুলও হয়; মনে হয় যেন একটির মধ্যে আর একটি গুঁজে দেওয়া। এরা প্রজাতিতে কিন্তু একই। এর বোটানিক্যাল্ নাম Datura metel Linn. ফ্যামিলি Solanaceae. এর হিন্দি নাম ধতুর, ধুরা, ধতুরা। ঔষধে ব্যবহার হয় পত্র, ফল ও মূল।

আর এক প্রকার ধুতুরা গাছ বিহারের অঞ্চল বিশেষে এবং উত্তরবঙ্গে দেখা যায়। এগুলি ৬/৭ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়, তার পাতাগুলি দেখতে অনেকটা বাসক (Adhatoda vasica) পাতার মত, ফুলগুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা; কুচবিহার অঞ্চলে একে বলে গজঘণ্টা ধুতুরা। বিহার প্রদেশের বৈদ্যগণের মতে এটি রাজধুস্তুর।

প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে ধুস্তুরের ব্যবহার

১। **উন্মত্ত কুকুর ও শৃগালে কামড়ালে—** ধুতুরার মূল কাঁচা ১½ গ্রাম (দেড় গ্রাম) পুনর্নবার (Boerhaavia repens.) কাঁচা মূল ৫ গ্রাম একসঙ্গে বেটে শীতল দুগ্ধ বা জলের সহিত পান করাতে বলা হয়েছে সুশ্রুত সংহিতায়। কল্পস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এটি উল্লেখ করা হ'য়েছে।

২। **উন্মাদে—** ধুতুরার মূলের খুব সরু যে শিকড় (মূল শিকড় বাদ) কাঁচা ১ গ্রাম (৭/৮ রতি) শিলে বেটে সেটা আধসের জলে গুলে সেই জলে ৫০ গ্রাম আন্দাজ পুরানো চাল দুধ আধ সের ও মাত্রামত চিনি বা মিছরি দিয়ে পায়েস ক'রে এইটা সকালে এবং বৈকালে খাওয়ার কথা বলা আছে চক্রদত্ত সংগ্রহে (এটি ১১ শতকের গ্রন্থ)। তবে রোগীর বলাবল, ক্ষেত্র, বয়স এসব বিচার ক'রে রোগীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত।

মন্তব্যঃ— বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ভিন্ন জনসাধারণের পক্ষে এটি ব্যবহার করা উচিত হবে না। ধুতুরা গাছের কোন অংশের আভ্যন্তরিক প্রয়োগে (internal application) বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এর সঙ্গে আর একটা কথা জানিয়ে রাখি, পূর্বে বৈদ্যগণ বিশেষ ওষধিগুলি নিজেরা ক'রতেন। এই ধুতুরার শিকড় তোলার সময় গাছের উত্তরদিকের শিকড় তুলে নিতেন, তাঁদের বক্তব্য হ'লো—এই উত্তরদিকের শিকড় সোমগুণ প্রভাব বেশী পায় বলে তার বায়ু দমনের শক্তি সমধিক হয়, তাই তার নিদ্রাকর্ষণ করার শক্তি বেশী।

৩। **গরলবিষে—** ধুতরার মূল, কাঁচা হলুদ, শিরীষ ফুল (Albizzia lebbeck Benth.) একসঙ্গে বেটে লাগালে গরল বিষ দূর হয়।

পাতার ব্যবহার

৪। **টাক রোগে (বিক্ষিপ্ত টাকে)—** যেটা বৈদ্যকের দৃষ্টিতে ইন্দ্রলুপ্ত রোগ, সাধারণ লোকের ধারণা, এটা তেলাপোকায় কেটে দিয়েছে; তা নয়, এটা একপ্রকার Fungus infection.। একবার গায়ের কোন জায়গায় ব'সলে তাকে তাড়ানো মুশকিল। এ ক্ষেত্রে ধুত্‌রা পাতার রস মাথায় যেখানে হ'য়েছে সেখানে লাগাতে বলেছেন বাগ্‌ভট (এটি ষষ্ঠ শতকের গ্রন্থ); এটা বলা হ'য়েছে উত্তরতন্ত্রের ২৬ অধ্যায়ে। তবে অনেক সময় দেখা যায় প্রায় সমগ্র মাথায় এই রোগ ব্যাপ্ত হয়ে প'ড়েছে, সেক্ষেত্রে পাতার রস আজ এধার ও কাল ওধার ক'রে লাগাতে হয়; দিনে একবারের বেশী লাগানো উচিত নয়, আর এক দিন বাদ এক দিন লাগালেই ভাল। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এই রোগের নাম দেওয়া হ'য়েছে—Alopecia areata. যদি দেখা যায় যে মাথায় একটা যন্ত্রণা অনুভব ক'রছেন, তা হ'লে এটা ব্যবহার করা সমীচীন হবে না।

৫। **ক্রিমিতে—** পাতার রস ২/৩ ফোঁটা ক'রে দুধের সঙ্গে খাওয়াতে ব'লেছেন ভাবপ্রকাশ। এ ক্ষেত্রে প্রয়োগের বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার নেই, পরীক্ষা প্রয়োজন।

৬। **স্তনের ব্যথায়—** কাঁচা হলুদ ও ধুত্‌রার পাতা বেটে অল্প গরম ক'রে লাগাতে বলা হয়েছে। এটাও ভাবপ্রকাশের যোগ।

৭। **ফুলো ও ব্যথায়—** ধুত্‌রার পাতার রস করে, তাকে জ্বাল দিয়ে ঘন ক'রে (মধুর মত) তুলি ক'রে লাগাতে হয়, এর দ্বারা ব্যথা ও ফুলো দুয়েরই উপশম হয়। আর যদি এর সঙ্গে একটু আফিং ও মুসব্বর মিশিয়ে লাগানো যায় তবে আরও ফলপ্রদ হয়।

৮। **ফিক্ ব্যথায়—** সে ঘাড়ে বা পিঠে যে কোন জায়গায় হোক্ না কেন, ধুতরার পাতা ও চূণ একসঙ্গে র'গড়ে রস বের ক'রে সেই রসটা লাগালে ঐ ব্যথা কমে যায়; অন্ততঃ ৩ বার ৪/৫ ঘণ্টা অন্তর লাগাতে হয়।

৯। **সাদা আমাশায়—** কাল ধুত্‌রার পাতার রস ৩/৪ ফোঁটা আধ পোয়া দই-এ মিশিয়ে খেতে বলে থাকেন গ্রামীণ বৈদ্যরা।

১০। **হাঁপানীতে—** কাল ধুত্‌রার শুষ্ক পাতা ও ফুল বাসক পাতায় বেঁধে চুরুট তৈরী ক'রে সেই চুরুটের ধোয়া টানলে হাঁপের টান কমে যায় বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সর্দিটা টেনে যায়। বাসকপাতা বা ফুল ভেঙে বিড়ির তামাকের মত ক'রে নিতে হয়—তার মাত্রা হবে ৩ রতি থেকে ৬ রতি পর্যন্ত।

বৈদ্যবাড়ীর 'কনক তৈল'

প্রস্তুত বিধি—সরষের তেল ১ কেজি, ধুত্‌রোর পাতা ডাঁটা সমেত কুটে, নিংড়ে রস নিতে হবে ২ কেজি বা লিটার, আর ঐ শুধু পাতা বেটে আন্দাজ ১০০ গ্রাম। তেলটা আগুনে চড়িয়ে নিষ্ফেন হ'য়ে ধোঁয়া উঠতে থাকলে, তেলটা নামিয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'লে ঐ রসটা এবং ঐ পাতা বাটা অল্প অল্প ক'রে দিতে হবে। ১০/১৫ মিনিট পরে আন্দাজ ২ সের জল দিয়ে পাক ক'রতে হবে, জলটা ম'রে গেলে, ঐ তেলটাকে ছে'কে নিতে হবে।

১১। **পাদদারী রোগে—** যাঁদের পায়ের তলা ফেটে ফেটে যায়, তাকেই পাদদারী রোগ বলে। এ ক্ষেত্রে উপরিউক্ত কনক তৈল বিশেষ উপকারী।

১২ **ছুলিতে—** এই কনক তৈল লাগালেও কাজ হয়।

১৩। **কানের যন্ত্রণায়—** ঊর্ধ্বগ শ্লেষ্মার দোষে কানে বা কপালে যন্ত্রণা হয়, সে ক্ষেত্রে কানে তেলের ফোঁটা দেওয়া আর কপালের যন্ত্রণায় একটু তেল কপালে মালিশ করা।

১৪। **শ্বাসে—** সমগ্র গাছকে অর্থাৎ গাছ, পাতা, মূল, ফল ও ফুল সিদ্ধ করে অন্যান্য দ্রব্য সহযোগে সন্ধিত আসব (Fermentation) করা হয়। এইটি কনকাসব নামে প্রচলিত।

১৫। **বাতের ব্যথায়—** ধুতরা পাতার রসের সঙ্গে সরষের তৈল মিশিয়ে গরম ক'রে মালিশ ক'রলে ক'মে যায়।

১৬। **ফোঁড়ায়—** ধুতরার পাতার রসের সঙ্গে সামান্য একটু গাওয়া ঘি মিশিয়ে প্রলেপ দিয়ে পেকে যায়।

এই নিবন্ধের উপসংহারে জানাই যে, সব ফুলই দেখে চোখ জুড়োয়, ব্যতিক্রম কেবল এই ধুত্‌রো ফুলের বেলায়।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz., hyoscyamine, hyoscine, atropine, scopolamine, norhyoscyamine. (b) Vitamin C. (c) Other constituents viz., fixed oil and allantoin.

তিন্দুক

কথায় আছে, 'নারদের ঢেঁকি', জানি না নারদের বাহন ঢেঁকিটি কোন্ কাঠে তৈরী হ'তো, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় সে ঢেঁকি গাব কাঠে তৈরী হ'তো না, তার কারণটা ব'লছি—আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যত অচল জিনিস আছে, তাদের মধ্যে গাবের ঢেঁকিও একটি, এই গাছের সারকাঠে তৈরী ঢেঁক এত ভারি হয় যে, তা দিয়ে ধান ভানাও (ভাঙ্গা) সম্ভব হয় না। এই ঢেঁকি বস্তুটি যে কি, সেটা গ্রামাঞ্চলের লোকেই বেশী বুঝবেন; তাই অকর্মণ্য লোকের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া হ'য়ে থাকে; তাই ব'লছিলাম নারদের ঢেঁকি গাব কাঠে প্রস্তুত করা হয়নি।

তাই ব'লে কি গাবের সব অংশটাই অচল? তা নয়, তারও উপযোগিতা আছে, আভিজাত্যও আছে এবং আছে ভৈষজ্যগুণও। যদিও ঢেঁকি শব্দটি সাঁওতাল মুণ্ডাদের নিজস্ব ভাষা; কিন্তু তার উপাদান কাঠটি মুণ্ডাদের আবিষ্কৃত নয়; ওটি বহু প্রাচীন তিন্দুক; এর বৈদিক পরিচয় ও সমীক্ষা—তোমার ত্বক্ দিয়ে আমাদের শরীরের বলকে স্নিগ্ধ কর। তোমার ফলের রস আমাদের আহার্যের জীর্ণতা আনে না।

কালান্তরে

সেই বৈদিক তথ্যটিকে উপজীব্য ক'রে চরক ও সুশ্রুত সম্প্রদায়ের সংহিতা গ্রন্থে এটিকে রোগ-প্রশমনে কাজে লাগানো হয়েছে। চরকে উদর্দ প্রশমন বর্গে (শীতপিত্তের প্রকার ভেদ) এটির উল্লেখ দেখা যায়; তবে এই বৃক্ষের ছালটিকেই প্রধানভাবে ব্যবহার করার উপদেশ চরক-সুশ্রুতে দেওয়া হয়েছে, কারণ ফলের রস দুর্জর অর্থাৎ সহজে হজম হতে চায় না, অত্যন্ত সংগ্রাহী ও বায়ুবর্ধক। তারপর পরবর্তীকালের আয়ুর্বেদ

সংহিতার গ্রন্থকারগণ এই ভেষজটিকে নিয়ে যে কাজ করেননি তা নয়, কারণ বাগ্‌ভট্‌ (ষষ্ঠ শতকের গ্রন্থ) শ্ৰধ্ৰ স্ববর্ণকরত্বে তিন্দ্রক ফলের বাহ্যপ্রয়োগ ক'রেছেন—

(১) কোন জায়গায় ক্ষত (ঘা) সেরে যাওয়ার পর (যে কোন কারণেই হোক্‌) সাদা দাগ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কাঁচা গাব ফলের রস কিছ্ৰদিন ঐ দাগের উপর প্রলেপ দিলে ওটার বর্ণ স্বাভাবিক হ'য়ে যায়।

(২) প্ৰরাতন অজীর্ণে— গাব গাছের ছাল ৫।৬ গ্রাম আন্দাজ নিয়ে গাম্ভারী গাছের (Gmelina arborea) পাতায় ম্ৰড়ে মাটি দিয়ে লেপে আগ্ৰনে ঝ'ল্‌সে নিয়ে তারপর ওটাকে বের ক'রে নিয়ে অল্প জল দিয়ে থে'তো ক'রে তা ছে'কে সেই রসটায় একট্ৰ মধ্ৰ মিশিয়ে খেতে হয়। যাঁদের পাতলা দাস্ত কিছ্ৰতেই ভাল হয় না, তাঁরা এটাতে নিশ্চিত উপকার পাবেন, তবে অগ্নিবল ব্ৰঝে এবং আহারে সংযত না হলে অতিসার কখনই সারে না। এ যোগটি হারীত সংহিতায় বলা আছে।

(৩) **অগ্নিদগ্ধের ক্ষতে—** ক্ষতটা পুরে উঠছে না, তখন কাঁচা গাব সিদ্ধ ক'রে সেই জল ছেঁকে তারপর তাকে ঘন ক'রে লেহবৎ (paste) করতে হবে। এইটা একটু গাওয়া ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে লাগাতে হবে। এটা ষোড়শ শতকের ভাবপ্রকাশের যোগ।

(৪) **শিশুর হিক্কায়—** গাবের শুষ্ক ফুলচূর্ণ ১ গ্রেণ মাত্রায় একটু মধু মিশিয়ে শিশুকে চাটালে হিক্কা প্রশমিত হয়। এটা সপ্তদশ শতকের বঙ্গসেনের পরীক্ষিত যোগ।

চরক সূত্রস্থানের ৪ অধ্যায়ে ৪৩ গুচ্ছে 'তিন্দুক-পিয়াল-বদর-খদির ইতি' এবং সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ২৩ গুচ্ছে 'কদম্ব-বদর-তিন্দুক' প্রভৃতি কয়েকটি বৃক্ষের দ্রব্য-শক্তির পরিচয়ে তিন্দুকের রক্তপিত্তহরত্ব প্রভৃতি আরও কয়েকটির উল্লেখ আছে, তাছাড়া ৪৬ অধ্যায়েও আছে। চরকের টীকাকার চক্রপাণি বলেছেন—তিন্দুক মানে কেঁদ কিন্তু প্রচলিত ক্ষেত্রে দেখা যায় কেন্দু গাছ পৃথক প্রজাতি (species), যার পাতা দিয়ে বিড়ি তৈরী হয়। আর সুশ্রুতের টীকাকার ডল্বন ব'লেছেন—তিন্দুক মানে 'টিম্বরুয়নি'। নিঃসংশয়ে বোঝা যায়—চক্রপাণি বাংলার পরিভাষাই গ্রহণ ক'রেছেন আর ডল্বন মহারাষ্ট্রের। কিন্তু গাব এই ভাষাটি বাংলা ও হিন্দীতে উভয়েরই।

পণ্ডিতগণ খুব শক্ত বা কঠিন দ্রব্যকে সংস্কৃত ভাষায় 'গালব' বলেন, অপরপক্ষে নিষ্করুণহৃদয় গালব মুনিরও একটি নাম পরিচয়ে তিনি 'গালব' (দেবী ভগবত)। হয়তো কালে সেই গালব শব্দের তুলনামূলক গাবে পরিবর্তিত হ'য়েছে। সংস্কৃত ভাষায় এর আর একটি নাম দেওয়া হয়েছে 'নীলসার'।

এই নীলসারের সংহিতা পরিচিত নাম 'তিন্দুক'। তিন্দ শব্দের শব্দার্থ হ'ল—যেখানে সে লাগে, আর ছাড়তে চায় না। এর আরও একটি নাম 'কালস্কন্ধ', বোধ হয় গাছের নামই কালস্কন্ধ। গাছের ও ডালের রং কালো ব'লেই বা একে আমরা চল্‌তি কথায় গাব বলি। এ ভিন্ন বনৌষধির গ্রন্থে 'বিষতিন্দুক' ব'লে আর একটি ভেষজের উল্লেখ আছে। তার ফলগুলিও দেখতে গাবের মত হলেও ঐ ফলের গাত্র সবুজ ও মসৃণ। সেগুলি পাকলে হলদে রং হয়—চলতি নাম কুচিলা ফল। তার চ্যাপ্টা ও পুরু বীজ-গুলিই আমাদের ঔষধে ব্যবহৃত হয়। এই গাছটির বোটানিক্যাল্ নাম Strychnos nux-vomica Linn. ফ্যামিলী Loganiaceae. বর্তমানে এদেশে ঠিক গাবের মত দেখতে আর এক প্রকার ফল পাওয়া যায়। অবশ্য এটি এসেছে বার্মা অঞ্চল থেকে, একে চল্‌তি কথায় বিলিতী গাব বলে। এটি আমাশায় রোগে সেদেশে ধন্বন্তরি বলা যেতে পারে, এর বোটানিক্যাল্ নাম Garcinia mangostana Linn. ফ্যামিলী Guttiferae.

এই নিবন্ধোক্ত গাব গাছটি শাখাবহুল ও মাঝারি ধরণের। পাতা পুরু ও শক্ত, আকারে অনেকটা গরু-মহিষের জিভের মত। চৈত্র-বৈশাখে ফুল ও ফল হয়, ফল পাকে ৪। ৫ মাস বাদে, ফলগুলি দেখতে লাড্ডুর মত। কচি অবস্থায় এর ফলের গায়ের রং যেন ইটের গুঁড়ো মাখানো, ফল পাকলে ঈষৎ হলদে রং হয়। তখন ফলের শাঁসটা মিষ্টি ও একটু কষা লাগে—কাক ও অন্যান্য পাখী ওগুলি খেতে খুব ভালবাসে। গ্রাম্য অঞ্চলের বালকেরাও খায়। এই আলোচ্য গাছটির বোটানিক্যাল্ নাম Diospyros peregrina Gurke. ফ্যামিলী Ebenaceae. এই গাবকে উপমা দিয়ে একটি লোক-কথা দেশগাঁয়ে প্রচলিত। সেই ক্ষেত্রটি হচ্ছে—'কোন ব্যাপারে কোন ব্যক্তি ফেঁসে যাওয়ার পর তার কাকুতি-মিনতি। যেই সেই কার্যোদ্ধার হয়ে গেল, আর মনে থাকে না।' এই ক্ষেত্রেই পাকা গাব ফলকে উপমায় ব্যবহার করা হয়। সেই লোককথাটা হচ্ছে—"আর

গাব খাবো না, গাব-তলায় আর যাব না (যেহেতু গলায় পাকা গাবের বীজ আট্‌কে ছিল); যেমনি নেমে গেল, অমনি—গাব খাবো না খাবো কি, গাবের তুল্য আছে কি?"

লোক-ব্যবহার

১। **ঋতুস্রাবাধিক্যে**— অনেক মায়ের মাসিকের সময় স্রাব বেশী হয় ও দীর্ঘদিন থাকে—তাঁরা ৭।৮ গ্রাম কাঁচা গাব ফল অল্প জল দিয়ে থে'তো ক'রে সেই রস মাসিকের তিন দিন বাদ দিয়ে খাবেন। ২।৩ দিনের বেশী খেতে হয় না, ওর দ্বারা স্রাব বন্ধ হয়ে যায়।

২। **দীর্ঘদিনের আমাশায়**— এই গাছের ছালের রস ১ চা-চামচ মাত্রায় একটু গরম ক'রে ছাগলের দুধের সঙ্গে খেতে হয়। এটাতে আমাশার প্রকোপ কমে যায়।

৩। **লালা মেহে**— যাদের প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে অথবা যেকোন সময় লালার মত ক্ষরণ হয়, তাঁরা এই ফলের রস আধ বা এক চা-চামচ গরম ক'রে দুধের সঙ্গে খাবেন। তবে কোষ্ঠকাঠিন্য এলে অর্ধেক মাত্রায় খাবেন।

৪। **ডায়াবেটিস রোগে**— অল্প বয়সেই যাঁদের ডায়াবেটিস হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ বৈদ্যরা অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে এটিও ব্যবহার করতেন।

৫। **ক্যানসারের লালাস্রাবে**— গলায় বা জিভে ক্যানসার হ'লে বহু লালাস্রাব হ'তে থাকে; এক্ষেত্রে গাব ফল কাঁচা হলে ১০।১৫ গ্রাম ও শুষ্ক হ'লে ৬।৭ গ্রাম জলে সিদ্ধ ক'রে সেই জলে ভাত বা অন্য কোন আহার্য দ্রব্য পাক ক'রে খেতে দিলে ঐ লালাস্রাব উল্লেখযোগ্য ভাবে ক'মে যায়।

এ ভিন্ন (ক) কাঁচা গাবের পাতা জীরে জীরে ক'রে কেটে সিদ্ধ ক'রে জল ফেলে দিয়ে নারকোল কোরা দিয়ে মোচার ঘণ্টের মত রাঁধতে হয়। পূর্ব-উত্তর বাংলার এটি একটি রুচিকর তরকারি। একাধারে আহার ও ঔষধ।

(খ) গ্রাম্য লোকেরা মাছ ধরার জালের সুতো শক্ত করার জন্য গাবের রস লাগিয়ে থাকে। সুতোর আয়ু বাড়ে গাবের রসে।

(গ) লবণাক্ত জলে দীর্ঘ দিন ব্যবহারে নৌকার কাঠ খারাপ হয়ে যায়। সেজন্য গাবের রস নৌকার তলায় লাগানো হয়—একে বলা হয় গাব-ঘে'স্ দেওয়া।

তাছাড়া আরও কত লৌকিক ব্যবহার হয়তো আমাদের অজানা রয়েছে। মোট কথা আয়ুর্বেদের রীতিতে ভেষজের রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যায়গুলি যত খুঁটিয়ে অনুশীলন করা হবে, ততই ভৈষজ্যবিদ্যায় প্রবেশের রহস্য ও বিজ্ঞানের নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার হবে।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Tannin. (b) Acids viz., tannic acid, malic acid. (c) Fatty oil.

গন্ধনাকুলী

বাংলায় কতকগুলি কথা এমনভাবে মুখে মুখে ফেরে যেগুলি অনেক সময় খনার বচন ব'লে ভ্রম হয়, অথচ কথাগুলি খুব সার্থক, কারণ খনা ছিলেন ভারতীয় বিদুষী, তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় না, তিব্বতী ভাষায় মুখন শব্দে জ্ঞানীকে বোঝায়, সেই মুখন শব্দটি খনা বলেই উচ্চারিত হয় অর্থাৎ জ্ঞানীর বচন। ঠিক এমনি একটি জ্ঞানীর বচন 'ছোট চান্দা বড় চান্দা—কি হবে তোর দড়ি বান্ধা'। গ্রাম বাংলার এই প্রবাদ বাক্যটি প্রচলিত ছিল; কথাটার ভাবার্থ হ'লো ছোট চাঁদড় (Rauwolfia Serpentina) ও বড় চাঁদড় (Rauwolfia Canescens) থাকতে দড়ি বাঁধার দরকার কি—এটির দ্বারা এই ইঙ্গিত যে, এটি সর্পবিষে কাজ করে; অবশ্য তার দ্রব্যশক্তিরই ইঙ্গিত বহন ক'রছে কিন্তু যে যুগে এই ধরণের প্রবাদ প্রচলিত হ'য়েছে তখন আয়ুর্বেদ চিকিৎসারই প্রসার প্রতিপত্তি বেশী ছিল; এবং দ্রব্যগুণের বিচারও আয়ুর্বেদোক্ত বায়ু, পিত্ত, কফের মৌল ভিত্তিতে এবং ক্ষেত্র বিচারেই তার সীমা বাঁধা ছিল।

পরিচিতি—কাল-নাম-ধাম

তুমিই রাম না শ্যাম? এমনি মনোভাব নিয়ে যেমন আমরা প্রশ্ন করি—এই বনৌষধিটিও সেই সমস্যার সৃষ্টি ক'রেছে, তাই তার সম্পর্কে অনুসন্ধান ক'রতে ক'রতে এগিয়ে গিয়ে আজ থেকে তিন শত বৎসর পূর্বেকার সংকলিত বনৌষধির গ্রন্থ রাজ-নিঘণ্টুতে সর্পগন্ধা বা নাকুলী এবং গন্ধনাকুলী বনৌষধিটির নামোল্লেখ ও রস-গুণের বর্ণনা দেখতে পাই। সেখানে বলা হ'য়েছে 'নাকুলী গন্ধনাকুলী চ' অর্থাৎ নাকুলী এবং গন্ধনাকুলী। তৎপূর্ববর্তী গ্রন্থ 'ভাবপ্রকাশে' উল্লেখ আছে নাকুলী গন্ধনাকুলী (রাস্না ভেদ)।

রাজনিঘণ্টুকারের মতে রাস্না তিন প্রকারের— (১) মূল রাস্না, (২) পত্র রাস্না, (৩) তৃণ রাস্না। এই নাকুলী ও গন্ধনাকুলীই মূল রাস্না অনেকে এটা অনুমান করেন, কারণ উপরিউক্ত গ্রন্থে লেখা আছে—

'নাকুলী সর্পগন্ধাচ সুগন্ধা রক্তপত্রিকা'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সর্পগন্ধাই নাকুলী।

এই শ্লোকটির আর একটি ক্ষেত্রের উল্লেখ ক'রছি—সেখানে উল্লেখ আছে সর্পাক্ষী 'গন্ধনাকুলী', এই নামটির সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় যখন তার বীজগুলি পাকে; এর উল্লেখ ভারতীয় বৈদ্যক-অভিধানে কয়েকটি নামের মাধ্যমে; তার মধ্যে সর্পাক্ষীও একটি। বীজগুলি পাকলে দেখতে সাপের চোখের মত হয়।

ভারতবর্ষের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায়; পূর্বে হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা জেলার যত্র-তত্র পাওয়া যেতো, কিন্তু এখন এই প্রজাতিটি দুর্লভ হ'য়ে পড়েছে। বর্তমানে অবশ্য কোন কোন প্রদেশে কিছু কিছু চাষ আরম্ভ হয়েছে। বহু-শাখাবিশিষ্ট গুল্ম। গাছগুলি উচ্চতায় ৪।৫ ফুট পর্যন্ত হয়। গাছ ও মূল কাষ্ঠগর্ভ, এর শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে চারিটি বা তিনটি পত্র বিন্যস্ত। প্রধানতঃ দেখা যায় তার জন্যই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীগণ এই প্রজাতিটির (species) বর্তমানে নামকরণ ক'রেছেন Rauwolfia tetraphylla Linn.। পূর্বে এই প্রজাতিকে বলা হ'তো Rauwolfia Canescens Linn. ফ্যামিলি Apocynaceae.

আর একটি কথা এখানে জানিয়ে রাখি, মূলটি ছোট বা বড় চাঁদড়ের কিনা, এটি

চিনবার সহজ উপায় হ'লো—এদের মূল ভাঙ্গলে অবিকল কাঁচা তে'তুলের গন্ধ পাওয়া যাবে। সেটা না পেলেই এটা আসল কিনা সন্দেহ করার ক্ষেত্র থাকে, তবে কাঁচামূলের গন্ধটা পরিষ্কার বোঝা যায়। আর একটা কথা জেনে রাখা দরকার, ছোট চাঁদড়ের মূল ভঙ্গুর অর্থাৎ সহজেই ভাঙ্গতে পারা যায়, কিন্তু বড় চাঁদড়ের মূল খুবই শক্ত। দুইই কিন্তু স্বাদে তিক্ত এবং এর পাতাও তিক্তাস্বাদ।

ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় প্রধানতঃ মূল। এখন পত্রেরও ব্যবহার করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চ'লছে এটাকেও যদি সর্পগন্ধার মূলের পরিবর্তে কাজে লাগানো যায়।

গুণাদির বর্ণনা

উপরিউক্ত বনৌষধির গ্রন্থ রাজনিঘণ্টুতে বলা হ'য়েছে—

> 'নাকুলী যুগলং তিক্তং কটুকঞ্চ ত্রিদোষনুৎ। অনেক বিষ-বিধ্বংসি কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয়কং'।

অর্থাৎ এই নাকুলী ও গন্ধনাকুলী স্বাদে তিক্ত এবং বায়ু, পিত্ত, কফ নাশক; সর্বপ্রকার বিষহরণকারী; তবে দ্বিতীয় অর্থাৎ গন্ধনাকুলীটি কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ এ কথাও উল্লেখ করা হ'য়েছে; এই মূলটি যে কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ, পাশ্চাত্য ভেষজ বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এটা প্রমাণ পেয়েছেন। তাঁদের মতে এটি নাকি Less toxic. আয়ুর্বেদিক গ্রন্থে বলা হ'য়েছে এটি সাপ, মাকড়শা, বৃশ্চিক (বিছে), ইন্দুর প্রভৃতির বিষ নষ্ট করে, আর নষ্ট করে জ্বর ক্রিমি ও ব্রণ। এগুলি কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি।

জ্বর চিকিৎসায়— রাস্নার প্রয়োগ একাদশ খৃষ্টাব্দে চক্রপাণি দত্ত প্রণীত চিকিৎসার গ্রন্থ 'চক্রদত্ত সংগ্রহে' দেখা যায়; কিন্তু এই গ্রন্থে নাকুলী ও গন্ধনাকুলীর নামের উল্লেখ দেখা যায় না, সেখানে রাস্নার উল্লেখ; আবার তারও পূর্ববর্তী তিনখানি আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটে সেই রাস্নার উল্লেখ। এর দ্বারা এটাও বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করা যায় না যে, নিবন্ধোক্ত বনৌষধিটি তাঁদের নির্দেশিত বনৌষধি কিনা। তার আরও একটা কারণ হ'লো পাশ্চাত্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগণের মতে এই বনৌষধিটি নাকি বহিরাগত, কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রাচ্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের একটি মত আছে; সেটা হচ্ছে—প্রাচ্যের ভৈষজ্য পরিভাষার শব্দবিন্যাস ও তার অর্থবোধ সম্বন্ধ। এই গান্ধনাকুলী বা বড়চান্দা বা চাঁদড় ভেষজটি তার একটি উদাহরণ। তবে জানি না কত শত বৎসর পূর্ব থেকে ভারতে এসে বসবাস ক'রেছে অথবা এদেশে বরাবরই আছে।

এই গাছটি সম্পর্কে আর একটি বক্তব্য এখানে রাখছি—এর আর একটি পারিভাষিক শব্দনাম 'নকুলেষ্টা' অর্থাৎ নকুলের (বেজির Ichneumon) ইষ্ট সাধনকারী। আবার ওড়িষার অঞ্চল বিশেষে এই গাছটিকে বলা হয় 'পাতাল গরুড়ী; জানি না এই গড়ুর শব্দটির দ্বারা নামকরণের ইঙ্গিত কিনা, সে সর্পের শত্রু সেই প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটি। তাই হয়তো বা ঐ প্রদেশের এই পাতাল গরুড়ী নামকরণের তাৎপর্য এইখানে। এই কথাটিও পাশ্চাত্য দেশের অনুসন্ধিৎসু মনীষী সংকলিত সংগ্রহ পুস্তকেও (ইকোনোমিক্ প্রোডাক্ট্‌স্ অফ ইণ্ডিয়া) এই কথা লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে।

রোগ-প্রতিকারে অনুশীলনের উৎস

দ্রব্যের রস, গুণ, শক্তি অস্বীকার্যও যেমন হয় না তার কার্যকারণ দেখে, তেমনটি

কিন্তু মন্ত্রতন্ত্রের ক্ষেত্রে দ্রব্যকে তৎক্ষণাৎ কারণ মানা হয় না, যেহেতু ও ব্যাপারটা দ্রব্যের একান্ত যোগে হয় না; তবে ক্ষেত্র-অযোগ্য দ্রব্য নিয়েও হয় না। এমনই এক গূঢ় ঐতিহ্যপূর্ণ চিন্তাধারাগুলির উৎস খুঁজতে খুঁজতে ৬০০ খৃষ্টাব্দের একটি চিকিৎসার গ্রন্থে (অষ্টাঙ্গ হৃদয়) সর্পবিষের প্রতিরোধক দ্রব্যের ব্যবহারিক পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া গেলেও ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকেই মানুষ চেষ্টা ক'রে চলেছে সর্প-দংশনোত্তর কালের প্রতিকার ও পূর্বোত্তর কালের প্রতিষেধ ব্যবস্থার সন্ধানে। এ সম্বন্ধে ভারতের আয়ুর্বেদের চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ চরক সংহিতার উদ্ধৃতিগুলি বিশেষ চিত্তা-কর্ষক।

বিষ চিকিৎসার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের অগদ তান্ত্রিক চিকিৎসার দুটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; একটি মন্ত্রতন্ত্র, আর একটি ভৈষজ্য বিধান। আলোচ্য বনৌষধিটি সেই ভৈষজ্য বিধানের অন্তর্গত। ভেষজটির গুণ বিচারের প্রসঙ্গে আসতে গেলে প্রথমে সাপের জাতিভেদ ও তার বিষের প্রকৃতি সম্পর্কে একটু আলোচনা না ক'রলে প্রাচ্য বিজ্ঞানের চিন্তাধারার গতি-প্রকৃতি ও দ্রব্য বিচারটা সম্যক বোঝানো সম্ভব নয়।

সাপের জাতিভেদ—

> দর্ব্বীকরা মণ্ডলিনো রাজীমন্ত স্তথৈবচ। সর্পা যথাক্রমং বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম প্রকোপনাঃ। দর্ব্বীকরাঃ ফণী জ্ঞেয়ো মণ্ডলী মণ্ডলা ফণা। বিন্দুলেখা বিচিত্রাঙ্গ পন্নগঃ স্যাত্তু রাজীমান্। বিষং যথাক্রমং তেষাং ভস্মাং বাতাদি কোপনম্।

এই সর্পকুলকে তাঁরা তিন ভাগে ভাগ ক'রেছেন দর্বীকর, মণ্ডলী ও রাজীমান। তা ছাড়া কোন্ জাতীয় সাপের কি প্রকৃতি, তারা কামড়ালে বায়ু, পিত্ত ও কফ কোন্ দোষের প্রকোপ হয় ও কি কি উপসর্গ উপস্থিত হয় তার যথাযথ বর্ণনা তাঁরা দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে সর্পের বিষের প্রকৃতি যোজনা

যে সব সাপের ফণা হাতার মত তাকে বলা হয় দর্বীকর শ্রেণী। এদের বিষ বায়ু-বর্ধক। এই বিষ শব্দটির অর্থ ব্যাপ্ত, যা ছড়িয়ে পড়ে। দর্বীকর সাপের বিষ তড়িৎ-গতিতে ছড়িয়ে প'ড়ে স্নায়বিক যন্ত্রের অবসাদ ঘটিয়ে পক্ষাঘাত সৃষ্টি ক'রে এবং মৃত্যুও ঘটায়। একে বলা হয় নিউরোটক্সিক্ (Neurotoxic); (অগদ তন্ত্রের ভাষায় "স্নায়ুক্ষেপ")।

মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে আলোচ্য বনৌষধিটি কি ক'রে সাপের বিষে কাজ করে।

এখানে চরকীয় সমীক্ষায় দেহে বিষ সঞ্চারের ক্ষেত্রে বলা হ'য়েছে—

> জঙ্গমং স্যাদ্ উর্দ্ধভাগমধোভাগং তু মূলজম্।
> তস্মাদ্দংষ্ট্রাবিষং মৌলং হন্তি মূলং চ দ্রংষ্ট্রজম্॥

অর্থাৎ দেহে জঙ্গম বিষের গতি উর্ধ্বদিকে, আর স্থাবর বিষের গতি অধোদিকে, দুটি বিষের এই বিপরীত গতি হওয়ায় স্থাবর বিষ জঙ্গম বিষক্রিয়াকে এবং জঙ্গম বিষ

স্থাবর বিষক্রিয়াকে প্রতিহত করে; অর্থাৎ নৈসর্গিক কারণে স্থাবর বিষ পার্থিব শক্তিতে এবং জঙ্গম বিষ বায়বীয় শক্তিতে পূর্ণ। এই স্থাবর বিষ আবার দুই প্রকারের—একটি খনিজ, যেমন শঙ্খবিষ (আর্সেনিক) আর একটি উদ্ভিজ্জ বিষ—যেমন অমৃত বা মিঠাবিষ (এ্যাকোনাইট); এইগুলি পার্থিব ও গুরু।

দেখা যাচ্ছে—চরকীয় চিন্তাধারায় স্থাবর ও জঙ্গম বিষ ভেদে যে বিষের ঊর্ধ্ব ও অধোগতি বিচার করা হ'য়েছে, তার মধ্যে সর্পের জাতিভেদ বিজ্ঞানটিও ত্রিদোষের অন্তর্ভুক্ত ক'রে (বায়ু, পিত্ত, কফ) তাদের বিকৃতির বিচারও করা হ'য়েছে; অতএব কেউটে জাতীয় সাপে কামড়ালে হৃদ্‌যন্ত্রে যে বায়ুর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হয় (দ্রুততা) সেটা জাঙ্গমিক বিষের ঊর্ধ্বগতিই কারণ। সেইখানেই এই চাঁদড়ের প্রয়োগ। এটি গত শতাব্দীতেও প্রয়োগ করা হ'তো।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণের নিরীক্ষায় জানা যায়—ভারত ও পূর্বভারতীয় দ্বীপ যাভা ও মালয়ে অতি প্রাচীনকাল থেকে সাপে কামড়ালে এ গাছের মূল ক্বাথ ক'রে খাওয়ানো এবং বেটে প্রলেপ দেওয়া হ'তো। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন রাজ্যে বহু রোগেও এটির ব্যবহার হ'য়ে থাকে।

এ তো গেল গত শতাব্দীর সংকলিত তথ্য। বর্তমান যুগে ব্লাড্‌প্রেসার রোগে ও উন্মাদ রোগের ক্ষেত্রে এটির ব্যাপক প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। এখানেও সেই আয়ুর্বেদীয় চিন্তাধারায় বিকৃত বায়ুর উন্মার্গ গতিকে দমিত করা; এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, রোগোৎপত্তির জন্য যেটি বিকৃত হেতু সেটি ত্রিদোষের অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফের অন্তর্গত বায়ুরই অশান্ত গতিকে প্রতিহত করা; সুতরাং ব্লাড্‌প্রেসারে এবং কোন কোন প্রকার উন্মাদের ক্ষেত্রে এটি যে কার্যকরী হ'য়েছে—সে ইঙ্গিত পুরাতনের চিন্তাধারার নূতন রূপ। রাস্না মূলজ বিষ, তার একটি শক্তি তাতেই নিহিত আছে কিনা তাও আশু অনুসন্ধান করতে হবে, ব্লাড্‌প্রেসারটি প্রকৃতপক্ষে শোণিতজ মূর্ছা রোগ, সেই মূর্ছা রোগের উৎস যখন মলীভূত শোণিত, তখন সেই শোণিতেই বিষক্রিয়া ঘটে বলেই এই ভেষজ তাকে উপশমিত করে।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz., rauwolscine, reserpine, serpentine, deserpidine. (b) Sterols viz., betasitosterol, gama sitosterol. (c) Fatty alcohols.

সর্পগন্ধা

গোলা বুদ্ধি ও গোলা বিদ্যের অনেক দোষ, এই ধরুন—আমাদের দেশে একটা প্রখ্যাত প্রবাদ আছে যে—

'হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ'

এই শ্লোকটার অর্থ করে আমরা বলে থাকি—দুধে জলে মিশিয়ে দিলে হাঁস (হংস) নাকি দুধের অংশটা খায় আর জলটা পড়ে থাকে, এর পণ্ডিতি ব্যাখ্যা হ'লো—জলের সংগে মাটি গুলে দিলে সে জলটুকু শুষে নেয়, মাটি পড়ে থাকে। এই বক্তব্যের মধ্যে হংসকে খুঁজলে দেখা যায় এই হংস মানে সূর্য (যজুর্বেদ), সুতরাং গোড়াতেই গলদ। সেই রকমই এই 'সর্পগন্ধা' নামের ক্ষেত্রটিতে।

আমার বৈদ্যক জীবনের প্রথমাঙ্কে মনে ক'রেছিলাম এই গাছটার কোনও অংশে কি সাপের গন্ধ আছে? নাকি সাপ এ গন্ধ সহ্য ক'রতে পারে না? নাকি ভালবাসে? আমিও যে প্রথম জীবনে এ বোকামি করিনি তা নয়, গোখ্‌রো সাপকে রাগিয়ে তার মুখের কাছে এই গাছের মূল ধরতেই সে কামড়ে ধরলো, সুতরাং এই সর্পগন্ধা নামটি দেওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য কি, সে সন্ধান পাওয়া গেল না।

আজ উত্তর বয়সে এই নামটি অনুশীলন ক'রতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, এখানে গন্ধ শব্দের অর্থ হিংসা অর্থাৎ সাপকে যে হিংসা করে। আর তাকে হিংসা করার অর্থই হলো—তার বিষক্রিয়াকে হিংসা করা। এর আর একটি নাম 'সর্প-সুগন্ধা' অর্থাৎ সাপের বিষের ক্ষেত্রে উত্তমরূপে যে হিংসা করে। এখন এই ভেষজটি যে জন্য আমরা ব্যবহার করছি তা' কেন করছি, তার বিজ্ঞানটাই বা থোকায়, সেইটা প্রমাণ করতে গেলে ধান ভানতে গিয়ে শিবের গীত গাওয়ার মত গাইতে হয়। আর না গাইলেও এর

লজিক্যাল ফ্যালাসিটা কোথায় এবং কতটাই বা বিজ্ঞান-ভিত্তিক, সেটা বোঝানো যাবে না, তাই বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে চলে যাচ্ছি।

এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ একে প্রধানভাবে ব্যবহার করছেন ব্লাড-প্রেসারের ক্ষেত্রে, অবশ্য তার বীর্য-বিশেষকে (পার্ট অব প্রোটেন্সি) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশন ক'রে। আর ভারতীয় বৈদ্যক সম্প্রদায় ব্যবহার করেন উন্মাদের ক্ষেত্রে তার সমগ্র মূলাংশ। কিন্তু দু'জনের লক্ষ্যই উন্মার্গগামী বায়ুকে দমিত করা। ব্লাড-প্রেসারের সিস্টোলিক প্রেসার এটাতে নামিয়ে দেয় এবং উন্মাদের ক্ষেত্রে সেই উচ্ছ্বসিত বায়ুর বিকার অর্থাৎ তার উন্মার্গগামিতাকে দমিত করা, সুতরাং সেখানে দোষ অংশ বলতে বিকারগ্রস্ত বায়ুই।

এখন প্রশ্ন এসে পৌঁছচ্ছে যে, এর সঙ্গে সাপের কি সম্পর্ক—এ তথ্যের সন্ধান বৈদ্যক-সম্প্রদায়গণ জানতেন কিন্তু চিরাচরিত রীতিতে গোষ্ঠী-গুপ্তির রক্ষণশালিতার জন্য হয়তো বা প্রকাশ্যে গোচরীভূত হয়নি। কিন্তু এটা যে উন্মাদ ব্যাধিকেও দমিত করতে পারে—এ প্রচারটা করেছেন পাটনার হাসান ইমাম ছায়েব। আর এটি যে ব্লাড-প্রেসারের কাজে লাগানো যাবে—এ তথ্য দিয়েছেন তদানীন্তন কালের কলিকাতার দু'জন খ্যাতনামা চিকিৎসক।

প্রাচ্য বৈজ্ঞানিকদের সমীক্ষায়

এ'দের মতে সর্পগন্ধার দুই ভাগ—একটির নাম নাকুলী, অপরটির নাম গন্ধনাকুলী। শ্লোকটি হচ্ছে—নাকুলী-গন্ধনাকুলী চ—নাকুলী সর্পগন্ধাচ সুগন্ধা রক্তপত্রিকা ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে সর্পগন্ধাই নাকুলীর অপর একটি নাম। আর শ্লোকের শেষে আছে সর্পাক্ষী গন্ধনাকুলী। সর্পাক্ষী নামের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় যখন এই গন্ধনাকুলীর বীজগুলি পাকে, দেখতে অবিকল সাপের চোখের মত হয়। মাধবকরের পর্যায় মুক্তাবলীতে রাস্নার দু'টি নাম—নাকুলী ও গন্ধনাকুলী (তখনকার প্রচলিত নাম "বিষমুঙ্গরী")। মাধবকরের মতে এর নয়টি পর্যায়বাচী নাম। তাদের মধ্যে সর্পগন্ধা ও সর্পাদনী—এ দু'টি নামও ক্রিয়াবাচক।

সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৩৭ অধ্যায়ে এবং বাগ্‌ভটের সূত্রস্থানের ১৫ অধ্যায়ে অর্কাদি বর্গে রাস্নার উল্লেখ এবং চক্রদত্তের জ্বর চিকিৎসায় রাস্নার উল্লেখ। চরকে উন্মাদ রোগাধিকারে (মহাপৈশাচিক ঘৃতে) এর ব্যবহার করা হয়েছে।

সর্পগন্ধা, সর্পাক্ষী, সর্পাদনী প্রভৃতি যে কয়টি এর শব্দপর্যায় সেগুলির অনেকগুলি ক্রিয়াকারিত্বের এবং কতকগুলি আকৃতি পরিচায়ক। তা'ছাড়া অনেক সময় শব্দার্থ ও শব্দ-তাৎপর্যে জ্ঞানের অভাব থাকলে বৈদিক নামের ভেষজগুলির পরিচয় লাভ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। যেমন সর্পগন্ধা—সর্পাণাং বিষস্য গন্ধঃ—এর অর্থ আপাতদৃষ্টিতে সাপের বিষের গন্ধ বোঝালেও আসলে এখানে গন্ধ শব্দের অর্থ হিংসা। আর একটি শব্দ সর্পাদনী—'সর্পবিষং অদ্যতে অনয়া'—এর অর্থ যে ভেষজ সাপের বিষকে ভক্ষণ করে অর্থাৎ নষ্ট করে। এর আর একটি নাম সর্পাক্ষী, যা এর স্বরূপ পরিচয় জ্ঞাপন করে—'যস্য বীজং সর্পস্য অক্ষিরিব' অর্থাৎ যার বীজ সাপের চোখের মত। এই কথাটির সামঞ্জস্য দেখা যায় গন্ধনাকুলীর (Rauwolfia canescens Linn.) বীজের ক্ষেত্রে।

রাজনিঘণ্টুর ৬ষ্ঠ বর্গে রাস্নার ২১টি পরিভাষা এবং ৩টি প্রকার ভেদ—একটি মূল-রাস্না, একটি পত্র-রাস্না, একটি তৃণ-রাস্না। এই মূল-রাস্নাই নাকুলী ও গন্ধনাকুলী। গুণের বর্ণনায় বলা হয়েছে—'নাকুলী তুবরা তিক্তা কটূষ্ণাচ ত্রিদোষজিৎ। ভোগীলূতা-বৃশ্চিকাখু—বিষজ্বর ক্রিমি—ব্রণান্।' ভোগী শব্দের অর্থ সাপ, লূতা (মাকড়সা), বৃশ্চিক (বিছা), আখু (ইন্দুর)—প্রভৃতির বিষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

> 'নাকুলী যুগলং তিক্তং কটূষ্ণঞ্চ ত্রিদোষনুৎ।
> অনেক-বিষবিধ্বংসি কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠং দ্বিতীয়কং॥'

অর্থাৎ নাকুলী ও গন্ধনাকুলী উভয়েই তিক্তরস-সম্পন্ন, কটু, উষ্ণ ও ত্রিদোষনাশক। এটি বহুপ্রকারের বিষকে নষ্ট করে, তবে গন্ধনাকুলী কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ।

পরিচিতি

এ দুটি ওষধি Apocynaceae ফ্যামিলীভুক্ত। নাকুলী অর্থাৎ সর্পগন্ধার বোটানিক্যাল্ নাম Rauwolfia serpentina, এটির বাংলায় চলতি নাম ছোট চাঁদড় আর উর্দুতে বলে ইস্‌রোল এবং গন্ধনাকুলীর বর্তমান নাম Rauwolfia tetraphylla, এটাকে বলা হয় বড় চাঁদড়। বর্তমানে নব্য বৈজ্ঞানিক বলছেন যে, বড় চাঁদড় less toxic,

অথচ কয়েকশত বৎসর পূর্বে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন, তাই তাঁরা বলেছেন—ছোট চাঁদড় অপেক্ষা বড় চাঁদড়ের মূল কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ।

ছোট চাঁদড়ের গাছগুলি সাধারণতঃ ২।৩ ফুট উচ্চতায় দীর্ঘ হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ৩।৪ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতেও দেখা যায়, গাছে বিশেষ শাখা-প্রশাখা হয় না। পাতাগুলি দেখতে অনেকটা মালতীফুলের গাছের পাতার মত, কিন্তু পত্রাগ্র একটু সরু ও লম্বা। পুষ্পদণ্ডে অল্প গুচ্ছবদ্ধ গোলাপী ফুল হয়, পুষ্পাধি টকটকে লাল, বীজগুলি প্রথমে সবুজ, পরে পাকলে বেগুনী কালো হয়, বীজগুলি প্রায় ক্ষেত্রে জোড়া হয়। মূলগুলি দেখতে মোটা, প্রায় ১/১½ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ও ভঙ্গুর। মূলের রঙ ধূসর পীতবর্ণের। এর মূল চেনার উপায়—কাঁচা মূলের গন্ধ কাঁচা তেঁতুলের মত। বড় চাঁদড়ের গাছগুলি ৪/৫ ফুট লম্বা হয়, কাষ্ঠগর্ভ মূল। শাখায় তিনটি ক'রে পাতা বিন্যস্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে চারটি পাতাও হয়ে থাকে। এটার মূলের গন্ধও অবিকল কাঁচা তেঁতুলের গন্ধ। ঔষধার্থে ব্যবহার হয় গাছের মূল।

আর একটা কথা, এ সম্পর্কে অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পে ৩।১১।২৭ সূক্তে একটি তথ্য পাওয়া যায়, সেখানে বলা হ'য়েছে—

> ধন্বানি সর্পাদনী সহস্র যোজনেষু অর্হন্তী অধঃ ক্ষ্মাচরী নাকুলী
> বিষং অঘবদ্ স্তনুষবমীঢ়।

ভাষ্যকার সায়ণ বলেছেন—

> সর্পাদনীং স্তৌতি, ত্বং
> "ধন্বানি সহস্র যোজনেষু অধঃ ক্ষ্মাচরী নাকুলী বিষং মঘবদ্
> স্তনুধবমীঢ়।"

এটির অর্থ হ'লো সর্পাদনী লতার প্রশংসা ও স্তুতি—'তুমি সহস্র যোজনে বিস্তৃত হও, ধন্ব দেশে জন্মগ্রহণ ক'রে ধরণীর অধোভাগে প্রবেশ ক'রে নকুলের বিষ গ্রহণে সাহায্য কর।

তবে এ ক্ষেত্রে একটি বক্তব্য হ'চ্ছে এটি ধন্বন্ দেশে জন্মে; এই নিবন্ধোক্ত ওষধিটি অথর্ববেদোক্ত এই গাছ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রাখে।

এখানে আর একটি কথা জানিয়ে রাখি—অনেকের মতে এই গাছটির একটি পর্যায় নাম নকুলেষ্টা থাকায় এটা কি মনে হয় না যে সর্পদষ্ট নকুল (বেজি) আত্মরক্ষার জন্য এর মূলকে ইষ্টজ্ঞান করে? এটির বোটানিক্যাল্ নাম Ophiorrhiza mungos Linn. ফ্যামিলি Rubiaceae, একে Ichneumon plant- ও বলে; এটি দক্ষিণ-ভারতে খুব বেশী পাওয়া যায়, তবুও এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। যা হোক্ আমার বক্তব্য বিষয় প্রচলিত সর্পগন্ধা সম্পর্কে।

এখন প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, এটি সর্পবিষের হিংসা করে, এ কথার তাৎপর্য কি?

এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হ'লো, দর্বী সাপে (যাদের ফণা আছে তাদেরই দর্বী বলা হয়; এই দর্বীর অর্থ হাতা, যার ফণা দেখতে হাতার মত। কেউটে, গোখ্‌রো এই পর্যায়ের সাপ), কামড়ালে হৃদ্‌যন্ত্রে অসম্ভব বায়ুর চাপ সৃষ্টি হয়, যার ফলে রক্তের তঞ্চন ক্রিয়া অসম্ভব বেড়ে যায়, সেইটাই হয় হৃদ্‌যন্ত্রের বন্ধের কারণ; সেইজন্য এই বায়ুর চাপজনিত তঞ্চন ক্রিয়াকে সংযত ক'রতে এই সর্পগন্ধার মূল বাটার সরবৎ

খাওয়ানো হ'তো; যার দ্বারা চিকিৎসা করার সময় পাওয়া যেতো। এও কিন্তু সেই বায়ুর ঊর্ধ্বগতিকে দমিত করার পদ্ধতি। এই হেতু তার সর্পগন্ধা নামকরণ।

বাংলার চিকিৎসা জগতের দুটি উদিত সূর্য মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত কবিরাজ গণনাথ সেন ও ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় একযোগে এই মূলটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ ক'রেছিলেন (১৯৩০)। তাঁদের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত ক'রছি—'ইহা অত্যন্ত উত্তেজনানাশক ও নিদ্রাকারক, ইহার মূল চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সুনিদ্রা হয় ও উন্মত্ততার হ্রাস হয়। ইহার উপক্ষার (Alkaloid) হৃৎপিণ্ডের উপর অবসাদক ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং রক্তবহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাগুলিকে বিস্ফারিত করিয়া থাকে। এই ক্রিয়ার জন্য এই ঔষধটির ব্যবহারের দ্বারা রক্তের স্রোতে বাহিত বায়ুর চাপ কমিয়া যায়।'

এর মাত্রা সম্বন্ধে ব'লেছেন—নিদ্রাকারক মাত্রা ১৫—২০ গ্রেণ অর্থাৎ ১ গ্রাম-সওয়া গ্রাম মাত্রায়। রক্তগত বায়ুর বৃদ্ধিতে ৫ গ্রেণ মাত্রায় দিনে একবার প্রয়োজন হ'লে বায়ুর আধিক্যে দুইবার দেওয়া হয় দুধ ও চিনি সহ।

তাঁরা আরও লিখেছেন যে, সকলপ্রকার মনোবিকারে (Insanity) ইহা ফলদায়ক হয় না। শরীর দুর্বল ও নিস্তেজ বোধ হ'লে এবং মানসিক অবসাদজনিত রোগে (Melancholy) সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। বিশেষতঃ low ব্লাড্-প্রেসার রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

পূর্বে উন্মাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার সময় ৫।৭টি গোলমরিচ বাঁটা এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হ'তো। হয়তো এর উদ্দেশ্য সর্পগন্ধার অবসাদ আনা দোষটাকে সে অনেকটা কাটিয়ে দেয়, যেহেতু গোলমরিচ হৃদ্‌বলকারক, উষ্ণগুণবিশিষ্ট ও উত্তেজক।

সর্বশেষে আমার একটা বক্তব্য রেখে এই বনৌষধি নিবন্ধের উপসংহার ক'রছি।

ক্ষেত্র বিশেষে এই মূল সাময়িক ও সীমিতভাবে ক্ষতিকারক নাও হ'তে পারে, কিন্তু রক্তগত বায়ুর গতিকে দমিত করার জন্য অনেককে দীর্ঘদিন এই মূলকে রূপান্তরিত আকারে ব্যবহার ক'রে যেতে হচ্ছে জীবনের আশু বিপত্তি রক্ষার জন্যে; কিন্তু তারই ফলস্বরূপ কালে বিপর্যয় ডেকে আনছে কিনা বৈজ্ঞানিকগণের আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ক্ষেত্র আছে বলে মনে করি।

কারণ দুষ্টু ছেলেকে ঘেরা জায়গায় বন্ধ ক'রে রেখে দিলে সে বেরুতে না পেরে নীচের মাটিটাই যে খুঁড়বে না, এ কথা না ভাবাই ভাল।

CHEMICAL COMPOSITION:

(a) Alkaloids viz., ajmaline, ajmalinine, ajmalicine, serpentine, serpentinine, isoajmaline, neoajmaline, rauwolfine. (b) Other basic constituents. (c) Oleoresin, serposterol.

রুদন্তিকা

এই গাছটি সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভে বৃক্ষজগতের সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্কের মৌল সংহতি-সূত্র কোথায় এবং জন্ম-বৈচিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক কি, ঋষিচিন্তা-প্রসূত সেই মৌল সূত্রটা জানাই।

পশ্চিম পাঞ্জাবে যদি থানকুনি (Centella asiatica) না পাওয়া যায় তাতে তার ভৈষজ্য গুণটি অস্বীকৃত হয় না অথবা চব্বিশ পরগণায় যদি জটামাংসী (Nardostachys jatamansi) না পাওয়া যায় তাতেও জটামাংসীর ভৈষজ্যগুণ হারায় না; দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় আখরোটের গাছ চেষ্টা ক'রলেও হ'তে চায় না, এবং আপেলও হয় না, তেমনি কাশ্মীরে গেলে সেখানের কোথাও তুলসীর গাছ (Ocimum Sanctum) দেখা যায় না অথবা গোল মরিচের (Piper nigrum) লতাও নজরে পড়ে না; এর কারণ অবশ্যই মেনে নিতে হয় সেই সুশ্রুত সংহিতার (সূত্রস্থান ৩৫—৪১ অধ্যায়) কথা; কোন দেশ জাঙ্গল, কোন দেশ আনূপ, কোন দেশ মরু বা ধন্বন, কোনটি বা সাধারণ দেশ। প্রতি দেশেরই বৈশিষ্ট্য আছে, সে বৈশিষ্ট্য মৃত্তিকাপ্রধান, তারপর ভূখণ্ডের অবস্থান ভেদে সূর্যের তাপ বিকিরণের তারতম্যে জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ গুণের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যও কি জীবজগৎ কি বৃক্ষজগতের শরীরের ও প্রকৃতির গঠনের পরিবর্তন ঘটায় সুতরাং উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচারও স্থানীয় ভূশক্তির প্রাধান্য নিয়ে, সুশ্রুতে তাই বলা হ'য়েছে—

> "তত্র পৃথিবী অপ্-তেজো-বায়ু-আকাশানাং সমুদয়াৎ দ্রব্যাভি-
> নিবৃত্তিঃ উৎকর্ষস্বভি ব্যঞ্জকো ভবতি।

অর্থাৎ এই পৃথিবীই ইঙ্গিত করে সকল দ্রব্যকে, কোন দ্রব্য ক্ষিতি-প্রধান, কোনটি জল-

প্রধান, কোনটি বায়ু-প্রধান আর কোনটি বা আকাশ-প্রধান। কারণ পৃথিবীর অবস্থান ব্যঞ্জনার দ্বারাই দ্রব্য সমূহের স্বভাব প্রকৃতির নিষ্পত্তি।

আর এই জন্যই প্রতিটি ভেষজও প্রতিটি মানবের জন্য পৃথক পৃথক গুণ প্রকাশ করে। এছাড়া আছে কাল এবং বয়সে ঋতুর পার্থক্য থাকায় এই পার্থক্য সৃষ্টি করে।

এ সম্পর্কে চরক সংহিতার একটি উক্তি—

"যস্য দেশস্য যো জন্মি তজ্জং তস্য ভেষজম্।"

অর্থাৎ যে রোগ যে দেশে জন্মে, ভেষজও তার আশেপাশে থাকে। সেই যুগে ওষধীয় চিন্তায় ভারতবর্ষকে চারিটি ভাগে ভাগ করা হ'য়েছিল, সে সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া পরবর্তীকালে আরও দুটি অঞ্চলকে প্রাধান্য দেওয়া হ'য়েছে। একটি হৈম দেশ, দ্বিতীয়টি পার্বত্য দেশ। পূর্বেই উল্লেখিত হ'য়েছে যে, দেশভেদে কি জীবজগৎ কি বৃক্ষজগৎ, এ দুই-এর প্রকৃতিগত তারতম্য ঘটে; যার জন্য রোগের ও

ভেষজের বৈচিত্র্যও দেখা যায়; অতএব জলাসন্ন দেশের গাছ মরু দেশে হওয়া সম্ভব নয়। আলোচ্য বনৌষধিটি কিন্তু হৈম এবং পার্বত্য দেশজাত। এই গাছটি সম্পর্কে অথর্ববেদ বা অথর্বসংহিতায় এর উল্লেখ দেখা যায় না; এমনকি আমাদের সংহিতাগ্রন্থ চরক সুশ্রুতেও এই নামীয় কোন ভেষজের উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র এটির উল্লেখ দেখা যায় সপ্তদশ শতকের বনৌষধির গ্রন্থ রাজনিঘণ্টুতে।

সেখানে বলা হয়েছে—

> চনপত্রং সমপত্রং ক্ষ্ুপশৈচব তথাকৃতি।
> শৈশিরে জলবিন্দুনাং শ্রবন্তীতি রুদন্তিকা।

অর্থাৎ ছোলা গাছের মত গাছ ও পাতা, শিশিরকালে এর পাতা থেকে জলবিন্দু ঝ'রতে থাকে।

পরিচিতি

এটি সাধারণতঃ হিমালয়ের সন্নিকটে বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া গেলেও বর্তমানে এটি দুর্লভ বলা যেতে পারে। এখনও পাওয়া যায় উত্তরাখণ্ডের গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ও কেদারনাথের শিখরাঞ্চলে ৯—১৩ হাজার ফুট উঁচুতে। এটি দেখা যায় সাধারণতঃ যে সব অঞ্চলে বরফ পড়ে; এ ভিন্ন হিমাচল, কাশ্মীর, শিমলা, গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের পার্বত্য অঞ্চলেও বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে সব অঞ্চলে বরফ পড়ে সেসব অঞ্চলের ছোট গাছগুলির পাতা প্রায়ই রোমশ; এই সব ক্ষুপ জাতীয় গাছের রোমশ পাতাগুলি শিশিরকণাকে ধ'রে রাখে; সূর্যোদয়ের পর এই শিশিরকণা বিন্দু বিন্দু ঝ'রতে থাকে। তবে এটাও ঠিক যে অঞ্চলে এই রুদন্তিকা গাছ জন্মে, সে অঞ্চলের সব ছোট গাছের পাতা প্রায়ই অল্প রোমশ। ঠাণ্ডা সহ্য করার জন্যই এটা প্রকৃতির দান।

এই গাছটির বর্ণনার ক্ষেত্রে তাকে অবলম্বন ক'রে এর এই কাব্যিক রুদন্তিকা নামকরণ; সুতরাং সমতল ভূমিতে এ নামের সার্থকতা সম্ভবও নয়।

নিবন্ধোক্ত রুদন্তিকা আকারে ও সাদৃশ্যে ছোলা গাছের (Cicer arietinum) মত, কাণ্ড ছোট ও সরু, পাতা ঘন, ছোট ৩।৪ ইঞ্চি নালে পুষ্পমঞ্জরী হয়, এটি গোল ছোট, ঘন সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ফলও খুব ছোট লম্বাটে, বহিরাবরণের মধ্যে থাকে এক একটি কোষে ৩।৪টি বীজ, এটির সংগ্রহকাল আগষ্ট থেকে অক্টোবর অর্থাৎ বরফ-গলা থেকে বরফ-পড়া পর্যন্ত। বৎসরে মাত্র একবার সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এই গাছটির বোটানিক্যাল্ নাম Astragalus leucocephalus Garh. ফ্যামিলি Leguminosae.

এই গাছের আর একটি প্রজাতি আছে—তার নাম Astragalus candolleanus. এটা সাধারণতঃ ১০—১৩ হাজার ফুট উঁচুতে জন্মে, এর ফুলগুলি হলদে।

রুদন্তিকা মুশকিলের আসান

এই সব গাছপালা সংগ্রহকালে উচ্চতায় অক্সিজেনের অভাবহেতু একটু শ্বাসকষ্ট হ'তে থাকে, তখন আমরা এই গাছের মূল চিবিয়ে খাই; এর দ্বারা আমাদের ঐ অসুবিধেটা আর হয় না। এর মূলগুলি কিন্তু একটু পিচ্ছিল।

এই তথ্যটি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের হিমাচল প্রদেশস্থ বনৌষধির সার্ভে অফিসার (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) মিঃ এ, সি, দে মহাশয়।

গুণাদি বর্ণনা—রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বলা হ'য়েছে—

> কটুতিক্তোষ্ণা, ক্ষয়ঘ্নী, কৃমিঘ্নী, রক্তপিত্তঘ্নী, মেহঘ্নী, জরাব্যাধি হরত্বাৎ রসায়নী।

অর্থাৎ এটি রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, মেহ ও কৃমিরোগনাশী, আর নিঘণ্টুকার তার গুণ সম্পর্কে লিখেছেন—কটু-তিক্ত ও উষ্ণগুণ সম্পন্ন।

এর গুণ সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে—এটি বায়ু ও তেজগুণসমৃদ্ধ অর্থাৎ এটি শ্লেষ্ম-জনিত রোগ নিরাময়কারক; আর উষ্ণগুণান্বিত হওয়াতে সে কৃমি ও মেহরোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছে। আর স্বাদে তিক্ত হওয়াতে স্বভাবতঃই এটি কফ-নাশকারী আকাশধর্মীগুণের আধার।

দ্রব্যগুণ বিচারে দেখা যায় যে, শ্লেষ্মবিকারজনিত ক্ষয়রোগে তার ভূমিকা হ'তে পারে অসাধারণ।

রোগ-প্রতিকারে লোকায়তিক ব্যবহার

ঐ অঞ্চলের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগে সমগ্র ভেষজচূর্ণ ১—৩ গ্রেণ পর্যন্ত মাত্রায় প্রত্যহ একবার বা দুইবার দুধ ও মধু মিশিয়ে খেতে দিয়ে থাকেন। তবে আধ গ্রেণ থেকে সুরু ক'রে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দুই বা তিন গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার ক'রে থাকেন এবং আবার আস্তে আস্তে কমিয়ে তার ন্যূনতম মাত্রায় নেমে আসেন। আর এই ঔষধ ব্যবহারকালে আহার্য ও পথ্য হিসেবে দুধ-রুটি ও দুধ-ভাতের ব্যবস্থা আর অলবণ আহারই ব্যবস্থা। এক মাসের মধ্যে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়; এবং স্বাস্থ্যও ভাল হয়।

বিশেষ ইঙ্গিত

Glossary of Indian Medical Plants নামক পুস্তকে রুদ্রবন্তী ব'লে যে গাছের উল্লেখ আছে—সেটির বোটানিক্যাল্ নাম Cressa cretica Linn. ফ্যামিলি Convolvulaceae. রাজনিঘণ্টুতে উক্ত আছে—ওষধিটি স্বাদে তিক্ত—এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই কোন্‌টি আয়ুর্বেদোক্ত রুদন্তিকা সেটা নির্ণয় করা সমীচীন; তবে এটা ব'লতে পারা যায়, গ্লোসারিতে উক্ত রুদ্রবন্তী গাছটি তিক্ত নয়। এটি অভিজ্ঞের মত।

তিথিভেদে খাদ্যে বাছ-বিচার কেন?

দেহ ও মনকে সুস্থ রাখতে হলে খাদ্যের প্রয়োজন; খাদ্যের প্রতিক্রিয়ার শক্তিতে মনের বল বাড়ে, যদিও মনের সুস্থতার জন্য বাইরের পরিবেশেরও সুস্থতার প্রয়োজন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিশ্ব-বিজ্ঞানেরও মত আছে, প্রথমটির ক্ষেত্রে তা নেই।

প্রথম ক্ষেত্রে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের অভিমত—শরীরের প্রয়োজনে যেসব 'ভিটামিন' বা 'খাদ্যপ্রাণের' বিশেষ আবশ্যক, সেইসব ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ যেসব খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে আছে, তা গ্রহণ করলে শরীর সুস্থ থাকবে। এখানে মনের প্রসঙ্গে তাঁরা নীরব।

এক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের বক্তব্য—প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যে পাঞ্চভৌতিক (ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম) গুণরাশি বিদ্যমান, তা পাঞ্চভৌতিক দেহের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ এবং সেই পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যের স্থূলাবয়বের মধ্যে ত্রিদোষের (বিকারগ্রস্ত বায়ু-পিত্ত-কফের) বিচার করার উপাদান রয়েছে; অর্থাৎ ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে দ্রব্যের শক্তির উপচয় (বৃদ্ধি) বা অপচয় (হ্রাস) যেমনি ঘটে, তেমনি ঘটে প্রতিনিয়ত দিবা-রাত্রির মধ্যে চন্দ্র-সূর্যের শক্তিরও ব্যাপক প্রসার এবং অপসার। এটি বিশ্বের সর্বত্র অবিরত ঘটছে। মনেরও স্বাভাবিকতা এই প্রকৃতি-নির্ভর।

যেসব খাদ্যের দ্বারা প্রাণী জীবনধারণ করে এবং যেসব খাদ্যের অভাবে প্রাণীর জীবন-বিয়োগ হয়, সেখানেও বায়ু, চন্দ্র এবং সূর্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং উভয় ক্ষেত্রেই আবরক (ক্রিয়াশালী) ও আবৃত (বিকারগ্রস্ত) হয়েই কাজ করে।

খাদ্যের মধ্যেও এই দু'টি ক্রিয়া ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তাই আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে—দেহের সঙ্গে খাদ্যের প্রাণশক্তিতে তিথির শক্তিক্রিয়া। তিথি মানে যে আসে, থাকে এবং যায়। অত্+ইথিন্ অর্থাৎ কাল বা সময় চন্দ্র ও সূর্যের প্রভাবের মাধ্যমেই আসে, থাকে ও যায়। বায়ু তো সর্বদাই রয়েছে। সে চন্দ্র-সূর্যের প্রভাবের মাধ্যমেই আসে, আর

বায়ু তাদের ক্রিয়াকে গতিশালী ক'রে দেয়। চন্দ্রের শৈত্য-ক্রিয়াই হোক্, আর সূর্যের তীক্ষ্ন-ক্রিয়াই হোক্—এগুলি কখনো আবরক আবার কখনো বা আবৃত; এই খেলাই চলছে অহরহ—জগতের বস্তুর মধ্যে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে খাদ্য বস্তুগুলির উপর বায়ু চন্দ্র আর সূর্যের ক্রিয়াকে পরিলক্ষণ ক'রে আর্যসংহিতাকারগণ বিচার ক'রে দেখেছেন—বস্তু আর তার সংযোজন যদি সমান হয়, তবে উভয়ের সংযোজনে সাম্য হলেই ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয়, অসাম্য হলেই হ্রাস হয়।

তাই ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের সর্বজনীন ক্রিয়ার সঙ্গে তিথি বিচারের সামঞ্জস্য করার বিধানটা ভিন্নমুখী। সূর্য ও চন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেহ ও বস্তুতে কতখানি—এই দৃষ্টান্ত কিন্তু ভিটামিন তত্ত্বের সঙ্গে ঐক্যসাধনের পৃথক্ দৃষ্টিকোণ।

সূর্যের প্রভাব আপাতঃদৃষ্টিতে স্বাধীন মনে হলেও চন্দ্রের প্রভাব সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ও ভারতীয় ঋষিগণ এ ব্যাপারে একমত যে, চন্দ্রের মধ্য দিয়েই আমরা সূর্যের প্রভাবকে ভোগ করি। যদি তা না হতো, তবে সূর্যের প্রচন্ড দাহ্য শক্তিতে সবই অগ্নিময় হয়ে যেতো, কোন প্রাণশক্তির অস্তিত্বই থাকতো না। আবার চন্দ্রের প্রভাব স্বাধীন হলে সবই জলময় হতো। অতএব উভয়েই উভয়ের সহায়ক। সুতরাং দেহে ও খাদ্যে উভয়ের প্রভাবই বিকার ও আরোগ্যের এবং পুষ্টি ও ক্ষয়ের কারণ। বায়ু ও কাল কিন্তু স্বাধীন হলেও এটিকে অতিক্রম করে ক্রিয়াবত্তা প্রকাশ করতে পারে না।

শুক্লা ও কৃষ্ণা প্রতিপদে প্রকৃতি ও দেহের মধ্যে কফধাতু বলবান হওয়ায় লবণ রসের আধিক্য ঘটে। কফের প্রত্যক্ষ আস্বাদও লবণাক্ত। এর জের উভয় পক্ষের দ্বিতীয়াতেও থাকে। এই জন্যই প্রতিপদে ও দ্বিতীয়ায় চালকুমড়ো খাওয়া নিষিদ্ধ, কারণ চালকুমড়ার রসে ও বীর্যে ক্ষারের প্রাধান্য থাকলেও ঐ দু'টি তিথিতে কফধাতু যখন লবণাক্ত হয়ে বৃদ্ধি পায়, তখন তার সঙ্গে যদি আর একটি ক্ষার-প্রধান দ্রব্যের সংযোগ ঘটে, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। আর দেহে রুক্ষতা, ক্ষারপ্রাধান্য ও লবণাক্ত ভাব যখনই দেখা যায়, তখনই ব্রণ, চুলকণা, খোস-পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি ব্যাধিগুলি দেহের মধ্যে স্থান পায় এবং এর জের দীর্ঘদিন থাকে। যেহেতু চালকুমড়ায় ক্ষার আছে —এটা প্রমাণিত সত্য, সেইহেতু শুক্লা ও কৃষ্ণা প্রতিপদ ও দ্বিতীয়ায় চালকুমড়া খাওয়া নিষেধ। এ নিষেধের অর্থ—হিতকর, অর্থাৎ হিতকারিত্বই বিধেয়।

তৃতীয়ায় পটোলের নিষেধ

উভয় পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পিত্তধাতু ও বায়ু পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত উষ্ণ হয় এবং কুটিল গতিতে শরীরে সঞ্চারিত হয়; তার ফলে শরীরের রক্ত উষ্ণ হয়। এদিকে পটোল উষ্ণবীর্য এবং সে রক্তে উষ্ণতা আনে, সেইহেতু ঐ তিথিতে পটোল খেলে দ্রব্যের ও প্রকৃতির স্বভাব একই হবে এবং এজন্য বাতরক্তের পীড়া হবে। বাতরক্ত স্বভাবতঃই কষ্টদায়ক পীড়া এবং শোথের ও চুলকণার কারক। তাই স্বভাব সাম্যে তৃতীয়ায় পটোল খাওয়া নিষেধ।

চতুর্থীতে মুলার নিষেধ

চতুর্থী তিথিতে কফ ও পিত্ত ধাতু রুক্ষ হয় এবং তার সঙ্গে বায়ুও কুপিত হয়; যার ফলে মলাধার থেকে অনিয়মিতভাবেই মল-নিঃসরণের কারণ ঘটে এবং তাতেই আমাশয় রোগটি জন্ম নেয়। যেহেতু অ-কাঁচ মুলা আমকারক, মলরোধক, বায়ুবৃদ্ধিকর,

রুক্ষ এবং পিত্ত ও কফের ক্রূরতা আনে, সেহেতু মূলার স্বভাবের সঙ্গে এই তিথির স্বভাবের মিল আছে। ফলে এই তিথিতে মূলা খেলেই শরীরের পক্ষে তা ক্ষতিকর, আমের উদ্ভবেরও আশঙ্কা থাকবে।

পঞ্চমীতে পাকা বেলের নিষেধ

স্বাভাবিক কারণেই পঞ্চমীতে পিত্তবৃদ্ধি হয়, তাই এই তিথিতে পিত্তকর দ্রব্য ত্যাগের উপদেশ, বিশেষ ক'রে পাকা বেল। কাঁচা অবস্থায় এটি যেমন খুবই হিতকর, পাকা অবস্থায় তেমনি ক্ষতিকর। তাই শাস্ত্রকারগণ কাঁচা বেলকে অমৃতের সঙ্গে এবং পাকা বেলকে বিষের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে এ তিথির স্বভাবই হচ্ছে পেটের দোষ, হাত-পা জ্বালা ইত্যাদি ঘটানো, আর তাতে যদি পাকা বেলের সংযোগ ঘটে তো আর কথাই নেই, তাই এত বিধি-নিষেধ। এখানে বিল্ব নিষিদ্ধ নয়, পক্ক বিল্বই নিষিদ্ধ।

ষষ্ঠীতে মাষকলায়, দই, পুঁইশাকের নিষেধ

স্বভাবধর্মবশতঃ এ তিথিতে শিরায় শিরায় শ্লেষ্মধাতুর কোপ বৃদ্ধি পায়; তাই শৈত্যকর দ্রব্যমাত্রেরই ভোজন নিষিদ্ধ; তাতে শিরাস্থিত শৈত্য রসের স্বাভাবিক বৃদ্ধি আর বাড়তে পারে না। এজন্য যাঁদের গৃধ্রসী, গেঁটেবাত, কোষ বৃদ্ধি প্রভৃতি শৈত্য-প্রভাবযুক্ত রোগ আছে, তাঁরা তো এগুলি খাবেনই না; পরন্তু অপরেও না।

সপ্তমীতে তাল-নারিকেল-মৎস্যের নিষেধ

তিথি অনুসারে স্বাভাবিকভাবেই এ তিথিতে শরীরস্থ রক্ত ও পিত্ত ধাতুর একইসঙ্গে তারল্য দেখা যায়। এদিকে দ্রব্যের বিচারে তাল-নারিকল ও মৎস্য রক্তধাতুকে দ্রুত তরল ক'রে দেয় এবং সেজন্য রক্তধাতুর গাঢ়তা নষ্ট হয়। সুতরাং এই তিথিতে উপরিউক্ত নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি খেলে অজীর্ণ, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত প্রভৃতির রোগীরা তো কষ্ট পাবেনই, যাঁদের এসব রোগ নেই, তাঁদেরও সাবধান থাকা উচিত।

অষ্টমীতে লাউ-মৎস্য-নারিকেল নিষিদ্ধ

অষ্টমী তিথিতে স্বভাবতঃই অগ্নিমান্দ্য, পক্বাশয়ের দুর্বলতা, রক্তের সঞ্চার মৃদু হয়। যেহেতু লাউ-নারিকেল-মৎস্য-মাংস স্বভাবতই অগ্নিমান্দ্যকর, সেহেতু এই তিথিতে এগুলি খেতে না বলাটা যুক্তিযুক্ত। অগ্নিমান্দ্যের রোগীরা তো খাবেনই না; সুস্থ লোকেদের বেলায়ও নিষিদ্ধ।

নবমীতে লাউ-কলমীশাকের নিষেধ

এই নবমী তিথিকে সন্ধি তিথি বলা হয়, কারণ উভয় দিকের প্রকৃতি-বিকারই তাতে সমন্বিত থাকে। এই তিথি থেকেই প্রকৃতির গতি এমন পরিবর্ধিত হয় যে, একেবারে প্রতিপদ পর্যন্ত তার প্রতিটি অবস্থাই পর পর বৃদ্ধির পথে থাকে। এ

তিথিতে বায়ু প্রকুপিত হয়, শ্লেষ্মধাতুর বৃদ্ধি হয়। লাউ ও কলমী শাকের মধ্যে বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্য যেহেতু দেখা যায়, সেহেতু এই তিথিতে তা খাওয়া উচিত নয়।

দশমীতে কলমীশাক নিষিদ্ধ

দশমী তিথিতে পিত্তধাতু ক্রূর হয়, সেটিতে বায়ু চালিত হয়ে অজীর্ণ, অম্ল, জ্বর প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে। এজন্য এই তিথিতে মলসংগ্রাহক দ্রব্য ভোজন করতে শাস্ত্রের নিষেধাজ্ঞা। সেইজন্য দশমীতে কলমীশাক খাওয়া নিষেধ, কারণ এটি যেমন মল রোধ করে, তেমনি মলের পরিমাণ ও মলে বায়ু বৃদ্ধি করে।

একাদশীতে শিম-অন্ন-শাকের নিষেধ

একাদশীতে রসধাতুর বৃদ্ধি এবং শ্লেষ্মার ক্রূরতা হয়, সেইসংগে বায়ুম্বারা রক্তের ক্ষোভ হয়। সেইজন্য একাদশীতে শিম, অন্ন (গম-যব-ডালও অন্ন), শাক প্রভৃতি খাওয়া নিষিদ্ধ। একাদশীর উপবাস নিরম্বু নয়; তবে ফলাদি, দুধ এবং ছানা, ঘৃতপক্ক দ্রব্য অল্প মাত্রায় খেলে রসধাতুর বৃদ্ধি হয় না।

দ্বাদশীতে পুঁই, মৎস্য, গুরুপাকদ্রব্য নিষিদ্ধ

তিথির নিয়মানুসারে এই তিথিতে বায়ু কুপিত হয়ে রক্তের গতি মৃদু ক'রে দেয় এবং ধমনী, শিরা, স্নায়ুতে গিয়ে নানাপ্রকার বাত-বিকারের সৃষ্টি করে। এই তিথিতে এমন দ্রব্য খেতে নেই, যাতে তিথির স্বাভাবিক স্বভাব বেড়ে যায়। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায়—এই তিথিতে ব্লাড্-প্রেসার প্রকাশ পায়। আয়ুর্বেদে এই রোগটি শোণিতজ মূর্ছা ব'লে আখ্যায়িত। এই জন্যই এই তিথিতে পুঁই, মৎস্য, গুরুপাক দ্রব্য ইত্যাদি খেতে মানা।

ত্রয়োদশীতে বার্তাকুর নিষেধ

ত্রয়োদশীতে বায়ু মৃদু হয় কিন্তু রক্তের গতি প্রবল হয়। তাই এ তিথিতে রক্ত-সম্পর্কযুক্ত পীড়ার বৃদ্ধি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই এই তিথিতে বার্তাকু অর্থাৎ বেগুন খাওয়া নিষেধ। যদিও প্রাচীন আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে—বেগুনের সাতটি গুণ, তাহলে হবে কি, এটি যে উষ্ণবীর্য। তাই ত্রয়োদশীতে শুধুমাত্র বেগুন নয়, সর্বপ্রকার উষ্ণবীর্য দ্রব্যেরই ভোজন নিষিদ্ধ।

চতুর্দশীতে মাষকলাই, ডাল, তিক্ত দ্রব্যের নিষেধ

চতুর্দশীতে বায়ুর গতি স্বাভাবিক রুদ্ধ হয়, বিশেষ ক'রে অপান বায়ুকে রুদ্ধ করে; পেটের মধ্যে স্তব্ধতা আনে। যাঁদের উদরে বায়ুর পীড়া প্রায়ই হয়, তাঁদের পক্ষে এই তিথিটিতে মাষকলাই ডাল, তিক্তদ্রব্য খাওয়া উচিত নয়। বায়ুকর দ্রব্যমাত্র থেকেই,

বিশেষভাবে এগুলি থেকে সাবধান হওয়া একান্ত কর্তব্য। তাই এগুলি এ তিথিতে নিষিদ্ধ ভক্ষ্য।

পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় অগ্নিমান্দ্যকর, কফবর্ধক ও গুরুপাক খাদ্যের নিষেধ

পূর্ণিমায় চন্দ্রের পূর্ণ রূপ আর অমাবস্যায় চন্দ্রের কলা লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় পূর্ণিমা অপেক্ষা অমাবস্যায় বেশী। তবে রসবর্ধক শক্তির উচ্ছ্বাসের কারণ হয় তার দু'টি রূপেই। এই সময় রস-রক্তাদি শরীরস্থ সর্বধাতুরই স্ফীতি হয়। এই জন্যই এই দু'টি তিথিতে বায়ু বৃদ্ধিকর কোন খাদ্যই শরীরের পক্ষে অনুকূল নয়; রস-প্রধান রোগের বৃদ্ধি করে। এতে মন্দাগ্নি, পরিপাক দৌর্বল্য, কফোৎপত্তি হয়ে থাকে বলেই এই দু'টি তিথিতে অগ্নিমান্দ্যকর, কফবর্ধক খাদ্য বর্জনীয়। এই দু'টি তিথিতে উপবাসের কঠোরতাকে না মেনে লঘুপাক দ্রব্যের মধ্যে যার যেটি সাত্ম্য বা অভ্যস্ত দ্রব্য, তাই আহার করা যুক্তিসঙ্গত উপায়।

এইসব ক্ষেত্রে চরকের উপদেশ খুবই চমৎকার। তিনি বলেছেন—দেশ, ঋতু, তিথি বিচার করবে; বয়সের, দেহের ও অগ্নির বল বিচার করবে; তারপর হিতকর, পরিমাণমত এবং সময়মত অভ্যস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণ করলে মানবের রোগ হবে না।

আমাদের দেশে আয়ুর্বেদ কোন প্রাদেশিক মানুষের জন্য রচিত হয় নাই; এমন-কি কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্যও না। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে কোন দেশের মানুষের পক্ষে এই যুক্তিসঙ্গত হিতকর উপদেশটি বিজ্ঞানসম্মত বলেই সেখানে গৃহীত হয়েছে। খাদ্য-বিজ্ঞানে তার প্রাণ-বিজ্ঞানটাই সব নয়। প্রাণের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং দেশ-কাল-ঋতু প্রভৃতির সঙ্গে তার হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়াটা যে স্বাভাবিক—এ জ্ঞানটুকুও আহরণ করতে হয়। আয়ুর্বেদ সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের জন্যই সৃষ্টি, এটি বিশেষ কোন একটি দেশের জন্য নহে।

রোগ ও পথ্য

ব্যবহারিক দ্রব্যগুলি যেমন নিরপেক্ষ নয়, কালের স্বভাবও তেমনি আপেক্ষিক। সুতরাং দ্রব্য এবং কাল নিয়ে যখন ব্যবহারিক প্রকৃতি, তখন সেও নিরপেক্ষ নয়, কারণ গুণ, ক্রিয়া এবং সত্তা এই প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে বলে। তাই চিকিৎসককে রোগ, রোগী, কাল, বয়স এবং দেশের ধর্মকে বিচার ক'রতে হয়। এই বিচার করাটা চিকিৎসকের কাজ। তা ছাড়া রোগীর নিজের অবস্থা তো নিজের পক্ষে বিচার করা সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গেই বলি, আয়ুর্বেদে সাত্ম্য ব'লে একটা কথা আছে; আপনার যে দেশে জন্ম তার কাল ও জলবায়ুর সঙ্গে অন্য দেশের পার্থক্য তো আছে, তাই দেশ কাল বয়স সব কথাই বিচার ক'রে রোগীর পথ্যাপথ্য চিকিৎসককে নির্বাচন ক'রতে হয়। যেমন ঠাণ্ডা দেশের লোকের স্নেহপ্রধান দ্রব্য তাদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় না, কিন্তু উষ্ণপ্রধান দেশে সেটা বেশী খেলে তার শরীরে সহ্য হয় না, কোন না কোন রোগ সৃষ্টি করবে। অতএব সেটা তার পক্ষে সাত্ম্য নয়।

এই সাত্ম্য কথাটা আরও সোজা ক'রে বলি—মনে করুন মাতৃগর্ভ থেকে যার ছাতুর নাড়ী হয়ে গেছে, তার পক্ষে ছাতুতে শরীর বা পেট খারাপ হয় না, আর আমার মত ভেতো বাঙ্গালী যদি এটা রোজ খায় তা হলে আমাশা হবেই; তাই বলছি প্রথম থেকে যেটায় যে অভ্যস্ত সেইটাই তার সাত্ম্য। এ তো গেল দেহের সাত্ম্য-বিচার—এইবার প্রকৃতির সাত্ম্যবিচারের কথা বলি—গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যদি রোজ পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, আখরোট খেতে থাকি তা হ'লে 'কাল' তার বিরুদ্ধে লেগে অতিসার ধরিয়ে দেবে, অথচ এটা শীতপ্রধান দেশে খেলে কিছুই হবে না। সুতরাং পথ্যের ব্যবস্থা দিতে গেলে সেখানকার আবহাওয়ারও বিচার করার প্রয়োজন।

তাই তাঁরা বলেছেন যেটা একজনের পথ্য—সেটা আর একজনের অপথ্য; সুতরাং সার্বজনিক পথ্য অপথ্য বিচারের একটা অসুবিধেও হ'য়ে পড়ে, তবে এটা বলছি না যে

অতিসার হ'য়েছে কিন্তু ঠাণ্ডা দেশ বলে তাকে লুচি খেতে দিতে হবে।

প্রকৃতি বিচার

এইবার ধরুন, যেমন আমি আর গাছ অথবা যে কোন দ্রব্যই হোক, আমাদের মৌল উপাদানের তফাৎ নেই—সেই পাঁচটি মহাভূত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই থেকেই আমাদের উদ্ভব। তবে এই পাঁচটি মৌল উপাদানের একের অপরের সংযোগ বিয়োগে, তার তারতম্য ঘটলেই তার রূপ ক্রিয়া সবই বদলায়। আসলে আমরা প্রকৃতির যমজ সন্তান, আমাদের আছে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অন্তশ্চেতনা ও বহিশ্চেতনা দুই-ই, আর বৃক্ষজগতের আছে কেবল মাত্র নিরীন্দ্রিয় অন্তশ্চেতনা।

এখন প্রশ্ন হ'লো—এই যমজ ভাই, কি ক'রে সে আমাদের উপকার বা অপকার করে?

এইবার বৈদ্যের ভাবভাষার কচ্‌কচানিতে আসতে হচ্ছে, সেটা সেই বায়ু, পিত্ত কফ।

এখন বায়ু কি?—এটাকে সোজা কথায় ব'লে দিই—একটা বন্ধ ঘরে বসে কথা কইলে সেটা আপনার কানে যায় না কিন্তু ওঘরে যে বাতাস নেই তা নয়, সেটি সেখানে স্তব্ধ হ'য়ে আছে; আবার পুকুরে ডুব দিয়ে কথা কইলে পুকুরের ওপারে ডুব দিলে শোনা যায়, সুতরাং দুই অণু বা পরমাণুর মধ্যে যে স্থান, সেখানে তো বায়ু রয়েছে। সেই রকম দেহের প্রতিটি স্তরে এই বায়ুর চলাচল অহরহ চ'লছে। এখানে একথা বলে রাখি—আয়ুর্বেদের সংগ্রহ পুস্তকে একটি শ্লোক আছে—

পিত্তং পঙ্গুঃ কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ।
বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র গচ্ছন্তি মেঘবৎ।

অর্থাৎ পিত্ত এবং শ্লেষ্ম ধাতু এদের কোন চলৎ শক্তি নেই, বায়ু তাদের যেখানে টেনে নিয়ে যায়, তারা সেইখানেই উপস্থিত হয়। কোন জায়গায় আগুন লাগলে আমরা দেখি তাপ পেয়ে হওয়া ছুটছে, সেই রকম দেহের যে তাপ সেই ওকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, আর এই আগুনের তাপ সৃষ্টি ক'রছে আমাদের খাদ্য। দেহস্থ এই আগুনের পারিভাষিক নাম পিত্ত। পিত্ত আমাদের কয়েকটি জিনিস দিয়ে চ'লেছে —ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রুচি, সৌন্দর্য, মেধা, দৃষ্টি প্রভৃতি পিত্তের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

এইবার শ্লেষ্মা ধাতু সম্পর্কে বলি—আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে—নাক মুখ দিয়ে গড়গড় ক'রে বেরুচ্ছে এই বুঝি আয়ুর্বেদের কফ। না, তা নয়, ওটা বিকারপ্রাপ্ত শ্লেষ্মা ধাতু। দেখুন মটরের ইঞ্জিনে যদি মবিল্ অয়েল্ না থাকে তা হ'লে ইঞ্জিনটা যেমন জ্বলে যাবে, সেই রকম যদি এই কফ বা শ্লেষ্মা ধাতু আপনার আমার শরীরে না থাকতো তা হ'লে পিত্তের দাহে ও বায়ুর চাপে আপনি ম'রে যেতেন। সুতরাং এই জলীয় অংশটাই দেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। এইটাই আপনার আমার শরীরকে সুস্থ রেখে জীবন ধারণ করাচ্ছে। এই তিনের সমন্বয়ে দেহ ধারণ করি ও চলি। এই শ্লেষ্মা ধাতু আমাদের দান ক'রছে দেহের স্থূলাংশ, এবং বাহ্যতঃ আসছে স্নিগ্ধতা ও কোমলতা।

এই শ্লেষ্মা ধাতুর প্রথম কাজ আমাদের ভুক্তদ্রব্যকে পাকস্থলীতে পিণ্ডাকার তৈরী ক'রে দেওয়া, তার পরের ক্রিয়া পিত্ত ও বায়ুর। এদের যার যে কাজ, সেটা ক'রে গেলেই আমরা নীরোগ, আর একজন বিগড়ে গেলে অন্যেরও কাজের বিশৃঙ্খলা। সেটাই আমাদের রোগ।

যারা বায়ুপ্রধান—

তাদের প্রকৃতিটা রুক্ষ এবং দেহটা কৃশ হবেই। এরা ঘুমুতে চাইলেও ঘুম কম হবে, অথবা নিদ্রাহীন হয়ে কাটাতে বাধ্য হবে। কথা বেশী ব'লতে ইচ্ছে ক'রবে। দেহের শিরাগুলি শীঘ্র দেখা দেবে। এরা হঠাৎ উত্তেজিত হয়, ভীতও হয়। অনুরক্ত ও বিরক্তও হয়, সবই হঠাৎ হঠাৎ। এদের স্মরণশক্তি কম, চঞ্চল বুদ্ধি, চঞ্চল গতি, চঞ্চল দৃষ্টি—অর্থাৎ সবই এঁদের ছট্‌ফটে। এরা বেশী শীত সইতে পারে না। মুখ প্রায়ই শুকিয়ে যায়। প্রস্রাব সাদা প্রায়ই হয় না। জল বেশী খেলে হয়। ঘুমে স্বপ্ন বেশী দেখে। ওড়ার স্বপ্নই বেশী দেখে।

এদের পক্ষে উপযোগী খাদ্য

মিষ্টি, অল্প টক, অল্প লবণরস বিশিষ্ট খাদ্য আর দই, দুধ, ঘোল, ঘি; তৈলাক্ত দ্রব্য, মাখন এবং গরম দুধ, গমের রুটি, তা ছাড়া তিলের নাড়ু, গুড় ও গুড়ের জিনিস, আপেল, আঙ্গুর, আতা, আনারস, পাকা আম, কিস্‌মিস্‌, খেজুর, তরমুজ, নারিকেল, দাড়িম, ফলসা, বৈঁচি প্রভৃতি।

এদের পক্ষে অনুপোযোগী খাদ্য

তিক্ত ও কষায় দ্রব্য, ঝাল, বেশী মধু, লঘু (মুড়ি, বিস্কুট, পাঁউরুটি. যবের ছাতু, ছোলার ছাতু), শাক, ভারি মাংস, মুগ, মসুর, বা অড়হর, মটর, ছোলার গাঢ় ডাল, উচ্ছে, কাঁকরোল, বরবটী, শিম, কচু, ঢ্যাঁড়শ। কেবলমাত্র নটে, কলমী ও সুষ্‌নী ছাড়া আর সব শাক, গাজর, পাকা বেল, জাম, তালশাঁস।

বিহারেও এগুলি অনুচিত

বেশী কথা বলা, বেশী পরিশ্রম করা, বেশী পথ হাঁটা, রাত জাগা, উপবাস, তর্ক ও কলহ।

পিত্তপ্রধান ব্যক্তিদের প্রকৃতি

পিত্তপ্রধান ব্যক্তিরা বেশী তাপ বা গরম সহ্য ক'রতে পারে না; এদের ঘাম বেশী হয়, ঠাণ্ডা খোঁজে বেশী, এদের হাতের ও পায়ের তলায়, চোখে জ্বালা বেশী হয়। সারা শরীরে একটা গরম বা উষ্ণতা থাকেই সর্বদা, এরা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত বেশী হয়। এদের চুল বেশী কাল হয় না, শরীরে লোম কম হয়; অল্প বয়সেই টাক প'ড়ে আসে, অভিমানপ্রধান এদের মানস প্রকৃতি, অল্প কারণেই এদের চোখ লাল হয়, এদের শরীরে কোথাও না কোথাও একটা চুলকানির অবস্থার ক্ষেত্র থাকে। এদের শরীরের এখানে সেখানে তিল চিহ্ন বেশী হয়। এদের পিত্তপ্রধান প্রকৃতি ব'লেই মুখের আস্বাদ অল্পতেই তিক্ত হয়, প্রস্রাবও একটু হ'লদে রংএর হয়, ঘামে দুর্গন্ধ হয়, স্বপ্ন দেখে রাগারাগি হ'চ্ছে, মারামারি হ'চ্ছে, ফুলের বাগানের স্বপ্নও তারা দেখে, আবার উল্টোপাল্টাও দেখে এবং সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে যায়।

পিত্তপ্রধানদের উপযোগী খাদ্য

মিষ্টি জিনিস, অল্প তিক্ত, কষায়, ঘৃত, মাখন, ছানা, মুগ, মটর, অড়হর, ছোলা ও কড়াইএর ডাল, এ ভিন্ন খেসারির ডাল খাওয়া চলে।

মাছের মধ্যে—শিঙ্গী, মাগুর, কই, শোল এবং পুকুরের মাছ।

তরকারী হিসেবে—পটোল, পলতা, ডুমুর, টাট্‌কা ও পাকা ফল, কচি ডাবের জল।

পিত্তপ্রধানদের অনুপযোগী আহার ও বিহার

অসময়ে খাওয়া, ঝাল, টক, বেশী লবণ, তীক্ষ্ম দ্রব্য অর্থাৎ ভাজাপোড়া, তিলের তেল, মাখনযুক্ত দইএর ঘোল, টক ফল, গরম গরম খাবার বা চা প্রভৃতি। ঝিঙে, পানিফল, লাউ—তা ছাড়া দই, রসুন, পেঁয়াজ, হিং, সরষে বাটা, বেশী টক লেবু, কুল, পান ও বাসি জল।

শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তিদের প্রকৃতি

এই প্রকৃতির ব্যক্তি সাধারণতঃ ধীর স্বভাবের হয়। চেহারাটা একটু ভারী, অল্পতেই ঘুমুতে ভালবাসে, অল্পতেই আলস্যে আক্রান্ত হয়, বিশেষ খাওয়াদাওয়া নেই অথচ মেদ বেড়েই চ'লেছে, এরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় বেশী কাতর হয় না। শ্লেষ্মার বিকার হ'লেও এদের পরিপাক শক্তি কম হয় না, মুখে সর্বদা মিষ্টাস্বাদ অনুভব করে, মিষ্টি জিনিস বেশী পছন্দ করে। হাত-পায়ের তলার চামড়া বেশ নরম হয়, পা ঠোঁট প্রায় ফাটে না, এদের স্বপ্নে পুকুর, নদী, জলা বেশী থাকে।

কোন্ কোন্ জিনিসে কফপ্রধান প্রকৃতির লোকের আকর্ষণ বেশী

এদের স্বাভাবিক প্রকৃতিতে যদিও মিষ্টি, টক্, লবণ এবং গুরুপাক আহার্যে টান বেশী থাকে তা হ'লেও ঐ সব খাদ্যে এদের শ্লেষ্মার প্রকোপই বাড়ে।

এদের মাছ, মাংস, গমের রুটি, কড়াইএর ডাল, দই, দুধ, পায়েস, গুড় প্রভৃতি জিনিস বেশী প্রিয়। সব রকম মিষ্টি ফল এদের ভাল লাগে, এই সব মিষ্টি জিনিস বেশী খেলে এদের ক্ষতিই হয়। শ্লেষ্মাপ্রাধান্য জনিত রোগে আক্রান্ত হয়। দিবা-নিদ্রা এদের পছন্দ বেশী কিন্তু এটাতে ক্ষতিও বেশী হয়।

এদের পক্ষে সব রকম মাছ খাওয়া, তিক্ত কষায় রস বিশিষ্ট দ্রব্য, ঝাল (আদা গোলমরিচ পিপুল, চই প্রভৃতি) তবে বোয়াল, শিঙ্গী, ইলিশ, ভেট্‌কী, সিলেট্, আড়, বেলে, খয়রা, বাচা, পাঁকাল, মাছের ডিম, যে কোন রকম লবণজলের মাছ এদের পক্ষে খাওয়া ক্ষতিকর হয়। এই প্রকৃতির লোকের অল্প সিদ্ধ হাঁসের ডিম ভাল, তবে যাদের এলার্জি, অথবা একজিমা, হাঁপানী, হাত-পা ঘামা থাকে—তাদের খাওয়া অনুচিত। কূর্ম অর্থাৎ কচ্ছপের মাংস ও মুরগীর মাংস ভাল। পায়রার মাংস এদের পক্ষে অপথ্য। এই যে প্রকৃতি ও সাত্ম্য বিচার ক'রে পথ্যের ও অপথ্যের ব্যবস্থা লেখা হ'লো এটা রোগীর নিজের বিচারের জন্য নয়, চিকিৎসককে তাঁর রোগীর অবস্থা বিচার ক'রে পথ্য নির্বাচন ক'রে দিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হ'লো এই পথ্য গ্রন্থে জ্বর চিকিৎসার পথ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হ'চ্ছে কেন? তার উত্তরে বলা যায়, যদিও জ্বর আসে অনুগামী হ'য়ে, তথাপি অগ্রগামী হিসেবে ধ'রে নেওয়ার পক্ষে কারণ এই—তাপ সৃষ্টির উৎস পিত্ত, জ্বরের সঙ্গে সে অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে, যেমন অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি অবিচ্ছিন্ন সেই রকমই; অতএব শরীরগত তাপ বা উষ্মা সেই পিত্তটি যদি কোন আভ্যন্তর অথবা

বাহ্য কারণে বিকারগ্রস্ত অথবা আহত হয়, তখন সেই উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে বহির্মুখী হয়, সেই কারণেই রসরক্তাদির অগ্নিটি (Metabolism) বিকারগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে, সুতরাং চিকিৎসার ও পথ্যের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য তাকে অন্তর্মুখী ক'রে স্বস্থানে নীত করা, তাই অনুগামী হ'লেও তাকে চিকিৎসক সম্প্রদায় অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই তো চরক সংহিতায় উক্ত হয়েছে—

'সর্বরোগাগ্রজো বলী', অর্থাৎ বলবান জ্বর সর্বরোগের অগ্রজ।

জ্বর বললেই যদি আমরা থার্মোমিটার বগলে দিয়ে বিচার করি, তা হ'লে আয়ুর্বেদের চিন্তার ধারায় ভুল হবে। কারণ অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, শ্বাস, কাস, মূত্রাতিসার, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, পক্ষাঘাত, শূল প্রভৃতির ক্ষেত্রে অগ্নিক্রিয়া কিন্তু মন্দীভূত থাকবেই। এখানে কিন্তু ধাতুগত (রসাদি সপ্তধাতু) অগ্নিক্রিয়া বিকারগ্রস্ত, তাই পিত্ত উৎক্ষিপ্ত, এর (অর্থাৎ রসাদি ধাতুর) অগ্নিবল স্বস্থানগত ক'রতে পারলেই তবেই তো রোগ সারবে, নইলে রোগ লক্ষণের চিকিৎসা ক'রে লাভ কি? এর সঙ্গেই কিন্তু পথ্য ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, একটিকে বাদ দিলে শুধু আর একটিতে হবে না; সুতরাং সব সময়ে জ্বর মানেই তাপ নয়, এখানে অগ্নিবল। এই হেতু জ্বরের পথ্যটাই প্রথমে বলা হলো। এই পথ্য সম্বন্ধে কতকগুলি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রও থাকে—যেমন শ্লেষ্মা জ্বরে ঠাণ্ডা জল পথ্য নয় কিন্তু বায়ুপ্রধান জ্বরে সেটা পথ্য। আবার পিত্তজ্বরে ও অজীর্ণে শীতল ঝর্ণার জলও তো অপথ্য। কিন্তু ঐ শীতল জলই আবার উদাবর্তে ও পুরানো জ্বরে পথ্য, এইভাবে প্রতিটি দ্রব্যের মধ্যে তো হিতাহিত ব্যবস্থা অবশ্য রয়েছে, এটার বিচার করা চিকিৎসকের কাজ। এই রকম রোগের তরুণাবস্থা, মধ্যাবস্থা এবং জীর্ণাবস্থায় কালসাপেক্ষ পরিবর্তন করা দরকার হয়।

নব জ্বরে

কোন কষায় রস, দিবানিদ্রা, দুধ, ঘোল, ঘি, মিষ্টরস, ডাল বা মাছ খাওয়া অহিতকর। এ ভিন্ন পূর্বদিকের বাতাস লাগানো ও বেশী চলাফেরা অনুচিত। আবার পুরানো জ্বরের ক্ষেত্র বিচার করে এগুলিই আবার উপকারী হয়।

জ্বরের মধ্যাবস্থায়

পুরোনো চালের ভাত, কচি বেল, সজিনার ডাঁটা, ছোট উচ্ছে, কচি বেতের ডগা, পটোল, কাঁকরোল, কচি মূলা, মুগ, মসূর ও ছোলার ডালের যূষ। মুগের ডালের সঙ্গে পলতা বা শিউলি পাতা বেটে ওটা গুলে নিয়ে, তাওয়ায় সেঁকে মুড়মুড়ে করে বড়া, লাজামণ্ড—এটি তৈরী করার নিয়ম ২৫ গ্রাম আন্দাজ গোটা মুগ সিদ্ধ ক'রে, ফেটে গেলে, ওর সঙ্গে ২৫ গ্রাম সাদা খৈ দিতে হবে; এই দুটি গ'লে গেলে, ওটা পাত্‌লা গামছায় ছেঁকে ঐ মণ্ডটা নিতে হবে, তাইতে অল্প লবণ মিশিয়ে খেলে সুপথ্যও হ'লো এবং এটা জ্বরের উপশামকও বটে। তা ছাড়া বেতো শাক, ছোট নটেশাক, কিসমিস, দাড়িম, ফলসা, আপেল, পাকা ন্যাসপাতি, কচি পানিফল, কুলথ কলাইএর যূষ, এগুলি উপকারী।

পুরানো জ্বর বা ঘুস্‌ঘুসে জ্বরের পথ্য

এ সময় ছোট মুরগীর মাংসের যুষ, অল্প ঘি; আমলকীর মোরব্বা, কুমড়োর মিঠাই বা মোরব্বা, খোব্বানী, দুই/চারটি আখরোট, ঘি বা মাখন মাখানো সেঁকা পাঁউরুটি, দুধ, পাহাড়ী ঝরণার জল, হরীতকীর মোরব্বা, কচি বেগুন, নটে, সুষ্‌ণী ও পালং শাক, কাঁচা পেঁপে, লাউ, পলতা, কাঁচা কলা, বেগুন, লাল আলু এই সব তরকারি, এবং মশলা হিসেবে ধনে ও জীরে, তবে ভাজা জিনিস ভাল নয়, এমন কি মুড়ি পর্যন্তও না।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সর্বপ্রকার জ্বরে অপথ্য ও কুপথ্য—সর্বপ্রকার ভাজা জিনিস, তেল ঘিএ পাক করা জিনিস, টক ঝাল প্রভৃতি ফল হিসেবে তরমুজ, কলা বেরুনো ছোলা ও মুগ, পোস্ত বাটা, পিঠে-পুলি, শাকপাতার তরকারী, পেঁয়াজ, রসুন, মুলো। আতা, নারিকেল এগুলি ভাল নয়, এ ভিন্ন স্নান করাও ভাল নয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে বাত-পিত্ত জ্বরে অথবা পেটের দোষ র'য়েছে এমন জ্বরে অথবা তীব্র জ্বরে ভুল বকা আছে, সে ক্ষেত্রে শীতল জলে মাথা ধোয়ালে উপকার হয়। তবে মনে রাখতে হবে শ্লেষ্মাকর খাদ্য খাওয়া, সর্দি থাকলে স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় থাকা, জলো হাওয়া খাওয়া, তা ছাড়া নূতন মধ্য ও পুরাতন জ্বরে যেগুলি অবস্থা বিশেষে পথ্য ধার্য করা হয়েছে সেগুলিও ভাল নয়।

এই জ্বরের পথ্য প'ড়ে বর্তমান চিকিৎসক সম্প্রদায় নিশ্চয় মনে ক'রবেন যে, এভাবে খেয়ে আধমরা হ'য়ে থাকা কি পথ্যের ব্যবস্থা? পূর্বে যেটা বলা হ'লো এটা তো চরকীয় ধারার ব্যবস্থা। এইবার এই আয়ুর্বেদের মৌল চিকিৎসার অন্তিম যুগে রস-তান্ত্রিকদের গুপ্ত মন্ত্রটা বলি—

> ন দোষাণাং ন রোগাণাং ন পুংসাং চ পরীক্ষণম্।
> ন দেশস্য ন কালস্য কার্য্যং রস চিকিৎসিতে॥
> (রসতরঙ্গিণী)

অর্থাৎ রসচিকিৎসায় (পারদ, গন্ধক) বিষ ঘটিত ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা ক'রলে বয়স, কাল, দেশ বা অন্য কোন হেতুর অপেক্ষায় রোগীর পথ্যাপথ্য বিবেচনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। এটা যুগের হাওয়া পাল্টে যাওয়ার পর নিশ্চয়। বর্তমান যুগের ভাবনাটা আজ থেকে এক হাজার বৎসর পূর্বেই তাঁরা ভেবেছিলেন।

আয়ুর্বেদ মতে জ্বরের অন্তর্নিহিত কারণ যখন অগ্নিমান্দ্য, জ্বরাবসানে যদিও সে স্বস্থানগত কিন্তু তখনও সে হীনবল, তাই তাকে বেশ কিছুদিন অগ্নির বলাধান বাড়ানোর জন্যে হিসেব ক'রে চলতে হয়, এখানে অনবধানতা বশতঃ সে অভিভাবকের বা চিকিৎসকের ভ্রান্তিতে অথবা অপথ্যের কারণজনিত পুনরাক্রমণ হয়, তাতেই অতিসার কারণ হয়, তাই এখানেই বলা হ'লো জ্বরাতিসার।

জ্বরাতিসার (জ্বরের সঙ্গে পেটের দোষ)—এখানে চিকিৎসক উভয় সংকটে পড়েন, যেমন বলা যায় 'জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ', জ্বর ছাড়াতে গেলে, পেট পরিষ্কার, আবার সেদিকেও সামাল্ সামাল্, তাই চিকিৎসক হন নাজেহাল তার পথ্য ব্যবস্থা দিতে। এ ক্ষেত্রে যবের মণ্ড, শঠীর পালো, কচি ডাবের জলে সিদ্ধ ক'রে পুরানো চালের ভাত, শিশুর ক্ষেত্রে এইটাকে চট্‌কে মণ্ড ক'রে দেওয়া, কাঠখোলায় ভাজা চিড়ের ভাত বা মণ্ড, অথবা মুগ, মসুর বা অড়হর ডালের যুষে ভাজা চিঁড়ে বা খই সিদ্ধ করে দেওয়া, এখানে লবণ দেওয়া চলবে না, একটু চিনি দিতে হবে। অথবা

খইএর মণ্ডে ছাগলের দুধ মিশিয়ে দেওয়া, মুখে অরুচি থাকলে অল্প একটু কয়েৎ-বেলের শাঁস একটু চিনি মিশিয়ে দেওয়া যায়।

এ ক্ষেত্রে তরকারী দেওয়া যায়—কচি মোচা চট্‌কে ছিবড়ে ফেলে কচি কাঁচাকলা বা কাঁচা কাঁঠালী কলা, পাকা জাম, চালতার পাতলা অম্বল, শালুক ডাঁটার তরকারী, কাঁচা গাব, টক বা মিষ্টি ডালিম, কচি বেল পোড়া, আমরুল শাকের চাট্‌নী। মিষ্টি আলু আর মশলার মধ্যে ধনে, জীরে, আদা ও শুঁঠের গুঁড়ো, এগুলি কিন্তু হিতকর, তবে পেটের অবস্থা বিবেচনা ক'রে ব্যবস্থা দিতে হবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি অহিতকর

গরম জলে স্নান, বেশী জল খাওয়া, রাত্রি জাগা, বেশী ধূমপান, কোন রুক্ষ জিনিস, যেমন চাল বা মুড়ি ভাজা, বিস্কুট, পাঁউরুটি প্রভৃতি খাওয়া, কড়াইএর ডাল, যবের বা গমের রুটি, সজিনার ডাঁটা, শিম, মুলো, চালকুমড়ো বা লাল কুমড়ো, কুল আঙ্গুর, কিস্‌মিস্‌, আমলকীর মোরব্বা, রসুন, পেঁয়াজ, পাত্তা শাক, কাঁকুড়, পুনর্ণবা শাক, সরষে, ডিম, পুঁইশাক ও বেতোশাক, গুড়, আখের রস, নারিকেল, দই, পাকা আম।

গ্রহণী—এই রোগটি যে কোন কারণে পেটের দোষ ঘটে গেলে এবং সেটি দীর্ঘদিন চ'লতে থাকলে, পরিণামে এই রোগটি সৃষ্টি হয়। এই রোগটিকে পাশ্চাত্য চিকিৎসার ভাষায় কোলাইটিস্‌ (Cholitis) বলা হয়। এই গ্রহণীরোগ দীর্ঘদিন হ'য়ে গেলে, সে হবে সংগ্রহ গ্রহণী, যাকে পাশ্চাত্য মতে বলা হয় chronic cholitis। এটির বিশেষ লক্ষণ হল দিনের বেলায় দাস্ত কয়েক বারই হবে কিন্তু রাত্রে কোন উদ্বেগ থাকে না।

আয়ুর্বেদ মতে এর তিনটি ভাগ—বাতপ্রধান, পিত্তপ্রধান ও শ্লেষ্মপ্রধান, এর চিকিৎসার সূত্র অগ্নিউদ্দীপক ঔষধ ও পথ্য। এর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ্য মাখন তোলা ঘোল, কয়েত্‌বেলের শাঁস, আমরুল শাকের রস ও দাড়িমের রস, যোয়ান বাটা ও ভাজা হিং এদের তরকারীতে মিশালে উপকার ভাল হয়। এ ভিন্ন খাওয়া যায় কচি বেগুন পোড়া (অল্প), ভাতের আমানি (পুরানো কিম্বা টাট্‌কা), ছাগলের দুধ, গোদুগ্ধের মাখন, টাট্‌কা দই, মসুর ডালের জল, মুরগীর বা ছোট পাখীর মাংস, কচ্ছপের মাংস, পুরানো চালের ভিজে ভাত, মশলার মধ্যে আদা, জীরে, ধনে; আপত্তি না থাকলে বা রুচি হ'লে গুগ্‌লী বা গেঁড়ির ঝোল। জামের জেলি, মাছের মধ্যে থল্‌সে বা মৌরলা মাছ। মোচা, ডুমুর, এগুলি চিবিয়ে ছিবড়ে ফেলে খাওয়া। কাঁচা কলা সিদ্ধ করে ভাজা চিড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে রুটি, শুষ্ক পানিফল গুঁড়ো করে তার রুটি। সুষ্ণী শাক।

এগুলি অপথ্য বা কুপথ্য

পুঁই, পিড়িং, মেথি, পালং এসব শাক, ছাঁচি কুমড়ো, লাউ, ঝিঙে, কচু, ওল, মান, উচ্ছে, শিম, কাঁকুড়, চুবড়ি আলু, সজিনার ডাঁটা প্রভৃতি। ফল হিসেবে পাকা বা কাঁচা আম, পাকা পেঁপে, নারিকেল, শসা, আর মেওয়া হচ্ছে খেজুর, আপেল, ন্যাসপাতি, কিস্‌মিস্‌ প্রভৃতি।

অর্শরোগের পথ্য

এই রোগের পরিচয় অপেক্ষা এ রোগে কোন্ কোন্ দোষের প্রাধান্য থাকে সেটা সংক্ষেপে বলি। এই রোগ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাপ্রধান তো হ'য়ে থাকেই, আরও হয় সান্নিপাতিক, রক্তজ এবং সহজ অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যার হয়। এর চিকিৎসা খুব সরল নয়, সব অর্শই এক ধরণের চিকিৎসায় সারে না, তার পদ্ধতিও ভিন্ন; যেমন ক্ষারসূত্র দিয়ে অথবা শস্ত্রের সাহায্যে বা অগ্নিময় ভেষজ প্রয়োগ ক'রে কিম্বা আভ্যন্তর ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা এর চিকিৎসা হ'তে পারে।

এই সব আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগের মূল লক্ষ্য থাকে বায়ুর অনুলোম করা; জাঠরাগ্নির বল বৃদ্ধি করা।

আর অর্শ হ'লেই যে এক পথ্য হবে তা নয়, কারণ অর্শ আভ্যন্তরও হয় আবার বাহ্যও হয়। সুতরাং পথ্যের পার্থক্য হবে, এ কথার সমর্থন পাই চরকে।

আভ্যন্তরিক অর্শের উপযোগী পথ্য (চরকের মতে)

রসুন, পেঁয়াজ, পুঁইশাক, কুলত্থ কলাই, মসুর, অড়হর, বন মুগ (যাকে মোট বলে) ডালের যূষ, মাখন, তরকারীর সঙ্গে কালো তিল বাটা, আমলকীর বা হরীতকীর মোরব্বা, আখের (ইক্ষু) রস, আখের গুড়, কিসমিস, ফলসা, গাওয়া ঘি, গাওয়া ছানা, আর তরকারির মধ্যে কাঁকরোল, কাঁচা পেঁপে, বেতো শাক, পুরানো চাল-কুমড়ো, পুরানো ওল (অর্থাৎ মাটি থেকে তুলে রাখার ৪/৫ মাস বাদ), পটোল, পলতা (পটোল পাতা), লাউডগা কিন্তু লাউ নয়। কাগজী লেবুর রস (পাতি লেবু নয়), কয়েৎবেল, এই সব জিনিস—আর এদিকে খাওয়া যায় বেগুন পোড়া (ঘি দিয়ে), আদা কুচিয়ে বা শুঠের গুঁড়ো মিশিয়ে টাট্কা ঘোল (তক্র)। এ ভিন্ন বায়ুর অনুলোমকারী যাবতীয় খাদ্য।

অর্শরোগের অপথ্য ও কুপথ্য

ছাগমাংস; যে কোন প্রকার মাছ, পিষ্টক (পিঠে), মাষ কলাইএর ডাল, কাঁচা আম, পালংশাক, বরবটি, হাঁসের বা মুরগীর ডিম, লাল কুমড়ো, বাঁধা বা ফুলকপি, মহিষের দুধ ও দই, শালুক ডাঁটার তরকারি, কচু, চুবড়ি আলু (খাম আলু), এ ছাড়া রক্তপিত্তে লিখিত অপথ্যগুলিও বর্জন করা উচিত। একটা কথা যে—যে যেটায় ছোটবেলা থেকে খেয়ে অভ্যস্ত, এর মধ্যে সেটি থাকলে যতদূর সম্ভব বর্জন ক'রে চলার চেষ্টা করা উচিত, তবে দেখা যায় অভ্যস্ত হ'য়ে প'ড়লে তার সেটায় খুব বেশী ক্ষতি করে না, অন্যে যতটা করে, কারণ সেটা তার সাত্ম্য হয়ে আছে। অর্থাৎ তার শরীর সেটা নিতে অভ্যস্ত। এগুলি তো আমার কথা নয়, প্রাচীন দ্রব্যগুণ বিশারদগণেরই কথা।

অগ্নিবিকার (অগ্নিমান্দ্য)

এই একটি রোগ যেন 'রামধনু'। বৃষ্টি বজ্রপাতের মত তার মৌলিকত্ব নেই, কিন্তু তার রূপ আছে।

আমরা প্রধানভাবে এই তিনটি রূপে তার অভিব্যক্তি দেখতে পাই।

(১) মন্দাগ্নি, এটি কিন্তু শ্লেষ্মাধাতুগত অগ্নি মন্দীভূত হয়ে সৃষ্টি হয়, আবার পিত্তধাতু যখন বিকারপ্রাপ্ত তখন সে সৃষ্টি করে তীক্ষ্ন্যাগ্নি, আর বায়ু যখন বিকারগ্রস্ত হ'য়ে যায় তখনই সৃষ্টি হয় বিষমাগ্নি। আর যখন সবই হীনবল হয়, তখন একটু অসাম্য দ্রব্য আহার করলেই বিপত্তি আসে, একেই বলা হয় সমাগ্নিদোষ; একটি কথা বলে রাখি এই যে, অগ্নিবিকার বা অগ্নিমান্দ্যের ক্ষেত্র সেটি কিন্তু উর্ধ্ব আমাশয়ে (dysentery) প্রায় সব রোগসৃষ্টির উৎসের প্রাথমিক স্তর এই অগ্নিবিকার।

চরকীয় ধারায় চিকিৎসার ব্যবস্থা

মন্দাগ্নির ক্ষেত্রে বমনের ব্যবস্থা, তীক্ষ্ন্যাগ্নির ক্ষেত্রে পিত্তনিঃসারক ভেষজের ও বিরেচনের ব্যবস্থা আর বিষমাগ্নিতে বায়ুর সমতা ফিরিয়ে আনার জন্য অথবা অনুলোম করার জন্য তৈলাদি অভ্যঙ্গের ব্যবস্থা। আর সমাগ্নির ক্ষেত্রে সর্বধাতুর (বায়ু, পিত্ত, কফ) অগ্নিবল, যাকে বলা যায় metabolism বাড়ানো দরকার হয়। তবে এক কথায় বলা ভাল যে যোগ ব্যায়ামের দ্বারা রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করাটাই সর্বোত্তম। কিন্তু উপযুক্ত গুরুর আদেশেই এ সব করা সমীচীন।

এখন পথ্য সম্বন্ধে বলি

খৈ, ভাজা চি'ড়ে বা যবের মণ্ড, মুগের যূষ, ছোট পাখীর মাংস (পায়রা নয়), ছোট মাছের ঝোল, মাছটা অল্প ভাজা অথবা না ভাজা হ'লেই ভাল হয়। শাক হিসেবে হিঞ্চে, শালিঞ্চে, বেতো শাক, বেতের ডগা, কচি মুলো, কাঁচা পে'য়াজ, পুরানো চালকুমড়োর তরকারি, কচি কাঁচা কলা, সজিনার ডাঁটা, পটোল, বেগুন, কাঁকরোল, গাঁদাল পাতা, পলতা, সুষুণী শাক, যবের আটার রুটি, মাখন (অল্প), ভাজা হিং, যোয়ান, আদা, গরম জল, জীরা ও ধনে প্রভৃতি।

কোনগুলি অপথ্য

এ রোগে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে পেট নরম বা পাতলা দাস্ত না হয়।

এ ক্ষেত্রে রাত্রি জাগরণ যেমন ভাল নয় তেমনি দিবানিদ্রাও ভাল নয়। আর ভাল ক্ষিধে (ক্ষুধা) না হ'লে পুষ্টিকর কোন খাদ্যও গ্রহণ করা উচিত নয়। বিশেষ নিষেধ আছে এদের রক্ত মোক্ষণ করা। খাওয়া হিসেবে ব'লতে গেলে কোন মাছই খাওয়া উচিত নয়, তবে দুই/এক টুকরো কই, মাগুর বা শিঙ্গি (পেটের অবস্থা বুঝে) ক্বাথ ক'রে দেওয়া যায়। তারপর ডিম, মাংস এ তো আর কথাই নেই। তরকারির ক্ষেত্রে পু'ইশাক, আলু, পে'য়াজ, রসোন, বরবটি, ওল, কচু, মান, চুবড়ি আলু, লাল বা মিঠে কুমড়ো, কচুশাক, শিম, যে কোন রকম শাক, তেল, ঘিয়ে রান্না যে কোন জিনিস, পিঠে, ক্ষীর, গু'ড়ো দুধ, ছানা, কালজাম, তালশাঁস, মিছরি বা চিনির সরবৎ, ডাবের জল, গাঢ় ঘোল, দই, তা ছাড়া যে কোন মশলা। এগুলিকে কুপথ্য হিসেবে ধরা চলে।

ক্রিমি রোগ

ক্রিমি এই নামকরণটি ব্যাপক অর্থে করা হয়েছে। সে দৃশ্যমান হোক আর

নাই হোক—যে কীটের ক্রিয়াশালিতা আছে সেটাকেই ক্রিমি আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সে দেহের আভ্যন্তরীণই হোক আর বাহ্যই হোক, আর সে দৃশ্যমান বা অদৃশ্য যাই হোক। বর্তমান যুগের ভাইরাস্ (Virus) ও (ফাংগাস্‌কেও) (Fungus) তাঁরা ক্রিমি আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। সেই রকম দেহাভ্যন্তরের মলাশয়েতেও ক্রিমি হয় এবং রক্তাশয়েতেও ক্রিমির উদ্ভব হয়, আবার অন্ত্রেও তো ক্রিমি বাস করে, সেই রকম বাহ্যক্রিমিও আমাদের শরীরের নানাস্থানে বাসা বাঁধে।

বহু রোগ আছে যেটার ক্রিমি থেকে উদ্ভব হয়ে থাকে, যেমন উন্মাদ, অপস্মার (Epilepsy), হৃদ্‌রোগ, অতিসার, আমাশা, গুল্ম পাণ্ডু, শূল, কুষ্ঠ প্রভৃতি।

কি ধরণের পথ্য এদের খেতে দেওয়া উচিত—পুরানো ধানের চালের ভাত, পটোল, বেতের ডগা, রসোন, বেতোশাক, চিতে পাতার সংগে (Plumbago Zeylanica), মুগের ডাল বেটে বড়ি দিয়ে, শুকিয়ে নিয়ে, তরকারির সংগে খাওয়া। (আর একটা কথা দিয়ে সাবধান ক'রে রাখি যে, আমাদের দেশে বেড়ায় যে চিতে হয়, যার পাতা আকারে ছোট লুচির মত সে চিতে নয়); এ ভিন্ন ক্রিমিতে আর এক রকম পাতা মুগের ডালের সংগে বেটে বড়ি দিয়ে, শুকিয়ে, তরকারির সংগে খাওয়া যায়, সেটি হ'লো পারিভদ্র গাছের পাতা, যাকে চল্‌তি কথায় পালুধে মাদারের গাছ বলে। এ ভিন্ন সরষে শাক, কাঁঠালী কলার মোচা, বৃহতীর কাঁচ ফল, নাল্‌তে বা তিতো (তিক্ত) পাট শাক, পলতা, থানকুনী (থুলকুড়ি), তিল তেলের রান্না তরকারি। তবে একটা কথা জানা দরকার ক্রিমি-জনিত কোন রোগ হ'লে সরষের তেল খেতে নেই। তা ছাড়া খাওয়া যায় পাকা তালের মাড়ি (মজা), পান, বনযোয়ান বাটা মিশিয়ে তরকারি, শুল্‌ফো শাক, করলার পাতা, গোল মরিচের ঝাল, ধনে, চই, বক ফুল, সজ্‌নে শাক, কাল কাসুন্দের ফুল, কচি বেগুন, কোয়াস, ডুমুর, থোড়, ছাগল দুধ, এ ভিন্ন ক্রিমিনাশক আহার্য দ্রব্যগুলি।

এ ক্ষেত্রে কোনগুলি অপথ্য

দিবানিদ্রা, সব রকমের পিঠে (পিষ্টক), কড়াইএর ডাল, ডালের বড়া, ডালের বেশন, পাঁপর, ডিম, সবরকম পাতা শাক, মাংস, লাউ, টক দই, পুঁই শাক, টোমাটো, সুজির হালুয়া, তৈলাক্ত বা পাকা মাছ, সব রকমের আচার, বিশেষ ক'রে চিংড়ি মাছ।

পাণ্ডু ও কামলা রোগ (Gaundice)

প্রস্রাব হ'লদে বা চোখ হ'লদে হ'লেই তখন আমরা বলি জণ্ডিস্ হ'য়েছে, আর হাত পা ফ্যাকাশে হ'লেই তবে বলি যে এ্যানিমিয়া (Anaemia) বা পাণ্ডুরোগ হ'য়েছে, তার আগেও অনেক লক্ষণ আসে, তা ছাড়া এমন লক্ষণও ইঙ্গিত দিয়ে দেয় যে এগুলি পাণ্ডুরোগ। এই যেমন অল্পতে ক্লান্তি বোধ, মাঝে মাঝে অরুচি, প্রায়ই পিপাসা, হাসি-কান্নার অল্প উত্তেজনাতেই চোখে জল, যখন তখন ঝিমুনি, বিনা পরিশ্রমে শরীরের যেখানে সেখানে ব্যথা, সব ঋতুতেই দেহ খস্‌খসে; এ সবই পাণ্ডুরোগের লক্ষণ।

যাঁরা এ সব লক্ষণাক্রান্ত তাঁদের প্রথম কর্তব্য হ'লো মাঝে মাঝে মৃদু বিরেচন বা

জোলাপ নেওয়া, যতটা সম্ভব পুরানো চালের ভাত খাওয়া, মুগ, মসুর বা অড়হর ডালের পাত্‌লা যূষ, পায়রা ভিন্ন সব রকমের ছোট পাখীর মাংস, কচি মাছ, হিঞ্চে ও কুলেখাড়া শাক, বেগুন, রসোন পেঁয়াজ, পাকা আম, হরীতকীর মোরব্বা, টাট্‌কা ঘোল, অল্প ঘি বা মাখন (যদিও বর্তমান যুগে সর্বপ্রকার তেল, ঘি জাতীয় জিনিস বর্জন করার রেওয়াজ চ'লছে, কিন্তু আয়ুর্বেদ সে কথা বলে না। এ ভিন্ন পুনর্ণবা শাক, মশলা হিসেবে তেজপাতা, দারুচিনি ও যোয়ান ব্যবহার এ রোগে ভাল। ঝাল হিসেবে চই ভাল। যেখানে আহার্যে তেলের ব্যবহার ক'রতে হবে সেখানে সরষের তেলের পরিবর্তে তিল তেলের ব্যবহার ক'রলে রোগ তো বাড়েই না অধিকন্তু ক'মে যায়। তাই দক্ষিণ ভারতে দেখা যায় পাণ্ডু ও কামলা রোগ কম হয়। আর একটা খাদ্য ও ঔষধ হিসেবেই বলি—কাঁচা কলা চাকা চাকা ক'রে কেটে, শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে, সেটার সঙ্গে অল্প যব বা গমের আটা মিশিয়ে রুটি ক'রে খেলে ২/৪ দিনেই পাণ্ডু ও কামলা রোগের উপশম হবে এটা পরীক্ষিত।

এ রোগে অপথ্য

পোস্ত বা সরষে বাটা, সরষের তেলে রান্না, পান খাওয়া, টক দই, শিম, যে কোন রকম পাতা শাক, কচু ডাঁটার তরকারি, ওল, কচু, মান, বরবটি, লাল কুমড়ো, মুলো, বিট, গাজর, ফুলকপি, ওলকপি, বাঁধাকপি, পালং শাক, টোমাটো, তেঁতুল, জামীর লেবু, এ ছাড়া দিবানিদ্রা, কাঁচা লবণ, বেশী জল খাওয়া, নদীর জলে স্নান ও পান, আর সমীচীন নয় বিড়ি সিগারেট খাওয়া।

এইবার রক্তপিত্ত সম্পর্কে বলি

এই রোগের নামেই লোকের আতঙ্ক, রক্ত যেখান থেকেই পড়ুক না কেন, মানুষের আশঙ্কা হয়, নানা চিন্তাই মনে আসে, এই রক্তপিত্তের রক্ত শুধু মুখ থেকেই আসে তা নয়, মলদ্বার ও প্রস্রাবের সঙ্গেও যায়, এ ভিন্ন নাক থেকেও আসে, এও দেখা গেছে রোমকূপ থেকেও বিন্দু বিন্দু ঘামের মত বেরোয়।

এখন প্রশ্ন—রক্তের সঙ্গে পিত্ত কথাটার সংযোগ কেন করা হ'লো—সে ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের বক্তব্য পিত্ত ও রক্ত দুইএর উষ্ণতায় এবং দ্রবত্বে সমভাবাপন্ন; এই পিত্তটাই খাদ্যরসকে রক্তে রূপান্তরিত করে; আর সর্ব ধাতুর একটা নিজস্ব উষ্মা আছে, তার দ্রবত্ব ও স্থূলত্ব আছে, এই উষ্মাই আয়ুর্বেদের ধাতুগত অগ্নি, যখন রক্তপিত্তের রক্ত নির্গত হয় তখন রক্তের দ্রবত্বটাই পিত্তের দ্রবত্বের সঙ্গে মিশে যায়। সেইটাই আমরা দেখতে পাই। এর সঙ্গে শ্লেষ্মার যোগ হ'লেই বায়ু তাকে উৎক্ষিপ্ত ক'রে দিয়ে থাকে, যেহেতু এটি প্রকৃতিবিরুদ্ধ দ্রব পদার্থ।

এই জন্য আহার বিহার সম্পর্কে বিশেষ অবহিত না হ'লে এর থেকেই ভবিষ্যতে যক্ষ্মারোগ এসে পেঁছাবে।

এ রোগের পথ্য

পুরাতন ধানের চালের ভাত, এখানে ব'লে রাখি, আমরা চালটাকেই পুরানো ধরি, কিন্তু তা নয়, পুরানো ধানের চাল, কাঙ্গুনী দানার ভাত, এর সংস্কৃত নাম

(কণ্ঠগুনী)—এটা ভেজে, ঝেড়ে নিয়ে খাওয়া যায়। যবের পালো বা বার্লি, মুগ, মসুর, ছোলা অথবা বনমুগের (মোটডাল) পাত্‌লা যূষ, ঘুঘু পাখীর মাংস, এক বল্‌কা দুধ, পাতলা ছাগদুগ্ধ ও ঘি, কাঁঠালী কলা, ক্ষুদে নটে শাক, বেতের ডগা, বন আদা, পুরানো চালকুমড়ো, কচি তালশাঁস, দাড়িম, খেজুর, আমলকীর মোরব্বা, ডাবের জল, ঝুনো নারকোলের শাঁস, পানিফল, কেশুর, পাকা কয়েৎবেল (তবে মিষ্ট হওয়া চাই), ফলসা, কিসমিস, আখের রস। আর ব্যঞ্জন হিসেবে এই রোগের পক্ষে ভাল—পলতার শুক্তোর মত বাসকপাতা দিয়ে রান্না শুক্তো, লাল শালুকের ডাঁটার ও পদ্মমূলের (গোঁড়ের) তরকারি। আর ঝাল হিসেবে—পিপুল বা চইএর গুঁড়ো মিশিয়ে অথবা চই বাটা দিয়ে তরকারি রান্না ক'রে খাওয়া, পানীয় হিসেবে ঠাণ্ডা জল, কুয়োর (কূপ) জল খাওয়া, ঠাণ্ডা জলে স্নান, কলাপাতায় খাওয়া, তিল তেল মাখা।

এই রোগে অপথ্য ও বর্জনীয়

বেশী হাঁটা, ব্যায়াম, সাঁতার দেওয়া, মলমূত্রের বেগ ধারণ, ধূমপান, এদের কোনটাই ভাল নয়।

খাওয়া হিসেবে—কুলত্থ কলাইএর ডাল, পোস্ত ও তিল বাটা দেওয়া তরকারি, সরষে শাক, কলাইএর ডাল, তেঁতুলের টক, দই, লেবু (অবশ্য কোন লেবুই ভাল নয়) আর তরকারির দিকে—বেগুন-নিমপাতা, মানকচু, কচুরমুখী, মেটে আলু, শিম, টোমাটো, মুলো, রসোন, পেঁয়াজ, ডিম, বেশী লবণ বা বেশী লবণ দেওয়া রান্না তরকারি, আর যে সব খাদ্যে অজীর্ণ সৃষ্টি করে সেগুলি যথাসম্ভব হিসেব করে খাওয়া ভাল।

যক্ষ্মারোগ ও তার পথ্যাপথ্য

এই রোগের উৎপত্তির প্রধান কারণ থাকে শরীরের সহনোপযোগী শ্রম ছাড়া অতিরিক্ত শ্রম করা এবং আহার-বিহারের মাত্রাতিরিক্তে। এই রোগে পুরুষ বেশী আক্রান্ত হয় ঐ সব কারণে, স্ত্রীজাতি আক্রান্ত হন সাধারণতঃ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, অথচ সন্তান প্রসবে যখন নিরুপায় হন।

এই কারণে শরীরের ধাতুগুলিই ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে রোগাক্রমণের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হ'য়ে যায়। এর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা দেহের অগ্নিবল রক্ষা, পুরুষের ক্ষেত্রে শুক্র রক্ষা, আর নারীর ক্ষেত্রে বার বার সূতিকাগারে প্রবেশ থেকে বিরত থাকা।

এই রোগের সুপথ্য

রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করে, ছোট ছোট পাখীর মাংস খাওয়া ভাল, তবে বিনা মশলায়, মুগ ও ছোলার ডালের পাত্‌লা যূষ, ছাগলের দুধ, ঘি, মাখন, কলার মোচা, ছানার মিষ্টি, পাকা আম, আমলকীর মোরব্বা, মিষ্টি খেজুর, ফলসা, ডাবের জল (তবে দুপুরবেলায়), ঝুনো নারকোল চিবিয়ে ছিব্‌ড়ে ফেলে খাওয়া, কিসমিস, মহিষের দুধ, ঘি (অবশ্য পুষ্টিকর হিসেবে); এ রোগে বিশেষ তরকারি পাকা চালকুমড়ো রান্না করে খাওয়া, ঘৃতকুমারীর শাঁসের তরকারিও খাওয়া যায়, শাকের মধ্যে গিমে শাক, (খুব অল্প) আর থানকুনী (থুলকুড়ি), মশলা

হিসেবে ধনে, মৌরী, জিরে, ঝাল হিসেবে পিপুলের গুঁড়ো, শঠীর পালোর বা পাণিফলের গুঁড়োর হালুয়া। আর আখের (ইক্ষু) রসও খারাপ নয় তবে কালো আখ হ'লে ভাল হয়।

এ রোগে অপথ্য ও বর্জনীয়

রোগভোগকালে পরিশ্রম করাটাই দোষের, তা ভিন্ন বেশী হাঁটা, দিবানিদ্রা এবং স্ত্রী-পুরুষের একত্রে অবস্থানটাও বিশেষ ক্ষতিকর, যেহেতু শুক্রক্ষয়ই এ রোগের অন্যতম একটি কারণ, তা ছাড়া সাহস করে কোন কায়িক পরিশ্রমের কাজে লেগে যাওয়া এবং রাত জাগাও ভাল নয়। এ রোগে পান খাওয়া অসমীচীন।

আহার্য হিসেবে—ডালের মধ্যে কুলথকলাই ও মাষকলাইএর ডাল, তরকারির মধ্যে কাঁকরোল, শিম, বেগুন, লাউ, সরষে শাক, অন্য কোন পাতা শাক; মশলার মধ্যে—রসোন, পেঁয়াজ, হিং, ফলের মধ্যে—তরমুজ, টক কমলালেবু, পাকা পেঁপে, তিতো (তিক্ত) কষায় বিশিষ্ট ফল, পাকা বেল, এ ভিন্ন দই, সে টক মিষ্টি যাই হোক। বনৌষধির মধ্যে তুলসী পাতার রস।

কাস রোগ

লোকে কথায় বলে 'পেট গরমের কাসি'; কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়।

মনে করুন কালবৈশাখীর ঝড়, গরমে হাওয়া উঠে সে জায়গাটায় আংশিক শূন্যতা সৃষ্টি হ'লো আর ওমনি সন্ধ্যেবেলা অন্য জায়গা থেকে ঐ শূন্য জায়গাটাকে পূরণ করার জন্যে বাতাস ছুটে আসাটার সময়টাই তো ঝড়ের রূপ, সেই রকম দেহের মধ্যে বায়ু সর্বত্রই তো কাজ ক'রে চলেছে, একেই বলে সমান বায়ু, এই দেহের মধ্যবর্তীস্থানে অর্থাৎ গ্রহণী নাড়ীর ঊর্ধ্বদিকে কেন্দ্র ক'রে যিনি বসে আছেন তার নাম উদান বায়ু, তিনি কুপিত হ'লেই কাসি হবে, তার সঙ্গে শ্লেষ্মার যোগ থাক আর নাই থাক, আবার এরই সঙ্গে যখনই বিকৃত কফপিত্তের যোগ হবে, তখনই হবে কাস রোগ। এই সময় সতর্ক না হলে বা তার প্রতিকার না করলে পরিণামে আসবে যক্ষ্মা, জ্বরও এসে জুটবে, সঙ্গে সঙ্গে সব ধাতুরই ক্ষয় হ'তে থাকবে, তার ফলে আসবে অকালবার্ধক্য। আর একটি কুলক্ষণ দেখা যায় যে, প্রথম যৌবনটার ঈপ্সিত প্রবৃত্তি তাকে চেপে ধরে।

পথ্য—কি আহারে কি বিহারে

ডালের মধ্যে মুগ মসুরের ও কলাইএর যূষ, মাংসের মধ্যে ছোট পশু-পক্ষীর অথবা কচ্ছপের (কূর্মের) মাংস, মেওয়া হিসেবে খেজুর, কিসমিস, দাড়িম ও আমলকীর মোরব্বা, হরীতকীর মোরব্বা, অম্লবেতসের চাটনি।

সাধারণ পথ্য হিসেবে—শঠীর পালো, খই, খইএর মণ্ড, শুষ্ক মুলো চূর্ণ ক'রে তরকারিতে দেওয়া, গমের ডালিয়া, সৈন্ধব লবণ, তরকারি ও শাকের মধ্যে বেতো, কাকমাচি শাক, কালকাসুন্দের ফুল, থানকুনি, লাল পুনর্ণবা শাক, সুষুণী শাক, তরকারির মধ্যে কচি মুলো, কচি বেগুন; মশলার মধ্যে—ধনে, পিপুল, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, রসোন, আদা; প্রক্রিয়া হিসেবে পেটে বায়ু হ'লে ওখানে পুরানো ঘি মালিশ, আর বিরেচনের জন্য মৃদু জোলাপ নেওয়া।

এ ক্ষেত্রে অপথ্য কি

এ রোগে ড্রুস্ নেওয়া, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম করা, রৌদ্র লাগানো, বেশী পথ হাঁটা, কোন রুক্ষ দ্রব্য, সংযোগবিরুদ্ধ হয় এমন খাদ্য, যে দ্রব্য খেলে উদ্গার (ঢেকুর) ওঠে এমন খাদ্য খাওয়া, ঠাণ্ডা জলে স্নান আর কোন ঠাণ্ডা হ'য়ে যাওয়া দ্রব্য খাওয়া উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে কোন রকম মাছই ভাল নয়। তরকারির মধ্যে ওল, কচু, মান, লাউ, বরবটি, বিশেষ ক'রে পুঁইশাক, আর বর্জনীয় সরষে, খেঁসারি ও মটর শাক।

শ্বাস ও হিক্কা রোগ

শ্বাস রোগকেই আমরা বলি হাঁপানি। বংশগত যত রোগ আছে তার মধ্যে এই রোগটি শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা জীবন দীর্ঘায়িত করে। দুই-একটা সাধারণ কারণ থেকেও হাঁপানি হয়, যেমন বিকারগ্রস্ত শ্লেষ্মণ ধাতু শুকিয়ে গেলে, হৃদদৌর্বল্য হ'লে; আহার বিহারের ব্যভিচার হ'লে অথবা সীসা বা দস্তার বিষক্রিয়াতেও হ'তে পারে। এ সকলই সাক্ষাৎ কারণ, আর এ সব থেকে মুক্ত থেকেও যে এ রোগ থেকে রেহাই পায় না, তা হলো পিতৃ বা মাতৃ সূত্রে সেটা তার দেহে পেঁছেছে।

আহার ও বিহারের বিধি

এ রোগে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান, রাত্রিতে অল্প গরম জল খাওয়া, সৈন্ধব লবণ পিপুল, শুঁঠ (শুষ্ক আদা), গোল মরিচ, ছাগলের দুধ। এই দুধ নিত্যপথ্য হিসেবে অভ্যেস করলেই ভাল হয়। ছাগল দুধের ঘি, পুরানো গুড়, পুরানো ধানের চালের ভাত, কুলথ কলাইএর যূষ, যবের পালো, গমের ডালিয়া, ছোট মুরগী ও পাখীর মাংস, এ ক্ষেত্রে ঔষধের মাত্রায় অল্প পরিমাণ মৃতসঞ্জীবনী খাওয়া ভাল, তবে এটি যথাশাস্ত্র প্রস্তুত না হ'লে, অন্য ঐ জাতীয় সুরাসার খাওয়াও চলে; এবং মধুও দুই/এক চামচ মাঝে মাঝে খেলে ভালই হয়।

এদিকে তরকারির মধ্যে কাঁচ মুলো, পটোল, সজিনার ডাঁটা, বেতো ও নটে শাক, বেগুন, পুরানো চালকুমড়ো, হরীতকী বা আমলকীর মোরব্বা, তা ছাড়া যে সব জিনিসে কফ এবং বায়ু বিকারগ্রস্ত বা কুপিত না হয় সেই সব দ্রব্য ব্যবহার করা চলে।

এ রোগে কি অপথ্য ও বর্জনীয়

মলমূত্রের বেগ ধারণ, পিপাসায় ঠাণ্ডা জল খাওয়া, বেশী পরিশ্রম, ধুলো ও রৌদ্র লাগানো, ঠাণ্ডা ঘরে বায়স্কোপ দেখা, ফ্রিজে রাখা কোন ঠাণ্ডা জিনিস বা আইসক্রিম খাওয়া, ঠাণ্ডা ঘরে থাকা এগুলি সর্বদা বর্জন ক'রে চলতে হয়; আর উভচর প্রাণীর অর্থাৎ যারা ডাঙ্গায়ও থাকে আবার জলেও চলে, যেমন কচ্ছপ (কাছিম)-এর মাংস, যেসব মাছ মাটিতে থাকতে ভালবাসে, যেমন শিঙ্গি, মাগুর, পাঁকাল প্রভৃতি মাছ ও কাঁকড়া, লবণাক্ত জলের মাছ, যেমন বড়চাঁদা (পম্‌প্রেট্), ভোলা, ভেটকি এই সব মাছ, এ ভিন্ন চিংড়ি মাছ খেলেই এ উপদ্রব যেন ছুটে আসে।

এদিকে তরকারির মধ্যে শিম, ওল, কচু প্রভৃতি এবং কন্দজাতীয় জিনিস ভাল নয়। তারপর সরষে ও পোস্ত, সরষের তেল, তেলে ভাজা, কলাইএর ডাল, এসব জিনিসও বর্জন ক'রে চলতে হয়।

স্বরভঙ্গ

এ রোগ যত তাড়াতাড়ি আসে তত শীঘ্র যেতে চায় না, কারণ লোকে এ রোগের গুরুত্বও দেয় না; সুতরাং এটা নিরাময়ের জন্য তৎপরও হয় না, তার উপর আহার বিহারেও তার বিধিনিষেধ মেনে চলে না। এর চিকিৎসা কিন্তু হিক্কা-শ্বাসের মত এবং পথ্যও তাই, এর মধ্যে যেটুকু বিশেষ করণীয় সেইটুকুই লিখছি।

বিশেষ পথ্য

মাঝে মাঝে জোলাপ নিয়ে পেটটা পরিষ্কার রাখতে হয়, আর দু'বেলা বার্লি একটু দুধ মিশিয়ে খেলে ভাল হয়। মাংসের মধ্যে এই রোগে হাঁস বা মুরগীর মাংস ভাল, শাক হিসেবে—কাকমাচি শাক তবে যেগুলি তিতো (তিক্ত) সেগুলি নয় কিন্তু; তরকারি হিসেবে—কচি মুলো, কচি বেগুন, আর এদিকে রসোন ফোড়নের তরকারি, আদা, মরিচ, গাওয়া ঘি ও দুধ এবং কিসমিস, খেজুর।

এ রোগে সর্বাপেক্ষা কুপথ্য হ'লো কয়েৎবেল, ওলের, কচুর এবং শালুকের ডাঁটার তরকারি, কচুর মুখী বা কচু, বরবটি, শিম, টোমাটো ও ফুলকপি খাওয়া উচিত নয়। ফলের দিকে জাম ও গাব দুটোই ভাল নয়।

অরুচি রোগের পথ্যাপথ্য

এ রোগটি অনেক কারণেই আসতে পারে, তবে দেখা যায় দুটি রোগের অনুগমন ক'রে আসে, একটি নাসা রোগ, একে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলে থাকে (polypus) আর একটি ক্ষেত্র হ'লো আমাশয়ের নিম্নভাগের গ্রহণী নাড়িতে ক্ষত, যাকে বলা যেতে পারে বৃহদন্ত্রক্ষত। এ ভিন্ন কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়, শোক, ক্রোধ, ও ঘৃণা থেকেও এ রোগ আসতে পারে। এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক যে কোন কোন রোগ-ভোগের পরেও অথবা গর্ভাবস্থাতেও তো অরুচি হয়; এটা তা হ'লে কি?

এ ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের বক্তব্য—আপাতদৃষ্টিতে রোগ দেখা যাচ্ছে না বটে, তবে সে এখনও পূর্ণ সুস্থ হয়নি, তাই তার এই অরুচি। আর দ্বিতীয়টি—তার ক্লেদযুক্ত আমাশয়ের প্রতিক্রিয়া।

এ রোগে করণীয় কি

মাঝে মাঝে মৃদু জোলাপ নিতে হয়, তবে গর্ভবতীর অরুচির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন। তা ছাড়া তিক্তরসপ্রধান দ্রব্য খাওয়া ভাল, আর মাছ হিসেবে চ্যাং, মৌরলা, পুঁটি, ইলিশ, খ'লসে, কই, মাছের ডিম, বা মাছের তেল, এর মধ্যে যার যেটায় রুচি, সেটা তিনি খাবেন।

লিখতে সঙ্কোচ বোধ করলেও লিখছি—মাছ কলার পাতায় জড়িয়ে, মাটি লেপে,

জ্বলন্ত উনুনে ফেলে, পুড়িয়ে, সেটাকে পরিষ্কার ক'রে তেল-নুন দিয়ে মেখে খেলে তাড়াতাড়ি অরুচিটা চলে যায়। জাপানে দগ্ধ মৎস্য খাওয়া ওদেশের সম্প্রদায় বিশেষের একটা প্রিয় খাদ্য। আর আমাদের উড়িষ্যা প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে এটা এখনও প্রচলিত, সে অরুচি হোক আর নাই হোক, মুড়ি বা পান্তা ভাতের সঙ্গে পোড়া মাছের টাক্না। আর তরকারির মধ্যে চালকুমড়ো, বেতের ডগা, কচি মুলো, কচি বেগুন, কলার মোচা, পলতা, হিঞ্চে প্রভৃতি তিতো শাক, এদিকে ওল, মান প্রভৃতি।

টক হিসেবে জামির লেবু বা যে কোন লেবু, কাঁচা বা পাকা আম, নুন জলে ভিজানো কিসমিস, প্যাকা কুল, বৈঁইচ ফল, পুরানো তেঁতুল, কুল-শুঁঠের গুঁড়ো, কয়েৎবেল, হিং (ভাজা) যোয়ান প্রভৃতি।

এ ক্ষেত্রে অপথ্য

যা খেতে ভাল লাগে না, তা খাওয়ার দরকার নেই, সে পুষ্টিকর দ্রব্য হ'লেও না, তবে রকমফের রান্না করে দিলে সেই জিনিসেই আবার অরুচি কেটে যায়।

ছর্দি (বমি) রোগ

অনেক কারণেই এ রোগ আসতে পারে, পেটে ক্রিমি হ'লে, বেশী দিন শুধু তরল জিনিস খাওয়ার অভ্যাস ক'রলে, বেশী তিতো (তিক্ত) জিনিস অর্থাৎ (তীক্ষ্ণ তিক্ত) বেশী দিন খেতে থাকলে, অথবা ক্রিমির উপদ্রব দূর করতে অতিরিক্ত তিতো বেশী দিন খাওয়ালে বমি রোগ আসতে পারে, আর একই নির্দিষ্ট সময়ে না খেয়ে উল্টো-পাল্টা সময়ে খেলে এবং খাওয়ার দোষে পাকস্থলীতে (stomach) দূষিত কোন জিনিস গেলে বমি হয়ে থাকে।

করণীয় কি

এ রোগে গুলঞ্চ, তা কাঁচা বা শুষ্ক যাই হোক, কাঁচা হ'লে রস ২/১ চামচ আর শুকনো হ'লে ৪/৫ টুকরো, ১ কাপ গরম জলে ভিজিয়ে, সেই জলটা খেলে বমি বন্ধ হয়। এ ভিন্ন খইএর মন্ড বা খই, কয়েৎবেল, পিপুল বা গোলমরিচের ঝাল, হরীতকীর মোরব্বা, ধনে বাটা দিয়ে তরকারি, রান্না করা মুগ বা মসুর ডালের পাতলা যূষ, গমের ডালিয়া, যবের পালো, জায়ফল ঘষে (অল্পমাত্রায়) একটু তরকারিতে দিয়ে খাওয়া, নিম বেগুন, মৌরী, শুলফো বা নটে শাক, কচি বেগুন পোড়া (২/৫ ফোঁটা ঘি ও লবণ দিয়ে), ডাবের বা তালশাঁসের জল, ঝুনো নারকোল কোরার সঙ্গে মুড়ি বা ভাজা চিড়ে প্রভৃতি। বমি হ'তে থাকলে বা বমি রোগে অবস্থা বিবেচনায় এগুলির মধ্য থেকে বিচার ক'রে দিতে হয়, তবে এ সবে কুল না পেলে একটু মৃতসঞ্জীবনী বা ব্রান্ডী আধ বা এক চামচ বেশী ক'রে জল মিশিয়ে দেওয়া যায়।

এ ক্ষেত্রে অপথ্য কি

এমন কিছু করা উচিত নয়, আর যে জিনিস কখনও খাওয়া অভ্যেস নেই সে জিনিস খাওয়া অনুচিত। তরকারির মধ্যে কুঁদ্রী, শিম, বরবটি, ভুঁইছাতা, বিট, গাজর, সরষে শাক, আর সরষে বাটা, মশলার মধ্যে ছোট এলাচ খাওয়া উচিত নয়।

তৃষ্ণা রোগ

বার বার পিপাসা পাওয়াটার মূলে অন্য কারণ থাকে, যাদের মূত্রগ্রন্থি ও তালুগ্রন্থি বিকারগ্রস্ত হয় অর্থাৎ কোন দোষে দুষ্ট হয়, এ ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের বক্তব্য, তার সেই দুই স্থানের জলবাহী স্রোতবায়ু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বুঝতে হবে। এই রোগ দীর্ঘদিন চলতে থাকলে, সেটা থেকে আসে মূর্ছা (হিষ্টিরিয়া) অথবা অপস্মারও আসতে পারে; সুতরাং এই রোগটিকে খুব লঘু ক'রে দেখা উচিত নয়।

এই রোগের পথ্য কি

গরম ভাত অথবা মুড়ি অল্প গাওয়া ঘি মেখে কিছুদিন ধ'রে খাওয়া। এটাকে নিরাময়ের ব্যবস্থা না ক'রলে পরিণামে উপরি উক্ত রোগ দুটির যে কোন একটি আসার সম্ভাবনাও যেমন আছে, সেই রকম ভ্রমরোগ, তন্দ্রা (ঝিমুনী) এমন কি সন্ন্যাসরোগও হ'তে পারে। এই তৃষ্ণারোগে খইএর মণ্ড, মোয়া খইএর ছাতু, চিড়ে ভাজা, চিড়ে মণ্ড (একটু দুধ চিনি মিশিয়ে খাওয়া) আর ব্যঞ্জন হিসেবে অল্প ঘি দিয়ে ভেজে নিয়ে মুগ, মসুর ও ছোলার ডালের রান্না অথবা ঘি দিয়ে সাঁত্‌লে (সন্তলন ক'রে) নিয়ে সেটা খাওয়া প্রয়োজন। মোট কথা একটু ঘি পেটে পড়া চাই। আর তেল হিসেবে তিল তেল বা বাদাম তেল খাওয়া ভাল। আর তরকারি হিসেবে মোচা, চালকুমড়ো, লাউ, পুঁই শাক, পটোল, আর এদিকে—কাঁকুড়ের বা তরমুজের তরকারি, বেতের ডগার শুক্ত, পাকা তেঁতুলের অম্বল। এগুলি এই রোগের উপযোগী খাদ্য, আর ডাবের জল, মধুর সরবৎ, ঝুনো নারকোল কোরা, মহুয়া ফুলের সরবৎ, ফলের মধ্যে মিষ্টি জামীর লেবু, আপেল, ন্যাসপাতি, কিসমিস, ঝাল হিসেবে চই আর আমিষ হিসেবে ছোট পাখীর মাংস ভাল।

এদের অপথ্য কি

সরষের তেল খাওয়া বা মাখা, যে কোন রকম টক ফল, কোন রকম কষায় জিনিস (মোচা বাদ), কোন গুরুপাক দ্রব্য, নোন্‌তা জিনিস ও ঝাল, আর আমিষের দিক থেকে মাছ ও মাংস, বিশেষ করে কচ্ছপের (কূর্মের) ও মুরগীর মাংস বেশী ক্ষতিকর।

একটা কথা ব'লে রাখি, মূর্ছারোগের পথ্য ও অপথ্য ঐ তৃষ্ণারোগেরই তুল্য। তবে মূর্ছারোগের বিশেষ পথ্য হচ্ছে পাত্‌লা মটরের ডাল, ছোট নটে শাক, খরগোসের মাংস, পায়েসে কিসমিস দিয়ে খাওয়া।

উন্মাদ

এ রোগের উৎপত্তি বংশজ কারণেও হ'তে দেখা যায়, মনোবিকারেও হয়, এবং মস্তিস্কের বিকার সৃষ্টি করে এমন ধরণের কোন বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করলেও উন্মাদ হতে দেখা যায়।

ভূতোন্মাদ ব'লে অথর্ববেদে একটি উক্তি আছে, এটার ব্যাখ্যায় চরক সুশ্রুতের অভিমত হচ্ছে—অতীত জীবনে দম্ভ, মোহ, ঈর্ষা ও লোভ প্রভৃতি কারণে উৎকট

দুষ্কর্মজনিত কর্মের স্মৃতিতে মন পীড়িত ও অনুতাপদগ্ধ হ'তে থাকলে, সে অবস্থাটাকে বহিঃপ্রকাশ না করতে পারার জন্য যে মনোবিকার সেটাকেও ভূতোন্মাদের পর্যায়ে ধরা হয়।

এ ভিন্ন আর একটা কারণে উন্মাদ হ'তে পারে, সেটা হ'লো কামজ উন্মাদ, বিশেষতঃ এ রোগে যুবক বা যুবতীকেই আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রের প্রধান কারণ থাকে বয়সকালের ধর্ম। সেটায় যদি তার মন অতৃপ্ত হয়।

আর এক প্রকার উন্মাদ আছে, সেটা অত্যধিক শরীর ক্ষয়জনিত, সে স্ত্রী-পুরুষ যেই হোক্।

এ রোগের চিকিৎসামূলক পথ্য

(১) যদি দেখা যায় তার সর্দি হ'তেই চায় না, শরীর কালো হ'য়ে, এবং শুকিয়েও যাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে এটা বায়ুপ্রধান উন্মাদ। সে ক্ষেত্রে ঘৃত পান করানো ভাল।

(২) যে ক্ষেত্রে তার ক্রোধ বেশী, গায়ে জ্বালা, ঠাণ্ডা জিনিস ভাল লাগা, বিবস্ত্র হ'য়ে থাকার প্রচেষ্টা, এ সব কিন্তু পিত্ত-প্রধান উন্মাদ রোগের লক্ষণ। এদের দাস্ত বেশী যাতে হয় এইভাবের বিরেচন ঔষধ খাওয়ালে উন্মাদের তীব্রতা ক'মে যাবে।

(৩) শ্লেষ্মাপ্রাধান্যে উন্মাদ হ'লে, বিড়্‌বিড়্ ক'রে বকা বেশী হয়, স্থবির হয়ে থাকতে চায়, কিন্তু এদের ঘুম হয় অথচ পাগল, যে কাজে লেগে যায় সেটা নিয়ে ক্ষণিকক্ষণ থাকে, এই যে ক্ষেত্র, এ ক্ষেত্রে চরকের ব্যবস্থা বমন করানো; অবশ্য এটা চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে করাতে হবে। আর সাধারণভাবে ব্রাহ্মীশাকের রস (Herpestis monniera) ২ চামচ একটু গরম করে দুধের সঙ্গে খাওয়ানো ভাল, কিন্তু পিত্তপ্রধান ও বায়ুপ্রধান উন্মাদে মণ্ডূকপর্ণী বা থুলকুড়ির (যার প্রচলিত নাম থানকুনি— Centalla asiatica) পাতার রস খাওয়ানো ভাল অথবা ঝোল করে খাওয়ানো যেতে পারে। আর পুরানো চালকুমড়োর রসের (৩/৪ চামচ) সঙ্গে চিনি দিয়ে সরবৎ করে খাওয়ানো যেতে পারে, আর, ব্যবহার করা যেতে পারে সুষুনী শাক, জটামাংসী, শতমূল, শঙ্খপুষ্পী প্রভৃতি; এগুলি যেটাকে যে ভাবে খাওয়া সম্ভব সেই পদ্ধতিতে উন্মাদের ক্ষেত্রে খাওয়াতে পারা যায়—এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য নয় যে সব কয়টি একসঙ্গে বা এক সময়েই খাওয়াতে হবে। এ ভিন্ন তিল তেল মেখে স্নান, গায়ে ঠাণ্ডা জিনিসের প্রলেপ দেওয়া, পথ্য হিসেবে গমের ডালিয়া, মুগের যূষ, ধারোষ্ণ দুধ, নূতন বা পুরানো ঘি খাওয়া, প্রত্যহ কচ্ছপের মাংস (প্রয়োজন হ'লে লুকিয়েও খাওয়াতে হবে) পুরানো চালের ভাত, চালকুমড়োর তরকারী, শাকের মধ্যে নটে, বেতো, পালং, সুষুনী শাক, সম্ভব হ'লে গাধার দুধ, আরও সম্ভব হ'লে এই প্রাণীর মূত্র পানেরও ব্যবস্থা দেওয়া আছে চরকে। এখানে একটা কথা ব'লে রাখি, বসন্ত রোগাক্রমণ কালে, যদি উন্মাদের লক্ষণ দেখা যায়, তা হলে তাকে গাধার দুধ খাওয়াতেই হবে। আর যে কোন রকম উন্মাদ রোগীর ক্ষেত্রে বৃষ্টির জল, হরীতকীর মোরব্বা, আমলকীর মোরব্বা, কিসমিস, ডাবের শাঁস, পাকা কয়েৎবেল, পাকা কাঁঠালের রস, যখন যেটা পাওয়া যায় খেতে দিতে পারা যায়। মোট কথা যেহেতু পাগল হয়েছে ভেবে তাকে গতানুগতিক ধারায় চিকিৎসা না ক'রে বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে কোন্ দোষের লক্ষণের সঙ্গে তার লক্ষণের

মিল আছে সেটা বিচার করে চিকিৎসা করলে তাড়াতাড়ি উপশম হবে। একেই আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে দোষ প্রত্যনীক চিকিৎসা, এ ক্ষেত্রে ব্যাধি প্রত্যনীক চিকিৎসা করা বিধি নয়।

উন্মাদ রোগের অপথ্য

এ রোগে কেবল মদই নিষিদ্ধ নয়, কোন রকম নেশা করাই উচিত নয়, কারণ যেটার দ্বারা মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয় এমন ধরণের সব জিনিসই পরিত্যজ্য। এ ভিন্ন যে সব ঔষধ ও পথ্যে মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রকে লাঠি মেরে স্তব্ধ ক'রে দেয় এ সব বর্জন ক'রে চলাই উচিত; আর নির্দিষ্ট সময়ে তাকে খেতে দিতে হবে অর্থাৎ অভুক্ত রাখা উচিত নয়। এদের পিপাসা বেশী হয়, চাইলে জল দিতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে তরকারিরও বাছবিছার আছে, যেমন উচ্ছে বা করলা, নাল্‌তে পাতা (তিক্ত পাট শাক) চিচিঙ্গে, যে কোন রকম পাতা শাক (পথ্য হিসেবে যেগুলি বলা আছে সেগুলি ভিন্ন) ওল, কচু, মান, পলতা, এসব তরকারি খাওয়া উচিত নয়।

অপস্মার

আয়ুর্বেদে দুটি কথা আছে, আধি আর ব্যাধি, আধি হয় মনে, আর ব্যাধি হয় দেহে আর মনে। দেখা যাচ্ছে—এই অপস্মার রোগের হেতু হ'লো মনোবহ স্রোত বিকারগ্রস্ত হওয়া, অবশ্য এই রোগ বায়ু, পিত্ত, কফ যে দোষের আধিক্যেই সৃষ্টি হোক না কেন, তার চিকিৎসার চিন্তাধারা থাকবে মনের সুস্থতা বজায় রাখতে যে স্নায়ুকেন্দ্রকে অভিভূত বা শান্ত করে রাখার প্রয়োজন হয় সেই রকম আহার-বিহারই এ ক্ষেত্রে বিধি, সুতরাং উন্মাদের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ এবং পথ্য ও অপথ্যগুলি মেনে চললেই এ রোগের শান্তি হয়।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখি, আয়ুর্বেদ এই অপস্মার চিকিৎসার ক্ষেত্রে কখনও অতিসত্ত্বা বাদে বিশ্বাসী নয়, তাঁরা অপগত স্মৃতিকে (সাময়িক হারানো স্মৃতি) ফিরিয়ে আনার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত সেই উপদেশই দিয়েছেন।

বাতব্যাধি

কৃষ্ণের শতনামের মত এই একটি রোগ, যেমন যেমন কর্মের জন্য তিনি এক একটি নামে আখ্যায়িত হয়েছিলেন, সেই রকম এই বায়ুবিকারগ্রস্ত হয়ে এক একটি অবতারের মত রোগ সৃষ্টি করে। এই যেমন রোমকূপে যদি বায়ু বিকারগ্রস্ত হয়, দেখা গেল রোমাঞ্চ হ'লো, চোখের পাতায় বায়ুর বিকার হলো, তখন সে নাচতে লাগলো, সংস্কারে পড়লাম কল্যাণ অকল্যাণের।

এই হাত বা মাথা কাঁপা, তার নাম হ'য়ে গেল কম্পবাত, রাত্রে শুয়ে আছেন, সকালে উঠে দেখা গেল মুখখানা যেন বাংলার পাঁচ, এও কিন্তু বায়ুর ক্রিয়া, একে বলা হ'লো অর্দিত রোগ, হঠাৎ চোয়াল আটকে গিয়েছে, এটাকে বলা হ'লো হনুগ্রহ, কানে বাঁশি বাজছে এও বায়ুর ক্রিয়া, সেখান তার নাম হ'লো কর্ণনাদ। এই রকম বাতবিকারে ৮০ প্রকার রোগ হয়। এই বায়ু কিন্তু রোগ

আসার রাডার—এই মনে করুন, অন্যমনস্ক হ'লে আপনার পা নাচে, এটা কিন্তু আপনার ভবিষ্যৎ জীবনে বাতব্যাধি আসার ইঙ্গিত, তারপর যাঁরা প্রায়ই (প্রত্যহই) পেট বাজিয়ে থাকেন, তাঁদের ঢেকুর ওঠার রোগ (উদাবর্ত) এসে প'ড়বে তারই ইঙ্গিত। যাঁদের মলত্যাগে মনের খুঁতখুঁতুনি যায় না, তাঁদের হয় অর্শ আছে, না হয় আসবে; যাঁদের ঘন ঘন হাই উঠছে, তাঁদের হয় পাকাশয়ে খাদ্যের অভাব হয়েছে না হয় হৃদদৌর্বল্য এসেছে বা আসছে। এ রকম বহু ইঙ্গিত দেওয়া আছে সংহিতা গ্রন্থে।

বাতব্যাধি রোগের আহার ও বিহার

(১) তেল মেখে স্নান, তবে অবগাহন স্নানই প্রশস্ত। আর খুবই উচিত দেহের সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক রেখে যতটা সম্ভব চলাফেরা এবং শোয়া-বসা যায়। গা-হাত-পা টেপানোটা ভালো, যাকে বলা যায় ম্যাসেজ্ করানো।

পথ্য বিচার

এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে যেটা হজম হবে সহজে, অথচ পুষ্টিকর। অল্প ঘি দিয়ে রান্না তরকারি, দইএর অগ্রভাগ, গমের তৈরী খাবার, মাষকলাই ও ভাজা কুলথ কলাইএর ডাল। মাছ হিসেবে—পাব্দা, কৈ, রুই, মৌরলা, বানমাছ। মাংস হিসেবে—কচি পাঁঠা, কচ্ছপ (ছোট কাছিম)। তরকারির মধ্যে—পটোল, স'জ্নের ডাঁটা, বেগুন, কাঁচা পেঁপে, বেতো শাক। ফলের মধ্যে—দাড়িম, কিসমিস, আলুবোখারা, ফলসা, আপেল, পাকা মহুয়া, মিষ্টি কুল, সফেদা, সরবতি লেবু, এ ভিন্ন মিষ্টি ফল; তবে সব সময়েই মনে রাখতে হবে, যে কোন ফলই হোক সূর্যাস্তের পর খাওয়া উচিত নয়।

এ ক্ষেত্রে রসোন শাক ও রসোন বিশেষ উপকারী।

অপথ্য কি

পরিশ্রম, রাত্রি জাগা, উপবাস এগুলি বিশেষ ক্ষতিকর। আর ডাল হিসেবে—ছোলা, মুগ, মসুর এই তিনটি বর্জনীয় আর খে'সারির ডালের তো কথাই নেই। এ ক্ষেত্রে গম চলে কিন্তু যবের পালো, যবের ও ছোলার ছাতু ভাল নয়। তরকারির মধ্যে—ডুমুর, লাউ, থোড়, মোচা, চাল কুমড়ো বা লাল কুমড়ো, শিম, করলা, উচ্ছে, কাঁচা কলা ভাল নয়। মোট কথা আদা, রসোন, পেঁয়াজ বাদে কোন মাটির নিচের তরকারি ভাল নয়। পদ্মের ডাঁটা (নাল) ও শালুক ডাঁটার তরকারি খাওয়া নিষেধ।

বাতরক্ত

এই রোগটি যেন শুম্ভ নিশুম্ভ, কারুরই প্রতাপ কম নয়। সুশ্রুতের মতবাদে রক্তও একটি মূল ধাতু, সেই হিসেবে বাত (বায়ু) ও রক্ত দুটি মূলধাতু একক হিসেবে যখন বিকারগ্রস্ত হয় তখনও যেমন বহুরোগ সৃষ্টি ক'রতে পারে, আর এই দুই মূলধাতু বিকারগ্রস্ত হ'য়ে এক সঙ্গে জোট বাঁধলে শরীরের বর্ণ, রূপ দুটিকেই সে নষ্ট ক'রে দেয়।

রোগের পূর্ব রূপ

প্রথম ও প্রধান উপসর্গ হয় ঘাম হওয়া, সে সর্ব শরীরেই হোক আর হাত-পায়েই হোক, (তবে অনেক সময় দেখা যায়, বংশ পরম্পরায়, সে পিতৃ বা মাতৃ যে কুলেই হোক, হাঁপানি বা এক্‌জিমা থাকলে শুধু হাতের তালু ও পায়ের তলাই ঘামে এ ক্ষেত্র ভিন্ন) পরবর্তী স্তরে তার অনেক রূপ, যেমন ছুলি, মেচেতা, গ্রন্থি-সংকোচ, হাত, পা শক্ত হ'য়ে কাঠের মত হওয়া, যেখানে সেখানে কালো বা লাল অথবা তামাটে দাগ দেখা যাওয়া, এ সব কিন্তু বাতরক্তের পর্যায়ে পড়ে, এ দাগগুলি আঘাত লেগে রক্ত জ'মে যাওয়ার মত দাগ। এ রোগ একবার দেহে বাসা বাঁধলে, তাকে সরানো দুঃসাধ্য বলা যেতে পারে, তবে পুরোনো কাঠে উইএর বাসা যেমন ভাঙ্গা কঠিন হয়, এই রোগ সারাটিও প্রায় সেই পর্যায়েই পড়ে বলা যেতে পারে।

মোটামুটি কিসে ভাল থাকা যায়

যদি রোজ যব সিদ্ধ ক'রে তার মণ্ডটা খাওয়া যায় অথবা বার্লি রান্না ক'রে খেলেও চ'লবে, আর মহিষের দুধ, এইসব রোগীর বেশী উপকারী, এ ভিন্ন যতটা সম্ভব পুরোনো চালের ভাত খাওয়া যায় ততই ভাল, আর ডাল হিসেবে বন মুগ (মোট ডাল) আর অড়হর এ দুটি ভিন্ন কোন ডালই এই রোগীর ভাল নয়। তরকারি ও শাকের মধ্যে বেতো, পুঁই, সুষুনি, নটে ও শালিঞ্চে শাক, গাঁদাল পাতা, উচ্ছে, চাল কুমড়ো, কচি বেগুন, পটোল, পলতা, কাঁচা পেঁপে, থোড় আর ঘি হিসেবে গাওয়াটাই ভাল।

মাংসের মধ্যে—তিত্তির পাখী, ছোট মুরগী, ছোট পায়রা খাওয়া ভাল।

এই রোগে কোন প্রকার মাছই ভাল নয়। আর খাওয়া যায়, মিষ্টি আঙ্গুর, কিসমিস, বাটা চিনি। তেল হিসেবে—তিল ও বাদাম তেল গায়ে মাখা ভাল, সাদা বা রক্তচন্দন ঘষে গায়ে মাখলেও ভাল অথবা গায়ে মেখে বেশ খানিকক্ষণ বাদে স্নান করলেও উপকার হয়। তবে বিত্তবান হ'লে চন্দনের তেল (Sandal wood oil) গায়ে মাখতে পারেন।

কি ভাবে চলতে হবে

দিনে ঘুমুনো বন্ধ করা দরকার, আগুনের কাছে যাওয়া বা রৌদ্র লাগানো চলবে না; মাষকলাই ভাজা, কুলথ কলাই, মটর, খেঁসারির ডাল খাওয়া ভাল নয়। তবে একটা কথা জানাই—অলবণ খাওয়ার অভ্যেস ক'রতে পারলে অনেক ক্ষেত্রে এ রোগের হাত থেকে ত্রাণ পেলেও পেতে পারা যায় আর ঔষধ হিসেবে তিক্তক ঘি, তিক্তক দ্রব্য আহার করা এ রোগে বিশেষ বিধান।

আমবাত

আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে আমবাত মানে গায়ে চাকা চাকা হ'য়ে ফুলে ওঠা ও চুলকানো থাকবে কিন্তু আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে আমবাত পৃথক রোগ; এ রোগের আক্রমণ যে কোন দেহে, যে কোন ঋতুতে, যে কোন বয়সে যে কোন দেশেই

ঘটে, কারণ অপক্ক আহার্য রস, বায়ুর দ্বারা আমাশয় (Stomach) ও দেহের সন্ধিস্থলে উপনীত হ'য়ে সেই বায়ুর দ্বারাই দ্রুত দূষিত হ'য়ে দেহের সমস্ত স্রোতকে ক্লেদযুক্ত ক'রে দেয়, তাতে সমস্ত শরীরটা ভারী হয়, প্রচণ্ড দুর্বলতা দেখা দেয়। হেন ব্যাধি নেই যে আমবাত রোগ থেকে আসতে পারে না। এ রোগটি সাধারণভাবে প্রকাশ পায় ও বিশেষভাবেও প্রকাশ পায়। এ রোগের উৎকৃষ্ট চিকিৎসা উপবাস, তিতো (তিক্ত) জিনিস খাওয়া, যাতে অগ্নিবল বাড়ে এমন জিনিস খাওয়া, যে জিনিসে শরীরের রস টেনে নেয় এবং এমন জিনিস দিয়ে সে'ক, যেমন বালির পু'টুলির সে'ক। এ ক্ষেত্রে কোন স্নেহ দ্রব্যের মালিশ, যেমন তেল লাগিয়ে মালিশ, ক্ষতিকর হয়; এমন কি কোন প্রকার ম্যাসেজ করানোও উচিত নয়।

পথ্য কি

রসুন, শু'ঠ (শুষ্ক আদা), এরণ্ড তেল (ক্যাষ্টর অয়েল), ভাজা কুলথ কলাইএর ডাল, এই ডাল ভিন্ন আর কোন প্রকার ডালই ভাল নয়। আর সব সময়ে ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করাই উচিত, এ রোগে কোন প্রকার মাছ মাংসই ভাল নয় তবে বলাধানের জন্য পাখীর মাংসের যূষ ভাল, অবশ্য ছোট মুরগী চ'লতে পারে। মোট কথা যাতে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে এমন কোন জিনিসই ব্যবহার করা ভাল নয়। তরকারির মধ্যে—পটোল, শালিঞ্চে শাক, করলা, উচ্ছে, বেগুন, সজনে শাক, সজনে ডাঁটা, আর মশলার মধ্যে আদা বাটা ও অল্প যোয়ান বাটা, এ ভিন্ন জলখাবারের ব্যবস্থা হ'লো চিড়ে ভাজা, খৈ, মুড়ি, চাল ভাজা, এই রকম শুকনো জিনিস।

অপথ্য ও কুপথ্য

দই, মাছ, গুড়, পু'ই শাক, যে কোন প্রকার ডালের খাবার অথবা ডাল, (কুলথ ছাড়া) এদিকে আখের রস, চিনি, গুড় অর্থাৎ এক কথায় মিষ্টি জিনিসই বর্জন করতে হবে। আর যে কোন রকম গুরুপাক দ্রব্যও, সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য, আর অসময়ে খাওয়া—এ সবই কুপথ্য।

শূল রোগ

এ যেন শিবের ত্রিশূল—এর কালাকাল নেই, বয়স নেই, কারণের হদিস বোঝা যায় না, রোগী তো দিশেহারা, আর চিকিৎসক সেই সঙ্গে ব্যতিব্যস্ত; এ রোগের নিয়মের বাঁধাধরা ছক দেওয়া মুস্কিল, খেলে বাড়ে কোন শূল, আবার কোন ক্ষেত্রে খেলে কমে, কারুর বর্ষাকালে বাড়ে, কারুর আবার এই সময়ে কমে যায়, কারুর রাতে বাড়ে কারুর দিনে বাড়ে, কিন্তু রাতে কমে। এই রকমই শূল রোগের ধারা, আর একটা কথা জানিয়ে রাখি, এখন খাদ্যপ্রাণ বেশী গ্রহণ করছি বলে আমরা কলা বেরুনো ছোলা, মটর ভিজানো খাই কিন্তু আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মাধব নিদানেই তো বলা আছে যে এটাতে শূল রোগ হয়; কিন্তু এ কথা আজ যদি বলি আমি উন্মাদের পর্যায়ে পড়ে যাবো না তো? তবুও কথাটা কানে তুলে দিলাম।

তবে সব রকম শূল রোগে সর্বাঙ্গে তেল মালিশ, এমন ধরণের জিনিস খাওয়া উচিত যেগুলি শরীরের রুক্ষতা আনে না অথচ অগ্নিবলকে স্থির রাখে। আর

রোগোপশমের প্রধান সরণী দাস্ত পরিষ্কার রাখা। এত হিসেব করে সাধারণের চলা সম্ভব হবে না ব'লে একটা সাধারণভাবে পথ্য ব্যবস্থা লেখা হ'লো, যবের পালো, গরম দুধে বার্লি মিশিয়ে খাওয়া, যবের আটার রুটি, তরকারির মধ্যে পটোল, সজনের ডাঁটা, কচি বেগুন; ভাল জাতের কোন কোন পাকা আম, কিসমিস, আঙ্গুর, কয়েৎবেল (তবে মিষ্টি ও পাকা হওয়া চাই), সৈন্ধব ও সচল লবণ, হিং, আদা, যোয়ান, লবঙ্গ, গরম জল, পাকা জামীরের রস, বুনো মুরগীর মাংস, বেতো শাক, ক্ষুদে নটে শাক, শালিঞে শাক, লঘুপাক খাদ্য, খইএর মণ্ড বেশ উপকারী।

অপথ্য ও কুপথ্য

তিল, সরষে, পোস্ত, ধনে বাটা মিশানো তরকারি এবং যে কোন ডাল বা ডালের তৈরী খাবার, নতুন চালের ভাত, ঠাণ্ডা খাবার, চা কফি, ফুলকপি বাঁধাকপি, সংস্বেদজ শাক যাকে আমরা চলতি কথায় ব্যাঙের ছাতা বলি, শিম, লাল কুমড়ো, বরবটি, করলা, উচ্ছে, চিচিঙ্গে, কলা বেরুনো যে কোন রকম কলাই; তা ছাড়া এ রোগে অলবণ খাওয়ার অভ্যেস করতে পারলে ভাল হয়।

উদাবর্ত ও আনাহ

এ রোগে ভরা পেটই হোক আর খালি পেটই হোক ঢেকুর উঠবেই, এমন কি যে কোন জায়গায় একটু টিপে দিলেও ঢেকুর ওঠে অথচ বদ হজমের কোন লক্ষণ নেই, এতে পিপাসাও থাকে আবার হাঁচিও হয়, আবার বমি বমি ভাব। অল্পতে ঝিমুনি এমন কি ঘুম এসে প'ড়বে, অল্প পরিশ্রমে হাঁসফাসানি। এ লক্ষণগুলি দেখে মনে হয় না যে এটা দুঃসাধ্য ব্যাধি, কিন্তু এটা একটা রোগ। এর সঙ্গে আর একটি এসে জোটে, নাম তার আনাহ। দুটি রোগ পৃথক হ'য়েও একত্র থাকে, পার্থক্য আনাহে পেটে বায়ু থাকবে আর উদাবর্তে খালি পেট, এ দুই-এর পরিণাম মূত্রকৃচ্ছ্র; মূত্রাতিসার ও অশ্মরী।

পথ্য ব্যবস্থা

প্রয়োজন হ'লে তীক্ষ্ন অথবা মৃদু বিরেচন নিতে হয়। নিত্য একটু ক'রে মাংসের যূষ খাওয়ার অভ্যেস করতে হয়, মাংস নয়।

তরকারি হিসেবে—কচি মুলো ও বেগুন, নটে ও বেতো শাক, কাঁচা পে'পে, আলু (অল্প), পটোল খাওয়া যায়।

জলখাবার হিসেবে—কিসমিস, তবে এটা লবণ জলে ভিজিয়ে খেলে ভাল হয়। আর ফলের দিকে শাঁক আলু, পানিফল। তিল তেলের রান্না, লবঙ্গ বাটা, ভাজা হিং, তেজপাতা, যাঁরা মৃতসঞ্জীবনী সুরা সহ্য করতে পারেন তাঁরা দু'বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর একটু একটু খেতে পারেন। এদের ক্ষেত্রে পাতলা দুধই ভাল।

অপথ্য ও কুপথ্য

আলু জাতীয় কোন দ্রব্য, এবং কোন প্রকার ডাল এ রোগে ভাল নয়,—আর

ভাল নয় নাল্‌তে পাতা, তিল, পোস্ত এবং সরষে বাটা, সরষের তেল, কোন রকম পিঠে (পিষ্টক) খাওয়া চলে না। কোন প্রকার ভাজাভুজি এমন কি পাঁউরুটি বিস্কুট পর্যন্তও অপথ্য; এ দিকে মহিষের দুধ এবং দই, পাতলা বা জমাটি ছানা, জাম, কাঁচা আম, নিমের শুক্তু, শিম; আর কোন প্রকার গুরুপাক খাদ্য, এ রোগের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর হ'লো উপবাস।

গুল্ম

সাধারণের ধারণা গুল্ম রোগটি বুঝি কেবলমাত্র নারীজাতিরই হয়, তা নয়, এ রোগ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হ'য়ে থাকে, এ রোগ নারীজাতির হ'লে হবে মাসিক ঋতু বন্ধ আর গর্ভের অন্যান্য লক্ষণ, বাকী অরুচি, মলমূত্রের কষ্টকর প্রবর্তন, পেটে বায়ু, মাঝে মাঝে পেটে গুড় গুড় শব্দ আর হবে ঢেকুর। এ রোগে অধো বায়ু নিঃসরণ হয়ই না। আয়ুর্বেদের চিন্তাধারা হ'লো গর্ভ কিনা নিঃসন্দেহ না হ'লে নারীদের ঔষধ ব্যবহার করা নিষেধ। তাই তাঁরা বিধান দিয়েছেন দশ মাস অতিক্রম ক'রে চিকিৎসা আরম্ভ করতে; আর পুরুষের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন এ রোগ হ'য়ে থাকলে শস্ত্র চিকিৎসার আওতায় আসে এবং নারীর ক্ষেত্রেও তাই।

পথ্য

মোট কথা আহার ও ঔষধ এমন ধরণের হবে, যেটায় দাস্ত পরিষ্কার থাকে, মাঝে মাঝে উপবাস এটাও উপকারী, কুলথ কলাইএর যূষ, ছাগলের দুধ, পাকা জামীর লেবুর রস, ফলসা ফল, থৈকলের চাটনি, কচি মূলো, শালিঞ্চে ও বেতো শাক, সজনে শাকও খাওয়া যায় তবে ওকে সিদ্ধ ক'রে জল ফেলে তারপর তাকে রান্না করা। আর এদিকে ফলের মধ্যে দাড়িম, কিসমিস আর আমলকীর মোরব্বা। এ রোগে রসোন উপকারী। হ্যাঁ, বিশেষ কথা, এই সব তরকারি এরণ্ড তেলে (Castor oil) পাক ক'রে খাওয়ার কথা বলা আছে। তবে রিফাইন্‌ড্‌ ক্যাস্টর অয়েল হলে আর কোন গন্ধ লাগে না।

অপথ্য ও কুপথ্য

এমন কোন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয় যাতে বায়ু বাড়ে, তা ছাড়া বিরুদ্ধ ভোজন, কোন প্রকার মাছ ও মাংস, মিষ্টি রসের ফল, এবং মুগ মসুর ও ছোলার ডাল, কোন প্রকার গুরুপাক জিনিস ও বার বার জল খাওয়াটাও অপথ্য। এ রোগে বমন প্রবৃত্তিটা তাড়াতাড়ি বন্ধ ক'রে দিতে হয়, অথবা যাতে বমন হ'তে পারে এমন কোন জিনিস ব্যবহার করা উচিত নয়।

হৃদ্‌রোগ

বঙ্গদেশ ব'ললে যেমন রাঢ়, বরেন্দ্র, পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি বহু ভূখণ্ড প'ড়ে যায়, আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় হৃদয়ও তেমনি, এর অন্তর্গত বক্ষস্থল, ফুসফুস, হৃদযন্ত্র ও উরশ্চদ (প্লুরা) প্রভৃতি যত ক্রিয়াশালী যন্ত্র আছে সবকেই ধরা হয়। এটি একটি সংজ্ঞা-

মাত্র, আর বর্তমান মতে হৃদযন্ত্রটাকেই (heart) কেবল হৃদয় বলা হয়। সেই প্রাচীন মতে এখানে শ্লেষ্মধাতু বিকারগ্রস্ত হ'লে কফের আধিক্য আসে এবং বায়ুকে অনুবন্ধি ক'রে বাত শ্লেষ্মবিকারজনিত যাবতীয় রোগ সৃষ্টি করে, মোট কথা কফের সংশ্রব থাকবেই। অতএব হৃদ্‌রোগ ব'লতে গেলে আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় মূলতঃ কফের অস্তিত্বকে বাদ দিয়ে ওখানের চিকিৎসা করলে চলবে না।

হৃদযন্ত্রের রোগ হ'লে বমন করানো নিষিদ্ধ সত্যি, কিন্তু হৃদয়ের ক্ষেত্রে কফের প্রাধান্যে কোন রোগ হ'লে সেখানে বমন করানো বিধি।

পথ্য

উপবাস করা; ডুস নেওয়া এ রোগের অন্যতম পথ্য, পুরাতন ধানের চালের ভাত, ছোট বন্য পাখীর মাংস, মুগের ডালের যূষ, চাল্‌তার অম্বল, পটোল, কচি কাঁচা কলা, কচি মুলো, পুরোনো চালকুমড়োর তরকারি, পাকা আম, ও কিসমিস, ঘোল, যোয়ান, আদা, রসোন, অল্প ধনে বাটা, গোল মরিচ; মাঝে মাঝে পান খাওয়া, উৎকৃষ্ট মদ্যও ঔষধের মাত্রায় খাওয়াটা খারাপ নয়।

অপথ্য ও কুপথ্য

এই হৃদযন্ত্রের রোগে (heart disease) এমন কোন খাদ্য খাওয়া উচিত নয়, যাতে অরুচি, তৃষ্ণা বা বমির বেগ আসে। মূত্ররোগ বা অধোবায়ুর সৃষ্টি হয় এমন দ্রব্য খাওয়া উচিত নয়, এ রোগে উষ্ণবীর্য জিনিস, যেমন চিচিংগে, বরবটি, ছোলা ও অড়হরের ডাল, শিম, তরমুজ প্রভৃতি জিনিস খাওয়া উচিত নয়, আর বর্জন ক'রতে হবে গুরুপাক দ্রব্য, পাতা শাক, উৎকট ঝাল, আর লবণ সম্পর্কে বিশেষ সাবধান হতে হয়। যাঁরা হৃদ্‌রোগগ্রস্ত তাঁরা লবণ বর্জন না ক'রলে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হওয়াটা অসম্ভব নয়।

মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ

এটি তিনটি স্থানকে আশ্রয় ক'রে হ'য়ে থাকে; (১) মূত্রাশয় অর্থাৎ কিড্‌নিতে, (২) বস্তিদেশে অর্থাৎ মূত্রথলিতে আর মূত্রদ্বারে অর্থাৎ প্রোষ্টেট্‌ গ্লান্ড্‌ যেখানে অধিষ্ঠিত; এ রোগ আসার হেতু সাধারণভাবে—যাঁরা তীক্ষ্ণবীর্য দ্রব্য আহার করেন, যেমন পাকা মাছ, পায়রার মাংস; তরকারির মধ্যে ওল, মানকচু, মুলো এইসব জিনিস, আর ভাল জীর্ণ হয়নি সে অবস্থায় আবার খাওয়া, যাকে বলা হয় অজীর্ণে ভোজন, মাংস গুরুপাক ক'রে রান্না ক'রে খাওয়া, এইসব কারণে এ রোগ আসে, আবার অনেক ক্ষেত্রে গণোরিয়ার পরিণতিতেও এ রোগ আসতে পারে।

পথ্য কি

আমলকীর মোরব্বা, গুলঞ্চের রস, শ্বেত পুনর্ণবা শাক, গমের তৈরী খাবার, ছোট এলাচ, ছাগলের দুধ, কিসমিস, পুরাতন ধানের চালের ভাত, টাটকা ঘোল, টাটকা দই, কাল কলাইয়ের যূষ, পুরানো চালকুমড়োর তরকারি, পটোল, বন আদা, ডাবের শাঁস, খেজুর, তাল আঁটির শাঁস, খেজুর রস এবং তালের তাড়িও অল্পমাত্রায় ভাল।

অপথ্য কি

এ'দের ব্যায়াম থেকে বিরত থাকা ভাল, বেশী পথ হাঁটা, কাঠের আসনে বসা, যানবাহনে বেশী দূরে ভ্রমণ করা। আহারের ক্ষেত্রে মাটির নিচের তরকারি, পাকা এবং তৈলাক্ত মাছ, আর অন্যান্য গুরুপাক দ্রব্য খাওয়া।

এই মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের পথ্য ও অপথ্য যেটা বলা হ'লো এটাকে মেনে চ'লতে হয় অশ্মরী (পাথুরী) ও সর্বপ্রকার মেহরোগ ও প্রমেহ (পূযযুক্ত) রোগ আর সোম রোগের ক্ষেত্রে।

মেদোরোগ

ভূরি ভোজন করা, দিবা নিদ্রা, কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ, এই তিনটি মূলীভূত কারণ হ'লেও শারীর ক্রিয়ায় রসবহ ও রক্তবহ স্রোতের মধ্যে সাবলীল গতিটা বাধা পেতে থাকে, এটাও যত না ক্ষতি করে, তার থেকে আরও নিমিত্তের কারণ হয়ে থাকে এই মেদোগত অগ্নির স্বল্পতা; যাকে বলা যায় মেদের মেটাবলিজিম্ হ্রাস হওয়া।

এর প্রতিকারের উপায়—ঔষধ না খেয়ে ক্রিয়াকরণের দ্বারা কমাতে হ'লে মাঝে মাঝে উপবাস, রাত্রি জাগা, প্রত্যহ খানিকটা ক'রে হাঁটা, গায়ে রৌদ্র লাগানো, আর এদিকে মাঝে মাঝে জোলাপ নেওয়া, প্রত্যহ সকালে ১ গ্লাস ঠাণ্ডা জলে ২ চামচ খাঁটি মধু মিশিয়ে খাওয়া; আহার্য হিসেবে ঘৃত বর্জিত দ্রব্য খাওয়া, চালের বিচার ক'রে খেতে গেলে—কোদো, শ্যামা ও কাঙনী ধানের চালের ভাত (বর্তমানে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ) ভাজা কুলত্থ কলাইয়ের ও অড়হরের ডাল, যে কোন প্রকার তিক্ত দ্রব্য (এক রকম) প্রত্যহ কোন কোন ভাবে খাওয়া ভাল। বেগুন পোড়াও মন্দ নয়, চিংড়ি মাছ খাওয়া যাবে, তবে এটাতে যাঁদের এলার্জি হয় তা হ'লে চ'লবে না, এ ভিন্ন সরষের তেল, পত্র (পাতা) শাক, মূলো, ওল, মানকচু খাওয়া যেতে পারে, এগুলি কিন্তু রোগোপশামক হিসেবে লেখা হ'লো।

অপথ্য কি

গমজাত খাদ্য, (তবে ঘৃত বর্জিত কড়া সে'কা রুটি খাওয়া যেতে পারে)। আর অপথ্য হ'লো ছানা, কড়াইএর ডাল, ঘিয়ের খাবার, মাছ, মাংস, দিবা নিদ্রা, মিষ্টি খাবার, মিষ্টি রসের ফল, খাওয়ার পর বেশী জল পান করা, ঊষা পান, কোন রকম পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়া, খইএর মোয়া, এগুলি খাওয়া উচিত নয় অর্থাৎ মেদস্বী হ'লে এগুলি বর্জন করে চলতে হবে।

উদর রোগ, প্লীহা-যকৃৎ রোগ ও শোথ রোগ

এই রোগগুলি প্রায় জন্ম নেয় অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ থেকে, কারণ এ সব রোগ যেমন স্বেদবহ স্রোত ও অম্বুবহ স্রোত রুদ্ধ হ'য়ে সৃষ্টি করে তেমনি প্রাণবায়ু, অপানবায়ু ও জাঠর অগ্নি দূষিত হ'য়েও এ সব রোগ সৃষ্টি হ'তে পারে। তার দ্বারা আসে দৌর্বল্য, চলৎশক্তির হ্রাস ও অগ্নিমান্দ্য।

এ সব রোগের পথ্য

মাঝে মাঝে উপবাস, পুরানো গোটা কুলত্থ কলাইএর যূষ, মুগের যূষ (গোটা মুগ), যবের পালো, যবের ছাতু, আদা, শালিঞ্চে শাক, ছোট ছোট বন্য পাখীর মাংস, পলতা, পুনর্ণবা, সজনের ডাঁটা, রসুন, ছাগল দুধ (পাতলা করে), করলা উচ্ছে এবং তিক্ত স্বাদের খাবার, বড় এলাচ, ভাজা জীরের গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে টাটকা ঘোল, কাঁচা পেঁপের তরকারি, লবণটা বর্জন করতে পারলে ভাল।

অপথ্য কি

উপরি উক্ত রোগগুলিতে ঘিয়ের খাবার ও নোনতা খাবার খাওয়া, বেশী জল পান করা, দিবা নিদ্রা, জলার মাংস (কচ্ছপ, শামুক প্রভৃতি), পত্র শাক, শিম, অড়হর বা ছোলার ডাল, এবং ডালজাত গুরুপাক খাদ্য, ধূমপানের অভ্যাস আর লবণ খাওয়া, ও বিনা জলে মদ্য পান করা।

এই রোগগুলির মধ্যে শোথের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ পথ্যাপথ্য সম্পর্কে বলি—পুরানো ধানের চালের ভাত, যবের ও কুলত্থ কলাইয়ের যূষ, বন্য ছোট পাখী, কচ্ছপ ও মুরগীর মাংস, শিঙ্গী মাছ, অসুবিধে না হ'লে পুরানো ঘিয়ে রান্না করা তরকারি, টাট্‌কা ঘোল আর এদিকে তরকারির মধ্যে কচি শিম, গাজর, পটোল, বেতের ডগা, মুলো, সাদা বা লাল পুনর্ণবা শাক, কচি নিমপাতা, কুলেখাড়া শাক, লাল সজ্‌নে শাক ও ডাঁটা। এ রোগে মাঝে মাঝে উপবাস, রক্তমোক্ষণ, স্বেদ দেওয়া, কাঁচা-পাকা জলে স্নান করা বিশেষ পথ্য।

শোথের ক্ষেত্রে বিশেষ নিষেধ

কোন রকম দূষিত বায়ু-বন্ধ ঘরে থাকা, বাসি জল পান করা, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ করা, অনিয়মিত সময়ে খাওয়া, যখন তখন জল পান করা, দই, পিঠে, ভাজা জিনিস, শুক্‌নো এবং বাসি মাংস খাওয়া, দিবা নিদ্রা ও যৌন সংসর্গ বিশেষভাবে বর্জন করা উচিত।

বৃদ্ধি রোগ (হাইড্রোসিল)

কুপিত বায়ু অধোগামী হ'য়ে যখন কুঁচকি থেকে অণ্ডকোষে এসে ফলকোষবাহিনী ধমনীগুলিকে পীড়িত করে তখনই এ রোগের উৎপত্তি হয়।

এ রোগে বায়ুর প্রাধান্য থাকে, সেইজন্য এটি বাতব্যাধিরই অন্তর্গত; যদি এই বাতব্যাধিটি অন্ত্রগত হয়, তবে শল্যতন্ত্রের আশ্রয় নিতে হয়, অর্থাৎ শস্ত্রচিকিৎসার আওতায় এসে যায়। এই অন্ত্রগত বায়ু আর এক প্রকার রোগ সৃষ্টি করে, সেটাকে আয়ুর্বেদে বলা হয় ব্রধ্নরোগ, যাকে বর্তমানে বলা হয় হার্ণিয়া।

এ রোগাক্রমণের পূর্বে ও পরে কি পথ্য

মাঝে মাঝে রক্তমোক্ষণ করানো ভাল, শোধিত এরণ্ড তেলের (ক্যাস্টর অয়েল)

রান্না তরকারি খাওয়া, এরণ্ড তেলের বস্তি (ডুস নেওয়া), পুরানো ধানের চালের ভাত, ছোট ছোট পাখীর মাংস, ঘোল, গরম জল, মধু, পুরানো ঘি খাওয়া।

তরকারির মধ্যে—সজনের ডাঁটা, পটোল; লাল বা সাদা পুনর্ণবা শাক; বেগুন, গাজর, তা ছাড়া আমবাতে লেখা যে সব পথ্য।

এ রোগে কুপথ্য

বিরুদ্ধ সংযোগের আহার, অসাত্ম্য খাদ্য (তা সে যতই উপকারী হোক্ না), দই, মাষকলাই, দুধ, পুঁইশাক, কোন রকম মাছ মাংস, গুরুপাক খাদ্য। এ ভিন্ন একটা বিশেষ হ'লো যদি কামোদ্রেক হয়, তা হ'লে সেই বেগ এ রোগে দমন করাটা আরও ক্ষতিকর, সুতরাং সেইমত নিজেকে সাবধান হ'য়ে চ'লতে হয়।

গলগণ্ড

এ রোগ গলাতে মালার মতও হয় আবার কণ্ঠনালীর উপরেও হয়। বায়ুই কফ এবং বিকৃত মেদকে উপাদান ক'রে গলার পিছন দিকে মন্যা নামে যে দুটি শিরা আছে তাদিকে আশ্রয় ক'রে সৃষ্টি হ'লেও সামনের দিকে রূপ পরিগ্রহ করে। আয়ুর্বেদ মতে এটিও শোথ রোগের অন্তর্গত। অতএব শোথরোগের পথ্য এ রোগে উপকারী, তা ছাড়াও যব, মুগ এবং পটোল প্রধান আহার্য দ্রব্য হওয়া ভাল; এবং রসুন খাওয়াও ভাল। বিশেষ উপকার হচ্ছে মাঝে মাঝে বমি করানো, পুরানো ঘিএ রান্না করে খাওয়া, পুরানো ধানের চালের ভাত, সজ্নের ডাঁটা, করলা, শালিঞ্চে শাক, বেতোর ডগা, এবং নিত্যই অল্প ক'রে মাংসের যূষ, তার সঙ্গে অল্প আদা বাটা দেওয়া যায়।

অপথ্য কি

দুধ বা দুধের জিনিস যত, আখের রস, পিঠে পায়েস, মিষ্টি, গুরুপাক খাদ্য, সংযোগ বিরুদ্ধ খাদ্য।

শ্লীপদ বা গোদ রোগ

বিকৃত বায়ু, পিত্ত, কফ ও মেদ এ রোগের হেতু। এই রোগের পূর্বরূপে দেখা দেয়—নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ কাঁপুনি, আবার কোন কোন সময় অল্প জ্বরও তার সঙ্গে, এটা প্রধানভাবে হ'য়ে থাকে একাদশী থেকে অমাবস্যা বা পূর্ণিমার মধ্যে, তারপর অনেকের কুঁচকি বা বগলের গ্রন্থিগুলি (গ্ল্যাণ্ড) ব্যথা হয়। তার সঙ্গে অল্প ফুলো থাকে, এ ফুলো আর কমে না, পুনরায় জ্বর হ'লে ওটা আরও একটু বেড়ে যায়, এইভাবেই তার বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে। সাধারণতঃ এই রোগ আশ্রয় ক'রে কানের ও চোখের পাতায়, হাতে বা পায়ে, নাকের ডগায় ও ঠোঁটে, কনুইএর পর্বের উপর দিকটায় এবং জননেন্দ্রিয়ে।

সংস্কৃত ভাষায় একে বলা হয় শ্লীপদ, অর্থাৎ শিলীভূত (পাথরের মত) পদ।

পথ্য কি

এ রোগে উপবাস, বমন, রক্তমোক্ষণ, জোলাপ নেওয়া, পুরানো ধানের চালের ভাত, যব, কুলত্থ কলাই, রসুন, পটোল, কচি বেগুন, সজনের ডাঁটা, করলা উচ্ছে, পুনর্ণবা শাক, এরণ্ড তৈল ও অন্যান্য তিক্তদ্রব্য; এ রোগে কচি মুলো বেশ উপকারী।

অপথ্য ও কুপথ্য কি

কোন প্রকার পিঠে (পিষ্টক), দুগ্ধজাত দ্রব্য যেমন ছানা ক্ষীর প্রভৃতি, গুড়, মাংস, মিষ্টি খাবার, নদীর জল (পানের উপযুক্ত হলেও নয়), গুরুপাক খাদ্য, পিচ্ছিল খাদ্য, শ্লেষ্মাকর দ্রব্য, আতা, চালতা, আমড়া এগুলিকে বর্জন ক'রে চ'লতে পারলে ভাল হয়।

ভগন্দর

এটি স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েরই হয়, মলদ্বার থেকে এক ইঞ্চি ব্যাসের মধ্যে। কেবল স্ত্রী জাতির ক্ষেত্রে আর একটি রোগ হয়ে থাকে তাকে বলে 'যোনিকন্দ', সেটা হয় যোনি ও মলদ্বারের মাঝখানে, এটিও ঐ ভগন্দর জাতীয় রোগ।

এ রোগে পথ্য কি

উপবাস, রক্তমোক্ষণ একান্ত প্রয়োজন, তা ছাড়া পুরানো ধানের চালের ভাত, গোটা মুগের যুষ, যব ও মুগ এক সঙ্গে সিদ্ধ করে তার যুষ, ছোট পাখীর মাংস, পটোল, সজনের ডাঁটা, বেতের ডগা, কচি মুলো, তিল তেলের রান্না আর তিতো (তিক্ত) তরকারি রান্না খাওয়া।

অপথ্য এবং কুপথ্য

সংযোগ বিরুদ্ধ খাদ্য, রৌদ্র লাগানো, অসময়ে খাওয়া, যানবাহনে চড়া, কাঠের আসনে এবং শক্ত জায়গায় অথবা উবু হ'য়ে বসা, কোঁথ দিয়ে মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। আর একটা বিষয়ে বলা দরকার যে যতদূর সম্ভব যোনি সংসর্গ বর্জন করা।

কুষ্ঠরোগ

নামটা শুনলেই লোকে আঁতকে ওঠে, কিন্তু যদি আয়ুর্বেদ পরিভাষা দেখা যায়, আঁতকে ওঠার কোন কারণ নেই। অর্থাৎ কুৎসিতভাবে যে বসে থাকে সেইই কুষ্ঠ, ঘামাচি, চুলকণা, ছুলি এরাও তো কুষ্ঠ; কিন্তু কোন ক্ষেত্রে এই দোষ কুপিত. কোথাও দূষিত আবার কোথাও সে আক্রান্ত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে; কিন্তু এই একটি রোগ যে রোগে এই তিনটি উপসর্গের দ্বারা সে আত্মপ্রকাশ করে। কোন জায়গায় সে রসধাতুকে দূষিত ক'রে কয়েকপ্রকার রোগ সৃষ্টি করে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সে রক্তধাতুকে দূষিত ক'রে সৃষ্টি করে, আবার মাংস ও অস্থিকেও সে

বাদ দেয় না, তবে দেখা যায় তার অভিব্যক্তি চর্মকে কেন্দ্র ক'রে; তাই আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় চর্মরোগ মাত্রেই সে কুষ্ঠের পর্যায়ভুক্ত—এই দৃষ্টি নিয়েই কুষ্ঠরোগ নামটি দেওয়া। এই রোগটির সাধারণ সংখ্যা করা হয়েছে সাত প্রকার, আর বিশেষ সংখ্যা করা হয়েছে আঠারো প্রকার। এই রোগে বিশেষ বিশেষ দোষের প্রাধান্য দেখে বাতপ্রধান ঘৃতপানকে প্রশস্ত করা হয়, আর পিত্তপ্রধানে বিরেচনকে এবং শ্লেষ্ম-প্রধানে বমনকে, তা ছাড়া পিত্তপ্রধানে রক্তমোক্ষণ এক প্রশস্ত ক্রিয়া, প্রলেপ দেওয়াটাও অন্যতম একটা উপায়। তবে শেষোক্ত পদ্ধতিটি ত্বক্‌গত কুষ্ঠে বেশী উপকারী, যেমন দাদ, কণ্ডু, সিধ্ম (ছুলি), কিটিম (একজিমা) বিচর্চিকা (চাপড়া ঘামাচি), কচ্ছু (খোস), শ্বিত্র (শ্বেতি) প্রভৃতি।

পথ্য কি

এ সব রোগে আক্রান্ত হ'লে প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক হিসেবে পুরানো ধানের চালের ভাত, গমের ডালিয়া, অড়হর এবং মসুর ডালের যূষ; টাট্‌কা মধু, ছোট ছোট পাখীর মাংস, বেতের ডগা, পটোল, কাকমাচি শাক, কচি নিমপাতা, হিঞ্চে ও পুনর্ণবা শাক, চাকুন্দের পাতা ও ফুলকে শাকের মত রান্না করে খাওয়া রসুন, পাকা তাল, পুরানো ঘি, এ ভিন্ন তিক্তরসের শাকপাতা। চর্মরোগের ক্ষেত্রে রান্নার জন্যে তিল তেলটাই প্রশস্ত।

অপথ্য ও কুপথ্য

বিরুদ্ধ ভোজন, দিবা নিদ্রা, রৌদ্র লাগানো, কোন প্রকার ভাপ লাগানো, স্ত্রী-পুরুষে এক শয্যায় অবস্থান, ব্যায়াম, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, এ ছাড়া আখের রস, চিনি, টক ফল, টক রসের দ্রব্য, মাষকলাই, খেঁসারির ডাল, পথ্যে লিখিত কাকমাচি শাক ছাড়া অন্য কোন শাক; মুলো, ডিম, যে কোন প্রকারের মাছ ও মাংস, নদীর জল, দই, দুধ, গুড় বা গুড়ের পাককরা জিনিস; এ রোগে মদ্যপান সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর।

শীতপিত্ত, উদর্দ (ইরিসিপ্লাস), কোঠ (মণ্ডল কুষ্ঠ) কুষ্ঠের পথ্য, অপথ্য ও কুপথ্যগুলিকে মেনে চলতে হয়।

অম্লপিত্ত রোগ

একটি প্রচলিত কথা আছে যে—'ছুঁচ হ'য়ে ঢোকে ফাল হ'য়ে বেরোয়'; এই একটি রোগ যেটা এই উপমারই উপযুক্ত স্থল। দেহ রাখতে গেলে আহার করতেই হবে সত্যি, কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা করে খাওয়ার হিসেব সবাই করে না। পেটে ক্ষিধে থাকলে খাওয়ার আবার হিসেব কি, কিন্তু তা নয়; এত বেছে গুছে খাওয়া মানেই রোগ ডেকে আনা এ ধারণা যাঁর হবে, তাঁর কিন্তু গর্তে পড়ে যেতে হবে। এই ধরুন ঘাস পাতা জ্বাললেও আগুন হয়, আবার কাঠ খড়েও আগুন হয়, সেই রকম ঘুঁটেতেও আগুন হয়, তারপর গ্যাস, কয়লা, বিদ্যুৎ, দাবাগ্নি, বাড়বাগ্নি সবেতেই তো আগুনের উষ্মা আছে, কিন্তু সব আগুনেরই পরিপাক শক্তি কি এক? তা তো নয়—পাতার আগুনে কি মানুষ পোড়ে, আবার কাঠের আগুনে কি লোহা গলে? দেহের অগ্নিবলেও সেইরকম কেউ লোহা খেয়ে হজম ক'রছে, কেউ আবার

সাগু খেয়ে ঢেকুর তুলছে; অতএব দেহের আকৃতি প্রকৃতি যখন একরকম হয় না তখন অগ্নিবলও একরকম থাকে না। এর আর একটা কারণও থাকে, যেমন পচা ছানা আর দোলো চিনিতে ভাল সন্দেশ তৈরী হয় না,—সেই রকম রুগ্ন মা-বাপের সন্তানও কি তাঁদের প্রকৃতি থেকে কিছু পাবে না? তবে মার কাছ থেকেই সে বেশী পায়, যেহেতু মার থেকে সে পেয়েছে রস, রক্ত ও মাংস; সুশ্রুত বলেছেন যকৃতের বল পায় মার কাছ থেকে আর হৃদয়ের বল পায় বাবার কাছ থেকে। আবার দেশ-ভেদে জলবায়ুর আহার্যের ভেদ হয়, সেজন্য তাদের প্রকৃতির পার্থক্যও ঘটে। আমরা দেখতে পাই এক এক দেশে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস।

যে অম্লপিত্ত রোগটির সম্বন্ধে এখন আমার পথ্যাপথ্যের নির্বাচন, সেটির মুখ্য বক্তব্য দুধ দিয়ে মাছ রান্না ক'রে খাওয়ার অভ্যাস এবং তা জীর্ণ করার সামর্থ্য সাময়িক-ভাবে থাকলেও বস্তুশক্তি যখন বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না, নিজের কাজ নিজেই করে, তেমনি বিরুদ্ধ সংযোগের আহার্যগুলি কিছুদিনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেই করে, এমন কি ওষধিটিও প্রয়োগের ক্ষেত্র উপযুক্ত না হলে সেটা প্রয়োগ ক'রে আপাতঃদৃষ্টিতে রোগ সামলানো যায় বটে, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া সে করবেই। যার ফলে অম্লপিত্ত রোগের উদ্ভব হবে। অতএব নিজে মৌলিকরোগ না হয়েও অনেক রকম ঝঞ্ঝাট ঘটিয়ে দেয়, যেমন ব্লাড্ প্রেসার, জলোদর, শোথ, জটিল অগ্নিমান্দ্য, জণ্ডিস্, বাত, মুখে ক্ষত, অন্ত্রে ক্ষত, হৃৎশূল এমন কি ক্যান্সার পর্যন্ত—এ যেন নারদের ভূমিকা।

এ রোগের প্রথমাবস্থায় ঊর্ধ্বগত বায়ুর চাপ থাকলে অর্থাৎ গলা-বুক-জ্বালা, ঢেকুর এইসব উপসর্গ আরম্ভ হ'লে বমন করানো ভাল আর অধোগত হ'লে বিরেচন দেওয়া ভাল, আর একসঙ্গে দুটি হ'লে আহার কমাতে হবে।

পথ্য হিসেবে

পুরানো ধানের চালের ভাত, যবের পালো, গোটা মুগের যূষ, মশলাবিহীন রান্না-করা পাখীর মাংস, মধু মিশিয়ে যবের ছাতু খাওয়া। তরকারির দিকে—পটোল, কাঁকরোল, বেতো ও হিঞ্চে শাক, বেতের ডগা, পাকা চালকুমড়ো, মোচা, কয়েৎবেল (পাকা), দাড়িম, আমলকী, অল্প তিক্ত রস, অল্প তিল তেলে রান্না তরকারি (ব্যঞ্জনাদি)।

এদের ক্ষেত্রে কুপথ্য কি

নূতন ধানের চালের ভাত, বিরুদ্ধ সংযোগের খাবার, রুক্ষ শুষ্ক খাবার, মাষকলাই, কুলথকলাই, সরষের তেল, সরষে, লঙ্কা, ডিম, লবণ, মাছ, মাংস, গুরুপাক দ্রব্য, দই, মিছরির সরবৎ, লেবুর রস; মরিচের ঝাল, ঘোল, ছানা, ক্ষীর এদের কোনটাই ভাল নয়। তবে রোগের প্রকোপ ক'মে গেলে অল্পস্বল্প বিনা মশলায় মাছের ঝোল খাওয়া যায়, কিন্তু চর্বি যেন না থাকে।

বিসর্প, অগ্নিবিসর্প, কর্দমবিসর্প, গ্রন্থিবিসর্প

এই রোগগুলির মূল প্রকৃতিটি প্রায় কুষ্ঠেরই মত, প্রভেদ হ'লো—কুষ্ঠে একসঙ্গে

রক্ত ও পিত্তের প্রাবল্য থাকে আর বিসর্পে রক্ত এবং পিত্ত পৃথক পৃথকভাবে প্রবল বিকৃত হ'য়ে দেখা দেয়।

কুষ্ঠরোগে দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) আর দূষ্য অর্থাৎ রস, রক্ত মাংস প্রভৃতি ধাতুকে দূষিত ক'রে দীর্ঘদিন অবস্থান করে।

আর বিসর্পে এই দোষ ও দূষ্য অংশ দ্রুত প্রসর্পিত হয়, এবং দ্রুত ক্ষত সৃষ্টি করে প্রধানতঃ কোমল অঙ্গে, গ্রন্থিতে ও কোমলাস্থিতে। এইটাই বর্তমানের ক্যানসার রোগ, সে যে ধরণেরই হোক্।

এ ক্ষেত্রে করণীয় কি

তাঁরা রক্ত পরীক্ষার কথা বলেছেন, কিন্তু কিভাবে করা হ'তো তার সূত্র আজ আর পাওয়া যায় না। আর করা হ'তো রক্ত মোক্ষণ। সামান্য লক্ষণ দেখা দিলে নিমছাল, পলতার ক্বাথ ক'রে খাইয়ে বমন করানোর ব্যবস্থা ছিল, এর দ্বারা আমাশাকে (ষ্টমাক্) শোধন করা হ'তো।

পথ্য কি

পদ্মের মৃণাল (মাটির নিচে দিয়ে যে ফেক্ড়ি চলে, এটা মূল থেকে বেরোয়), মোচার তরকারি, গোটা মসূর, মটরের যূষ, তিক্ত রসপ্রধান খাদ্য আর ঘি দিয়ে সাঁতলানো তরকারি এবং কাঙ্গনি ধানের চালের হালুয়া (ঘি দিয়ে), পুরানো ধানের চালের ভাত, তাও ঘি দিয়ে, ছোলা ভিজানো জলে অল্প দুধ মিশিয়ে স্নান করা, গায়ে রক্তচন্দন মাখা আর বালা (pavonia odorata) বেটে গায়ে লাগানো।

এই পথ্যটি যে কোন চর্মরোগেই ব্যবহার করা উচিত।

অপথ্য ও কুপথ্য কি

যে কোন রকম শাক, বিরুদ্ধ ভোজন, দই, ঘোল, কোন প্রকার আসব, অরিষ্ট, মদ; এদিকে ছানা, রসোন, কুলখকলাই ও মাষকলাইএর যূষ, মাছ, মাংস; যে কোন টক জিনিস, ঝাল, তিল ও পোস্ত বাটার তরকারি, সরষে বা তিল তেলে রান্না তরকারি এগুলি ক্ষতিকর হয়।

এ ভিন্ন রৌদ্র লাগানো, ব্যায়াম করা, দিনে ঘুমানো, বেশী হাওয়া খাওয়া উচিত নয়। এটা মনে রাখা দরকার, যে কোন চর্মরোগের পক্ষেই এগুলি ক্ষতিকর হয়।

বসন্তরোগ

এই রোগ বর্ষা, গ্রীষ্ম ও শরতে প্রায়ই হয় না, বসন্ত ঋতুতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হয় বলেই তাকে উপলক্ষ্য ক'রে এই নামকরণ। কিন্তু এর আয়ুর্বেদিক নাম মসূরিকা, যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর স্ফোটকগুলি দেখতে গোটা মসুর কড়াইএর মত হয়। এই রোগের কারণ পিত্ত শ্লেষ্মার আধিক্য, এরা রস রক্তাদি সপ্তধাতুর যে কোনটিকে আশ্রয় ক'রে উদ্ভূত হ'তে পারে। যেমন রসধাতুকে আশ্রয় করে যে বসন্ত হয়, তাকে

আমরা বলি পানি বসন্ত, চিকেন্ পক্স্ (chicken pox); তারপর রক্ত-মাংস প্রভৃতি উত্তরোত্তর পরিণত ধাতুকে দূষিত ও আশ্রয় ক'রে যে সব বসন্ত উদ্ভূত হয়, সেগুলিকে আমরা বলি small pox; সাধারণে একে বলে জাত বসন্ত। যত গভীরে এই রোগের সৃষ্টি হয় তাদের আকৃতি কিন্তু ছোট হ'তে দেখা যায়, কিন্তু মারাত্মক।

আর একটা কথা, বসন্তের রং দেখে চিকিৎসক জানতে পারেন এটা কোন্ ধাতুকে আশ্রয় করেছে, যেমন রক্তগত হ'লে লাল হয়, মাংসগত হ'লে আকৃতিতে মুখবিহীন লাল আমবাতের (শীতপিত্তের) মত হয়, এইভাবে তার বিচার ক'রে নেওয়া হয়। তবে চিকিৎসক কখনও মনে করেন না যে চরণামৃত খাইয়ে ফেলে রাখলেই চলবে।

এ রোগে পথ্য

উপবাস (রসগত পানিবসন্ত হ'লে), প্রয়োজন হ'লে বমন, পুরানো ধানের চালের ভাত, গোটা ছোলা, মুগ ও মসুরীর যে কোনটির যূষ খাওয়ানো যায়। সংস্কারে না বাঁধলে ছোট ছোট পাখীর মাংসের যূষও খাওয়া যায়; আর তরকারির মধ্যে পটোল, করলা উচ্ছে, কাঁকরোল, কাঁচা কলা, সজনের ডাঁটা, হিঞ্চেশাক, ফলের মধ্যে কেবল কিসমিস। এ ছাড়া নিসিন্দে বা নালতে পাতা সিদ্ধ করে সেই জলে স্নান। বসন্তের গুটিগুলি শুকিয়ে গেলে, কাঁচা হলুদ বাটা মেখে স্নান করা ভাল।

অপথ্য ও কুপথ্য

রোগী স্ত্রী-পুরুষের এক শয্যায় শয়ন অনুচিত, মশারির মধ্যে রোগীকে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এ ভিন্ন তেল মাখা, গুরুপাক দ্রব্য খাওয়া, দূষিত বায়ু লাগানো, জানালা বন্ধ ক'রে থাকা অনুচিত। এ ভিন্ন শিম, আলু, কোন রকম শাক, লবণ, টক জিনিস খাওয়া ও মলমূত্রের বেগধারণ যেমন অনুচিত, তেমনি রৌদ্র লাগানো, কোন রকম সেঁক নেওয়াও উচিত নয়।

ক্ষুদ্ররোগ

এমন কতকগুলি রোগ আমাদের দেহে সৃষ্ট হয়, যেগুলিকে বলা যায় ক্ষুদ্র-রোগ; অবশ্য রোগের যন্ত্রণায় তারা ক্ষুদ্র নয় কিন্তু চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেগুলির বেশীর ভাগ ক্ষেত্র খুব জটিল হয় না। টাক পড়া, নখকুনি, পা ফাটা, মাথায় খুস্কি, গায়ে পদ্মকাঁটা, মেচেতা, তিল, এই সব ছোট রোগগুলিকেই ধরা হ'য়েছে; যদিও এ সব ক্ষেত্রে বায়ু, পিত্ত, কফের বিকার ধ'রে চিকিৎসা করা হয়, তবুও এ সব রোগের নির্ধারিত ভেষজের দ্বারা চিকিৎসা ক'রলে যে সারে না তা নয়। তবে টাক ক্ষুদ্র-রোগ হ'লেও বৃহতেরও বাড়া।

এখানে একটা কথা ব'লছি, এ সব রোগ কায়চিকিৎসার অন্তর্গত হলেও কয়েকটি ক্ষেত্র আছে, যেগুলি ধন্বন্তরি সম্প্রদায় অর্থাৎ সুশ্রুতের শল্য শালক্য চিকিৎসার আওতায় পড়ে, যেমন কার্বঙ্কল, (বল্মীক্ রোগ), ইন্দ্রবিদ্ধা (হারপিস্) অগ্নি-রোহিণী (ইরিসিপ্লাস্) গলরোহিণী (ডিপ্থিরিয়া) প্রভৃতি চরকীয় ধারার চিকিৎসকদের মতে উপরি উক্ত রোগগুলি কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা দিতে বলেছেন।

ঊর্ধ্বজত্রুগত রোগ

দেহের একটি অংশকে আয়ুর্বেদ বলেছেন "ঊর্ধ্বজত্রু", যাকে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন E. N. T. । তার মধ্যে আবার ভাগ আছে, যেমন মুখরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, তালুগত রোগ, কণ্ঠরোগ, গলরোগ, জিহ্বারোগ, দন্তবেষ্টরোগ এই রকম ১৯টি ক্ষেত্রে এই রোগের কথা বলা আছে; দেখা যাচ্ছে স্থানকে আশ্রয় ক'রে, রোগের নামকরণ করা হ'য়েছে।

এখন মুখরোগের পথ্যের কথা বলি—এ সব ঊর্ধ্বজত্রুগত রোগ, যেখানে হয় তার মূলীভূত কারণ কিন্তু সেখানের নয়। কেবলমাত্র আগন্তুক ও নৈমিত্তিক কারণ ভিন্ন বাকী সবগুলিই জন্ম নেয় পাকাশয়ে, আমাশয়ে, ও অগ্ন্যাশয়ে; অতএব সে সব ক্ষেত্রে এ রোগ যে দোষে সৃষ্ট, সেইটার নিরসন করাই (এ সব রোগ নির্মূল করার) উপায়। তবে স্থানিক ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন যে হবে না সে কথা বলছি না।

মুখরোগের পথ্য

যব, মুগ, ও কুলথকলায়ের যূষ্ বা ঝোল, তরকারির মধ্যে পটোল, করলা উচ্ছে, কচি মুলো এ ভিন্ন গরম জল সর্বদা ব্যবহার করা উচিত। আর ব্যবহার ক'রতে পারা যায় বিনা চুণে সুপারি খয়ের দিয়ে পান খাওয়া। তবে খয়েরটি আসল হওয়া চাই।

অপথ্য কি

অম্লরসের খাবার খাওয়া, মাছ, মাংস, ডিম, দই, সরষে, কড়াইএর ডাল, গুড় এগুলি খাওয়া উচিত নয়। আর বর্জন করতে হবে শক্ত কোন খাবার চিবিয়ে খাওয়া, কোন শক্ত জিনিস দিয়ে দাঁত মাজা, জিভ ছোলা, বার বার স্নান করা, উপুড় হ'য়ে শোওয়া।

কর্ণরোগ

কানে যত রকম রোগ হয় সবই এক দোষে অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত কফের দোষে তা নয়। এর সঙ্গে রক্তের দোষও এসে জোটে।

কর্ণ নাদ (কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ হওয়া), কর্ণ শোথ (কান ফোলা), কর্ণক্ষত (যাকে চলতি কথায় কানচটা রোগ বলে), কর্ণ কণ্ডু (কান চুলকানো), কর্ণ গূথ (কানে কম শোনা), কর্ণ প্রতিনাহ (কানে দম্ দম্ শব্দ হওয়া) কর্ণ পূতি (কান দিয়ে জল ঝরা বা পুঁজ পড়া), কর্ণপাক (কানের মধ্যে ক্ষত হওয়া; এটা শিশুদের হয়) কর্ণ অর্শ (কানের মুখের কাছে মটরের মত দানা হওয়া)। এই রোগগুলির জন্য অল্প বিরেচনের ব্যবস্থা ভাল। এবং কোন ওষধি দিয়ে ভাপ দেওয়াও খারাপ নয়। ক্ষেত্র বিশেষে নস্যও দেওয়া যায়, তা ছাড়া পুরানো ধানের চালের ভাত, মুগের যূষ্, মুরগির মাংস, তরকারির মধ্যে পটোল, সজনের ডাঁটা, বেগুন, সুষুণী শাক, করলা উচ্ছের তরকারি, মশলা হিসেবে আদা ও ধনে বাটা দিয়ে তরকারি, এগুলি ব্যবহার করা ভাল।

অপথ্য ও কুপথ্য

বিরুদ্ধ অন্ন ও পান, মলমূত্রের বেগধারণ, বেশী কথা বলা, কড়া ব্রাসে দাঁত মাজা, ডুব দিয়ে এবং মাথা ঝুলিয়ে স্নান করা, ব্যায়াম করা, গুরুপাক দ্রব্য খাওয়া, কানে বার বার কিছু দিয়ে চুলকানো, আর ঠাণ্ডা লাগানো ক্ষতিকর।

নাসারোগ

নাসিকার রোগের সংখ্যা যতই থাক, এ সব রোগের পরিণাম কিন্তু ঘ্রাণশক্তির বিলোপ। কারণ নাসারোগের মূল কারণ থাকে শ্লেষ্মপিত্ত বিকার, এ বিকারের পরিণতিতে মুখের কোন স্বাদ থাকে না।

এখন বলি, নাসিকার রোগের সংখ্যা তেরটি, অর্থাৎ নাসার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্রোতগুলি বায়ুর দ্বারা শোষিত এবং পিত্তের দ্বারা প্রতপ্ত হ'য়ে পীনস (Polypus) ও নাসা-অর্শ হয়।

তা ছাড়া গলা ও তালুর স্রোতকে এমন কি শঙ্খস্রোত অর্থাৎ কপালের পাশের (যাকে আমরা রগ বলি) স্রোতকে রুদ্ধ করে, এমন কি বিনষ্ট হ'য়েও যায়, তারপর এই জন্য চক্ষুরোগ আসতে পারে এ রোগ সুরু হয় প্রতিশ্যায় থেকে, যাকে এখন সাধারণে বলে থাকেন। nasal allergy.

এ ক্ষেত্রে কর্তব্য যেখানে বায়ুর প্রবাহ কম সেখানে বাস করা; সেকালের বৈদ্যগণ পায়ের দিকটা গরম রাখা ও মাথায় উষ্ণীষ্ ধারণ অর্থাৎ টুপি পরা বা পাগড়ি বাঁধার ব্যবস্থার কথা বলতেন। তাঁদের অভিমত হ'লো—এ দ্বারা ঋতু পরিবর্তনজনিত অগ্নি-বলের যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এটি ব্যবহারে সেটি হয় না। মধ্যে মধ্যে উপবাস, নস্যগ্রহণ, বমন, স্নেহদ্রব্যের নস্য নেওয়া, মাথায় তেল মাখা, পুরাতন ধানের চালের ভাত, কুলথ-কলায় ও মুগের যূষ্, জঙ্গলা পাখীর মাংস; আর তরকারির মধ্যে বেগুন, পলতা, সজনের ডাঁটা, কাঁকরোল, কচি মুলো, রসুন খাওয়া ভাল; আর খাওয়া উচিত গরম জল, তবে তালের রসকে তাঁরা ব্যবহার করতে বলেছেন কিন্তু গেঁজিয়ে নয়।

সাধারণতঃ এ রোগে অপথ্য কি

বিরুদ্ধ ভোজন, দিবা নিদ্রা, শ্লেষ্মাকর দ্রব্য, তরল দ্রব্য এ রোগ বৃদ্ধি করে, তাই সে অপথ্য; আর একটা কথা—মাটিতে শোয়া, মলমূত্রের বেগ ধারণ, বার বার স্নান করা, দই খাওয়া এ রোগে অপথ্য ব'লেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নেত্ররোগ

আমরা সকলেই জানি চক্ষুই হ'লো আমাদের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়, কিন্তু এই ইন্দ্রিয় যাতে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার প্রতি সর্বদা সচেতন থাকা একান্ত কর্তব্য। এই ইন্দ্রিয়ে বহু কারণে রোগ আসলেও প্রধানভাবে কয়েকটি কারণ থাকে; অত্যধিক কোন আলো চোখে লাগানো, তাপ লাগানো, ধোঁয়া-ধুলো এগুলি থেকে সাবধান হওয়া দরকার। এ ভিন্ন রাত্রি জাগরণ, দিবা নিদ্রা, বমি করার প্রবৃত্তি, মলমূত্রের বেগ ধারণ, অত্যধিক শোকেরও বেগ সম্বরণ, মাথায় আঘাত, বেশী মদ খাওয়া, তা ছাড়া

ঋতুগুলির যথাযথ প্রকৃতি না থাকলে অর্থাৎ শীতে গ্রীষ্মের ও বর্ষায় অন্য ঋতুর প্রকাশ পেলে, চোখে অভিষ্যন্দ ক্লেদ দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে খুব সাবধানে থাকা উচিত, তা ছাড়া বেশী কষ্ট সহ্য করা, মস্তকে প্রচণ্ড ভার বয়ে নিয়ে যাওয়া, চোখ উঠলে তার প্রতি যথাযথ যত্ন না নেওয়া, বসন্ত রোগে চোখ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া, তা ছাড়া অত্যধিক রেতঃক্ষয়ে, বেশী দূরের জিনিসকে জোর ক'রে দেখার চেষ্টা করা প্রভৃতি কারণে চক্ষুরোগ আসে; এ ক্ষেত্রে প্রাচীনদের উপদেশ —মাঝে মাঝে চোখে অঞ্জন দেওয়া ভাল। এখানে একটা কথা বলে রাখি, আপনারা অনেকে লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে ইউনানি চিকিৎসক সম্প্রদায়ের প্রভাবে যাঁরা চলেন, তাঁরা চোখে সুরমা লাগিয়ে থাকেন, এ রীতিটি কিন্তু আমাদের প্রাচীন রীতি—অঞ্জন লাগানোরই একটি পদ্ধতি। চোখকে নিরাপদ রাখার জন্য দাস্ত পরিষ্কার রাখা, মাঝে মাঝে রক্ত মোক্ষণ করা, পায়ের তলায়, নাভিতে ও নখের কোণে ভাল ক'রে তেল লাগানো সব থেকে চোখ ভাল রাখে; যদি সরষের বা তিল তেলের কবল ধারণ করা যায় অর্থাৎ মুখে পুরে খানিকক্ষণ বসে থাকা যায়। এ ছাড়া খাদ্য হিসেবে মুগের যূষ, যবের পালো, জংলা মুরগীর মাংস, ঘিয়ের রান্না খাওয়া, রসুন, পটোল, বেগুন, কাঁকরোল, করলা, মোচা, কচি মুলো, পুনর্ণবা ও শালিঞ্চে শাক, ঘৃতকুমারীর শাঁসের ডালনা, তা ছাড়া একটু তিক্তাস্বাদের তরকারি ও ব্যঞ্জন এবং লঘুপাক খাদ্য খাওয়াটা খুব উপকারী।

অপথ্য ও কুপথ্য

এই চক্ষুরোগের পক্ষে ক্ষতিকর হ'লো—কোন কারণে চোখ দিয়ে জল পড়া, বমি আসা, রাত জাগা, দাঁতে দাঁত ঘ'সে কথা কওয়া, দাঁতে দাঁতে চেপে কিছু খাওয়া, মাথায় বেশী জল ঢালা, রৌদ্র লাগানো, তরল খাদ্য খাওয়া, ধূমপান করা, চোখে ভাপ্ দেওয়া, দই, ঘোল, তরমুজ, তিলবাটা, পোস্তবাটা, কলা বেরুনো কোন রকম কড়াই খাওয়া, পান খাওয়া, নূতন চালের ভাত, মদ, বেশী লবণ, কোন প্রকার গরম (উষ্ণবীর্য) জিনিস খাওয়াটাই কুপথ্যের মধ্যে পড়ে।

শিরোরোগ

লোকে কথায় বলে মাথা থাকলেই মাথাব্যথা, কিন্তু সেই মাথাটা যাতে থাকে, তার ব্যবস্থা করতে গেলেই এর রোগ যাতে না হয়, তার ব্যবস্থাটা করা প্রথমেই দরকার। কারণ সমস্ত ইন্দ্রিয় সক্রিয় ও স্বাভাবিক থাকলেও, যদি মাথাটা রোগগ্রস্ত হয়, তা হ'লে সবটাই বিকলেরই সামিল। ইলেক্‌ট্রোনিকের যুগে ব'সে যদি বলি, তখনকার ঋষিরাও কম ছিলেন না। এই ছোট মাথাটার মধ্যে রেডিও-এক্‌টিভের যন্ত্রগুলি কে কোথায় আছে, তাঁরা বিচার ক'রে গেছেন। এর মধ্যে তাঁরা দেখেছেন ৪০টি কোষ্ঠ (Cell) আছে। এদের কাজের ভাগটাও অদ্ভুত। সবাইকেই কণ্ট্রোল্ ক'রছে মন, যেমন চিন্তার কাজের জন্য চারটি, স্মৃতির ৪টি, বাকপ্রবৃত্তির ৪টি এই রকম চিত্র দর্শন অর্থাৎ কোন জিনিস চেনা বা মিলিয়ে নেওয়া; আর শব্দ শ্রবণের জন্য ৪টি আর আঘ্রাণের জন্য ৪টি এমনি প্রতিটি কাজের জন্য পৃথক পৃথক কোষ্ঠ সক্রিয় হয়; এর মধ্যে যে কোষ্ঠের যে প্রকোষ্ঠ বিকল হ'য়ে যায় সেই অংশের কাজটাতেই অভাব হ'য়ে প'ড়লো। মনের কাজ স্বাভাবিক থাকলেও কোষ্ঠ প্রকোষ্ঠ যদি কার্যকর না থাকে তবে মনের কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না।

আয়ুর্বেদ মতে ১১ প্রকার রোগের দ্বারা এই কোষ্ঠ প্রকোষ্ঠগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইসব রোগোৎপত্তির মূলের কারণ থাকে—ধাতুক্ষয়, ক্রিমিরোগ, রক্তের বেগ অথবা স্তব্ধতা, অত্যাধিক বমন হওয়া প্রভৃতি। এর পরিণতিতে আসে শিরোরোগ, তারপর মন নিজেও যখন গ্রস্ত হ'য়ে পড়ে তখনই সে আক্রান্ত হয় মূর্ছা ও অপস্মারে। অনেক সময় দেখা যায়—ঘাড়টা ফেরানো যাচ্ছে না সেটাও অনন্ত বাতের লক্ষণ; যদিও ওটা বাতব্যাধির অন্তর্গত। মূলতঃ ওখানে শিরোদেশের এবং গ্রীবার দু' পাশে মন্যা নামক দুটি শিরা আক্রান্ত হয় বলেই ওটা শিরোরোগের আওতায় পড়ে।

এইসব রোগে হিতকর ব্যবস্থা হিসেবে নানাপ্রকার ভেষজের প্রলেপ এবং ওসব ক্ষেত্রে উপবাস করা, শিরোবস্তি দেওয়া, রক্ত মোক্ষণ, মাথায় পাগড়ী বাঁধা, পায়ে মোজা পরা, পুরানো ঘি মাথায় লাগানো।

তা ছাড়া মুগ মসুরের যূষ, মাংসের কেবল যূষ, আর তরকারির মধ্যে পটোল, সজনের ডাঁটা, বেতো শাক, করলা উচ্ছে, ঘৃতকুমারী শাঁসের তরকারি; আর এদিকে মিষ্টি পাকা আম, আমলকী ও হরীতকীর মোরব্বা, দাড়িমের রস, ঘোল, নারিকেলের জল, বেণামূল বাটা মিশিয়ে সরবৎ, এবং বড় এলাচের দানায় মুখশুদ্ধি করা।

অপথ্য ও অবিধি

হাঁচি, কাসি, হাই তোলা যে সব কারণে ঘটে, সেইটাই অবিধি, মলমূত্রের বেগ ধারণ, ঘুম এলেও না ঘুমানো এবং দিনে ঘুমানো, বাসি জল বা পুরানো কুয়োর জল মাথায় ঢালা, চোখে ঘন ঘন অঞ্জন দেওয়া, চেঁচিয়ে পড়া, এমন কি চেঁচিয়ে কথা বলা, অল্প আলোয় পড়াশুনো বা কাজকর্ম করা, আর পেটে বায়ু হয় এমন খাদ্য খাওয়া, বেশী পথ হাঁটা, রৌদ্র লাগানো, কোন তীব্র গন্ধের ঘ্রাণ নেওয়া, এগুলি সব অপথ্য ও অবিধির পর্যায়ে পড়ে।

অসৃগ্দর বা রক্তপ্রদর

এর পথ্য বা অপথ্য সবই রক্তপিত্তের মত, তবে রোগের ক্ষেত্রটি কেবলমাত্র রমণীদের জননকোষ্ঠের ঋতুগ্রন্থিতে সৃষ্টি হয় বলেই তার নাম অসৃগ্দর বা রক্তপ্রদর বলা হয়েছে।

এ সম্পর্কে আয়ুর্বেদে বলা আছে—

যৎ পথ্যং যদপথ্যঞ্চ রক্তপিত্তেষু কীর্ত্তিতম্।
প্রদরেঽপি যথা দোষং তৎতন্নারী ভজেৎ ত্যজেৎ॥

অর্থাৎ রক্তপিত্ত রোগে যে সমস্ত পথ্যাপথ্যের কথা বলা হয়েছে প্রদর রোগাক্রান্তা নারীদের জন্য পথ্য এবং অপথ্য সেই সবই গ্রহণ করতে হবে এবং বর্জন করতে হবে।

যোনি ব্যাপদ

[এখানে ব্যাপদ অর্থে রোগ]

নারীর শারীর বৈশিষ্ট্যের প্রধান ক্ষেত্র যে যোনি সেই স্থান ব্যাধিগ্রস্ত হয় প্রধানতঃ এই কারণগুলিতে, যথা—অনুপযুক্ত আহার বিহারে, মাসিক ঋতুর অনিয়মে, পতি-পত্নীর মানসিক বিকারে, তা ছাড়া অসংযত পুরুষের সঙ্গমজনিত দোষেও এই রোগ আসে।

আয়ুর্বেদ মতে এই রোগ ২০ প্রকার। এই রোগে আক্রান্তা হ'লে পথ্যাপথ্য *হওয়া উচিত—যে সব জিনিসে বিকৃত বায়ুর প্রশমন করে এমন ধরণের আহার বিহারের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজন হলে কোন দ্রব্য ক্বাথ ক'রে* উত্তরবস্তি (ডুস দেওয়া। আর পিচুধারণ Plugging Procedure করানো। এর পথ্যাপথ্য বিচার করতে দেখা দরকার যে কোন্ দোষের আধিক্য ঘটেছে এবং সেইটার প্রশমনের ব্যবস্থা প্রথমে করা।

গর্ভিণীরোগ

গর্ভটা তো আর রোগ নয়, তবে সেই সময় যে সব উৎপাত আসতে পারে, যেমন গর্ভটি ধরে রাখার ক্ষমতা না থাকায় গর্ভস্রাব হ'য়ে যাওয়া, এটা কিন্তু ৮ মাস পর্যন্ত ঘটতে পারে। এ সময়টায় আরও কতকগুলি রোগ এসে হাজির হয়,—যেমন রক্তাল্পতা (পাণ্ডুরোগ), বলহানি, মাঝে মাঝে স্রাব, হঠাৎ তলপেটটা টে'সে বা খি'চে ধরা ব্যথা, কোন সময় একাঙ্গগত কোন সময় বা সর্বাঙ্গ শোথ, পাণ্ডু, মলক্ষয়, মলের শুষ্কতা. যোনি কণ্ডূতি (অসম্ভব চুলকোয়) এগুলি আসে।

এ ক্ষেত্রে কি খাওয়া উচিত

সাধারণ পথ্য,—তবে বিশেষ হলো খইএর মণ্ড, যবের ছাতু, মাখন, ঘি, পাতলা ক'রে চিনির সরবৎ, পাকা কাঁঠালের রস, পাকা কলা, আমলকীর মোরব্বা, কিসমিস, পাকা আম, যে কোন মিষ্টি ফল খাওয়া যায়। আর বমি বা বমি ভাব এইটাকে যতটা সংবরণ ক'রতে পারা যায় সেটার চেষ্টা করা উচিত।

অপথ্য কি

এ সময় ভাপ্ নেওয়া, বমি করা ভাল নয় (যদিও এ সময়টায় বমি ভাব আসে), মলমূত্রের বেগ ধারণ করা, কোন গরম জিনিস খাওয়া, উপবাস করা, পথশ্রম করা, বেশী ঝাল এবং মদ খাওয়া, চিত হ'য়ে শোওয়াও ভাল নয়। এ ভিন্ন কোন প্রকার যৌন আলোচনা করাটাও অহিত কার্যেরই সামিল।

শিশুরোগ

আয়ুর্বেদে শিশুর সংজ্ঞা ৩ প্রকার (ত্রিবিধ); অর্থাৎ শিশুর বয়ঃসীমাকে ৩ ভাগে দেখা হয়। (১) দুগ্ধজীবী, (২) দুগ্ধান্নজীবী, (৩) অন্নজীবী। এখানে পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থায় দুগ্ধজীবী শিশুর ক্ষেত্রে কেবল তার মাকেই চিকিৎসা ক'রতে হবে, আর দুগ্ধান্নজীবীর জন্য উভয়কে, আর অন্নজীবীর জন্য সেই শিশুকেই ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা ক'রতে হবে; তবে তার রোগ হ'লেই যে উপবাসে রাখতে হবে সেটাও বিধি নয়, তবে পুরোপুরি অন্নজীবী হ'লে তার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এই জন্য শিশুর এ ত্রিবিধ অবস্থা বিবেচনা ক'রে তার পথ্যের ব্যবস্থা করতে বলেছেন।

সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদীয় বৈদ্যগণ মনে করেন যে, শিশুরোগের কারণ গ্রহবৈগুণ্য, তাদের কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয় না, গ্রহদৃষ্টি অপসৃত হ'লেই রোগ সেরে

যাবে; কিন্তু যুক্তিবাদী আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক বলেন, বিনা কারণে কোন ব্যাধির সৃষ্টি হয় না, তখন ব্যাধির অস্তিত্ব দেখেই তার কারণ নিরসন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিষরোগ

এমন অনেক রোগ সৃষ্ট হয়, যেটার কারণ আমাদের অজ্ঞতা; তবে সেটা প্রত্যক্ষ ক্রিয়াতেও হ'তে পারে আবার সংযোগজ হ'য়েও হ'তে পারে; যেমন ধুতরোর বীজ প্রত্যক্ষ বিষক্রিয়া করে, আবার তামার বা কাঁসার পাত্রে ঘি রেখে সেটা খেলেও বিষক্রিয়া ঘটায়। এইটাই সংযোগজ বিষক্রিয়া। তা ছাড়া আছে কতকগুলি আগন্তুক বিষ-ক্রিয়ার রোগ, এগুলিকে গরবিষোদ্ভব রোগ বলা হয়। চলতি কথায় একে গরলও বলে।

কতকগুলি বিষজ ব্যাধি আছে যেগুলি দেহে দীর্ঘকাল অবস্থান করে; এসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা দরকার যে বাত, পিত্ত, কফ কোন্ দোষের প্রাবল্য ঘটেছে, সেই দোষের উপশামক যে সব আহার্য, সেগুলিকে পথ্য হিসেবে খেতে দেওয়া উচিত; তবে সাধারণ পথ্য হ'লো—কাঙনী ধানের চালের ভাত, মটর কলায়ের যূষ, তিল তেলের অথবা গাওয়া ঘি দিয়ে রান্না তরকারি হিসেবে বরবটি, বেগুন, পলতা, পুঁই শাক ও নটে শাক, রসুন, পাকা কয়েৎবেল, তিক্তাস্বাদের তরকারি ব্যবহার করা ভাল।

বিষরোগে অপথ্য

রাগান্বিত না হওয়া, বিরুদ্ধ ভোজন, টক, লবণ, সরষের তেল, ডিম, স্বেদ বা ভাপ্ নেওয়া, দিনে ঘুমোনো, ধূমপান, অভুক্ত থাকা আর মদ।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরোগ

দেহের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানই বলুন আর শ্রেষ্ঠস্থানই বলুন, সেটা হ'লো শিরোভাগ। তার মধ্যে আবার যেটা উৎকৃষ্টতম স্থান, সেটাই মস্তিষ্ক অর্থাৎ যার চলতি নাম 'ঘিলু' যাকে ইংরাজীতে বলে (brain), ওখানেই থাকে আমাদের ভাব, ভাষা, কর্মশক্তি, কর্মপ্রেরণা, মানবিক অমানবিক কর্মপ্রবৃত্তির উৎস। সেখানটায় ব্যাধি হ'লে সমগ্র দেহটাই অচল। দুটি রোগ প্রধানভাবে এখানে হ'য়ে থাকে; একটি মস্তিষ্কে, আর একটি তার ধারক ও আবরক স্নায়ুকেন্দ্রে।

এই আবরক কেন্দ্রটি ব্যাধিগ্রস্ত হ'লে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলেই অল্প-বিস্তর রোগাক্রান্ত হয়, এরই কারণে হাত পা কাঁপে, এ রোগের উৎস কিন্তু ঐ স্নায়ুকেন্দ্র।

আর মস্তিষ্কজাত রোগ হ'লে তার ভাব, ভাষা, কর্মশক্তি, কর্মপ্রেরণা সবই স্তব্ধ হয়ে যায়।

এগুলির মূলীভূত কারণ স্নায়ুপোষক ও মস্তিষ্কের পোষক দ্রব্য গ্রহণের অভাব। এ ক্ষেত্রে বিচিত্র হ'লো এদের যত পোষণ করা যাবে, ততই তার সাত্ত্বিকতা বেড়ে যাবে, আর তার তমোগুণের ক্রিয়াকলাপ স্তিমিত হবে। অথচ খাদ্য হিসেবে অনেক দ্রব্যই তমোগুণাত্মক, এই যেমন ছোট কচ্ছপের মাংস (কূর্ম মাংস), রুই এবং মাগুর মাছ, দুধের সর ও দুধ, বাদাম, দুধ কলা (কাঁঠালী কলা হ'লে ভাল হয়), দুধ দিয়ে গমের পায়েস, কিসমিস, খোবানি, আঞ্জির, ছোহারা, চিল-

গোজা, চি'রৌজি (পিয়াল বীজ), আপেল, খেজুর, ডাবের জল, এ ছাড়া ঘিয়ে রান্না খাদ্য, চালকুমড়ো, পাকা আম, দাড়িম, ঝুনো নারকোল কোরা।

অপথ্য কি

বিষম আহার অর্থাৎ যেটা যতটুকু খাওয়া উচিত তা না খেয়ে, একটা জিনিস অর্থাৎ এক রসের (সে মিষ্টি, টক যাই হোক্) আহার্য প্রচুর খাওয়া, অসময়ে খাওয়া এবং অধিক খাওয়া, রুক্ষ দ্রব্য, ঝাল, তিক্ত আর কষায় দ্রব্য রোজ খাওয়া।

দিনে ঘুমানো, রাত্রি জাগা, মলমূত্রের বেগ ধারণ করা, যোগ্যতায় অসমর্থ হ'য়েও অপ্রয়োজনীয় কাজে নিজেকে নিযুক্ত করা, এসবই মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরোগগুলিকে ডেকে আনে।

বিরুদ্ধাচরণে বিপর্যয়

গ্রাম বাংলায় একটা কথা চালু আছে—

'ভাত খায় কি দে (কি দিয়ে)।
ভাত খায় ক্ষিধে॥'

এ কথাটারও কিন্তু একটা গ্যাঁজ রয়ে গেল, কেন বলছি?

অনেক সময় অত্যগ্নি হ'লেও তো ক্ষিধে পায়; সেও তো এক ধরণের অগ্নি-মান্দ্য; সুতরাং ক্ষিধে হচ্ছে বলেই যে তা থেকে শরীরের পোষণ হবে এ কথা ভাবা উচিত নয়। আবার খাদ্যের বলেই যখন দেহের ও মনের বল, তেমনি খাদ্যের দোষেও তো এই দুটি ক্ষেত্রের হানি ঘটে।

বাঁচার জন্য চাই খাদ্য আর মরার জন্য চাই রোগ, কিন্তু এই রোগ আসে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অহিত আহার-বিহারে। এই অহিত আহারটা স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় ও অপরের ইচ্ছায়ও হ'তে পারে, আবার অজ্ঞতাবশতঃও হ'তে পারে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান বক্তব্য আমরা অজ্ঞতাবশতঃ কি কি অহিতাচরণ করি। এর কুফল নিজে তো ভোগ ক'রেই থাকি, তা ছাড়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যও রোগটা উইল ক'রে যাই. এমন কতকগুলি রোগও আছে; এই যেমন হাঁপানি, অর্শ, মধুমেহ, রক্তপিত্ত, যক্ষ্মা, অপস্মার, মূর্ছা, উন্মাদ এই রকম আরও কয়েক প্রকার রোগও আছে। তা ছাড়া স্বকৃত দোষেও কতকগুলি রোগ হয়—যেমন পাণ্ডু (এনিমিয়া), গ্রহণী, আমাশা, শোথ, উদাবর্ত, বিসর্প, ক্লৈব্য, আনাহ, রাত্র্যান্ধ্য (রাতকানা), ভ্রমরোগ (ভুল হয়ে যাওয়া), অরুচি প্রভৃতি; এ ভিন্ন বালিশে লালাপড়া, হাতে-পায়ের ডিমগুলি (মাংশপেশীগুলি) ব্যথা হওয়া, হাতে পায়ে জ্বালা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাতিসার, ওঠা-নামায় হাঁপ ধরা, আমবাত, অজীর্ণ, জ্বরবোধ, মুখে জল ওঠা, ঘন ঘন ঢেকুর তোলা, ক্রিমির উপদ্রবে আক্রান্ত হওয়া, খোস, চুলকানি ও দাদে ভোগা, দাঁতের মাঢ়ীর যন্ত্রণা হওয়া প্রভৃতি রোগগুলি সংযোগ বিরুদ্ধ, কাল বিরুদ্ধ, মাত্রা বিরুদ্ধ, সংস্কার বিরুদ্ধ, পাক বিরুদ্ধ প্রভৃতি অন্ততঃ ১৮ প্রকার বিরুদ্ধ ক্রিয়ার ফলেই এগুলি ঘটে থাকে।

তবে এটাও ঠিক যে, কতকগুলি এমন খাদ্য আছে যেগুলি স্বাভাবিক হিতকর, তবুও সেগুলি সংযোগ বিরুদ্ধ বা কাল বিরুদ্ধ হ'লে, তারাও রোগ সৃষ্টি করে।

যেমন জল, ঘি, মাখন, ছানা, দুধ, ভাত, রুটি, ফলের রস, বিশেষ ধরনের ফল, কয়েক প্রকার মাংস প্রভৃতি, এগুলি স্বাভাবিক হিতকর হলেও যদি সংযোগ, সংস্কার প্রভৃতি দ্বারা দুষ্ট হয় তবে তাহাও অহিতকর।

এই হ'লো সাধারণ নিয়ম, বিশেষ নিয়ম হ'লো—বায়ুপ্রধান প্রকৃতির যা ভাল, পিত্তপ্রধান প্রকৃতির তা কি ভাল? আবার পিত্তকর যেগুলি—সেগুলি কি শ্লেষ্মা-প্রধান ব্যক্তির খুব ক্ষতিকর হয় না?

সংযোগ বিরুদ্ধের ধারা কি

সংযোগ বিরুদ্ধ কি ভাবে হয়—এই যেমন মাছও মধুর রস (শরীরের পক্ষে পোষক যে রসটি) আবার মাংসও মধুর রস এবং দুধও মধুর রস—তাই ব'লে কি একসঙ্গে এই তিনটি খাওয়া চলে? এইটাই সংযোগ বিরুদ্ধ।

এইবার সংস্কার বিরুদ্ধ ও পাক বিরুদ্ধ সম্বন্ধে বলি—এই যেমন আপেল, ন্যাসপাতি, পেয়ারা, শসা, আম, জাম, তরমুজ, খরমুজ, ডালিম, খেজুর, জামরুল প্রভৃতি কাঁচা পাকা যেটাই খাওয়া হোক ক্ষতিকর হয় না, আর সিদ্ধ ক'রে খেলেও সবই লঘুপাক হয়, আবার এগুলি যদি মশলা দিয়ে রান্না ক'রে তেল বা ঘি দিয়ে সাঁতলে খাওয়া যায় সে তো ক্ষতিকর হবেই, একেই সংযোগ বিরুদ্ধ ও পাক বিরুদ্ধ বলা হয়ে থাকে। ঠিক এমনিই তো গাছের যে কোন ফল, যেমন লাউ, কুমড়ো, পটোল, সজনের ডাঁটা, পেঁপে, আমড়া, চালতা, কলা, বেল এগুলি কি মশলা দিয়ে ঘি তেলে সাঁতলে তরকারি ক'রে খাওয়া ভাল? এটা শাস্ত্রসিদ্ধান্তের মতে এ পদ্ধতিতে খাওয়া অসমীচীন হ'লেও আমরা কিন্তু আবহমান কাল থেকে খেয়ে আসছি, এটা আমাদের আজকাল সাত্ম্য হ'য়ে গিয়েছে ব'লতে হবে। তাই বলে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই সংস্কার বিরুদ্ধ আহার আমাদের রোগের মাধ্যম হ'তেই পারে না।

এই যে মুগ, মসুর, অড়হর, এগুলি রবি শস্য এবং ফল। এই সব ডাল রান্না ক'রে খেতে ভয় পান অজীর্ণ রোগীরা কিন্তু কোন মশলা না দিয়ে যদি সিদ্ধ করা উপরের পাতলা যুষটা খাওয়া যায়, তা হ'লে উপকার বই ক্ষতিকর হয় না, তবে সারাংশ খেয়ে হজম করার মত অগ্নিবল থাকলে খেতে দোষ কি? লঘু জিনিসটাকে গুরু ক'রে খাওয়ার অভ্যেস এখন আমাদের মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর একটা বলি—এই যেমন শাক, চরক সুশ্রুতের কালে অল্প সিদ্ধ ক'রে জলটা ফেলে দিয়ে অল্প লবণ দিয়ে এবং ২/৪ ফোঁটা ঘি মিশিয়ে খাওয়ার বিধি ছিল (সাঁতলে নয়)। এর দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয় না এ কথা বলা আছে। তবে আমাদের নানা রকম মশলা খেয়ে খেয়ে পেটের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে শাক খাওয়ার কথা এখন বলতেই ভয় হয়ে যায়। এখন ভেষজগুলিই হয়েছে মশলা, ওষুধে কাজ হবে কি?

এখনও ভারত এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চল ছাড়া সব দেশেই তরকারি ও মাংস এক সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে তার যুষটা খেতে দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা। এটা কিন্তু ক্ষতিকর হয় না।

এইবার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দিচ্ছি—দুধ, এটি স্বাভাবিক হিতকারী পানীয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য; কিন্তু তার সঙ্গে চাল বা গম ও চিনি দিয়ে পাক ক'রে গরম মশলা দিয়ে যদি খাই, তা হ'লে সে গুরুপাক তো হবেই, আর যে দুধ আধসের/তিন

পোয়া খেলেও ক্ষতিকর হয় না, কিন্তু সেইটাই যদি ক্ষীর ক'রে খাওয়া হয় তখন তা পেটে সহ্য হয় না। এইটাই হ'লো সংস্কারে গরু।

দই—এটি স্বাভাবিক উপকারী, কিন্তু কালবিরুদ্ধ হ'লে ক্ষতিকর, যেমন শরৎ, গ্রীষ্ম, বসন্তে দই খেতে নেই, এটি কালবিরুদ্ধ।

আর দইএর সংযোগবিরুদ্ধ হ'লো—ছাতু, পাকা বেলের শাঁস, বেসনের বড়া, শাক পাতা সিদ্ধ ক'রে মিশিয়ে খাওয়া।

তারপর তরকারিতে দই দিয়ে রান্না করা, এটাও কিন্তু সংযোগবিরুদ্ধ।

এই সব সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য খাওয়ার ফলে হয় অজীর্ণ, আমদোষ, আর এই আমদোষ এমন ক্রূরভাবে বসে থাকে, যেটা সহজে বেরুতে চায় না।

ঘি (ঘৃত)—এও খুব স্বাভাবিক হিতকর। কিন্তু ওই ঘিয়ে সমান মাত্রায় মধু, গরম দুধ বা ফলের রস মিশিয়ে খেলে, সেটা হয় সংযোগবিরুদ্ধ; এর দ্বারা আসতে পারে রাত্র্যান্ধ্য (রাতকানা), মাথা ভার, পেটে বায়ু এই সব রোগ। এই দৃষ্টিতে রান্না ডালকে ঘি দিয়ে সাঁত্‌লানো ভাল না, তবে ঘি পরে মিশিয়ে দেওয়া ভাল।

নারিকেল—এর জল, শাঁস, কুরে নিয়ে তার দুধ খুব উপকারী, কিন্তু ঐগুলোকে যদি ঘিয়ে, তেলে, মশলা বাটার সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যায়, এইটি ক্ষতিকর হয়।

আমাদের দেশে বিশেষতঃ বাংলায় গরম তরকারিতে, টকে, বড়ায় নারিকেল কোরা মিশিয়ে রান্না করা হয়, এটা কিন্তু হিসেব মত অসমীচীন, তবে চলছে—তাতে দোষ যে হয় সেইটাই জানিয়ে দিলাম। এই দোষে আসতে পারে মূত্রকৃচ্ছ্রতা; আবার স্বাভাবিক-ভাবে কিন্তু এটা মূত্রকৃচ্ছ্র রোগেরই ওষুধ।

মাংস—স্বাভাবিকভাবে দেহের খুব পুষ্টি করে কিন্তু ওতে ভিনিগার দিয়ে মশলা মিশিয়ে ওটার বিরুদ্ধ গুণই হয়—এটা প্রাচীন ধারার অভিমত।

এবার বলি—খাদ্যগুলির সংযোগ বিরুদ্ধের প্রকার ভেদ—যদিও এই বিরোধের হিসেব হ'লো ৪০ প্রকার, তবে মোটামুটি হিসেবে ১৮ প্রকার। এ প্রসঙ্গটি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রামাণ্য গ্রন্থ চরকে বলা হ'য়েছে সূত্রস্থানের ২৬ অধ্যায়ে আর সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ২০ অধ্যায়ে।

(১) **দেশবিরোধ—**

প্রথমেই বলে রাখি সেকালে ভেষজবিজ্ঞানীরা দেশকে মোটামুটি ৫ ভাগে ভাগ করেছিলেন। (১) **জাঙ্গল দেশ,** (২) **আনূপ দেশ,** (৩) **ধন্বন দেশ,** (৪) **সাধারণ দেশ,** (৫) **পার্বত্য দেশ।**

জাঙ্গল দেশ ব'লতে—যে দেশে গাছপালা কম, প্রচুর আলো-বাতাস। এ দেশটায় বায়ু এবং পিত্তের আধিক্য হয়, এখানে রোগও হয় বায়ু-পিত্তপ্রধান। এই যেমন বিহারের ও উড়িষ্যার কতকাংশ, ছোট নাগপুরের অঞ্চল বিশেষ, এই বাংলারও কতকাংশ, যেমন বীরভূম ও বাঁকুড়ার অঞ্চল বিশেষকে বলা যেতে পারে জাঙ্গল দেশ।

আনূপ দেশ—এখানে গাছপালা অনেক, এ দেশের মাটি হবে স্যাঁৎসেঁতে, নদী নালা ডোবায় ভরা, যেমন খুলনা, ২৪-পরগণা, যশোহর প্রভৃতি জেলার আঞ্চলিক পরিবেশ; এখানে নারিকেল, কলা, তমাল, বেত, গাব এইসব গাছ বেশী জন্মে। এখানকার লোকের বায়ু ও কফের প্রাবল্য থাকে।

ধন্বন দেশ—যাকে বলা যায় মরুভূমিপ্রধান দেশ, এখানে গাছপালাও খুব বেশী হয় না, সাধারণতঃ দেখা যায় কাঁটা গাছ বেশী হয়। এখানকার লোকের দেহটা পিত্তপ্রধান হয়, এই সব অঞ্চলের লোকে ঘি, দুধ, মাখন খেতে ভালবাসে; এইটাই আয়ুর্বেদ মতে আরোগ্যকর দেশ।

সাধারণ দেশ—সাধারণ দেশ ব'লতে এখানে সব দেশেরই প্রকৃতি কিছু কিছু থাকে।

পার্বত্য দেশ—যেমন হিমাচল প্রদেশ, কাশ্মীর, চট্টগ্রাম, দার্জিলিং জেলার কতকাংশ। এখানকার লোকের আকৃতিটি একটু খর্বাকৃতি হয়। সব থেকে বড় কথা, যে দেশে থাকতে হবে সে দেশের আবহাওয়া, জল অর্থাৎ দেশ-প্রকৃতির উপযোগী যে সব ওষুধ ও পথ্য, সেগুলি গ্রহণ ক'রতে হবে। না হ'লেই দেশবিরোধ হবে।

যেমন জাঙ্গল দেশের মানুষ স্নিগ্ধকর খাদ্য খায়, এ সব অঞ্চলের লোকের রুক্ষ, তীক্ষ্ণ খাদ্য খেলে বাত, পেটের দোষ, আমাশা হ'য়ে যায়, তাই তারা পছন্দ করে ঠাণ্ডা জিনিস।

(২) **কালবিরোধ**—মানুষের জীবনে তিন কালে তিন দোষের বেগ আসে। যেমন বাল্যে পায় শ্লেষ্মা, যৌবনে পায় পিত্ত, আর বৃদ্ধকালে পায় বায়ু। আবার সমস্ত দিনটায়ও তিন কালের ছোঁয়াচ লাগে, সকালের দিকে শ্লেষ্মা, দুপুরবেলা পিত্ত, আর বৈকালের দিকে বায়ু। রাত্রির দিকটায়ও এই তিনের বিবর্তন ঘটে।

এই রকম হলো কালের স্বরূপ—বাল্যের আহার যেমন যৌবনে চলে না, তেমনি যৌবনের আহার বাল্যেও চলে না। এই কাল বিচার ক'রে আহার যেমন দেহের ক্ষেত্রেও দরকার, তেমনি আহ্নিক কালের প্রাত্যহিক খাদ্যবিচারও এই ধরে ক'রতে হয়; বয়সের কাল ধ'রে বলি—শৈশবে দুধ, যৌবনে দই, বার্ধক্যে ঘৃত উপযোগী পানীয় খাদ্য। তাই বৃদ্ধকালে দই খাওয়া কি ভাল?

এমনি শীতকালের খাদ্যগুলিও গ্রীষ্মকালে খাওয়া ভাল নয়; আবার বর্ষাকালের খাদ্য শীতকালেও খাওয়া ভাল নয়।

(৩) **মাত্রাবিরোধ**—সমান মাত্রায় ঘি ও মধু খাওয়া ভাল নয় অথবা যত চিনি তত জল দিয়ে সরবৎ খাওয়াও ভাল নয়। এই যে আমরা সিরণী (সিন্নী) তৈরী ক'রে থাকি, সত্যি কথা ব'লতে কি, এটা কিন্তু মাত্রাবিরোধ ঘটিয়েই তৈরী করা হয়। এই পদ্ধতিতে তৈরী ক'রে কয়েকদিন খেলেই তার অগ্নিমান্দ্য, আমাশা না হয় উদাবর্ত রোগ হবেই।

(৪) **সাত্ম্যবিরোধ**—এই সাত্ম্য ৪ প্রকার—(ক) **গর্ভসাত্ম্য**, (খ) **দেশসাত্ম্য**, (গ) **কালসাত্ম্য**, (ঘ) **ক্রিয়াসাত্ম্য**।

(ক) **গর্ভসাত্ম্য**—মনে করুন আপনি মাতৃগর্ভ থেকেই ভাত ডালের আহারে অভ্যস্ত হয়ে বড় হ'য়েছেন; হঠাৎ আপনি রুটি ছোলা বা যবের ছাতু খাওয়া আরম্ভ করলেন, এইখানেই আপনার সাত্ম্যবিরোধ ঘটতে থাকলো। এইটাই হ'লো গর্ভসাত্ম্য।

(খ) **দেশসাত্ম্য**—যদি বিলেতে বসে, ঘোলের সরবৎ আর ডাবের জল, মৌরি মিছরির সরবৎ খাওয়া যায় তবে অসুখ তো ক'রবেই—এই যেমন পাঞ্জাবে লস্যি না হ'লে তাদের শরীর থাকে না। এইটাকে বলা হয় দেশসাত্ম্য।

(গ) **কালসাত্ম্য**—গ্রীষ্মকালে খুব গরম মশলা দিয়ে মাংস, ডিম রান্না ক'রে অথবা খুব গুরুপাক করে পিঠে-পুলি তৈরী ক'রে খাচ্ছেন; এসব তো শীতকালের খাদ্য। সেটাকে গ্রীষ্মকালে খেলে অসুখ তো ক'রবেই। এইটাকে বলে কালসাত্ম্য।

(ঘ) **ক্রিয়াসাত্ম্য**—ঠাণ্ডা ঘরে বসে যদি সরবৎ খাওয়া যায় কিংবা গরমে বসে যদি ঘি খাওয়া হয়, সেটাতেও যেমন দোষ, আবার চা পানের পর ঠাণ্ডা জল খাওয়াও বেশী ক্ষতিকর হয়, এটায় আমদোষ আসতে বাধ্য। এইটাই হ'লো ক্রিয়াসাত্ম্য বিরোধ।

এই সব সাত্ম্যবিরোধের ফলস্বরূপ আসে হৃদ্‌দৌর্বল্য ও শিরোরোগ।

৫) **অগ্নিবিরোধ**—যাদের স্বাভাবিক কারণে দেহের পাচকাগ্নির বল কম, তাদের

যদি ঘি, মাংস, পায়েস প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য খাওয়ানো হয়, তাদের হবে ক্ষয়মূলক জ্বর, মাথার রোগ, ঊর্ধ্বগত উদাবর্ত এইসব।

(৬) **দোষবিরোধ**—হ'য়েছে গাঁটে বাত, দেওয়া হ'চ্ছে ভাজা বালির বা গরম ন্যাকড়ার সেঁক (রসযুক্ত বাতে ফুলো থাকলে কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া যায়)—এইটাই হয় দোষবিরোধ।

(৭) **সংস্কারবিরোধ**—এটা পূর্বেই বলা হ'য়েছে।

(৮) **বীর্যবিরোধ**—এটাকে চলতি বাংলায় ঠিক বোঝানো যায় না, তবে উপমা স্বরূপ ব'লতে পারা যায় যে বরফ তো ঠাণ্ডা কিন্তু বীর্যে সে উষ্ণ। এই রকম দুধ তো শীতল কিন্তু প্রকৃতিতে সে স্নিগ্ধ উষ্ণবীর্য, গরম তেল কিন্তু গরম নয়, সে প্রকৃতিতে শীতল। এই রকম দুধের সঙ্গে মাছ, মাংসের সঙ্গে দই, ঘিএ তেলে ভাজা তরকারির সঙ্গে দুধ বা দই মিশিয়ে কোন তরকারি রান্না করা—এইখানেই হয় বীর্যবিরোধ।

(৯) **কোষ্ঠবিরোধ**— যাদের ক্রুর কোষ্ঠ থাকে তাদের যদি কোন মৃদুবিরেচক দ্রব্য দেওয়া হয় সেইটাই হয় কোষ্ঠবিরোধ। এই রকম কোমল কোষ্ঠে কোন তীক্ষ্ণ বিরেচন দিলে সেইটাই হয় কোষ্ঠবিরোধ।

এর ফলে হৃদ্দৌর্বল্য, হৃদ্রোগ যেন তাদের কাছে স্বাভাবিক হ'য়ে আসে; অথবা কোমল-কোষ্ঠ ব্যক্তির শ্লেষ্মাঘটিত রোগ হ'য়েছে, তাকে শোষক ঔষধ দেওয়া হলে এর হৃদ্রোগ ও হাঁপানি অনিবার্য হ'য়ে দেখা দেয়।

(১০) **অবস্থাবিরোধ**—যাঁরা পরিশ্রান্ত, যৌন সম্ভোগে ক্লান্ত, এবং উপবাসক্লান্ত তাদিকে যদি বেলের শাঁস খেতে অথবা মেদস্বী, অলস লোককে পান্তা ভাত, দই, কলা, সন্দেশ এই সব খেতে দিলে তাদের আমাশা রোগও ছাড়বে না আর এর সঙ্গে আসবে গ্রহণী রোগ (ক্রণিক কোলাইটিস্)। একেই বলে অবস্থা বিরোধ।

(১১) **ক্রমবিরোধ**—খেতে বসে আগে তেতো খাবে, না মিষ্টি খাবে অথবা কষা খাবে না নোন্তা খাবে, না টক্ খাবে—এটা না জেনে যাঁরা আহার করেন তাঁরা ক্রম-বিরোধের জন্যে অগ্নিমান্দ্য রোগে ভোগেন।

(১২) **পরিহারবিরোধ**—এই ধরুন গরম চায়ের সঙ্গে মিষ্টি খেতে নেই অথবা ভাত খাওয়ার শেষে দই খেতে নেই কিম্বা মাংস ভাত বা মাংস লুচি খেয়ে দুধ বা ক্ষীর খেতে নেই অথবা দই খেতে নেই—এগুলি না জানার নামই পরিহারবিরোধ।

পরিহারবিরোধ না জানা থাকলে রক্তপিত্ত, শিরোরোগ এদের আসা অবশ্যম্ভাবী।

(১৩) **উপচারবিরোধ**—কোন ঠাণ্ডা ঘরে বা গরম ঘরে অথবা খোলা উঠোনে বা হাওয়ার ছাদে বসে, কি কি দ্রব্য খেলে সেইটি হবে দেহের উপযোগী, তা না জানা অথবা কায়িক বা মস্তিষ্কের চালনা করে, তখন দেহের অগ্নি কি খাদ্য চায় তা না বুঝে উপবাস করা অথবা পেট ভ'রে খাওয়া এগুলি হ'লো উপচারবিরোধ। এতে হয় ক্ষয়, জ্বর, পাণ্ডু (এনিমিয়া), শোথ।

(১৪) **পাকবিরোধ**—কোন্ ফল কাঁচা খেতে হয়, কোন্ ফল পাকা খেতে হয় কিম্বা, ভাত, রুটি, লুচির সঙ্গে দই মিশিয়ে খেতে অথবা গুড়, চিনি মিশিয়ে খেতে হয়। তা না জানার নাম পাকবিরোধ অর্থাৎ পরিপাকবিরোধ।

(১৫) **সংযোগবিরোধ**—যদিও এটা পথ্যাপথ্য প্রসঙ্গে বলেছি, তবুও সংক্ষেপে একটু জানিয়ে রাখি। যেমন দইএর সঙ্গে ছাতু ও চিনি মিশিয়ে খাওয়া, রসুনের ফোড়ন দিয়ে কাঁচা কলার তরকারি, বেগুন পুড়িয়ে পেঁয়াজ, রসুন কুচিয়ে মেশানো, শাকে যোয়ান বাটার ফোড়ন দেওয়া,—স্নিগ্ধবীর্যের কোন তরকারিতে কোন উষ্ণ বীর্যের

ফোড়ন দিয়ে খাওয়া—এই যেমন লাউএর তরকারিতে আদা বাটা দেওয়া, চালকুমড়োর সুক্তোয় সরষেবাটা দেওয়া এইগুলি সংযোগবিরুদ্ধ।

(১৬) **হৃদ্‌বিরোধ**—অরুচিতে খাদ্য অনিচ্ছায় বা অপরের ইচ্ছায় খাওয়া, অর্থাৎ কারও কোন বিষয়ে সংস্কার আছে অর্থাৎ সেটা কখনও সে খায়নি অথবা খেতে নেই এই ধারণা বদ্ধমূল এ ক্ষেত্রে কোন দৈব আদেশ অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রভাবে —সেটা অনিচ্ছায় খাওয়ায় হৃদ্‌রোগই হয়।

(১৭) **সম্পদ-বিরোধ**—এই যেমন খেজুর, বেল, আখরোট, বাদাম, মুলো, মুথো, টমাটো, আমড়া, চালকুমড়ো, চালতা, এগুলি কাঁচা ভাল না শুক্‌নো ভাল, কচি ভাল না পাকা ভাল, এই বিচার ক'রে যাঁরা না খান তাঁরা প্রায়ই ক্রিমি ও অজীর্ণরোগে ভুগে থাকেন।

(১৮) **বিধিবিরোধ**—মানুষের সর্বদিক বিচার ক'রে আহার বিহার পালন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই চিকিৎসক, গুরু স্মার্ত—এ'রা অভিজ্ঞতা দ্বারা বিচার করে বা দীর্ঘকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা হিতকর বিধিগুলি পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলিকে কুসংস্কার ভেবে যদি বর্জন করি তা হ'লে তার ফলস্বরূপ রোগ আসা সম্পূর্ণ সম্ভব—এই যেমন স্মৃতিতে ব্যবস্থা আছে—রাত্রে দই খেতে নেই, এটা সকলের ক্ষেত্রে ও গর্ভিণীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে দই ছাতু খাওয়া, রাত্রে খিচুড়ি ও পায়েস খাওয়াটা নিষেধ করা হ'য়েছে। এ ছাড়া তিথি ভেদে খাদ্য পরিহার করা—এইগুলি না মেনে চলার নামই বিধিবিরোধ।

রোগ ও পথ্যের উপসংহারে এইটুকু নিবেদন যে সামর্থ্য, দুধ, মুখ ও বাটি—এই চারটির সমন্বয় হ'লেই তবেই চুমুক দেওয়ার প্রবৃত্তিটি সার্থক হয়—সেই রকম চিকিৎসক, রোগী, রোগ ও পথ্য এগুলির যথাযথ সমন্বয় হ'লে তবেই তো রোগ সারবে?

তাই অনুরোধের সুরে খাদ্যে ও পথ্যে এতগুলি বিরোধের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত ক'রলাম।

রোগানুসারিণী সূচী

পণ্ডিত স্বর্গত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের পুত্র শিবকালী ভট্টাচার্য জন্মেছেন ১৯০৮ সালে, অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলায়।

ছাত্রজীবনে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ঘটনা প্রবাহে এসে পড়েন কলকাতায়; অগ্রজ স্বর্গত কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্যের উৎসাহে তিনি আয়ুর্বেদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রখ্যাত আয়ুর্বেদবিশেষজ্ঞ ৺শচীন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৺জ্যোতিষ সরস্বতী, ৺হারাণ চক্রবর্তী, ৺গণনাথ সেন, ৺নলিনীরঞ্জন সেন প্রমুখের সান্নিধ্যলাভ করেন। পরবর্তীকালেও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডঃ পি. কে. বসু, ডঃ অসীমা চ্যাটার্জি, ডঃ বিষ্ণুপদ মুখার্জি, ডঃ এ. কে. বড়ুয়া, ডঃ বি. সি, কুণ্ডু, ডঃ আর. এন. চক্রবর্তী প্রমুখ মনীষীবৃন্দের সৌহৃদ্য লাভ করেন তিনি।

১৯৩৬—৪০-এর মধ্যে আয়ুর্বেদ ভেষজের ৩টি প্রদর্শনীর পরিকল্পনা এবং পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে তিনি সফলকাম হন, আবার ১৯৬৪ সালে শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে আয়ুর্বেদ প্রদর্শনী শাখার ভারপ্রাপ্ত হ'য়ে সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৪২—৪৭ পর্যন্ত রসায়ণশাস্ত্রের অধ্যাপনা এবং ১৯৬৭ থেকে ৫ বৎসর ভৈষজ্যবিজ্ঞানেও অধ্যাপনা করেন। ঐ সময় তিনি নিজেও উদ্ভিদবিজ্ঞানে জ্ঞানপিপাসু ছাত্র হ'য়ে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সান্নিধ্যে এসেছেন। তাঁর নিষ্ঠিত জীবনের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৬৯ সালে ষ্টেট্ আয়ুর্বেদ ফ্যাকাল্টি বোর্ড আয়ুর্বেদাচার্য উপাধি দান করেন।

আয়ুর্বেদের ভৈষজ্যবিষয়ে এবং রসতান্ত্রিক চিকিৎসা সম্পর্কে গবেষণামূলক কয়েকখানি গ্রন্থের যুগ্ম-সম্পাদনায় তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ ক'রেছেন, এবং সম্প্রতিকালে 'আয়ুর্বেদীয় পরিভাষা পরিক্রমা' নামক একটি বিশিষ্ট গ্রন্থও তাঁর দ্বারা সম্পাদিত হ'য়েছে এবং সেটি পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে গৃহীতও হয়েছে।

....

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

....